Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Documentation of Bengali documents in collaboration with Rabindra Bharati University and the Ford Foundation: microfilmed and digitised in December 2006

Record No: 2006/ 168	Language of work: Bengali
Author (s) / Editor (s): SUDHINDRANĀTH DUTTA (1931 - 1943) SUDHINDRANĀTH DUTTA & HIRANKUMAR SĀNYĀL (JULY 1940 - JUNE 1943)	
Title: পরিচয় PARICAYA	
Volume(s): VOL. 1 no 1 (SRABAN 1338 [JULY 1931] - VOL 12 [ASHADHA 1350 [JUNE 1943]	
Place (s) of Publication: CALCUTTA	Publisher: JAGATBANDHU DUTTA 4 & 5 DALAHAUSI SQUARE. SRI KUNDABHUSAN BHADURI 11 COLLEGE SQUARE ET AL
Year / edition:	
Size: 23·2	Condition of the original: BRITTLE
Remarks: TITLE PAGE MISSING - VOL 4, VOL. 9 PART II VOL 10 PART II TORN VOLUME - VOL. 5 (LITTLE TORN) VOL 7 PART I	
Holding institute: Rabindra Bharati University, Calcutta	Microfilmed and digitised by: Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 2006 - 2007.

Microfilm Roll No:	From gate:	To gate:

পরিচয়

সপ্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪৪ হইতে আষাঢ়, ১৩৪৫

H904

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
ACC. NO. ম 1826
DATE 21-5-2011

পরিচয়

সূচিপত্র

৭ম বর্ষ—২য় খণ্ড : মাঘ, ১৩৪৭—আষাঢ়, ১৩৪৫

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ৭৯৭, ৯০২, ১০০৩, ১২০০

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল—
গানের সমালোচনা ... ৬২৮

৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ—
বাংলা ও ইংরাজী ... ১১৩১

আব্‌দুল কাদির—
সহচরী (কবিতা) ... ১০৬৯

শ্রীআশানন্দ নাগ—
বৈষ্ণবধর্ম্ম ও স্বদেশসেবা ... ৮৬৪

শ্রীকানাই সামন্ত—
নিরুদ্দেশ কামনা (কবিতা) ... ৮৬৩

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—
'মুহূর্ত্তের রিক্ত হাহাকার' (কবিতা) ১১৮০

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—
জাতিস্মর (কবিতা) ... ১১৭৯

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়—
প্রান্তর (কবিতা) ... ৮৬২

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ৭৯২, ১১০৩

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত—
পুস্তক-পরিচয় ... ৯৯৭

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—
মা (গল্প) ... ১১৪১

শ্রীদর্শন শর্ম্মা—
পুস্তক-পরিচয় ১০৯৬, ১১৯৭

শ্রীদিলীপকুমার রায়—
বিশ্বরূপ (কবিতা) ... ৯৮৪

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—
অব্যক্ত (কবিতা) ... ৭৩০

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ... ৯৯৩

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—
পুস্তক-পরিচয় ... ৮৯৮

শ্রীনবেন্দু বসু—
পুস্তক-পরিচয় ... ১০৯৮

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—
কাব্যের মহত্ব ... ১১৭২

শ্রীনিশিকান্ত—
গরুর গাড়ী (কবিতা) ... ৯৮৬

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY LIBRARY 11904

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য—
ইউরোপ ও অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ১০৪১
পুস্তক-পরিচয় ... ৬৯৪

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়—
তুমি ও আমি (কবিতা) ... ৬৮১
বিচ্ছেদ „ ... ৬৮২
পূর্ণিমা „ ... ১১৭৮
পুস্তক-পরিচয় ৮৯৪, ১১৮৯

শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী—
পুস্তক-পরিচয় ১১৯২

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ—
পুস্তক-পরিচয় ... ৮০০

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক—
পুস্তক-পরিচয় ৯৮৮, ১১৮২

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—
গানের প্রাচীন ধারা ... ৮২৬
পুস্তক-পরিচয় ৭৯৪, ১০০৫, ১০৮৩, ১২০৫
বাংলাদেশে বৈদিক সভ্যতা ... ১১৫৫

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—
পুস্তক-পরিচয় ... ৬৯০
শরৎচন্দ্র ... ৭৮২

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ—
সৎকার্য্যবাদ (খণ্ডন) ... ৬৫৬
পুস্তক-পরিচয় ... ৮৮৬

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ১১০৪, ১১৯৪

শ্রীবিশ্বতোষ দত্ত—
পুস্তক-পরিচয় ... ৭৮৯

শ্রীবিষ্ণু দে—
পুস্তক-পরিচয় ... ১১০১
বিভীষণের গান (কবিতা) ... ১১৭৭

শ্রীভোলানাথ ঘোষ—
শিবের গীত ... ৭৭৪

শ্রীমণীশ ঘটক—
ঝড়কে ডানায় পুষে (কবিতা) ৬৮০
তারপর „ ১০৬৭
শুভ্রা „ ১০৬৭

শ্রীরজত সেন—
শেষ রাত্রির চাঁদ (গল্প) ... ১০১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
কথা ও সুর ... ৭২৫
বুদ্ধভক্তি (কবিতা) ... ৭০৫

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—
নিষ্ফলা (গল্প) ... ৯২২

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—
ট্র্যাজেডি ও তাহার বিবর্ত্তন ... ৯৫৮

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—
পুস্তক-পরিচয় ৬৯৮, ১০৯০

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য—
ওরা (কবিতা) ... ১০৬৮

শ্রীসমর সেন—
বর্ষশেষ (কবিতা) ... ৭৫৯
পুস্তক-পরিচয় ... ৭০৩

শ্রীসমীর রায়—
ৎসিগান (গল্প) ... ৭১৫

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী—
সোমলতা (উপন্যাস) ৬৪৬, ৭৬১, ৮৩৯, ৯৪৬, ১০৫১, ১১১৫

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—
নিতুই নব (কবিতা) ... ৭২৮

শ্রীসুকুমার দে সরকার—
মানুষ (গল্প) ... ৮১৫

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত—
ভীক্টোরীয় ইংলণ্ড ... ৯০৭

শ্রীসুশোভন সরকার—
সাম্যবাদের সঙ্কট ... ৮৪৯

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—
ভারতপথে (উপন্যাস) ৬৬৯, ৭৩১, ৮৭৫, ৯৭৪, ১০৭১, ১১৬৩
পুস্তক-পরিচয় ... ৭৯৮

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—
দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র ... ১১০৭
পুস্তক-পরিচয় ৭৮৪, ১০৮৬
প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের 'দৃষ্টি' ... ১০০৭
মধুরা রতি ... ৬০৫
সাংখ্যের সাংপরায় ৭০৭, ৮০৫, ৯৩৫

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
চীনের প্রতিরোধ ... ৬৮৩
পুস্তক-পরিচয় ... ১২০১

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত—
কসাইখানা (কবিতা) ... ৮৭৩

হুমায়ুন কবির—
ভারতবর্ষ (কবিতা) ... ৮২৩

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়—
সমালোচনার আলোচনা ... ৭৪৫

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
11904
1689

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪৪

পরিচয়

মধুরা রতি

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি 'রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ' অর্থাৎ শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি। অতএব ভক্ত পঞ্চবিধ—শান্তভক্ত, দাসভক্ত, সখা-সখীভক্ত, বৎসল-ভক্ত ও মধুর ভক্ত। গতবারে শান্ত-ভক্তি, দাস্যভক্তি, সখ্যভক্তি ও বাৎসল্য-ভক্তির যথা-সম্ভব আলোচনা করিয়াছি। আমরা জানিয়াছি—

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ

* * *

শান্তের গুণ দাস্যে আছে—অধিক সেবন
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ

* * *

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়
দাস্যে সম্ভ্রমগৌরব সেবা—সখ্য বিশ্বাসময়

* * *

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন
সখ্যের গুণ অসংকোচ অ-গৌরব সার
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার।

ঐ বাৎসল্য-ভক্তির উপর মধুর বা উজ্জ্বলা ভক্তি অর্থাৎ কান্তভাবে ভগবানের ভজনা। চরিতামৃতকার বলেন—

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥

অর্থাৎ, মধুর ভজনে 'রতি'—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের সীমা ছাড়াইয়া 'মহাভাবে' পর্য্যবসিত হয়। এই মহাভাব দ্বিবিধ :—'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'। এ-সম্পর্কে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণে' বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ।

আর—কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্ত বৃশ্চিক সর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতি, সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।

এই মধুর ভজনে জীব পৌরুষ বর্জ্জিয়া প্রকৃতি হয় এবং ভগবান্‌কে বলে,—

মধু হ'তে মধু তুমি প্রাণ বঁধু
চরণের দাসী কর।
কিছু নাহি চাব চরণ সেবিব
দেহ নাথ এই বর!

খৃষ্টীয় মিষ্টিকের ভাষায়—

It is a passive and joyous yielding up of the virgin soul to its Bridegroom; a silent marriage-vow. সে অবস্থায়, it is ready for all that may happen to it, all that may be asked of it—to give itself and to lose itself, to wait upon the pleasure of its Love. (Underhill. p. 301)

মধুর ভক্তের উদাহরণে চরিতামৃতকার বলেন—

মধুর-রস-ভক্তমুখ্য ব্রজে গোপীগণ
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন।

পুনশ্চ,—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার
লক্ষ্মীগণ এক নাম, মহিষীগণ আর,
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার।
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে।

অর্থাৎ এই মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ ও পুরে রুক্মিনী আদি পত্নীগণ—আর পরকীয়া—বৃন্দাবনে গোপীগণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধা, যিনি গুণৈঃ বরীয়সী, যিনি হরেঃ অত্যন্ত-বল্লভা।

অতএব মধুররস কহি তার নাম
স্বকীয়া পরকীয়াভাবে দ্বিবিধ সংস্থান
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

গত ভাদ্র ও আশ্বিনের 'পরিচয়ে' আমি এই পরকীয়া-তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তবে এ কথা বলিতে চাই যে, পরকীয়া মধুর রসের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধায়—তাঁহাতেই মহাভাবের অতিম্নী (acme)—তিনি 'মহাভাবময়ী'। শ্রীরাধা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—

Radha then is the prototype of all lovers of God, male or female, only her love is human love raised to the *n*th power. For, if I may employ the words of Gertrude More, "never there was or can be imagined such a love as there was between this humble soul (Radha) and God." So she is called Mahabhabamayi.*

* See my article 'God as Love' in March 1936 Theosophist pp. 499-509

শ্রীরাধা—'কুলশীল লাজ ভয়, তেয়াগিয়া সমুদয়' জীবন যৌবন মন সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
সুদুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
—চরিতামৃত, আদিলীলা

নিজ অঙ্গে রূপে গুণে বৈদগ্ধীর সীমা
অনন্ত মমতা করে নিরুপাধি প্রেমা
ইহলোক পরলোক খায় সর্ব্ব আগে
নিষিদ্ধ করিয়া লোকে বেদে বলে যাকে।
—দুর্লভসার

অর্থাৎ ধর্মাধর্ম-অনপেক্ষ ভাবে তাঁহার সানুরাগ আত্মনিবেদন—ভাগবত যাহাকে বলিয়াছেন 'মদর্থোজ্‌ঝিত লোক-বেদ-স্ব' (১০।৩২।২০) [স্ব=আত্মীয়] —অথচ সর্ব্বস্ব নিবেদিয়াও তিনি অতৃপ্তিতে বলেন—

বন্ধু! তোমার পিরীতি সুখ সাগরের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙা চরণ জীয়ন্তে যেন দেখি॥

সর্ব্বদা, তাঁহার প্রাণের কথা এই—

বধু! কি আর বলব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

তোমারি চরণে আমারি পরাণে
বাঁধিল প্রেমেরি ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিচয় হলেম দাসী।
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥
—চণ্ডীদাস

তিনি বলেন—আমার স্বতন্ত্র সুখ দুঃখ নাই—

তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।

তিনি বলেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি কৃষ্ণপদদাসী তিঁহ রস সুখ রাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনু মন,
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ—অন্য নয়।

সেই জন্য বৈষ্ণব বলেন—রাধয়া মাধবো দেবঃ মাধবেনৈব রাধিকা—যখন কৃষ্ণের বিরহ তাপ তাঁহাকে দগ্ধ করে, তখন তিনি বলেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥
উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।

বৈষ্ণব পরিভাষায় এ ভাবের নাম মাদন—ইহাই মহাভাবের চরম—রাধিকা ভিন্ন অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয় না—(কেবল রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবে সময় সময় দৃষ্ট হইত)।* এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'উজ্জ্বল নীলমণি-কিরণে' লিখিয়াছেন—

'অধিরূঢ়' মহাভাবের মোদন ও মাদন এই দ্বিবিধ ভেদ। মোহনোঽয়ং প্রবিশ্লেষ দশায়াং (অর্থাৎ বিরহের অবস্থায়) মাদনো ভবেৎ * * প্রায়শো বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং মাদনোঽয়ম্ উদঞ্চতি। মাদনস্য এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ; যত্র উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদয়ো প্রেমময্য অবস্থাঃ সন্তি। * * এষ মাদনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়াম্ এব নান্যত্র।

অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র জল্প মোহন দুই ভেদ॥

উদ্‌ঘূর্ণাবিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান॥
—চরিতামৃত

এই সকল কথা মনে রাখিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন॥
* * *

* এ সম্পর্কে 'পরিচয়' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত আমার 'সঙ্গম ও বিরহ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রস মোরে করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
* * *
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ান।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগে-য়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
* * *
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥
* * *
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি তবু নাহি পাই অন্ত॥
* * *
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধাসুখ শত অধিকাই॥

শ্রীরাধার মুখেও আমরা এই কথাই শুনিতে পাই—

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়
কানুক পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবহুঁ হিয়া জুড়ন না গেল।

ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি কেন জয়দেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

ইতস্তত স্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥
—গীতগোবিন্দ ৩।৩

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাঞ্ছাতে একা রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি—কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা॥
শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

সেই জয়দেবের কথা—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

—গীতগোবিন্দ, ৩।১

অতএব আমরা দেখিলাম যে, ঐ রতি-পঞ্চকের মধ্যে, শান্তরতিতে শরণাগতি ও সংভ্রম (ইস্‌লাম), দাস্যরতিতে সংভ্রমের উপর সেবার যোগ, সখ্য-রতিতে সংভ্রম ও সেবার উপর সৌহার্দ্দ্যের যোগ—বাৎসল্যরতিতে সংভ্রম, সেবা ও সৌহার্দ্দ্যের উপর স্নেহ বা পালনের যোগ, এবং সর্ব্বশেষ মধুরে বা কান্তারতিতে সংভ্রম, সেবা, সৌহার্দ্দ্য ও স্নেহের উপর সংরাধন, আত্মনিবেদন, সম্মিলনের যোগ। সখ্য ও বাৎসল্য রতিতে যথেষ্ট মমতা আছে কিন্তু মিলন নাই। সেইজন্য কান্তাভাব চাই—বিশেষতঃ রাধার ন্যায় পরকীয়-ভাবে ভজন চাই।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যসখ্যবাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

—চরিতামৃত

এ কথা বুঝাইতে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

অন্যত্র—

আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

প্রশ্ন উঠে—এ পঞ্চরতির মধ্যে কোন্ রতি শ্রেষ্ঠ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, না শৃঙ্গার? ইহার উত্তর এই যে, যাহার যে রতি—সে রতি যদি আন্তরিক ও আত্যন্তিক হয়—তবে তাহার কাছে তাহাই শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম

—চরিতামৃত

পুনশ্চ—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার
চারিবিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি
সর্ব্বরস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

এইরূপ তটস্থভাবে বিচার করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য
মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য

শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়
দাস্তরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।
শান্তাদিরসের যোগ-বিয়োগ দুই ভেদ
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে।

* * *

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি

মহাভাবময়ী শ্রীরাধাকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্ত ও ভাবুকগণ এই অধিরূঢ় মহাভাবরূপ মধুর রতির কি চমৎকার বিবরণ ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন—'পরিচয়ে'র পাঠকবর্গকে 'প্রেমের প্রগতি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অভিসার ও সঙ্গম' 'মান ও মানান্ত' 'মাথুর' ও 'মাথুরের পর মিলনে'র মধ্য দিয়া,—'মহামিলন' পর্য্যন্ত প্রবন্ধাবলীতে প্রেমের পরিণতি ও চরমে পর নির্বৃতির কতকটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধাবলীর প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এ আলোচনা এখানেই সাঙ্গ করিলাম।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

লক্ষ্মীছাড়া

লক্ষ্মীছাড়া অনেক থাকে বটে, কিন্তু ছিষ্টে সরকারের মত লক্ষ্মীছাড়া আর দুটি ছিল না। জন্মিবার মাস কতক পরেই সে মাকে খাইল; তিন বৎসর বয়সে বাপও মারা গেল। বিধবা পিসী মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করিতে লাগিল। কিন্তু ছিষ্টের অদৃষ্টদেবতার ইহাও সহ্য হইল না। কালের ডাকে পিসীও অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তখন ছিষ্টের বয়স সাত বৎসর মাত্র। উপরের একজন ছাড়া তাহাকে দেখিবার আর কেহ রহিল না।

ছিষ্টের জ্যাঠা ছিল জ্যাঠী ছিল। কিন্তু জ্যাঠী নিজের সংসার ছেলেপিলে লইয়া অস্থির। আর জ্যাঠা গোবিন্দ সরকার লোকের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির এবং হরিনামের মালা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং ছিষ্টেকে দেখিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না। ছিষ্টে বামুনপাড়ার গরু চরাইয়া, বামুনদের পাতের ভাত খাইয়া মানুষ হইতে লাগিল।

ছিষ্টের বাপের লাখরাজ জমায় দশ-বারো বিঘা জমী ছিল, খিড়কী পুকুরের অর্দ্ধেক অংশ ছিল। গোবিন্দ সরকার শুধু দায়ে পড়িয়াই ভ্রাতুষ্পুত্রের জমী জায়গার দেখা শোনা করিতে লাগিলেন। আর ছিষ্টেকে দেখিতে লাগিল উপরওয়ালা।

এই অদৃশ্য উপরওয়ালার অযাচিত করুণার বলে ছিষ্টে যখন চৌদ্দ বৎসরে পড়িল, তখন জ্যাঠা একদিন তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে ছিষ্টে, আমার ভাইপো হ'য়ে তুই লোকের গরু চরিয়ে বেড়াবি, এটা কি ভাল দেখায়? তুই আমার ঘরে থাক্।"

ছিষ্টের তখন বামুনদের পান্তা ও পাতের ভাতে অরুচি জন্মিয়া গিয়াছিল। সুতরাং জ্যাঠার কথায় সে হাতে চাঁদ পাইল। জ্যেঠার আশ্রয়ে থাকিতেই স্বীকৃত হইল।

জ্যাঠার ঘরে থাকিয়া ছিষ্টে গরম ভাতের মুখ দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সারাদিন মাঠে যে খাটুনী খাটিতে হইত, তাহাতে সে পান্তা

ভাত ও গরম ভাতের মধ্যে কোন্‌টা তাহার পক্ষে অধিক সুখকর, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। জ্যাঠার তিন চারিটি গরু ছিল। ছিষ্টে আসিবার পরই রাখালটা সেই যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। জ্যাঠা বলিলেন, "ওরে ছিষ্টে, গো-সেবা পরম ধর্ম্ম। বারো বৎসর গোয়াল পরিষ্কার করলে হাতে পদ্মগন্ধ হয়।" ধার্ম্মিক জ্যাঠার আদেশ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিষ্টেকে এই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইল।

ছোট ছেলেটা তাহার এমনই নেওটা হইয়া পড়িয়াছিল যে, ছিষ্টের কোলছাড়া সে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিত না। একবার মাটীতে বসাইয়া দিলে চীৎকারে পাড়া মাথায় করিত। রোদনান্তে তাহার নাসানিঃসৃত জলধারা পরিষ্কার করিতে ছিষ্টের কাপড়ের খুঁট ভিজিয়া যাইত।

এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিষ্টে একদিন জ্যাঠা মহাশয়ের নিকট গরম ভাত ও পান্তা ভাতের পার্থক্য বুঝিয়া লইতে গেল, জ্যাঠা শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "ওরে হতভাগা, সে যে পরের ভাত, লোকে বল্‌তো—অমুকের চাকর। আর এটা নিজের ভাত, তুই কি আমার আর পর রে? আপনার ভাইপো যে।"

ছিষ্টেও বুঝিল, কথাটা মিথ্যা নয়। বাপ আর জ্যাঠায় কি প্রভেদ আছে? সুতরাং সে দিনরাত খাটিয়া দুইবেলা দুই মুঠা ঘরের ভাত খাইতে লাগিল। আর জ্যাঠা মামলায় এবং হরিনামে অধিকতর মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইয়া হরিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মাস কতক পরে গোবিন্দ সরকার একদিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু ছিষ্টিধর, তোমার জমী জায়গাগুলো পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্চে, তার চেয়ে ওগুলো বেচে ফেল। ওর একটা বিলি বন্দেজ হোক্‌।"

ছিষ্টে জ্যাঠার পরামর্শে সম্মতিদান করিল। বিপিন চক্রবর্ত্তী তাহাকে বলিলেন, "মর বেটা চাষা, জমী বেচবি কি দুঃখে?"

ছিষ্টে বলিল, "জ্যাঠা বলেছে, ওগুলোর বিলি বন্দেজ হবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তোর সাত পুরুষের মাথা হবে। আমাকে কবুলতী ক'রে দে। বছর বছর খাজনা পাবি, জমী তোরই থাকবে।"

ছিষ্টে গিয়া জ্যাঠাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। জ্যাঠা মালা জপিতেছিলেন। জপ বন্ধ রাখিয়া তিনি বলিলেন, "লোকের কথায় কান দিস্‌ নে বাবা, লোকে

কি কারু ভাল দেখতে পারে? আমি আপনার লোক, আমি তোর মন্দ করবো, আর পরে ভাল করবে? বলে—মার চেয়ে দরদী যে, তারে বলি ডান।"

সেদিন রাত্রিতে আহার কালে জ্যাঠা আপনার পাতের মাছের মুড়াটা ভাইপোর পাতে তুলিয়া দিলেন। গৃহিণী প্রতিবাদের সুর তুলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্যাঠা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, থাক্‌। ওকি আমার পর? ও খেলেই আমার খাওয়া হ'লো।"

মাছের মুড়াটা যত মিষ্ট না হউক, জ্যাঠার এই কথাগুলো ছিষ্টের এত মিষ্ট লাগিল যে, তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

পরদিন সকালেই গোবিন্দ সরকার ভাই-পোকে লইয়া রামপুরের রেজেষ্ট্রী অফিসে গেলেন। ছিষ্টে জ্যাঠার শিক্ষামত খাওয়া-পরার জন্য জমী বিক্রয় করিতেছে—ইহা রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে স্বীকার করিয়া টিপসই দিয়া জমীজায়গা বেচিয়া আসিল। আসিবার সময় জ্যাঠা তাহাকে সাড়ে সাত আনা দিয়া একটা গেঞ্জী কিনিয়া দিলেন।

গ্রামের লোকে বলিল, ছোঁড়াটা কি লক্ষ্মীছাড়া।

(২)

"দিদি। ও দিদি।"

দিদি মুখঝামটা দিয়া উত্তর করিল, "কেন?"

ক্রুদ্ধভাবে ছিষ্টে বলিল, "কেন আবার কি? আমি এলাম ভোর দুপুর খেটে, আর উনি ঘরে শুয়ে শুয়ে বলছেন কেন? বাঃ রে।"

কথাটা হইতেছিল, গোবিন্দ সরকারের বিধবা কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে। বিধবা হইয়া সে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

ছিষ্টে একটু অপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তবু যে শুয়ে রইলে?"

বিধু বলিল, "উঠে কি করবো?"

ছিষ্টে বলিল, "ভাত দেবে, আর করবে কি?"

বিধু মুখটা বালিসে গুঁজিয়া বলিল, "ভাত নাই।"

বিস্মিত-কণ্ঠে ছিষ্টে বলিয়া উঠিল, "ভাত নাই।"

বিধু বলিল, "না। রাঁধা বাড়ার পর মামার বাড়ীর একজন লোক এসেছিল। সে তোর ভাত খেয়ে গেছে।"

ছিষ্টে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর উগ্রকণ্ঠে বলিল, "বাঃ রে, ভাত খেয়ে গেছে, তা আমি খাবো কি?"

বিধু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তীব্রস্বরে বলিল, "আমার মাথা খেতে পারবি?"

বিধুর গলাটা যেন ভারী হইয়া আসিল। ঈষৎ হাসিয়া ছিষ্টে বলিল, "যে রকম পেটের জ্বালা ধরেছে, খেতে থাকলে তা খুব পারতাম দিদি।"

বিধু মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল। ছিষ্টে সহাস্যে বলিল, "তুমি যে কেঁদে ফেল্‌লে দিদি।"

বিধু ভ্রুকুটি করিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বোয়ে গেছে আমার কাঁদতে। তোর মত লক্ষ্মীছাড়ার জন্য আবার মানুষে কাঁদে।"

ছিষ্টে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "সত্যি দিদি, তুমি ছাড়া আমার জন্য আর কেউ কাঁদে না।"

বিধু কোনও উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছিষ্টে মাটীতে পা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তাই তো দিদি, মুড়ি-টুড়ি কিছু নাই? উঠে দেখ না?"

ধরা গলায়, "আমি পারবো না," বলিয়া বিধু আবার শুইয়া পড়িল। ছিষ্টে বলিল, "তবে কি আমি উপোস দেব নাকি?"

তীব্রকণ্ঠে বিধু বলিল, "তোর কপাল! বেটাছেলে, হাত পা আছে, আর কোথাও এই খাটুনী খাটলে তো দু'বেলা পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচিস্।"

ছিষ্টে কোনও উত্তর দিল না; শুধু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

গৃহিণী আহারান্তে গালে দোক্তা ও কোলে ছেলে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাড়ীতে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই ছিষ্টেকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ছিষ্টে, ছেলেটা তো কেঁদে সারা হয়ে গেল। নে, একবার ধর্।"

ছিষ্টে করুণদৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিল। বিধু উঠিয়া বসিল, এবং মাতার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, "শুধু ছেলেটা দিচ্চ

কেন মা, তুমি আছ, বাবাকে ডাক, আর কেউ থাকে ডেকে নিয়ে এস। সকলে মিলে ছোঁড়াটার বুকে চেপে ব'সো।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কেন বল্ দেখি বিদি, আজকাল দেখছি তোর বড় কথা হ'য়েছে।"

বিধু উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কথার মত কাজ করলেই কথা শুনতে হয় না। তোমরা কি মানুষ?"

গর্জ্জন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, মানুষ শুধু তুমি। আচ্ছা আসুক বাড়ীতে; আমার সঙ্গে সমানে কথা! খেংরা মেরে বিদায় করবো, তা জানিস্?"

মাতার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে বিধু বলিল, "তা তোমরা পার মা।"

বিধু জোরে জোরে পা ফেলিয়া রান্না ঘরে ঢুকিল।

হাঁড়িতে একমুঠো পান্তভাত ছিল। কতকটা আমানির সহিত সেই ভাতগুলি একটা পাথরে বাড়িয়া বিধু ছিষ্টেকে ডাকিল। ছিষ্টে সহর্ষে উঠানে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় সরকার মহাশয় সদর দরজা হইতে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে ঢুকিলেন—"বাবু গেলেন কোথায়? গরুগুলো মাঠ থেকে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া আমার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি, গরুর শাপে যে সব যাবে।"

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "থামো, আগে নিজের পিণ্ডি দান হোক্। গরুর কি আবার ক্ষিদে তেষ্টা আছে?"

ক্রুদ্ধভাবে সরকার মহাশয় বলিলেন, "ওগো বাবু, গরুগুলোকে এক মুঠো ঘাস জল দিয়ে এসে নিজের পিণ্ডি চটকাও না। গরু যে সাক্ষাৎ ভগবতী, ভগবতীর নিঃশ্বেসে যে ভিটে উঠে যাবে।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলিলেন, "তুমিও যেমন, ঐ তিন-কুল-খেকো লক্ষ্মীছাড়াকে আবার ঘরে ঠাঁই দেয়।"

রান্নাঘর হইতে বিধু ডাকিল, "ছিষ্টে!"

ছিষ্টে বলিল, "আগে গরুগুলোকে খাবার দিয়ে আসি দিদি।"

ছিষ্টে চলিয়া গেল। "চুলোয় যা" বলিয়া বিধু ভাত আমানী আবার হাঁড়ীতে ঢালিয়া রাখিয়া রাগে গর-গর করিতে করিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহিণী তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিদির আজ কাল বড্ড বাড় বেড়েচে দেখচি।"

গম্ভীর স্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "বাড়লেই পড়তে হয় গিন্নী, দর্পহারী মধুসূদন আছেন। তিনি কারো বাড় রাখেন না। হরি বল মন, হরি বল।"

(৩)

গোবিন্দ সরকারের মেয়ে বিধুর হৃদয়টা ঠিক বাপের মত ছিল না। দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা এতই কোমল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দুঃখীর দুঃখে তাহা ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। সুতরাং ছিষ্টের জন্য তাহার প্রাণটা আপনা হইতেই কাঁদিয়া উঠিত। কিন্তু প্রতিকার করিবার উপায় তাহার ছিল না। তাহার ইচ্ছে, ছিষ্টে অন্যত্র খাটিয়া খাউক। কিন্তু ছিষ্টের তাহাতে সম্মতি ছিল না। জ্যাঠার বাড়ী ছাড়িয়া দিদিকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে তাহার মন সরিত না। বিধু তাহাকে তিরস্কার করিত, গালাগালি দিত; ছিষ্টে হাসিমুখে নীরবে সে স্নেহ-কোমল তিরস্কার সহিয়া যাইত। এই তিরস্কার, এই গালাগালির ভিতর এমন একটা স্নেহের আস্বাদ অনুভব করিত যে, দুঃখের জীবনে এই আস্বাদটাই তাহার লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহার এই লোভনীয় জিনিষটুকুর জন্য দিদিকে যে কতটা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত, তাহা ছিষ্টে জানিত না। যে দিন জানিতে পারিল, সে দিন সে জ্যাঠার আশ্রয় ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। জেঠাও ইহাতে অসম্মত ছিলেন না। বলিলেন, "তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার। তুমি দু'বেলায় যা খাও তার অর্দ্ধেক খরচে একটা লোক থাকবে! গরু-বাছুরগুলোও খেয়ে বাঁচবে।"

ছিষ্টে বলিল, "বেশ, কিন্তু আমার জমী জায়গাগুলো?"

জ্যাঠা বলিলেন, "সে সব তো তুমি বেচে ফেলেছ।"

ছিষ্টে জিজ্ঞাসা করিল "বেচেছি তো, তার টাকা কোথায়?"

জ্যাঠা বলিলেন, "টাকা কোথায়, তা আমি জানি কি?"

ছিষ্টে রাগিয়া বলিল, "তবে সব জুয়াচুরি!"

কি? পরমধার্ম্মিক গোবিন্দ সরকার জুয়াচোর! জ্যাঠা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ের জুতাটা খুলিয়া সজোরে ছিষ্টের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

জুতাটা গিয়া ছিষ্টের কপালে লাগিল। ছিষ্টে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ছিষ্টে গিয়া বিপিন চক্রবর্ত্তীকে চাপিয়া ধরিল; বলিল, "বামুনকাকা, আমার যা হয় একটা উপায় করে দাও।"

বিপিন চক্রবর্ত্তীর সহিত গোবিন্দ সরকারের একটু বিবাদ ছিল। সরকার মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া প্রতিপক্ষকে জয়ী করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বিপিন বাবু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায় পাইয়া ছিষ্টেকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "উপায় তোমার করে দিতে পারি, তুমি আমার কথা মত চলবে?"

ছিষ্টে তাঁহার কথামত কাজ করিতে স্বীকার করিল। বিপিন বলিলেন, "বেশ, তোমার জমী জায়গা সব বার করে দেব, তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে স্থিতু করব।"

ছিষ্টে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে!"

বিপিন বলিলেন, "হাঁ! বিয়ে। শ্রীপতি ঘোষ মারা গেছে। তার বিধবা স্ত্রী আর একটা মেয়ে আছে। তাদের দেখবার শুনবার কেউ নাই। তোমাকে ওর জামাই হ'য়ে তাদের দেখা শোনা করতে হবে।"

ছিষ্টে শ্রীপতি ঘোষকেও জানিত, তাহার মেয়ে পুঁটিকেও জানিত। মেয়েটি দেখিতে বেশ। কিন্তু তাহার সহিত যে বিবাহ হইতে পারে, এ কথাটা ছিষ্টে আদৌ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

বিপিন বলিলেন, "আমি বললেই দেবে। কিন্তু বাপু, তোমার এরকম লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে থাকলে চলবে না, আগে জমী জায়গাগুলো উদ্ধার করতে হবে।"

ছিষ্টে বলিল, "আমি যে সব বেচে ফেলেছি।"

বিপিন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বিক্রয় করিলেও তাহা আইন-সিদ্ধ হয় নাই, কেন না, নাবালকের দান বিক্রয়ে অধিকার নাই। মোকদ্দমা করিলেই সমস্ত বিষয় বাহির হইয়া আসিবে। ছিষ্টে মোকদ্দমা করিতে টাকা কোথায় পাইবে জিজ্ঞাসা করিলে বিপিন বলিলেন, "সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, টাকা যা

খরচ হয়, আমি দিব ; কিন্তু বাপু, এর পর খালধারের আড়াই বিঘা জমীটি আমায় দিতে হবে।"

ছিষ্টে জমী দিতে স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তত দিন আমি থাকবো কোথায় ? খাব কি ?"

বিপিন বলিলেন "ততদিন তোমার হবু শ্বশুরবাড়ীতেই থাকবে, সেইখানেই খাবে দাবে।"

ছিষ্টে বামুনকাকার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

(৪)

বিধু যখন রায়দীঘিতে গা ধুইয়া ফিরিতেছিল, তখন ছিষ্টে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে ছিষ্টে, তোর নাকি বিয়ে ?

ছিষ্টে বলিল, "হাঁ দিদি, বামুনকাকা আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

বিধু বলিল, "তা বেশ, বামুনকাকার কথামত চলবি। যা বলে, তাই করবি।"

ছিষ্টে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা আর শুনবো না দিদি, আমার বিয়ে হবে, জমী জায়গা সব ফিরে পাব। তবে কি জান—"

বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি ?"

ছিষ্টে বলিল, "আর কিছু নয়, তবে জ্যাঠার সঙ্গে মোকদ্দমা—"

বিধু একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "তা হোক মোকদ্দমা, খবরদার বলছি, বামুনকাকার কথার একটুও এদিক-ওদিক করিস্ নে। তাহ'লে তোর মুখ পর্য্যন্ত দেখব না।"

ছিষ্টে বলিল, "না দিদি, তা করব না। তা হ'লে তোমার এতে মত আছে ?"

বিধু বলিল, "খুব মত আছে।"

ছিষ্টে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিধু ডাকিয়া বলিল, "হাঁ রে ছিষ্টে ?"

ছিষ্টে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হবু শাশুরী তোকে কেমন যত্ন করে রে ?"

ছিষ্টে সহাস্যে উত্তর করিল, "তা খুব যত্ন করে। তবে তোমার মত কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া বিধু বলিল, "আমার মত গাল দিতে পারে না বুঝি ?"

ছিষ্টে বলিল, "গাল ? তা দিদি, তোমার মত গাল যদি দেশ শুদ্ধ লোকে দেয়—"

ছিষ্টে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল।

বিধু রাগতভাবে বলিল, "যা যা, আর তোর অত ন্যাকামো করতে হবে না।"

ছিষ্টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিধু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, বৌ তোর সামনে আসে ? কথা টথা কয় ?"

ছিষ্টে মুখ টিপিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বিধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তারপর একদিন গিয়ে দেখে আসবো।"

মুখ তুলিয়া ছিষ্টে বলিল, "বিয়ের সময় যাবে না ?"

বিধু বলিল, "যাব না কেন। তুই নিয়ে যাবি তো ?"

মুখ ভার করিয়া ছিষ্টে বলিল, "নাঃ।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে", বলিয়া বিধু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

(৫)

গোবিন্দ সরকার যখন শুনিলেন যে, ছিষ্টের জমী জায়গা ভোগ করার জন্য ছিষ্টে তিন বৎসরের জমীর আয় বাবদ তাঁহার নামে দুইশত তিয়াত্তর টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিয়াছে, তখন তিনি কয়েকবার শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া জবাব দিয়া আসিলেন যে, তিনবৎসর আগে তেরো শত একচল্লিশ সালের চৈত্র মাসের সাত তারিখে সৃষ্টিধর সাত শত একচল্লিশ টাকা মূল্যে এই সকল জমী জায়গা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছে, এবং সেই বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রার সাহেবের দ্বারা রীতিমত রেজিষ্টারী হইয়াছে। এক্ষণে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় সৃষ্টিধর তাঁহার বিরুদ্ধে এই বে-আইনী নালিশ করিয়াছে।

ইহার জবাবে সৃষ্টিধর বলিল, "প্রতিবাদীর কথিত তারিখে সে একখানা বিক্রয় কোবালা রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সে স্বেচ্ছায় করে নাই, বা সে জন্য তাহাকে এক পয়সাও দেওয়া হয় নাই। তাহার নাবালক অবস্থায় তাহাকে ভুলাইয়া এই দলীল লেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিবাদীর দাখিলা এই বিক্রয় কোবালা আইন অনুসারে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

গোবিন্দ সরকার মোকদ্দমায় ঝাহ্নু। মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া তিনি মাথার চুল সাদা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ মোকদ্দমায় তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। উকীলও মোকদ্দমা মিটাইয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। সরকার মহাশয় কিন্তু মিটাইবার মত কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। বিপিন চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ছিষ্টিধরের জমীর সঙ্গে গোবিন্দ সরকার যদি নিজের তিন বিঘা জমী ফিরাইয়া দেন, তবেই মোকদ্দমা মিটিতে পারে।" সরকার মহাশয় ছিষ্টিধরের অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিপিন চক্রবর্ত্তী তাহাতে কান দিলেন না, হাসিয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিলেন। সরকার মহাশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল। বিশে অগ্রহায়ণ ছিষ্টের বিবাহের দিনস্থির হইল। ১৫ই মোকদ্দমা মিটিয়া গেলেই—মোকদ্দমায় যে ছিষ্টেই জয়ী হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারই সন্দেহ ছিল না—বিশে তারিখে বিবাহ হইয়া যাইবে। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ছিষ্টের উল্লাসের সীমা রহিল না। তাহার অত্যধিক উল্লাস দেখিয়া লোকে তাহাকে কত পরিহাস করিতে লাগিল। আর গোবিন্দ সরকার চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরিকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন।

সে দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সরকার মহাশয় মালা জপ করিলেন। জপ শেষ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী আশ্বস্তা হইলেন।

পরদিন সকালে ছিষ্টে জ্যাঠার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাজার যাইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে জ্যাঠা ডাকিলেন, "বাবা ছিষ্টিধর!"

ছিষ্টে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জ্যাঠার চেহারা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। এই কয়দিনেই তিনি যেন আধখানা হইয়া গিয়াছেন। জ্যাঠা ধীরে কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "গোটাকতক কথা আছে বাবা।"

ছিষ্টে বিস্মিতভাবে জ্যাঠার পশ্চাৎ বাড়ী ঢুকিল। সরকার মহাশয় তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াই তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছিষ্টে বিস্মিত—স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY
J 1826

সরকার মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা ছিষ্টিধর, বুড়ো জ্যাঠাকে মারবি? এই বয়সে—"

ছিষ্টে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার মহাশয় বাঁ হাতে চোখ মুছিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এই বয়সে তুই আমাকে অপমান করাবি? আমার অপমানে কি তোর অপমান নয়? আমার গায়ের রক্ত তোর গায়ের রক্ত কি আলাদা?"

ছিষ্টের বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। মুখ নীচু করিয়া বলিল, "আমাকে কেন জুতো মারলে?"

সরকার মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাগ চণ্ডাল বাবা, রাগ চণ্ডাল।"

ছিষ্টে নিরুত্তর। সরকার মহাশয় বলিলেন, "আর যদিই মেরে থাকি……। তোর বাপ্ যদি মারতো তবে কি তুই নালিশ করতিস্? বাপ্ আর জ্যাঠা কি আলাদা, ছিষ্টিধর?

লজ্জাজড়িতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে জ্যাঠা।"

জ্যাঠা সহর্ষে বলিলেন, "তোর অন্যায় নয় বাবা, লোকে তোকে নাচিয়েছে। তা নইলে তুই কি আমার তেমন? কিন্তু বাবা, এই আমি বলে রাখছি, মোকদ্দমা শেষ হ'লেই আমি গলায় দড়ী দেব, জলে ঝাঁপ দেব। তোমাকে এর পাপের ভাগী হ'তে হবে।"

ছিষ্টের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি কি করবো?"

তখন সরকার মহাশয় তাহাকে বসাইয়া, এক্ষণে তাহার কি করা কর্ত্তব্য, তাহার বিস্তৃত উপদেশ দিলেন। উপদেশদানান্তে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর বাবা, আমি তোমার বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেব? রাধে মাধব, রাধে মাধব! আমি কি এতটা পাষণ্ড! পাছে ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে নেয়, তাই ওটাকে হাত ক'রে রেখেছি। আমি সব ফিরিয়ে দেব, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে ফিরিয়ে দেব। তোমার বিষয় আমি নেব? হরি, হরি!"

ছিষ্টে ম্লান মুখে বলিল, "কিন্তু, বামুনকাকা যে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে?"

সদম্ভে সরকার মহাশয় বলিলেন, "বিয়ে? আজ যদি মনে করি কাল তোর তিন গণ্ডা বিয়ে দিতে পারি। নয়ত আমার নাম গোবিন্দ সরকার নয়!"

ছিষ্টে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোর যদি রাগ থাকে, তুই আমাকে দু' ঘা মার; কিন্তু বাবা, বিপিন চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে আমার অপমানটা করাসনে।"

সরকার মহাশয়ের দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারা পড়িতে লাগিল। ছিষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিধু স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, সে ছিষ্টেকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "ছিষ্টে!"

ছিষ্টে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। মাথা নীচু করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল।

আদালতে মোকদ্দমা উঠিলে ছিষ্টে হাকিমের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, আমি স্বেচ্ছায় জ্যাঠাকে বিষয় বিক্রি ক'রেছি। পাঁচজনের কথায় আমি মিথ্যা নালিশ ক'রেছিলাম। এখন আর আমি মোকদ্দমা চালাতে চাই না।"

আদালত শুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া ছিষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর গোবিন্দ সরকার মালা হাতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহিণীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় ছিষ্টে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "জ্যাঠা!"

জ্যাঠা উত্তর দিলেন "কে?"

ছিষ্টে বলিল, "আমি, ছিষ্টিধর।"

জ্যাঠা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কি?"

ছিষ্টে জ্যাঠার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমাকে ওখানে আর থাকতে দেবে না।"

জ্যাঠা রুক্ষকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তোমার মত লক্ষ্মীছাড়াকে কে ঠাঁই দেবে, বল। তুমি একটি আস্ত কাল-সাপ। আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে বসেছিলে। কেবল ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করেছেন। হরি হে দীনবন্ধু!"

ছিষ্টে স্তম্ভিতভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কাল জ্যাঠার নামে নালিশ ক'রে আজ আবার সম্পর্ক পাতাতে এসেছেন! লক্ষ্মীছাড়া হলে তার কি লজ্জা থাকে না গো!"

গৃহিণী উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্যাঠা মুখ ঘুরাইয়া লইয়া ঘন ঘন মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

ছিষ্টে অন্ধকারময় উঠানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। বিধু রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছিল। ছিষ্টে তাহার সম্মুখে গিয়া ডাকিল, "দিদি!"

রোষগম্ভীর স্বরে বিধু উত্তর দিল, "কেন?"

ছিষ্টে বলিল, "সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি দিদি, কিছু আছে?

বিধু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "উনানের ছাই আছে। খাবি?"

ছিষ্টে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। বিধু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া, আমি তোকে খাবার দেব? দূর হ'য়ে যা' বলছি আমার সামনে থেকে।

ছিষ্টে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর একবার দিদির মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। বিধু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যেন বিধুর চমক ভাঙ্গিল; সে ছুটিয়া গিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ছিষ্টে ছিষ্টে!"

কোনও উত্তর আসিল না। বিধু আবার চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ছিষ্টে ওরে ছিষ্টে!"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সে লক্ষ্মীছাড়া চুলোয় গেছে, এখন তুই তার সঙ্গে যাবি?"

বিধু দুই হাতে সদর দরজা চাপিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার মহাশয় জপান্তে মালাছড়াটা গলায় ফেলিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে গান গাহিলেন,—

এই কর হরি দীনদয়াময়—

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গানের সমালোচনা

(২)

"গান" বলিতে যথার্থতঃ কি বুঝায় এবং কি বুঝা উচিত ইহা নিষ্কাষিত করিতে হইলে শব্দশাস্ত্র-বিদ্ পণ্ডিতগণ শব্দ ও অর্থের আলোচনার জন্য যে সকল মাপকাঠির ব্যবহার করেন তাহাই করিতে হইবে। কথিত ভাষায়, এবং সাধারণ ব্যবহারে অর্থ কিছু না কিছু বিকৃত হইবেই, ইহাতে যায় আসে না। কিন্তু লিখিত সমালোচনায়, (বিশেষতঃ যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে পাঠকবর্গ লেখা পাঠ করিয়া তাহার অর্থ গ্রহণ করুন) একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা উচিত নহে। শব্দশাস্ত্র-বিদ্ পণ্ডিতগণ, শব্দার্থের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিবার প্রারম্ভে সংক্ষেপতঃ তিনটি বিষয় আলোচনা করিতে বলেন। তাহা এই—যথা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, নৈতিক সার্থকতা, এবং বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বলিতে বুঝায়, বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে কি না—অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রামাণ্য। সার্থকতার অর্থে—পুনঃপুনঃ ব্যবহার দ্বারা যাহার প্রামাণিকতা বিচার হয়। এবং বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি অর্থে—ব্যাকরণগত বা অন্য প্রকারে লব্ধ কিন্তু মাত্র একটি বিশিষ্ট অর্থ বা ভাবকে গ্রহণ করা বুঝায়। এই তিন প্রকারের প্রমাণ দ্বারা শব্দের যদি একই অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি ভিন্ন প্রকারের অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রকাশ হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকগণ সেই অর্থটি লইবেন যেটি একার্থ-নির্দ্দেশক এবং বিশিষ্ট-অভিধাসম্পন্ন। যেমন ইংরাজি ভাষায় matter কথাটির নানা অর্থে ব্যবহার সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে মাত্র একটি অর্থেই ব্যবহার করেন। ইউরোপে শব্দার্থ প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এত প্রকারে বিকৃত হইয়াছে যে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সমালোচকগণ কোনও একটি শব্দার্থের ব্যবহার কথিত তিন প্রকার পরীক্ষা না করিয়া মানিয়া লয়েন না। আমাদের দেশে শব্দার্থের বিকৃতি বহুল পরিমাণে না হইলে, কিছু হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্ হইতে কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

"গান" শব্দটিকে এইভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—যেহেতু গান বলিতে কি বুঝায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমানে—ঘটনা-ক্ষেত্রে এবং কাগজে কলমে যাহা প্রকাশ, তাহাতে সুললিতস্বরে রবীন্দ্রনাথের গান গাহিলে "গান" হইবে; অস্পষ্টভাবে, অসংযত-ভাবে হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষায় স্বরলীলা করিলেও গান হইবে;—দেড় ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ২।৩টি অক্ষর বুঝা যায় এমন যে আলাপ বা স্বর-বিস্তার তাহাকেও গান বলা হয়—তোম তা না নানা বলিয়া কার্য্য সমাধা করিলেও গান হইবে—এমন কি $(a+b)^2=x$ বলিয়া সুরে আত্ম-প্রকাশ করিলেও গান বলা যাইতে পারে। শেষোক্ত দুইটি কথা অতিরঞ্জিত নহে—আমি গানের সমালোচকগণকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া এরূপ মত পাইয়াছি। অর্থাৎ গলা দিয়া সুর বাহির হইলেই "গান" হইল।

এই মতটি পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তবে গানের এই প্রকার অর্থ মানিয়া লইলে আপাততঃ দুইটি সুফল দেখা যাইবে—; প্রথমতঃ, পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ, গানের দ্বারা হাস্যরসের উদ্দীপনা যাহা প্রাচীনকালে ছিল না। আমার একজন বন্ধু বলেন যে এই মতে ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিলে পরে কলিকাতার ফেরীওয়ালারাও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে, এবং আমাদের দেশের সঙ্গীতে এমন একটি jolly ভাব আসিবে যাহা স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করে নাই। আমার বন্ধুকে আমি সমর্থন করি।

গানের উদাহরণ, ইতিহাস-মতে, অতি প্রাচীন। এত প্রাচীন যে বোধ হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আবির্ভাবের সমসাময়িক। ইতিহাসের নজীর হিসাবে সাম গান হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। সাম গান বাস্তবিক কি প্রকারে গাওয়া হইত—সে সময়ে রাগ-রাগিণী ছিল কি-না—এ সকল বিষয় নির্দ্দিষ্টভাবে জানিবার কোনও উপায় না থাকিলেও সামগানগুলি যে মাত্র আবৃত্তি ছিল না এবং স্বর সংযোগে গাওয়া হইত তাহার ইঙ্গিত আছে। কথা, সুর ও মাত্রার ব্যবহার হইত। জনৈক বিশেষজ্ঞ বন্ধুর সাহায্যে ঐ গ্রন্থ আনাইয়া একবার বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। উক্ত বিশেষজ্ঞ বন্ধুবর্গের সাহায্যে, গ্রন্থের টীকার মধ্যে যেটুকু ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম তাহা দ্বারা মনে হয় যে—যে প্রকার স্বর-

বিন্যাস রাগ অবলম্বনে গাওয়া হইত তাহা প্রায় আধুনিক সময়ের ভৈরবীর মত। একথা বলা উচিত মনে করি যে—রাগ বা রাগিণী নামক কোনও শব্দ অথবা রাগ বা রাগিণীর কোনও নাম বা রূপ পাওয়া যায় না।

রামায়ণে—বাল্মীকি মুনির সহিত লব-কুশের রাম-সভায় গমন এবং ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সহযোগে রামায়ণ-কথা গানের ইতিহাস পাওয়া যায়। উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। এই প্রকার মনে করিলেও রামায়ণী কথা যে গান করিয়া হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশে গানের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে—হরিবংশে, শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবদিগের সমক্ষে উৎসব উপলক্ষে অভিনব একপ্রকার গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশে কথিত ঘটনার সময় অভিনব ঐ গান শ্রবণে সকলেই প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিল এরূপ উল্লেখ আছে। এই প্রকার গানকে "ছালুক্য সঙ্গীত" বলা হইয়াছে। এই ছালুক্য শব্দটির অর্থ বুঝা যায় না। তবে, সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে "ছায়ালগ" নামে মিশ্র রাগ-রাগিণীকে পৃথক্ শ্রেণী করা হইয়াছে, ইহার সহিত হয়ত কোনও ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রচলিত পুস্তকাদি পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গীতবাদ্যাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু কি ভাবে হইত তাহার কোনও বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইহা আমার নিজের পাঠলব্ধ জ্ঞান নহে। আমার জনৈক পণ্ডিত বন্ধু বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন—তাঁহার নিকট ঐপ্রকার মত পাইয়াছি। তাঁহার মন্তব্য যে এবিষয়ে শেষ কথা তাহা আমি বলিতে পারি না।

সংস্কৃত কাব্যে বৈতালিক নামক এক শ্রেণীর গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা ও রাজন্মন্য ব্যক্তিদিগকে প্রাতে শয্যাত্যাগ করাইবার জন্য প্রায়ই একাধিক ব্যক্তি ইহা গান করিত। কি প্রকার রাগ-রাগিণী সাহায্যে উহা নিষ্পন্ন হইত তাহার কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের মধ্যযুগের কাব্য দর্শনাদিতে নানাপ্রকারে নানাভাবে গান ও গীত শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সর্ব্বত্রই উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের বিচার করিলে কথা ও স্বরবিন্যাস এই দুইটি মূল ধারণা আমরা পাই। এরূপ কোনও উল্লেখ

পাওয়া যায় না যাহা হইতে সন্দেহ করা যাইতে পারে যে গানের কার্য্য কথা ব্যতিরেকে মাত্র স্বরসংযোগেই সমাধা হইল।

পাঠান এবং মোগল রাজত্বের প্রথমার্দ্ধ সময় গানবাজনার ইতিহাসের এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় যুগ গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই আমরা ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের ধুরন্ধর গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে দেখিতে পাই; ধ্রুবপদগানের প্রথম প্রবর্ত্তন দেখিতে পাই। যাঁহারা সঙ্গীতের ইতিহাস বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট জানা যাইতেছে যে দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক কথকতা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। ঐ কথকতার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গীত সন্নিবিষ্ট থাকিত এবং গাওয়া হইত এবং উহাদিগকে ধ্রুবপদ নাম দেওয়া হয়। ধ্রুবপদ অর্থে যাহার পদগুলি ধ্রুব অর্থাৎ স্থায়ী। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—এই ধ্রুবপদ গানের অন্তর্গত ভাবকেই স্থায়ীভাব বা রসাত্মক ভাবরূপে পোষণ করিয়া এই ভাবেরই আনুগত্যে পরবর্ত্তী "কথা" আবৃত্তি করা হইত। "ধ্রুব" অর্থে নির্দ্দেশক (Indicator) মনে করিলে ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এই ধ্রুবপদ গানের প্রধানতঃ দুইটি ভাগ ছিল—স্থায়ী ও সঞ্চারী। মিঞা তানসেনের ধ্রুবপদ গানের মধ্যেও যখন এই প্রকার ভাগের কথা পাওয়া যাইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ প্রকার ভাগ করার প্রথা অনেকদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই স্থায়ী ভাবকে দুই ভাগ করিয়া স্থায়ী ও অন্তরা এবং সঞ্চারীভাগকে দুই ভাগ করিয়া সঞ্চারী ও আভোগ—সর্ব্বশুদ্ধ চারি ভাগ করা হইয়াছিল। বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। সারকথা এই যে ধ্রুবপদ গানের নামকরণ রসসাহিত্যের ধারায় হইয়াছিল, উহার রচনাভঙ্গি সাহিত্যাদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্বরবিন্যাস সরল ও শ্রুতিমূলক ছিল। যতদিন উহা কীর্ত্তন ও লীলাগীতাদির অন্তর্ভুক্ত ছিল ততদিন উহাদের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তনও হয় নাই এবং উন্নতিরও কোনও প্রয়োজন ছিল না। পরে, মুসলমান রাজত্বকালে ঐ গানগুলি তাহাদের আশ্রয় (অর্থাৎ কথকতা) হইতে চ্যুত হইয়া মাইফেলে ও দরবারে নানারূপে প্রবেশলাভ করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, দেবদেবতার লীলাবর্ণনাদির ব্যাপারও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং তাঁহাদের স্থলে রাজা বাদশাহের জয়কীর্ত্তন করা ধ্রুবপদের fashion হইয়া উঠিতে থাকে। আমার ধারণা এই যে—যতদিন ইহা সাহিত্যাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত

ছিল, এবং জনসাধারণ ও রাজন্যবর্গকে নির্বিশেষ ও পরিপূর্ণভাবে দ্রবীভূত করিত ততদিন ইহার উন্নতি ছিল। পরে এই ধ্রুবপদ গান মনুষ্যপূজার উপকরণ যোগাইতে আরম্ভ করে এবং কাব্যাদর্শ ত্যাগ করিয়া সঙ্গীতের ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় ইহা রসপিপাসু এবং সুস্থমস্তিষ্ক জনসাধারণ এই উভয় শ্রেণীর আদর হারাইয়া ফেলে। এই ধ্রুবপদ গানের মধ্যে কথা ও তাহার উচ্চারণ যে কত প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল তাহার প্রমাণ ধ্রুবপদ গানের চারিপ্রকার বাণীর ব্যবহার। এখনও ইহাদের অস্তিত্বলোপ হয় নাই।

হোরী নামক আর এক প্রকার প্রসিদ্ধ গানের সমধিক প্রচলনও মুসলমানী যুগ হইতে আরম্ভ হয়, যদিও ইহা বহুপূর্ব্ব হইতে উত্তর ভারতের শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্দিরাদিতে আবদ্ধ ছিল। হোরী গান সম্পূর্ণভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল লীলার গান এবং ইহা ধামার নামক তালের সহিত গাওয়া হইত এবং এখনও হয় বলিয়া ইহাকে ধামারও বলা হয়। হোরী গান এখনও পর্য্যন্ত ইহার বিশিষ্টতা রাখিয়াছে অর্থাৎ কোনও রাজা-বাদশাহ নায়িকা বা সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত ফাগ ও পিচকারী খেলিতেছেন এরূপ অর্থে কোনও রচনা বা গান শুনি নাই। যদিই বা পাওয়া যায়—তাহাও হয়ত কোনও ওস্তাদের ঝুলির মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে।

গানের সম্বন্ধেই যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে তখন একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইংরাজি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেও দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অতি সুন্দর ধ্রুবপদগান রচনা ও গান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন রাজা আর একজন কবি ও গায়ক। বেতিয়ার রাজা শ্রীআনন্দ কিশোর এবং আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী স্বনামধন্য যদুভট্ট নামক গায়কের কথা বলিতেছি। ধ্রুবপদ গায়কগণ ইহাদের রচিত সুন্দর সুন্দর গানগুলি একরূপ অবহেলাই করিয়াছেন। সাধারণ লোকে যে কেন ধ্রুবপদ গান শুনিতে চাহে না, ভগবানই জানেন!

ধ্রুবপদ গানের ক্রমশঃ অবনতির সময় হইতে খেয়াল ও টপ্পা জাতীয় গানের উদ্ভবের ইতিহাস পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে বাদশাহ আলাউদ্দিনের রাজত্ব কালে আমির খোসরু নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও রসিক ব্যক্তিই খেয়াল গানের সৃষ্টি-কর্ত্তা; হইতেও পারে, যেহেতু ইহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই। যাহাই

1689

হউক—খেয়াল ও টপ্পা বিশেষ ভাবে জনসাধারণকে মোহিত করিয়াছে বা করিত এমন কোনও উল্লেখ আমরা পাই না—যেরূপ প্রাচীন ধ্রুবপদ সম্পর্কে আমরা পাইয়াছি। খেয়াল ও টপ্পা জাতীয় গানে সর্ব্বপ্রথম কথা ও স্বরবিন্যাসের অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। অর্থাৎ, কথা অতি অল্প এবং অল্পপ্রাণ, অথচ স্বরবিন্যাস বাহুল্যযুক্ত—ইহা খেয়াল ও টপ্পার একটি বিশেষত্ব বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। এবং রচনার যে সাহিত্যিক বা রসাত্মক আদর্শ ধ্রুবপদ গানে আমরা পাই, খেয়াল ও টপ্পা জাতীয় গানে তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অবহেলা দেখা যায়। যে স্বরবিন্যাসকে রসসৃষ্টির সহায়ক এবং করণ (Technique) রূপে ধ্রুবপদ গানে ব্যবহার হইতে দেখিতে পাইয়াছি—খেয়াল ও টপ্পায় সেই স্বরবিন্যাসকেই প্রথমে গানের উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লইতে দেখা যায়। কথার স্পষ্ট উচ্চারণ—যাহা ধ্রুবপদ গানে অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল এবং যাহার জন্য বাণীর সৃষ্টি—সেই স্পষ্ট উচ্চারণ খেয়াল গানে অনাবশ্যক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব বান্ধার নবাব সাহেবের মাইফেলে যে সকল খেয়াল গান শুনিয়াছিলেন এবং যাহাকে তিনি প্রধানতঃ শৃঙ্গার ও করুণ রসাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—সেই খেয়াল গান এবং হর্দ্দু খাঁর বাঘা খেয়াল—যাহাকে স্বর্গীয় সপ্তম এডওয়ার্ড tiger howling বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই দুই প্রকার খেয়াল গানের মধ্যে উইলার্ড সাহেবের খেয়াল গান অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম বলিয়াই বোধ হয়; কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে উইলার্ড সাহেবের সময়েও খেয়াল গানের শব্দ ও কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং তাহার অর্থও বুঝা যাইতেছে। তাহা না হইলে উইলার্ড সাহেব শৃঙ্গার ও করুণ-রসাত্মক এবং প্রণয়-ঘটিত কথা প্রভৃতি কি প্রকারে পাইলেন। হর্দ্দু খাঁর সময়ে খেয়াল গান উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল অর্থাৎ কথা আর বুঝা যাইত না, শুদ্ধ রাগের বিস্তার ও তানের অদ্ভুত বিস্তার করাই প্রথা হইয়াছিল। এখনও আমাদের দেশের বাইজিদের মুখে যে খেয়াল শুনা যায়, তাহা কিছু পরিমাণে উইলার্ড সাহেব বর্ণিত খেয়ালের সঙ্গে মেলে। কিন্তু এইরূপ খেয়ালকে অপকৃষ্ট বলিয়াই সমজদারগণ মনে করেন। কারণ ইহার কথার উচ্চারণ স্পষ্ট এবং সমগ্র গানটি শুনিতে শ্রবণমধুর লাগে। উৎকৃষ্ট অর্থাৎ হর্দ্দুখানি খেয়াল যে জনসাধারণ কেন পছন্দ করে না ভগবানই

জানেন। যাহাই হউক—উইলার্ড সাহেবকে এক হিসাবে ভাগ্যবান পুরুষ বলিতে হইবে, কারণ তাঁহার সময় পর্য্যন্তও খেয়াল গানে কথার উচ্চারণ ও অর্থ ছিল এবং রসও ছিল এবং আর এক হিসাবে দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে হর্দ্দু খাঁ ইত্যাদির উৎকৃষ্ট খেয়াল তিনি শুনিতে পান নাই।

টপ্পার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখা উচিত, এজন্য যে ভারতবর্ষে যদি কোনও দেশ টপ্পার আদর করিয়া থাকে তবে সেই দেশ বঙ্গ দেশ। ইহার পাঞ্জাবে উৎপত্তি। এবং প্রণয়সূচক কথাই ইহার অবলম্বন। এই সময়ে টপ্পা জনসাধারাণের প্রাণের বস্তু ছিল। সম্প্রতি শোরী মিঞার টপ্পা যাহা চলিত আছে তাহার কথার অর্থ যে টপ্পা গায়কগণই জানে না ইহা আমার সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসালব্ধ অভিজ্ঞতা। এমন কি ওস্তাদধুরন্দর বাদল খাঁ সাহেবও তাঁহার নিজের অভ্যস্ত টপ্পার অর্থ জানিতেন না। পাঞ্জাবী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি। তাহার বলে—ঐ ভাষা এখন প্রচলিত নহে। সুতরাং এদিক দিয়া উৎকর্ষ হিসাবে টপ্পা খেয়ালকেও অতিক্রম করিয়াছে। বোধ হয় এত উৎকর্ষ সহ্য হইবার নহে; সেই জন্য শোরী মিঞার টপ্পা আর বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু বলিহারী বঙ্গ দেশ—যে টপ্পার অর্থ তাহার জন্মস্থানবাসী পাঞ্জাবীরাও করিতে পারে না—সেই টপ্পাকে অতি সমাদরে মাইফেলে স্থান দিয়াছে। সেই বঙ্গদেশ—যে দেশ স্বদেশবাসী নিধুবাবুর টপ্পাকে অশ্লীল বলিয়া একঘরে করিয়াছিল—সেই দেশেরই সঙ্গীতজ্ঞ সমালোচকগণ শোরী মিঞার টপ্পা গান করিতেন ও প্রশংসা করিতেন অর্থ বুঝিতেন না বলিয়া; গান হইয়া যাইতেছে অথচ তাহার অর্থ কেহ বুঝিতেছে না—এই যে উৎকর্ষের অবস্থা, দুঃখের বিষয় তাহা অনেক দিন থাকিল না। কালের গতি বাস্তবিকই কুটিল।

খেয়াল ও টপ্পা জাতীয় গানের উৎকর্ষের সময় হইতে ঠুমরী নামক কথাবহুল গানের সৃষ্টি হয়। ইহার প্রধান বিষয় নায়ক নায়িকার ভাববৈচিত্র্য। কাপ্তেন উইল্যার্ড সাহেব ঠুমরী শ্রেণীর গান বলিতে মাত্র ব্রজভাষার এক অশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ খেয়াল সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ হয় যে তাহা খেয়াল কিম্বা ঠুমরী। ইহার একমাত্র মীমাংসা এই যে—প্রাচীনকালের শ্রবণযোগ্য ও সুমিষ্ট খেয়াল যেমন দুঃশ্রাব্য ও দুর্বোধ্য রূপ ধারণ করিয়া উন্নতির দিকে যাইতে লাগিল তেমনি সুশ্রাব্য খেয়ালগুলি ঠুমরীর

রূপে পরিণত হইয়া জনসাধারণকে তৃপ্ত করিবার জন্যই থাকিয়া গেল। কথার জন্যই হউক, বা সুমিষ্ট করিয়া গান করিবার জন্যই হউক—ঠুমরী এখনও বর্ত্তমান এবং ইহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

"গজল" শ্রেণীর গানকেও কথাবহুল ও রসাত্মক গান বলা যাইতে পারে এবং ইহা নিশ্চিন্তভাবে ঐ দুইটি গুণের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। কথার ভাগ কমাইয়া দিয়া এবং রাগ-রাগিণীর ভাগ বাড়াইয়া দিয়া "গজল"কে উন্নত করিবার চেষ্টা হইলেও তাহা ফলবতী হয় নাই—নানা কারণে। আপততঃ কথা-চিত্র (Talkie) নামে জনরঞ্জক বিদ্যা ও ব্যবসায়ের যেরূপ প্রগতি দেখা যাইতেছে তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে কলাবিৎ শিল্পী এবং জনসাধারণ ব্যক্তি এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে যুক্ত হইয়া গান বাজনাকে—অন্ততঃ ঠুমরী ও গজলকে সুশ্রাব্য ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর গানের পর্য্যায়ে বাঁধিয়া রাখিবেন এবং কিছুতেই ইহাদের উন্নতি (অর্থাৎ কথা হইতে মুক্তি) হইতে দিবেন না।

অতি সংক্ষেপে এই প্রকার ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে—গান বলিতে প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কি বুঝাইতেছে—তাহারই মর্ম গ্রহণ করা। পরিষ্কার বুঝা যায় যে গান বলিতে বুঝায় কথা, স্বরবিন্যাস ও ছন্দ—এই তিনের সংমিশ্রণ; এবং যে যে সময়ে কথার ভাগ্যে অবহেলা আসিয়াছে এবং স্বরবিন্যাসের ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে সেই সেই সময় ও অবস্থা হইতে উক্ত গানের উন্নতি বন্ধ এবং দৃশ্যমান ও ভোগ্য জগৎ হইতে অন্তর্ধানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক যে বহুল ব্যবহার দ্বারা 'গান' শব্দটির কি প্রকার অর্থ হয়, অর্থ ব্যবহারের মাপকাঠিতে গানের কি অর্থ সমীচীন হয়। গান শব্দটি ব্যাপকতার চরম সীমায়—'গুণগানে' পাওয়া যায়। গুণগান কথাটির মধ্যে সুরের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। 'বন্দনা গানে'রও প্রায় একইরূপ তাৎপর্য্য। সাহিত্য ও ধর্মজীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জনমনমোহনকর যে কীর্ত্তন ও ভজনগান, তাহা পদমাধুর্য্যের জন্যই প্রাণবন্ত হইয়া আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদলালিত্যের জন্যই প্রসিদ্ধ এবং পদগুলির উপরে "বসন্তরাগ যতিতালাভ্যাং গীয়তে" বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে, ব্যবহারে তাহার কোনও মূল্য নাই। তবুও এগুলিকে গানই বলা হয়।

ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশেও কাজরী, চৈতী, হোরী, শাওন, ঝুলন প্রভৃতি গান সম্পূর্ণভাবে কথা ও তাহার ভাববৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। রাজপুতানার চারণ কবিদের গানও কথাবহুল এবং ভাবসম্পদযুক্ত। গুর্জ্জর ও তৎসংলগ্ন দেশের "গরবা"-গুলিও গান এবং তাহা কথা ও অর্থকে নির্ভর করিয়া আছে। "লাওনি" নামক গানও ঐরূপ। মুসলমানদিগের ধর্মসংক্রান্ত—শোজ্ ও মরসিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ ও জনমুগ্ধকর গান কথা ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া আছে। পশ্চিমা ওস্তাদগণ এই গানগুলিকে রাগরাগিণী দ্বারা মণ্ডিত করিলেও গান করিবার সময় এতই স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ দ্বারা গান করেন যে সমগ্র জনসাধারণ মুগ্ধ হয়।

আমাদের দেশে সারিগান, বাউলগান ও আধুনিক গান প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ব্যাপারের মধ্যে এমন কোনও রূপ দেখা যায় না যাহাতে মনে হইতে পারে যে কথা বাদ দিয়াও ঐ সকল গান গাওয়া যায়। এগুলিকে 'গান' বলা হয়। এমন কি 'কবির গান'কেও গান বলা হয়। যাত্রাদলও (যাহাকে গীতাভিনয় বলা হয়) এককালে সুন্দর সুন্দর গান দ্বারা পুষ্ট ছিল। কিন্তু অধিকারী মহাশয়গণ তান ভাজিবার বাহুল্য করার জন্য এবং কালোয়াতী দেখানোর সময় হইতে কি জানি কোনও কারণে এই যাত্রাদলের আদর কমিয়া যায়।

সুতরাং ব্যবহার হিসাবে "গান" শব্দটির অর্থ ইহাই বুঝায় যে কতকগুলি কথা স্বরসংযোগে উচ্চারণ করিলে গান হয়। ব্যাবহারিক জগতে এমন কিছু পাওয়া যায় না বা পুনঃপুনঃ পাওয়া যায় না যাহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে কথা কিছু শুনা গেল না বা বুঝা গেল না অথচ সেই ব্যাপারকে আমরা গান বলিয়া আসিতেছি এবং গান বলি। অবশ্য মাইফেলে মাঝে মাঝে ঐরূপ কথাহীন স্বরলহরী আমরা শুনিতে পাই—যাহাকে একদল সমালোচক গান বলেন (যাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে); তবে ইহার সংখ্যা অন্য যাবতীয় গানের তুলনায় এতই অল্প যে ইহাকে বৈচিত্র্য বা বিকল্প বলিয়া মনে করা উচিত। Alice in Wonderland-এর Grin without the Cat-এর মত—বিড়াল নাই, কিন্তু বিড়ালের মুখব্যাদন—এইরূপ আর কি। ইহাও আমরা উপভোগ করি, অস্বীকার করা চলে না, তবে ইহাকে গান বলিয়া (শুধু গান বলিয়া নহে—আবার Classical গান বলিয়া) চালাইবার চেষ্টা বহুদিন হইতে হইতেছে বটে;

কিন্তু যে দেশের কর্ণে জয়দেবের ঝঙ্কার, ও প্রাণে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে সেই দেশে ঐ প্রকার কথাহীন স্বর বিস্তারকে গান বলিয়া দাঁড় করানো অতীব কঠিন ব্যাপার হইবে বলিয়া বোধ হয়। এই দলের Enthusiast বা মোড়লদের ভয় দেখাইতেছি না—তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য করিতে থাকুন; আমার নিজের ভয় হয়—ইতিহাসের নজীর হিসাবে—যে জনসাধারণ যেরূপ আধুনিক গান ও Talkies গানে মোহিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে ঐ প্রকার Classical গান হয়ত একেবারেই উঠিয়া যাইবে।

এখন দেখা যাউক গান শব্দটিকে এমন কোনও এক নির্দ্দেশক অর্থ দেওয়া যাইতে পারে কিনা যে অর্থে অন্য কিছু বুঝাইবে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সেই অর্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই প্রকার একনির্দ্দেশক অর্থ বাহির করিতে হইলে প্রথমে দেখা উচিত যে গান ক্রিয়াটি কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়।

গান করিবার সময়—নিম্নলিখিত মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়া লক্ষিত ও অনুমিত হয়:—

(১) সংকল্পাবস্থা—এই অবস্থায় গায়কের মনে কথা ও স্বরকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা হয়। এইরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ মানসিক এবং ইহার জন্য কোনও দৈহিক অবস্থান্তর নাও হইতে পারে।

(২) প্রারব্ধাবস্থা—এই অবস্থায় সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার উদ্দেশে অন্য কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের মধ্যে বাক্‌চক্র (speech centre) ও শ্রবণচক্র (auditory centre) সংক্ষোভিত হয়; এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাসচক্র (respiratory centre) শৃঙ্খলিত ও সংযত হয়। প্রথম দুইটি চক্রের ব্যাপার সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়াছেন; শেষের ব্যাপারটি সকলেই বুঝিতে পারে এবং ইহা হইতে আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে গান করিলে কিছু কিছু প্রাণায়ামের কার্য্যও হয়।

(৩) ক্রিয়াপরিণতি অবস্থা—এই অবস্থায় ফুস্‌ফুসান্তর্গত বায়ু সংযতভাবে এবং ইচ্ছাচালিত হইয়া কণ্ঠস্থ শব্দযন্ত্রের ভিতর দিয়া নির্গত হইতে থাকে এবং ঐ শব্দ-যন্ত্রও নিয়মিত ভাবে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। মাত্র ইহারই জন্য গীতোপযোগী স্বর (ব্যঞ্জন নহে) উৎপাদিত হয় এবং শ্রোতা

শুনিতে পায়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ হইতে গলনালী পর্য্যন্ত সমস্ত মুখগহ্বরের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ স্থানে ঐ পূর্ব্বোক্ত স্বর আঘাত পাইয়া ব্যঞ্জন বর্ণ সৃষ্টি করে; ইহাদের সংযোগে শব্দ এবং শব্দসংযোগে বাক্য প্রকাশ হয় কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্বরদ্বারা রঞ্জিত বলিয়া এইরূপ বাক্যাদিকে আমরা মাত্র আবৃত্তি হইতে পৃথক মনে করি। সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ" বলা হইয়াছে; এই "রঞ্জয়তি" অর্থ—বাক্যকে রঞ্জিত করে (মনুষ্যের মনকে নহে কারণ সঙ্গীত ব্যতিরেকে আরও অনেক কিছু কল্পনা করা যায় যাহা দ্বারা মনোরঞ্জন হয় অতএব তাহারাও রাগ—ইহা উদ্ভট ব্যাখ্যা); বাস্তবিক পক্ষে স্বরাদি দ্বারা আমরা শব্দ ও বাক্যকে রঞ্জিত করিলে তবে গানের রূপ হয়। সাধারণ বাক্য যেন বর্ণহীন—গান-বস্তু রাগাদি নানারূপ বর্ণ উপাদান দ্বারা রঞ্জিত সেই জন্য আমাদের মনের উপর শীঘ্রই আধিপত্য বিস্তার করে।

দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্যান্য বহুবিধ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন যাহা আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত। এবং আমরাও অনেক কিছু স্থূল পরিবর্ত্তন বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি যাহার সহিত 'গান ক্রিয়ার' কোনও সম্বন্ধ নাই। এই গুলিকে মুদ্রাদোষ বলে। এস্থলে ইহার আলোচনা বাহুল্য। সংক্ষেপে—অশক্তি বা অক্ষমতা এবং অজ্ঞানকৃত অনুকরণই ইহার কারণ।

একটি বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কণ্ঠ বা শব্দযন্ত্রকে একটি যন্ত্র বলিয়া ধরা হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রকারদিগের মতে—চারিপ্রকার যন্ত্রের মধ্যে কণ্ঠযন্ত্রটিকে শুষির নামক যন্ত্রের পর্য্যায়ে ধরা যাইতে পারে। যে সকল যন্ত্রদ্বারা শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইলে বায়ুর সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহাকে শুষির বলে—যেমন বাঁশী, সানাই, হারমোনিয়ম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহাই হউক—কণ্ঠও একটি যন্ত্র।

আমরা যখনই যন্ত্র-সঙ্গীতের কথা ভাবি এবং বলি আমাদের মনে সমস্ত রকম যান্ত্রিক সঙ্গীতের মধ্যে যে কোনওটির কথা মনে আসিলেও কণ্ঠের কথা মনে আসে না। অথচ কণ্ঠ একটি যন্ত্র ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহার একমাত্র কারণ—অন্য সকল যন্ত্র দেহ-বহির্ভূত, কিন্তু কণ্ঠ সর্ব্বদাই আমাদের দেহের অন্তরভাগে বর্ত্তমান এবং উহাকে দেখানো যায় না বলিয়া উহার পৃথক অস্তিত্ব আমরা মনে রাখি না।

যাহাই হউক—কণ্ঠকে যন্ত্র বিশেষ মনে করিতে বা স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে কি না দেখা উচিত। কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ অন্য যান্ত্রিক শব্দ হইতে ভিন্ন—ইহাও কিছু গ্রাহ্য আপত্তি নহে। কারণ যে কোনও যন্ত্র হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা অন্য জাতীয় যন্ত্রের শব্দ হইতে ভিন্ন। বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ বিশিষ্টতাকে, Timbre বা Character বলেন। বাঙ্গালা ভাষায় এই কথাটিকে অনুবাদ করিবার সময় একটু সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

অন্যান্য যন্ত্রও যেরূপ স্বেচ্ছায় বাজে না—কণ্ঠও সেরূপ কোনও স্বকীয় ইচ্ছায় বাজে না; যাহার ইচ্ছায় বাজে সে ব্যক্তি অন্য লোক।

অন্যান্য যন্ত্র হইতে যেরূপ বাক্যাদি বাহির হয় না কণ্ঠযন্ত্র হইতেও তদ্রূপ স্বর ব্যতীত আর কিছু বাহির হয় না। ব্যঞ্জন বর্ণাদির উচ্চারণ মুখগহ্বর হইতে হয় উহাতে কণ্ঠযন্ত্রের কোনও কারিগরি নাই।

অন্যান্য যন্ত্রাদি যেমন অচেতন, কণ্ঠও তদ্রূপ অচেতন। কণ্ঠের যে চেতনা আছে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। আমাদের দেশের দার্শনিক বলেন না যে কণ্ঠ চেতন বস্তু। ইহা চেতনাবিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি দ্বারা চালিত,—অথচ সেই চালককে দেখা যায় না বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় যে কণ্ঠ চেতন পদার্থ।

কণ্ঠকে যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেই—মাত্র কণ্ঠোদ্ভূত স্বর বা স্বরাদিকে অন্য যন্ত্রবাদনের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রবাদনই মনে করা উচিত। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ ও বাক্যাদির উচ্চারণ না হইবে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরোৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও উহাকে যন্ত্রবাদনের ন্যায় মনে করা উচিত। এই প্রকার স্বরোৎপত্তি যতই কৌশলে হউক না কেন, যতই বিচিত্র হউক না কেন—ইহাকে কোনও অংশে অন্যান্য যন্ত্রবাদন হইতে পৃথক্‌শ্রেণী করা উচিত নহে।

আমরা যে এরূপ মনে করি না—তাহার প্রধান কারণ কণ্ঠ যে যন্ত্র তাহা আমাদের মনে থাকে না। এবং জানিয়া শুনিয়াও যে মনে করিনা, তাহার কারণ অযথা গৌরববোধ। অথচ গান বাজনা সংক্রান্ত এমন একটি কথা আছে যাহার অস্তিত্ব এবং ব্যবহার দ্বারা আমার মতেরই প্রমাণ হয়। সেই কথাটি "আলাপ"। মহম্মদ খাঁ দরবারী কানেড়ার আলাপ করিলেন বলিলেই প্রশ্ন হয়—কিসে আলাপ করিলেন? অর্থাৎ সেতারে, সুরবাহারে, বীণায়, সানাইতে, হারমোনিয়মে কি কণ্ঠে? ইহার তাৎপর্য্য এই যে—আলাপ নামক ব্যাপারটি

গানের মত শব্দ ও অর্থসমন্বিত নহে—ইহা যে কোনও যন্ত্রে নিষ্পন্ন হইতে পারে। সেই যন্ত্রটি কি কণ্ঠ, না বীণা, না সুরবাহার ?

সুতরাং শব্দ-শাস্ত্রবিদ যে তিনটি মাপকাটি ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন তাহা দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে "গান" শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা প্রতিপাদিত করি। তাহা এই :—

রসোপযোগী কথাকে অবলম্বন করিয়া এবং সেই কথাগুলিকে স্বর দ্বারা রঞ্জিত করিয়া যাহা কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, অথবা এই প্রকাশের রূপকে অন্য কোনও যন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করিলে, তাহাকে গান বলা হইবে। সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ এক গ্রামোফোন সাহায্যে হইতে পারে। অন্যান্য যন্ত্রে যাহা হয় তাহাকে অনুকরণ না বলিয়া অনুসরণ বলাই সঙ্গত।

এই প্রকার সংজ্ঞা ঐতিহ্য, ব্যবহার ও বিজ্ঞান সম্মত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে গানকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিলে song বলা উচিত, music নহে। music কথাটির যদি কিছু অনুবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বরবিন্যাস ছাড়া আর কিছু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

গানের উক্ত প্রকার অর্থ ও সংজ্ঞা করিলে গান সমালোচনার মধ্যে গানের কথারও সমালোচনা করা বিশেষ উচিত হইয়া পড়ে। এইখানেই শেষ নহে; উক্ত কথা ও ভাবের সহিত স্বরবিন্যাসের সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহাই প্রধান বিচারের কথা হইয়া পড়ে। গানের কথা করুণ রসাত্মক এবং বেদনা ও দুঃখের ভাব জড়িত; তাহার সহিত সুরবিন্যাস হইল অতীব চটুল শৃঙ্গার রসোদ্দীপক রাগরাগিণী প্রভৃতির সাহায্যে। ইহা কি কখনও ভাল লাগে? "দিবা অবসান হল কি কর বসি যে মন" বাক্যকে "ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী" ইত্যাদি স্বরবিন্যাসে মণ্ডিত করিলে কিরূপ শুনাইবে তাহা বলাই বাহুল্য!

গানের সমালোচনার প্রসঙ্গে—এই প্রকার বিচারই প্রধান কর্ত্তব্য; অন্য সমস্ত কথা গৌণ। যেমন গান, তেমন সুর। বাঙ্গালা গানে কথা ও সুরের মধ্যে ব্যভিচার করিলেই কানে লাগে ও প্রাণে লাগে; সুতরাং বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গলা গানের যথাযোগ্য বিচার স্বাভাবিক।

কিন্তু বিপদ হইয়াছে হিন্দুস্থানী গান লইয়া। যে সকল শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গানকে নিম্নাঙ্গের গান বলিয়া প্রচার হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে একটি গুণ সবিশেষ বর্ত্তমান—কথা স্পষ্ট। সুতরাং বিচার করা চলে। এবং জনসাধারণ যে তুলাদণ্ডে বিচার করে—তাহাতেও তাহারা যোগ্য বিচার পায়।

যে শ্রেণীর গানকে উচ্চাঙ্গের গান বলিয়া এ পর্য্যন্ত প্রচার করা হইয়াছে—যাহা শুনিতে জনসাধারণ একরূপ নারাজ বলিলেই ঠিক হয়—সেই গানের বিশেষত্ব এই যে কথা বুঝা যায় না, অর্থ বুঝা যায় না। তবে গায়ক যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। বিচার্য্য বস্তু থাকে রাগাদির আলাপের নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং উক্ত শ্রমশীলতা। রাগরাগিণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অধিকাংশ রাগরাগিণী সম্বন্ধে অধিকাংশ গায়কদের মতভেদ। এবং যিনি বিচার করিবেন—তাঁহার কান এতই তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজন যে কোনও স্থানে বেসুর বা বিরুদ্ধসুর ব্যবহার হইলে তাহা বুঝা উচিত। বিচারক যদি বা ভাবিলেন যে বিরুদ্ধসুর, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নূতন রাগ। এই সমস্ত কথা শীতল মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বিচার অসম্ভব। যাহা সম্ভব—এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যাহা হইয়া আসিতেছে (বিচারের নামে) তাহা বিচার নহে—তাহা "মানিয়া লওয়া", অর্থাৎ লোক-জন উঠিয়া যাইলেও—কানে খারাপ লাগিলেও—প্রাণে না পৌঁছাইলেও—ইহা পুরিয়া, ইহা চৌতাল, ইহা ধামার, ইহা সেনী ঘরবানার, ইহা রসুল বক্সের; অতএব সারকথা—এই যে ইহা উচ্চাঙ্গের। তানসেনজী ইহাই গাইতেন, হরিদাস স্বামী ইহাই গাইতেন, বৈজুবাওরা ইহাই গাইতেন—অতএব ইহা উচ্চাঙ্গের। ইহাকে বিচার বলে না—ইহারই নাম "মানিয়া লওয়া"।

বড়ই অনুতাপের কথা—এ যুগের লোকসাধারণ মানিয়া লইতে নারাজ। যে গান শুনিয়া প্রাণে তৃপ্তি হয় না, শ্রবণকুহর তৃপ্ত হয়না—তাহা কি বাস্তবিকই গান? না আর কিছু? যাহার সাহায্যে সাধনা করিলে, ভজনা করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় ইহা কি সেই গান—যে গান শুনিলে মানুষ পালায়?—ইহাই জনসাধারণের প্রশ্ন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চ্চাকারীদের তরফ হইতে ইহার উত্তর ও মীমাংসা হওয়া উচিত। এই প্রকার উত্তর ও জিজ্ঞাসার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রমাণ অবশ্য থাকা চাই :—

(১) শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি পীড়াদায়ক হইলেও উচ্চাঙ্গের গান হইবে?

(২) গানের কথা বা অর্থ বুঝা না যাইলেও গান হইবে এবং উচ্চাঙ্গের গান হইবে ?

(৩) গানের কথার সহিত স্বরবিন্যাসের কোনও সামঞ্জস্য না থাকিলেও গান হইবে এবং উচ্চাঙ্গের গান হইবে ?

(৪) ঐ একই গান সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণ দ্বারা এবং যথাযোগ্য স্বরবিন্যাস দ্বারা গান করিলে উচ্চাঙ্গের গান কখনই হইবে না—কারণ সাধারণ লোক উহা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

(৫) রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, সঙ্গীত শাস্ত্রাদি, পুরাণ, শ্রুতি, মায় রঘুনন্দনের স্মৃতিতেও—দেখাইতে হইবে—যে সুশ্রাব্য, অর্থসমন্বিত ও রসযুক্ত গান করিলে পাপ হয় এবং এই কয়টি বর্জন করিয়া গান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

উপরি কথিত কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করিয়া উত্তর দিলেই আমাদের দেশের ধর্মভীরু জনসাধারণকে যাহা হউক একটা কিছু বুঝানো যায়। আর তাহা যদি না হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই প্রকারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত একেবারেই লোপ পাইবে।

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে আমি একজন প্রসিদ্ধ গায়কের গান শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় কোনও স্থানে উপস্থিত ছিলাম। গানের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইল যে মিয়াকি টোড়ির গান হইবে। সার্দ্ধ একঘণ্টাকাল মুগ্ধ হইয়া শুনিলাম। আমার মত এবং আমার অপেক্ষাও সঙ্গীতরসগ্রহণতৎপর অনেক ব্যক্তিই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতেছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও অবকাশ ছিল না। কিন্তু যাহা শুনিলাম তাহাকে গান বলা চলে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমগ্র দেড়ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাত্র চারটি অক্ষর বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং সেই চারটি অক্ষরও যে গায়কের অভিপ্রায়ানুযায়ী কি না তাহা এখনও সন্দেহ হয়—কারণ অন্যান্য উপস্থিত গানপ্রিয় ও সমালোচক ব্যক্তিকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া বিশেষ সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। এখন আমার প্রশ্ন এই যে—দেড়ঘণ্টা ধরিয়া যাহা শুনিলাম—তাহা কি গান ? অথবা তাহাকে আলাপ বলা উচিত ? আমি এমন বলিতেছি না যে মুগ্ধকারিত্ব হিসাবে ঐ ব্যাপার অন্যান্য গানের অপেক্ষা কম

ছিল—বরং অধিক ছিল ইহা আমার নিজের অনুভূতপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এনায়েৎ খাঁর সুরবাহারে আলাপ বা হাফেজ আলি খাঁর সরোদের আলাপ শুনিয়াও ত মুগ্ধ হই। সেইজন্য কি ইহাদিগকে গান বলিতে হইবে ? সর্পও তুবড়ী-বাদনে মুগ্ধ হয় ; তাই বলিয়া ঐ তুবড়ীবাদনকে গান বলিতে হইবে ? না বলা উচিত ? অবশ্য কয়েকদিন পরেই ইংরাজি দৈনিকে ঐ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া উক্ত গায়কের গানের চমৎকার সমালোচনা বাহির হইল। সেই সমালোচনার মধ্যে কোনও ইঙ্গিত পাইলাম না যে গানের কথাগুলি কি হইল। মনে হইল—ভাগ্যবান সেই কবি যে ঐ গান রচনা করিয়াছে। মনে হইল—আমাদের দেশের কবিরা অনর্থক বহুসংখ্যক অক্ষর দ্বারা বাক্য এবং বাক্যদ্বারা গান লিখিয়াছেন এবং লিখিতেছেন—যেখানে ২, ৩, বা ৪ অক্ষর হইলেই কার্য্য সমাধা হয় এবং উক্ত গায়কের ন্যায় শিল্পীর হাতে (মুখে ?) পড়িয়া পরিপূর্ণ গান বলিয়া আমাদের দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ও সমালোচককে পরিবেশন করা যাইতে পারে। হায় স্বর্গস্থ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রমুখ কবিগণ—হায় স্বর্গীয় রজনী সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল—এবং হায় রবীন্দ্রনাথ, আপনারা আমাদের দেশের গায়কদেরও চিনিলেন না, সমালোচকদিগকেও চিনিলেন না— ; বৃথা বাক্যের পর বাক্য ও ছত্রের পর ছত্র গান লিখিয়া পণ্ডশ্রম করিয়াছেন !

সত্য কথা বলিতে—আমরা বাঙ্গালী জনসাধারণ হিন্দীভাষা বুঝি না—অন্ততঃ ভাল বুঝি না ; এই প্রকার আলাপ বা কর্ত্তবকে আমাদের সমক্ষে গান বলিয়া প্রচার করা প্রকারান্তরে আমাদের অজ্ঞতাকে অপমান করা মাত্র। জাপান অথবা জার্ম্মানিতে গিয়া সেখানকার লোকদিগকে বুঝানো সহজ যে "মন তুমি কৃষি জান না" ইহা লক্ষ্ণৌ ঠুমরি—এমনি কি একটু নাচের অভ্যাস থাকিলে—পায়জামা ও ওড়নাই পরিয়া, পায়ে ঘুঙুর লাগাইয়া লক্ষ্ণৌর নাচওয়ালীদের কায়দায় নাচিয়াও দেখান যায়। ভাষা ও সঙ্গীত প্রণালী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জাপান জার্ম্মানির শ্রোতৃবৃন্দ উহাকে লক্ষ্ণৌ ঠুমরি বলিয়াই মানিয়া লইবে। ঠিক এইরূপ ব্যাপার নিরীহ বঙ্গদেশবাসী শ্রোতাদিগের উপর চালানো হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধ্রুবপদগানের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক গানই শৃঙ্গার রসাত্মক। এই গানগুলি আমাদিগকে এমনভাবে শুনানো হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে যাহার জন্য বাঙ্গালীর ধারণা হইয়াছে যে ধ্রুবপদ মাত্রই বীররসের

গান অন্ততঃ ভয়ানক রসের গান। গানটির অর্থ করিলে দেখা যাইবে নায়িকার উক্তি—হয়ত খণ্ডিতা নায়িকার উক্তি। কিন্তু আমাদের বুঝানো হইয়াছে—ধ্রুবপদগান 'মর্দ্দানা' (অর্থাৎ পুরুষোচিত) গান—ইহা রবীন্দ্রনাথের গানের মত মেয়েলী নহে! বাঙ্গালী শ্রোতার সহিষ্ণুতা অসাধারণ বলিতে হইবে। প্রসিদ্ধ বাগেশ্রীর খেয়াল "গোরে গোরে মুখ পর"—যাহার প্রতিপত্তি এখনও বাঙ্গালী আসরে আছে—ইহা নায়িকার রূপ সম্বন্ধে উক্তি। এই গানটিকে হর্দ্দুখানি style-এ হলকতান, গমকতান প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়া এমনভাবে গাওয়া হয় যেন দেবাসুরের সংগ্রাম বর্ণনা করা হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার ধাপ্পাবাজীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

এই সকল কথা আলোচনা করিতে দুঃখও হয় এবং হাসিও পায়। মনে করা যাউক—উক্ত তিন অক্ষরী খেয়ালের গায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে..." গাহিবেন। অতঃপর আমরা বেশ ধরিয়া লইতে পারি যে মাত্র "তোমারি রা" এই চারিটি অক্ষর সাহায্যেই ইমন কল্যাণের বিচিত্র বিচিত্র বিস্তার, তান, পাল্টা প্রভৃতি শুনিতে পাইব। যাঁহারা বলেন, স্বরবর্ণের অভাবে বাঙ্গালা ভাষায় Classical (আমাদের সদ্য পরিচিত উষ্ট্র) গান হয় না, তাঁহাদের ইহাতে কোনও আপত্তির কারণ থাকিবে না—কারণ মাত্র চারটি অক্ষরের তিন তিনটি স্বরবর্ণ! সুতরাং, আশা করা যায় বহুক্ষণ ধরিয়া "গান" হইবে। আমরা বাঙ্গালী জনসাধারণ, Classical music বুঝিবার শক্তি রাখি না—সুতরাং ভাল লাগিবে না—হাসিও পাইতে পারে এবং বাহিরে বৃষ্টি না হইতে থাকিলে চলিয়াও যাইতে পারি—একে অল্পায়ু তাহার উপর অনেক কাজ। আমাদের জন্য রজনী সেন, অতুল সেন, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল প্রভৃতির গোটা গোটা গানই ভাল। উক্ত গায়কের নিকট গোটা একটি গান এক আসরে আমরা পাইব না। এবারকার মত "তোমারি রা" শুনিয়া রাখিতে হইবে। আবার ২।৫ বৎসর পরে ঐ প্রকার আর একজন চার অক্ষরী গায়কের নিকট হয়ত "জীবন-কু" অংশটুকু পাইলেও পাইতে পারি—তবে ভরসা কম—কারণ high class আর্টিষ্টকে ফরমাইস্ করা না কি উচিত নহে। পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিলেও দুঃখ হয় যে এক জীবনে বোধ হয় গোটা গানটি শুনিতে পাইব না।

আসল কথা—এই প্রকার পাগলামি বাঙ্গালা ভাষায় চলে নাই এবং চলিবে

না—কারণ আমরা বাংলা ভাষা বুঝি। হিন্দুস্থানী গানে চলে (মাত্র বঙ্গদেশে) এজন্য যে আমরা কথার অর্থ বুঝি না সুতরাং হাস্যকর ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইতে পায় না। কেহ যদি মনে করেন যে ঐ প্রকার তিন অক্ষরী ব্যাপার হিন্দুস্থানীদের দেশে বিশেষ আদর লাভ করে তাহা হইলে তিনি ভুল ধারণা পোষণ করেন।

গানের সমালোচনায় আমার বক্তব্য শেষ করিতে ইচ্ছা করি এই বলিয়া যে গান একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি; কথা এবং ভাবই ইহার প্রাণবস্তু;—রাগরাগিণী ইহার সজ্জা;—ছন্দ ইহার গতিভঙ্গি। ইহার অনুভূতি একটি রসময় ব্যাপার যাহা মাত্র রাগরাগিণীর আলাপ, তোম তায় নোম প্রভৃতি দ্বারা একেবারেই লভ্য নহে। এইজন্য ইহার যদি বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় তবে কথা ও ভাবেরই প্রধান বিচার হওয়া উচিত এবং ঐ ভাবের সহিত রাগরাগিণী দ্বারা স্বরযোজনা কিরূপ সমঞ্জস ও সঙ্গত হইল তাহার বিচারই প্রয়োজন। কথা ও ভাব যা খুসি তা হউক এবং একদিকে পড়িয়া থাকুক—মাত্র রাগরাগিণীর ও তালের চুলচেরা বিচার সমালোচনাই হউক—এই প্রকার মনোভাব হইয়াছিল বলিয়াই ধ্রুবপদগান (যাহাকে Classical বলা যাইতে পারে) যাইতে বসিয়াছে, গোয়ালিয়রী ঢং-এর খেয়ালের নামে আসর হইতে লোক উঠিয়া যায়। অন্ততঃ এটুকু মনে রাখা উচিত যে অভিমান তাঁহাদেরই সাজে যাঁহারা নাম ও যশের প্রার্থী নহেন।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

সোমলতা

৮

বিনোদিনী যখন নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে ভিতরে চ'লে গেল, গৌরহরি স্তম্ভিতের মতো ডোবার সেই ছায়াঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে তার সম্বিৎ ফিরে এল। তখনও তার রক্ত দ্রুত তালে নৃত্য করছে।

গৌরহরি ডোবার ধার থেকে নেমে এল রাস্তায়। দু'পাশের ঘন বাঁশবন এবং কুয়াশার কল্যাণে তখনও রাস্তায় বেশ অন্ধকার আছে। কাক-পক্ষীর সাড়া নেই। বাঁশবনের ভিতর দিয়ে শন শন ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেই বদ্ধ অন্ধকারের জঠর থেকে সে বেরিয়ে এল মুক্ত প্রান্তরের বিস্তৃতির মধ্যে। গ্রামের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করল না, প্রভাতী গাইতেও না। এতক্ষণে সে যেন হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পেলে।

সে আর ফিরলে না। পিছন ফিরে চাইলেই না। তার মনের বদ্ধ জলাশয়ে অকস্মাৎ যেন নদীর মতো গতি এসেছে। তারই বেগে সে ক্রমাগত চলতে লাগল সুমুখ পানে,—কোথায় তা সে জানে না। জানবার প্রয়োজনও করে না। যার গৃহ নেই তার কাছে সকল গৃহই সমান, সকল গ্রামই এক রকম। যেখানে হোক, সে আপাতত চলল।

কিছুটা তার সুমধুর কণ্ঠের জন্যে, কিছুটা তার আত্মভোলা স্বভাবের জন্যে এদিকে এমন লোক নেই যে তাকে চেনে না। কুশনগরের বারোয়ারীতে গতরাত্রে কবিগান হয়েছে। গান ভেঙে গেছে, কিন্তু জনতা এখনও ভাঙেনি। প্রশস্ত আঙ্গিনায় খণ্ড খণ্ড দলে বিভক্ত হয়ে তারা কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে ব্যাপৃত ছিল।

তারা পরম সমাদরে গৌরহরিকে তামাক খাওয়ার জন্যে বসালে। এখনও তাদের গান শোনার সখ মেটেনি। বিশেষ, একতারা ডুবকি গৌরহরির সঙ্গেই থাকে, সেই দুটো দেখেই তাদের গান শোনার ইচ্ছা আরও বাড়ল।

বললে, একটা গান হোক বাবাজি, একখানা গোষ্ঠ বিদায়।

—আজ নয় ভাই। ফেরবার সময় শুনিয়ে যাব।

ওরা বললে, বিলক্ষণ। আজ কি আর তোমাকে ছাড়ব ভেবেছ? রাত্রে এখানে রামায়ণ গান হবে। আজকে এখানে থেকে, গান শুনে কাল সকালে যাবে।

এ-অঞ্চলের সকল লোকের মতো গৌরহরিরও গান শোনার সখ প্রচুর। তবু তার মধ্যে কেমন যেন একটা চঞ্চলতা এসেছে, কিছুতে তাকে স্থির হ'তে দিচ্ছে না।

একটু দ্বিধাভরে বললে, কিন্তু একটু দরকার ছিল যে।

ওরা হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, যাও যাও, তোমার আবার দরকার! সে কাল হবে।

গৌরহরির একতারা ডুবকি কেড়ে নিয়ে ওরা সেদিনের মতো তাকে জোর ক'রেই আটকে রাখলে।

স্নানাহার ক'রে গৌরহরি সেদিনের মতো সেইখানেই রইল। ডুবকি, একতারা বাজিয়ে গান ক'রে লোকের মনোরঞ্জন করলে। কিন্তু কিছুতে যেন সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। সকলের সঙ্গে সে হাসছে, গল্প করছে, গান গাইছে, সবই করছে,—কিন্তু সমস্তক্ষণ কি যেন একটা গুরুভার তার মনের মধ্যে সব সময় চেপে আছে। তা থেকে কিছুতে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

আজ যে সে গৃহহীন সন্ন্যাসী সে ওই বিনোদিনীর জন্যেই। তারই জন্যে সে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। তাকে একবার দেখতে, একটুখানি তার সান্নিধ্যলাভ করতে কি কাঙালপনাই না সে ক'রেছে! প্রহৃত কুকুরের মতো তার দৃপ্ত দৃষ্টির সামনে থেকে যতবার সে কুণ্ঠিতভাবে ফিরে এসেছে, কামনা যেন তার ততই বেড়েছে।

সেই বিনোদিনী অবশেষে তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু তার পরে?

গৌরহরির মনের মধ্যে ছিল একটি কিশোরী মেয়ের রূপ, রস, স্পর্শ। তারপরে কালের রথ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীও। কিন্তু গৌরহরি যেন এগোয় নি। কিশোর কালের স্মৃতির মধ্যে এখনও রয়েছে আটকে। মধ্যের এই যে অনেকগুলো বৎসর, এ যেন তাকে ছুঁতেই পারে নি। কিন্তু সে যে আজও সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কালের কিশোরী বিনোদিনীকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা সে নিজেও জানে না।

বিনোদিনীকে সে পেলে। যার সম্বন্ধে সে আশাই ছেড়ে দিয়েছিল, আশাতীতরূপে সে নিজে এসেই ধরা দিলে। কিন্তু ধরা দিলে কে? বিনোদিনী?

এত কথা গৌরহরি ভাবতে পারছে না। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অজ্ঞাত অনুভূতিতে তার মন আঁকু-পাঁকু করছে। বিনোদিনীকে পাওয়ার মধ্যে যে অসহ্য আনন্দের কল্পনা তাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছিল, তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। এ যেন সম্পূর্ণ নয়। তার আনন্দের সোনার শৃঙ্খলে মাঝ-খানের অনেকগুলি বন্ধনী যেন কোন অতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেছে,—আর কোনো দিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিনোদিনী সম্বন্ধে তার সত্যকার মনোভাবের এই নিস্তরঙ্গ কৃপণতায় সে নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা রাত্রেই রামায়ণ আরম্ভ হ'ল।

বারোয়ারী তলার উঠানটি বড় নয়। তার একদিকে সারি সারি খড়ের পালা। অন্যদিকে একটা প্রকাণ্ড বড় গোয়াল। সেখানে কতক মশক দংশনে, কতক লোকের কলকোলাহলে গরুগুলো সমস্তক্ষণ ছটফট করছে। এরই মধ্যে যতটুকু স্থান আছে তাতে রামায়ণের আসর হয়েছে। মাথার উপরে শততালিযুক্ত অনেকগুলি জীর্ণ চট সামিয়ানার কাজ করছে। একটা শতরঞ্চ রামায়ণের গায়কের জন্যে পাতা হয়েছে। তারই সম্মুখে আর একখানি শতরঞ্চে ব্রাহ্মণদের বসবার জায়গা। আর তার পিছনে, দু'পাশে উন্মুক্ত আকাশতলে গ্রামের অন্যান্য লোক, কেউ মৃত্তিকার উপর, কেউ বা এক এক আঁটি খড়ের উপর সুখাসনে আসীন। মেয়েরা দূরে, কেউ গোয়াল-ঘরের ছাঁচতলায়, কেউ বা অন্য বাড়ীর আনাচে গুটি-সুটি হয়ে বসেছে।

গান হচ্ছে "অহল্যা-উদ্ধার"। বিশ্বামিত্র এসেছেন তাড়কা নিধনের জন্যে রাম-লক্ষ্মণকে নিতে। বৃদ্ধ রাজা দশরথ এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনে প্রাণাধিক পুত্রদের জন্যে ভেবেই আকুল।

বললেন, সে কি হয় ঠাকুর! রাম-লক্ষ্মণ দুধের বালক। যুদ্ধের কিই বা তারা জানে! আর ওদিকে তাড়কার ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান। তাকে বধ করবে আমার রাম-লক্ষ্মণ?

বিশ্বামিত্র হাসলেন। পুত্র-স্নেহে অন্ধ পিতা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামকে সামান্য মানবশিশু ব'লেই মনে ক'রেছেন!

বললেন, আপনার পুত্রদের সামান্য শিশু ব'লে উপেক্ষা করবেন না রাজন! ওরা না পারে পৃথিবীতে এমন কোনোই কর্ম্ম নাই।

কিন্তু দশরথ তথাপি ভরসা পান না। পিতৃহৃদয় স্বভাবতঃই দুর্ব্বল।

বিশ্বামিত্র বললেন, রাজন! আপনি ভীত হবেন না। আপনার শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ বালক নন। তাহ'লে তাড়কার মতো দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসী নিধনের জন্যে আমি কখনই তাদের সাহায্য নিতে আসতাম না। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। রাক্ষসী-নিধন শেষ ক'রেই আমি আবার ওদের নিরাপদে আপনার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

দশরথ তবু কাঁদতে লাগ্‌লেন।

বললেন, ঠাকুর গো, তুমি বনবাসী সন্ন্যাসী। পুত্রের মমতা তুমি কি বুঝবে? রাম যে আমার নয়নের মণি। ওকে ছেড়ে আমি যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারি না!

আপন আপন পুত্রের কথা স্মরণ ক'রে মেয়েদের চোখের কোণে অশ্রু জমে উঠল। তারা অবরুদ্ধ শ্বাসে নেত্র মার্জ্জনা করতে লাগল।

এইবার পরিপূর্ণ আনন্দে মূলগায়ক গেয়ে উঠল। নূপুরের তালে তালে, করধৃত খঞ্জনীর মৃদু মৃদু ঝনৎকারে গাইলে:

হে রাজা! রাম কি একা তোমারই নয়নের মণি! জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, তিন ভুবন কি তাকে হারিয়ে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারে? তুমি ভয় পেও না। যাঁর পায়ের নখে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদের মতো উঠেছে আর লয় পাচ্ছে, তাড়কা তো তাঁর কাছে তুচ্ছ। যাঁর কৃপায় ভব-ভয় দূরে যায়, তাঁর জন্যে তোমার ভাবনা দেখে আমার হাসি আসে, হাসি আসে।

গৌরহরি তন্ময় হয়ে গান শুনছিল, আর রাজা দশরথের মূর্খতায় মৃদু মৃদু হাসছিল। ভাবটা এই যে, গৌরহরির বুদ্ধি অন্তত রাজা দশরথের চেয়ে বেশী।

কিন্তু তন্ময়তা তার বেশীক্ষণ টি'কল না। অনেকক্ষণ তামাক খায় নি, একটু তামাক খাবার ইচ্ছা হচ্ছিল। রামায়ণের আসরে ধূমপানের নিয়ম নেই। সুতরাং পাশের স্যাকরার দোকানে যদি একটু ধূমপানের ব্যবস্থা করা যায়, সেই চেষ্টায় বাইরে এল।

স্যাকরার দোকান বন্ধ। বোধ হয় তারাও রামায়ণ শুনতে গেছে। গৌরহরি ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসছিল। কিন্তু পাশের অন্ধকার গলিতে যেন হুঁকার শব্দ পাওয়া গেল। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনলে। হ্যাঁ, হুঁকার শব্দই বটে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সে গলির মধ্যে ঢুকল।

—কে?

—আমি গৌরহরি।

—এখানে কি মনে ক'রে?

গৌরহরি মাথা চুলকে বললে, একটু তামাক খাবার ইচ্ছা হ'ল। তাই ভাবলাম,

—বিলক্ষণ।

গৌরহরি সাগ্রহে ধূমপান করতে লাগল।

—গান বেশ জমিয়েছে। কি বল বাবাজি।

—হুঁ।

—গলাটিও বেশ মিঠে। কি বল?

—হুঁ।

কিন্তু অন্ধকারে উপবিষ্ট অপর একজনের একথা যেন ভালো লাগল না। বললে, গলা আর মিঠে থাকবে না কেন? গলার যন্ত্র কেমন সেটি লক্ষ্য রেখেছ?

—কি যন্ত্র?

—গান শেষ হ'লে গিয়ে একটি ছটাক গরম গাওয়া ঘি খাবে। বুঝলে? আমার মতন তো নয়!

অপরের কণ্ঠের সুখ্যাতিতে যে লোকটি সত্যসত্যই আহত হয়েছে, তা তার বাক্যের তিক্ততাতেই বোঝা যায়।

গৌরহরি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছিল। মূলগায়কের কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা নয়, বিনোদিনীর কথা। তার আর আসরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কেমন লোভ হ'ল, তাদের গাঁয়ে ফিরে যায়। এখন নিশুতি রাত্রি। গ্রাম নিস্তব্ধ। চুপি চুপি বিনোদিনীর ঘরের দরজায় কান পেতে শুনে আসে, সে ঘুমুচ্ছে, না জেগে আছে। শুনে আসে তার নরম বুকের স্পন্দন।

কিন্তু সে কি হয়! বিনোদিনীর সম্বন্ধে তার কি রকম একটা ভয় এসেছে। জীবনে আর কোনোদিন তার কাছে ফিরে যাওয়া নয়। তাকে এবার পালাতে হবে, বিনোদিনীর কাছ থেকে, যত দূরে হয়।

গৌরহরি আবার আসরে ফিরে এসে বসল।

তখন অহল্যা-উদ্ধার হয়েছে। শ্রীরামের পাদস্পর্শে পাষাণী প্রাণ পেয়েছে। কোথাও কিছু নেই, ধূ ধূ করা শূন্য মাঠের মধ্যে আচম্বিতে একটি নারী যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে তাঁদের পাদবন্দনা করছে।

চকিত হয়ে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, কে মা তুমি?

অহল্যা উত্তর দিলে না। তার কণ্ঠ রুদ্ধ। দু'চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরছে।

—তুমি কে?

গৌরহরি সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে আমি গৌরহরি।

—কোথা থেকে এলে?

গৌরহরি হাত জোড় ক'রে বললে, আজ্ঞে একটু তামাক খেতে গিয়েছিলাম। বাড়ী আমার…

সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের উচ্চহাস্যে তার বাকি কথা তলিয়ে গেল। আর আকস্মিক তুমুল হাস্যরোলে অপ্রস্তুত ও বিব্রত হয়ে গৌরহরি সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

হাসল না কেবল মূলগায়ক। এ রসিকতা তার ইচ্ছাকৃত। এমনি ভাবে মানুষকে অপদস্থ করার রেওয়াজ আছে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে করজোড়ে রামের পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে অহল্যার হয়ে বললে, প্রভু, দাসী অহল্যা। পতির শাপে পাষাণী হয়ে তোমার পদস্পর্শের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলাম।

—পতির শাপে?

—হ্যাঁ প্রভু। কিন্তু সে কলঙ্কের ইতিহাস আর আমার মুখে শুনতে চেও না। প্রভু বিশ্বামিত্র সমস্তই অবগত আছেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র অহল্যার কলঙ্কের ইতিহাস বিবৃত করতে লাগলেন।

শ্রোতৃবৃন্দের হাসি তখন থেমেছে। গৌরহরিরও অপ্রস্তুত ভাব কেটে

গেছে। সে তদ্গতচিত্তে অহল্যার কলঙ্ক-কাহিনী শুনতে লাগল। কলঙ্কিনী রাধা সতী তার আরাধ্যা দেবী। কলঙ্ক তার কাছে মধুর রসের অফুরন্ত উৎস।

কিন্তু অহল্যার কলঙ্ক-কাহিনী বিচিত্রতর। সকল কামনার উর্দ্ধগত স্বামী দূর বনে তপস্যানিরত। আর উদ্দাম যৌবন-বেদনায় অহল্যার তনুদেহ টলমল। হেনকালে এল ইন্দ্র, তার স্বামীর ছদ্মবেশে। এ চাতুরী অহল্যার চোখে গোপন রইল না। তবু সুমধুর মূঢ়তায় সেই চাতুরীর কাছেই সে আপনাকে সমর্পণ করলে।

ত্রিকালদর্শী মহর্ষি তপস্যান্তে ফিরে এসে দিলেন কঠোর অভিশাপ।

গৌরহরি অকস্মাৎ হাউ হাউ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল। যেন মহর্ষি গৌতমের অভিশাপ তারই মাথায় এসে পড়ল। তার কাণ্ড দেখে শ্রোতৃবৃন্দ আবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কিন্তু আর সে-ব্যঙ্গ সে গ্রাহ্যই করলে না। পরিপূর্ণ যৌবনা নারীর অন্তর্গূঢ় বেদনার যে সত্য ত্রিকালদর্শী মহাতপা মুনিও জানতে পারেন নি, সেই সত্য জেনেছে গৌরহরি। জেনেছে, মুগ্ধা নারী সমস্ত জেনেও কখন চাতুরীর মুখে নিজেকে দেয় বলি, কোথায় সেই সুমধুর মূঢ়তার উৎস। জেনেছে, নারী কেন ডেকে আনে সীমাহীন গ্লানি, পাষাণীত্ব ছাড়া যার হাতে মুক্তি নেই।

গান ভেঙে গেল।

গৌরহরি তার আশ্রয়ে ফিরে এসে ছেঁড়া মাদুরটি পাতলে। ঝুলিটি মাথায় দিয়ে শুলে।

—শুলে যে বাবাজি, খাবে না?

—না ভাই, ক্ষিধে নেই। অবেলায় খেয়েছি কি না।

—বিলক্ষণ! অতিথি রাত্রে উপবাসী থাকবে? তাই কি কখনও হয়! অন্ততঃ একটু গুড়-জলও…

—তা তাই দাও।

একটু গুড়-জল মুখে দিয়ে আলো নিবিয়ে গৌরহরি শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম কিছুতে আসে না। তার কেবলই মনে হয়, অহল্যার মতো বিনোদিনীও যেন পাষাণী হয়ে গেছে।

সকাল বেলায় উঠে গৌরহরি ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে বেরুল। বহু লোকের

ভিক্ষার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রেই বেরুল। পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা, তাদের গাঁয়ের সেই বৃদ্ধ ডাক্তারটি। এ-অঞ্চলে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁর ডাক।

—এ কি! তুমি এখানে যে!

গৌরহরি প্রাতঃপ্রণাম জানিয়ে হেসে বললে, আজ্ঞে তাই তো এসে জুটেছি দেখছি। গাঁয়ের সব কুশল তো?

—কুশল, তা এক প্রকার মন্দ নয়। তবে নিতাইপদর সেই বোনটির…

গৌরহরির সর্ব্বদেহে রক্ত চলাচল অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

—অসুখ বড় বেশী হয়েছিল।

ডাক্তারবাবু অন্যমনস্ক ভাবে ব'লে চললেন, অবশ্য ভয় যে এখনও কেটেছে তা বলতে পারি না। তবে যা হয়েছিল, বাঁচে যদি তো মেয়েমানুষ ব'লেই বাঁচবে।

জড়িত কণ্ঠে গৌরহরি বললে, হঠাৎ?

ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা-শাস্ত্রে অজ্ঞতায় হাসলেন। বললেন, হঠাৎই তো হয়।

—কি হয়েছিল?

—অসুখ…জ্বর…বিকার…নিমোনিয়া…আর কি চাও?

গৌরহরি চুপ ক'রে রইল।

—নাড়ী পর্য্যন্ত ছিল না। কাল সারাদিন যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নাড়ী এনেছি।

গৌরহরি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাঁচবে তো?

—ওই যে বললাম, যদি নিতান্ত না মরে তো…এই যে ঘনশ্যাম, তোমার বাবা কেমন?

ঘনশ্যাম প্রণাম ক'রে বললে, আজ্ঞে, বাবা তো এক প্রকার মন্দ নেই, কেবল জ্বরটা একটু বেড়েছে। কিন্তু ছোট ছেলেটার…

—জ্বর?

—আজ্ঞে, জ্বর হ'লে তো বাঁচতাম। কেবল সমস্তক্ষণ কাঁদছে, আর দই-এর মতো দুধ তুলছে।

—এই দেখ, চল চল। তোমাদের ওপাড়ার রত্নাকরকে দেখতে এসেছিলাম।

তা ভালোই হ'ল, পথেই দেখা হ'ল। তা চল, তোমার ছেলেটিকে আগে দেখেই রত্নাকরকে দেখতে যাব।

তারপর বললেন, রত্নাকর কেমন আছে বলতে পার?

—আজ্ঞে ভালোই। তবে বয়েস হয়েছে। এ যাত্রা বাঁচবে ব'লে তো মনে হয় না।

—হুঁ।

ডাক্তার বাবু গৌরহরির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতদূর যাবে গৌরহরি?

গৌরহরি হাত কচলে উত্তর দিলে, আজ্ঞে, ক্ষ্যাপা-বাউলের কি আর যাওয়া-আসার ঠিক থাকে?

ডাক্তার বাবু হাসলেন। বললেন, আচ্ছা।

ওঁরা চলে গেলেন। তে-মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে গৌরহরি কিছুক্ষণ ভাবলে, কোন দিকে যায়। তারপর সোজা বেরিয়ে পড়ল।

শীতের সকাল বেলায় হাঁটতে বেশ লাগে। পথের দুপাশে পাকা ধান মাঠে মাঠে শুয়ে আছে। কে যেন সারা মাঠে কাঁচা সোনা ছড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রাঁধুনী-পাগল ধানের সুমধুর গন্ধ ভেসে আসছে। গ্রাম-প্রান্তের জমিগুলিতে ধান কাটা আরম্ভ হ'লেও দূর মাঠে, যত দূর দৃষ্টি চলে, গলিত সোনার পর সোনার ঢেউ চলেছে। অরুণরাগদীপ্ত রঙীন পূর্ব্বদিগন্তের পটভূমিকায় অনতিদূরের আমবাগানগুলিকে চমৎকার দেখাচ্ছে। তার ভিতর দিয়ে দুটি একটি লোক ছায়ামূর্ত্তির মতো চলাফেরা করছে। কোথা থেকে একটা শ্যামা-পাখীর শিস্ অলসভাবে ভেসে আসছে। সরু ডালে ব'সে ফিঙে পুচ্ছ নাচিয়ে দোল খাচ্ছে।

তারই মধ্যে দিয়ে গৌরহরি গুণ গুণ ক'রে গাইতে গাইতে অন্যমনস্কভাবে পথ চলে।

মাঝে মাঝে থামে। হয়তো আলের মাথায় গৃহকর্ত্তা মজুরদের ধান কাটা তদারক করছে, আর তামাক খাচ্ছে। গৌরহরি তার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ায়।

গৃহকর্ত্তা চমকে একবার মুখ তুলে চেয়েই নিঃশব্দে কল্কেটা নামিয়ে দেয়।

গৌরহরি তামাক খেতে খেতে বলে, মা-লক্ষ্মী এবার মন্দ হবেন না। কি বলেন বাবুমশাই?

—মনে তো হচ্ছে।

গৌরহরি কল্কে নামিয়ে দিয়ে আবার হাঁটতে লাগে। আপন মনে হেঁটেই চলে। গ্রামের পর গ্রাম আসে, কিন্তু সে গ্রামের ভিতর ঢোকে না। বহু লোকের সংস্রব ইচ্ছা করছিল না। সে গ্রামের কোলে কোলে মাঠের পথ ধ'রে চলে।

ন্যাড়া আমড়াগাছে থোলো থোলো আমড়া ঝুলছে। তার তলায় ক'টি লোভার্ত্ত বালকের উদয় হয়েছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে গৃহস্থ বধূ গৃহসংলগ্ন বেগুনের ক্ষেতে জল দিচ্ছে।

কিন্তু গৌরহরি আপন মনেই চলে। সকাল পেরিয়ে দুপুর হ'ল, দু'পুর গড়িয়ে বিকেল। গুণ গুণ ক'রে সে গান গায়, আর হন হন ক'রে পথ চলে। হঠাৎ এক সময় থমকে দাঁড়াল। আপন অজ্ঞাতসারে সে একেবারে রসময়ের গ্রামে যাবার পরিচিত পথ ধ'রেছে। এখান থেকে রসময়ের আখড়া মাইল খানেকের মধ্যে।

ভালোই হ'ল! গৌরহরির এবার যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছে। পথে যখন সে বার হয়, তখন তার মনে বিনোদিনী ছাড়া আর কোনো চিন্তাই ছিল না। পথ চলতে চলতে কখন সে চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেছে। ললিতার আখড়ার কাছে এসে আবার তার নতুন ক'রে বিনোদিনীর কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল বিনোদিনীর কঠিন অসুখের খবরটা ললিতাকে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ সংসারে ললিতার চেয়ে বড় দরদী বিনোদিনীর আর কে আছে?

নদীর ধারে ধারে পথ। গৌরহরির অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছিল। কিন্তু আবার নদীতে নেমে অনর্থক খানিকটা বিলম্ব ক'রে ইচ্ছা হ'ল না। ওই তো রসময়ের আখড়া! সেখানে গিয়েই সুস্থ হয়ে জল খাবে বরং।

গৌরহরি শ্রমক্লান্ত পা দুখানা আরও একটু উৎসাহের সঙ্গে চালালে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সৎকার্য্যবাদ (খণ্ডন)*

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে বিজ্ঞানবাদীগণ সাংখ্যমতে আস্থাশীল না হইয়াও তাহার সপক্ষে যে যে প্রধান যুক্তি আছে সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিব কিরূপে তাঁহারা সৎকার্য্যবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের এই পরিণতি একদিক হইতে বড়ই বিস্ময়কর। যে সাংখ্যদর্শন আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি,—আমি অবশ্যই পালিপিটকান্তর্গত বৌদ্ধদর্শনকে আদি বৌদ্ধদর্শন বলিয়া স্বীকার করি না—সেই সাংখ্যদর্শনই পরে বৌদ্ধদিগের, বিশেষ করিয়া পরিপূর্ণ আদর্শবাদী বিজ্ঞানবাদীদের নিকট বিভীষিকায় পরিণত হইল। বিভীষিকার কারণ অবশ্য এই যে উভয় মতের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল প্রথম হইতেই মারাত্মক প্রকারের ("হিন্দু ও বৌদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কতকগুলি নৈয়ায়িকের সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞানবাদ এতদিনও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

Aristotelian logic দ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিক কাল Europeকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, Hegel-এর Dialectic-এর আঘাতেই সেই মন্ত্রজাল ছিন্ন হইয়াছে। Aristotle-এর মতে প্রত্যেক বস্তুই পৃথক্, এবং তাহার বিশেষ সত্তা আছে। স্বীকার করিতেই হইবে যে এই দিক হইতে Heraclitus-এর বিবর্ত্তবাদই ছিল অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সত্তার অনন্যত্বকে ভিত্তি করিয়াই Aristotle-এর logic গঠিত হইয়াছে,—major premise, minor premise, conclusion। Hegel কিন্তু বলিলেন সদ্বস্তু কখনও স্থির থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তনই অস্তিত্বের লক্ষণ, অপরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি অলীক কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু একথা বলিয়াই Hegel নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কারণ পরিবর্ত্তনই যদি অস্তিত্বের লক্ষণ হয়, তবে কাহার উপর অস্তিত্ব আরোপ করা হইবে? A এবং B নামক দুইটি কাল্পনিক বস্তু যদি পৃথক্ সত্তারূপে পরিগণিত হয় তবে উপরোক্ত মতে স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তিত

* Read in the Philosophical Section of the Second Indian Cultural Conference on 6. 12. 37.

হইতেছে। অর্থাৎ অস্তিত্বের দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে A হইয়া পড়িবে not-A এবং B হইয়া পড়িবে not-B। A এবং B হয়তো পৃথক্ ছিল, কিন্তু সেজন্য not-A ও not-B পৃথক্ হইবে কেন? Hegel এই সমস্যার যে সমাধান করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত :—Aristotleএর term-ত্রয়ের পরিবর্ত্তে Hegel প্রচার করিলেন thesis, antithesis ও synthesis—*ad infinitum*। Hegel-এর এই সমাধান আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়া থাকি; কিন্তু ভারতের প্রাচীন মনীষিগণ এই প্রকার সমাধান কখনই গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন এরূপ সমাধান কুঞ্জরশৌচদোষে দুষ্ট। হাতীকে স্নান করান যেমন ব্যর্থ—কারণ হাতী তৎক্ষণাৎ আবার গড়াগড়ি দিয়া শরীর মলিন করিবে—এই সমাধানও সেইরূপ, কারণ সমাধানের দ্বারাই পুনরায় নূতন সমস্যার সৃষ্টি করা হইতেছে। বিজ্ঞানবাদীগণ কিন্তু এ প্রশ্নের যে সমাধান করিয়াছেন তাহা, আমার নিকট অন্ততঃ, Hegelএর উত্তর অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে অস্তিত্বের দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে A is not-A ইহাও যেমন সত্য, A is not not-A ইহাও তেমনি সত্য। ইহারই নাম অপোহবাদ,—পরে এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"তত্ত্বসংগ্রহে" সৎকার্য্যবাদের খণ্ডনাংশ অত্যন্ত দীর্ঘ,—একটি প্রবন্ধের মধ্যে সমগ্রটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে খণ্ডনাংশের প্রধানাংশগুলির মাত্র আলোচনা করিব এবং আশা করি তাহা হইতেই সৎকার্য্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের কি বক্তব্য তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রতিবিধায়ক প্রথম কারিকায় শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

তদত্র সুধিয়ঃ প্রাহুস্তুল্যা সত্ত্বেঽপি চোদনা।
যত্তস্যামুত্তরং বঃ স্যাৎ তত্তুল্যং সুধিয়ামপি॥ ১৬॥

কারিকাটির প্রথমার্দ্ধ অস্পষ্ট; তবে মোটামুটি ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে "গুণিগণও বলিয়া থাকেন যে সমান যুক্তি (চোদনা) সৎকার্য্যবাদের বিরুদ্ধে ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; এবং উহারই মধ্যে আপনাদের (অর্থাৎ সৎকার্য্যবাদিদের) বিরুদ্ধে যে উত্তর আছে তাহা সুধীগণও (অর্থাৎ বৌদ্ধগণ) স্বীকার করিয়া লন"।

কমলশীল :—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন কার্য্যাবলি প্রধান হইতেই উৎপন্ন হয় এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে। যদি ঐ সকল কার্য্য প্রধানস্বভাবই হয় তবে ইহাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তি কেন? প্রধান হইতে অভিন্ন (অব্যতিরিক্ত) হইলে কারণত্ব ও কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ইহাদের লক্ষণ বিভিন্ন। সুতরাং আপনি যে বলিয়াছেন মূলপ্রকৃতিই কারণ, ভূতেন্দ্রিয়াদি কার্য্য, এবং বুদ্ধি, অহংকার ও তন্মাত্রাবলি একাধারে কার্য্য ও কারণ, তাহা ঠিক নহে। কোন বস্তুকেই যদি কোন বস্তু হইতে পৃথক্ করা না যায় তবে প্রত্যেক বস্তুই একাধারে কার্য্য ও কারণ রূপে পরিগণিত হইবে। যদি বলা যায় যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আসলে আপেক্ষিক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে,—তাহা হইলে যাহা আশ্রয় করিয়া রূপান্তর গ্রহণ সম্ভব হয় তাহারই অভাব বশতঃ (রূপান্তরস্য চাপেক্ষণীয়স্যাভাবাৎ) সকল বস্তু সম্বন্ধেই বলা চলিবে ইহা "পুরুষের" ন্যায় প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে। অন্যথা স্বীকার করিতে হইবে পুরুষও প্রকৃতিরই বিকার মাত্র। কথিত হইয়াছে :—

যদেব দধি তৎ ক্ষীরং যৎ ক্ষীরং তদ্দধীতি চ।
উদিতা রুদ্রিলেনৈব খ্যাপিতা বিন্ধ্যবাসিনা॥ *

অর্থাৎ "যাহা দধি তাহাই দুগ্ধ এবং যাহা দুগ্ধ তাহাই দধি" এই মত রুদ্রিল প্রকাশ এবং বিন্ধ্যবাসী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন যে বলা হইয়াছে যে "ব্যক্ত" হেতুমত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট এবং "অব্যক্ত" তাহার বিপরীত,—ইহাও বালপ্রলাপ মাত্র। অব্যক্ত যদি ব্যক্ত হইতে অভিন্ন-স্বভাবই হয় তবে বৈপরীত্য যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না, কারণ ভিন্নরূপত্বই বৈপরীত্যের লক্ষণ, নতুবা কোন বিষয়েই পার্থক্যের কথা বলা চলিবে না (ভেদব্যবহারোচ্ছেদ এব স্যাৎ)। সুতরাং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ও চৈতন্যাবলির মধ্যে পরস্পর যে পার্থক্য আছে—তাহাও বলা চলিবে না, এবং বিশ্বজগতে একটি মাত্র রূপ দেখা যাইবে; তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে উৎপত্তি ও

* ছাপা হইয়াছে "বদতা…বিন্ধ্যবাসিতা"। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভূমিকাতেও (p. LXII) এই শ্লোকটি এই আকারেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু "বিন্ধ্যবাসিতা"র স্থলে যে "বিন্ধ্যবাসিনা" হইবে ইহা তো সুস্পষ্ট। আর "বদতা" পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে বিন্ধ্যবাসীই রুদ্রিল নামে পরিচিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন একই ব্যক্তিকে একই স্থলে দুইটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করার কি সার্থকতা?

বিনাশ একই সঙ্গে ঘটিতেছে। উপরন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও জগতে সর্ব্বত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রধানাদি হইতে মহদাদির উৎপত্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা নিত্য তাহার পক্ষে কারণত্ব সম্ভব,—এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াও বলা চলিবে না যে প্রধান হইতে বিভিন্ন কার্য্যাবলির উৎপত্তি হইয়াছে, "নিত্যস্য ক্রমাক্রমাভ্যামর্থক্রিয়াবিরোধাৎ"।*

সাংখ্য :—যাহা পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না তাহার উৎপত্তি হইলেই যে কার্য্যকারণ ভাব সিদ্ধ হইবে একথা আমরা বলি না, কারণ কোন বস্তু স্বরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া (স্বরূপাভেদে সতি) বর্ত্তমান থাকিলেই এ যুক্তির বৈয়র্থ্য ধরা পড়িয়া যায় (স বিরুধ্যতে); সাপের ফণা যেমন তাহার কুণ্ডল হইতে (অভিন্ন হইলেও তন্মধ্য হইতেই) উদ্গত হয়, প্রধানও সেইরূপে মহদাদিতে পরিণত হইয়া মহদাদির কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং মহদাদিও প্রকৃতপক্ষে প্রধানের পরিণামমাত্র হইলেও তাহারই কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। (পরিবর্ত্তনের পরও বস্তু) যদি পূর্ব্বরূপই থাকে তাহা হইলেও তাহার পরিণামত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

বৌদ্ধ :—একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ এতদ্দ্বারা পরিণাম সিদ্ধ হয় না। পরিণাম বলিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ বা পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগ—এই দুইয়ের একটি বুঝায়। কিন্তু পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া পরিণাম সম্ভব নয়, কারণ তাহাতে অবস্থাসাঙ্কর্য্য ঘটিবে, বৃদ্ধাবস্থাতেই যুবত্ব স্বীকার করিতে হইবে।**—আর পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ করার অর্থ সম্পূর্ণ স্বভাবহানি, এক স্বভাবের স্থানে অপর স্বভাবের প্রতিষ্ঠা,—ইহাও পরিণাম নহে। যদি বলা যায় যে (পূর্ব্ববস্তুর) অন্যথাভাবই পরিণাম, তখনও মনে রাখিতে হইবে যে আংশিক পরিবর্ত্তন এবং সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন—এই উভয়কেই অন্যথাভাব বলে। কিন্তু আংশিক পরিবর্ত্তনে পরিণাম সিদ্ধ হইতেই পারে না, আর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনেও তাহা সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে (পূর্ব্ববস্তুর) বিনাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব অন্যথাত্ব কোনক্রমেই যুক্তি-যুক্ত নহে, কারণ অর্থান্তরোৎপত্তি ও পূর্ব্ববস্তুর পূর্ণবিনাশ পরস্পরাপেক্ষী।

* এই বাক্যটির অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

** ছাপা হইয়াছে "বৃহবাস্তবহায়াম্"। কিন্তু "বৃদ্ধত্ব'দ্যবস্থায়াম্" পড়িতে হইবে।

সাংখ্য :—(তাহা হইলে বলিব,) যে কোন বস্তুতে একটি ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও অপর কোন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকেই বলে পরিণাম, এজন্য স্বভাব-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা নাই।

বৌদ্ধ :—একথাও সন্তোষজনক নহে। কারণ সেই প্রবর্ত্তমান বা নিবর্ত্তমান ধর্ম্ম হয় ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তিত রূপেরই অঙ্গস্বরূপ, অথবা ধর্ম্মীর অপরিবর্ত্তিত রূপের অঙ্গস্বরূপ। এখন এই ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তিত রূপের অঙ্গস্বরূপ হয় তবে আদি ধর্ম্মী স্বয়ং তো তদবস্থই থাকিবে—পরিণাম আর ঘটিল কোথায়! পট, অশ্ব প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশে কি কখনও ঘটাদির পরিণাম সিদ্ধ হইতে পারে? তাহা হইলে তো স্বীকার করিতে হইবে যে পুরুষও পরিণামী। এতদুত্তরে যদি বলা হয়, যে বস্তুতে ধর্ম্মের উৎপত্তি বা বিনাশ ঘটে পরিণাম সেই বস্তুরই ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বস্তুর নহে, (তবে তাহাও আমরা অস্বীকার করিব), কারণ সৎ ও অসতের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকায় এক্ষেত্রেও সম্বন্ধ অসিদ্ধ। সম্বন্ধ বলিতে সৎ বস্তুর সম্বন্ধ বা অসৎ বস্তুর সম্বন্ধ বুঝায়। কিন্তু সতের কোন প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কারণ সম্বন্ধ বলিতে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও পারতন্ত্র্য বুঝাইবে, অথচ সৎ সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। আর অসতের পক্ষেও সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কারণ যাহারই সম্বন্ধ আছে তাহারই (অন্ততঃ সম্বন্ধস্বরূপ) গুণও আছে; কিন্তু যাহা অসৎ তাহার কোন গুণই থাকিতে পারে না। শশশৃঙ্গাদি কখনও কোন বস্তুর "আশ্রিত" হইতে পারে না।

আপনারা অবশ্য ইহাও বলিতে চাহেন না যে ধর্ম্মীতে অতিরিক্ত কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি ব্যাহত হইলেই পরিণাম সিদ্ধ হয়। যেখানে অবস্থাভেদ ঘটে অথচ বস্তুর আপন স্বভাব অক্ষুণ্ণ থাকে সেইখানেই আপনারা পরিণাম স্বীকার করিয়া থাকেন। (প্রবর্ত্তমান ও নিবর্ত্তমান) ধর্ম্ম পৃথক্ করিয়া লইলেই যে ধর্ম্মী একস্বভাব থাকে (ধর্ম্মিণঃ সকাশাৎ ধর্ম্ময়োঃ ব্যতিরেকে সতি) একথাও অযৌক্তিক। কারণ প্রবর্ত্তমান ও নিবর্ত্তমান ধর্ম্মের আত্মাই এই ধর্ম্মী। এখন আত্মাস্বরূপ এই ধর্ম্মীই যদি পৃথক্ রহিল তবে স্বভাবের অনুবৃত্তি (অনন্য পরিস্থিতি) কিরূপে সম্ভব? উপরন্তু এই দুই ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন ধর্ম্মীই কখনও উপলব্ধিগোচর হয় না, সুতরাং বুদ্ধিমান্ লোকে এরূপ ধর্ম্মীর অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না।

ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মীর অপরিবর্ত্তিত রূপের অঙ্গস্বরূপ হয়, তাহা হইলে বলিব একই মূলধর্ম্মী হইতে অভিন্ন হওয়াতে নবধর্ম্মোৎপত্তি এবং পূর্ব্বধর্ম্মবিনাশও ধর্ম্মীস্বরূপ হইয়া পড়িলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মী বা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে? ধর্ম্মী হইতে (প্রবর্ত্তমান ও নিবর্ত্তমান) ধর্ম্মদ্বয়ের কোন পার্থক্য না থাকায় পূর্ব্ব হইতেই অবর্ত্তমান কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি বা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান কোন ধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা কোন ধর্ম্মীরই পরিণাম সম্ভব হইবে না। সুতরাং পরিণামকে আশ্রয় করিয়া আপনি যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথা বলিতেছেন তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেই জন্যই সুধীগণ, অর্থাৎ বৌদ্ধগণ, বলিয়া থাকেন, "অসদকরণাৎ" ইত্যাদি যে পাঁচটি যুক্তি দেখান হইয়াছে সেগুলি সৎকার্য্যবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। বাস্তবিক পক্ষে সাংখ্যকারিকার বচনটির এইরূপ পাঠও সম্ভব :—

> ন সদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
> শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥*

এখানে "ন"এর সহিত "সৎকার্য্যম্"এর সম্বন্ধ। (এইরূপ ব্যবহিত দুইটি কথার সম্বন্ধ স্বীকার করিব) কেন? যেহেতু (বলা হইয়াছে) "সদকরণাদুপাদান-গ্রহণাৎ" ইত্যাদি। কিন্তু "অসদকরণাৎ" এবং "ন সদকরণাৎ"—এই উভয়বিধ পাঠের মধ্যে সমতা থাকিতে পারে না।

সমতা বাস্তবিক নাইও, কারণ উভয় পক্ষের অভিপ্রায় এক নহে। এখানে অকরণ সম্পর্কেই উপাদানগ্রহণাদির কথা বলা হইয়াছে, কারণ সৎকার্য্যবাদের বিরুদ্ধেও অকরণাদি যুক্তি সমভাবে প্রযুজ্য; সুতরাং এতদ্বিষয়ে (সৎকার্য্যবাদী-রূপে) আপনাদের যে মত সুধী বৌদ্ধগণও সেই মত স্বীকার করিয়া লইবেন।

> যদি দধ্যাদয়ঃ সন্তি দুগ্ধাদ্যাত্মসু সর্ব্বথা।
> তেষাং সতাং কিমুৎপাদ্যং হেত্বাদিসদৃশাত্মনাম্॥ ১৭॥

এ কারিকাটির অর্থ সরল, এবং কমলশীলও ইহার উপর বেশী কথা বলেন নাই :—যদি দুগ্ধাদির মধ্যেই তাহা হইতে পৃথকগুণবিশিষ্ট ক্ষীরাদি বর্ত্তমান থাকে তবে সেই সকল সৎবস্তুর আর উৎপাদ্য রূপ কি রহিল যে জন্য তাহাদের

* সাংখ্যকারিকার (কারিকা ৯) গৃহীত পাঠ "অসদকরণাৎ" ইত্যাদি। "অসৎ"এর স্থলে "ন সৎ" পাঠ করিয়া কমলশীল কারিকাটির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দুগ্ধাদি কারণদ্বারা উৎপন্ন হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই সকল উৎপাদ্যবস্তু তাহাদের হেতুরই সদৃশ। এখানে "হেতু" শব্দের অর্থ "প্রকৃতি", এবং "আদি" শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে চৈতন্য (পুরুষ)।

হেতুজন্যং ন তৎকার্য্যং সত্তাতো হেতুবিত্তিবৎ।
অতো নাভিমতো হেতুরসাধ্যত্বাৎ পরাত্মবৎ ॥ ১৮ ॥

কমলশীল :—এখানে হেতু—প্রধান, দৃষ্টান্ত দুগ্ধ ; তৎকার্য্য—মহদাদি, দৃষ্টান্ত দধি ; হেতুবিত্তিবৎ—প্রধান ও পুরুষের ন্যায়। যাহা সর্ব্বতোভাবে সৎ, অর্থাৎ পরিপূর্ণ, তাহা কাহারও দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে না, যেমন প্রকৃতি বা পুরুষ। অথচ (সাংখ্যমতে) কার্য্য সৎ। অর্থাৎ, (দুগ্ধের মধ্যেই) বিরুদ্ধ-পক্ষের মতে দধ্যাদি পরিপূর্ণরূপে সৎ। ইহা ব্যাপকবিরুদ্ধ (contradictory to the invariable concomitant) হইয়া পড়িল (অর্থাৎ, দধিও প্রধানের সহিত সমপর্য্যায়ের হইয়া পড়িল)। যে বস্তু কখনও পরিণামে পরিণত হয় না* তাহাও যদি উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সকল বস্তুরই জন্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহাতে অনবস্থা দোষ (infinite regression) ঘটিবে। উপরন্তু এই মতে যাহা জনিত তাহাই জনকে পরিণত হইবে। এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে (বিরুদ্ধ পক্ষ) যাহাকে কার্য্য বলেন তাহা কার্য্য নহে। এক্ষণে, যাহাকে কারণ বলা হয় তাহা যে কারণ নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে—"অতো নাভিমতঃ" ইত্যাদি। "অভিমত" বলিতে এখানে "অভিমত পদার্থ" বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, মূলপ্রকৃতি বীজ দুগ্ধাদি, মহদাদি ও দধ্যাদির হেতু হইতে পারে না, কারণ এতৎসম্পর্কে তাহাদের সাধ্যতা নাই ;—একথা অব্যবহিত পূর্ব্বেই কার্য্যত্বাভাব প্রমাণ উপলক্ষে দেখান হইয়াছে। সেই জন্যই কারিকাতে "অতঃ" এই কথাটি বলা হইয়াছে। "পরাত্মবৎ" কথাটির অর্থ "স্বাধীন কোন বস্তুর স্বভাবসম্পন্ন," অর্থাৎ "যাহার স্বভাব কোন কারণদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় নাই"। এইরূপ (পরাত্মবৎ পদার্থ) হইল চৈতন্য (পুরুষ), কারণ (সাংখ্য-কারিকায়) কথিত হইয়াছে "ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ"।

* "অনুৎপাদ্যাতিশয়" কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে :—(১) ন উৎপাদ্যাতিশয়ঃ (২) ন উৎপাদ্যোঽতিশয়ো যস্মাৎ। এখানে প্রথম অর্থেই কথাটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতেছি।

যাহার করিবার কোন কার্য্য নাই তাহা কখনই কারণ হইতে পারে না (যদবিদ্যমানসাধ্যং ন তৎ কারণম্),—যথা চৈতন্য। কিন্তু (যাহাকে কারণ বলা হইতেছে) তাহার সাধ্য কিছু নাই—সুতরাং ব্যাপকের অনুপলব্ধি ঘটিতেছে। সাংখ্যগণ যদি বলেন যে প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হওয়াতে পুরুষেরও ভোগ আছে* তখন কারিকান্তর্গত "পরাত্মবৎ" কথাটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিব :—পরশ্চাসাবাত্মা চ (তখন এটিকে দ্বন্দ্বসমাস মনে করিতে হইবে।),—এক কথায় "মুক্ত"। অর্থাৎ তখন বুঝিতে হইবে, সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় পুরুষের ভোগের উপরেও কর্তৃত্ব নাই।**

হেতুদ্বয় প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে সাংখ্য বলিতেছেন :—

অথাস্ত্যতিশয়ঃ কশ্চিদভিব্যক্ত্যাদিলক্ষণঃ।
যং হেতবঃ প্রকুর্ব্বাণা ন যান্তি বচনীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥

অর্থাৎ, উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন বস্তুর মধ্যে অন্ততঃ একটি পার্থক্য আছে,—সেটি উৎপন্ন দ্রব্যের দৃশ্যত্বাদি (অভিব্যক্তি) ; হেতুসকল এই অতিরিক্ত লক্ষণই সৃষ্টি করিয়া থাকে, সুতরাং এগুলি দূষণীয় নহে।

তদুত্তরে বৌদ্ধ :—

প্রাগাসীদ্যদ্যসাবেবং ন কিঞ্চিদ্দত্তমুত্তরম্।
নো চেৎ সোঽসৎ কথং তেভ্যঃ প্রাদুর্ভাবং সমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ, বাস্তবিকই অতিরিক্ত যদি কিছু উৎপন্ন হয় তবে দুইটি সম্ভাবনা (বিকল্পদ্বয়ম্)—হয় তাহা অভিব্যক্ত্যাদ্যবস্থার পূর্ব্বে প্রকৃতি অবস্থাতেই বিদ্যমান ছিল, নয় ছিল না। যদি স্বীকার করেন যে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে আপনারা দুইটি হেতুর কোনটিরই অসিদ্ধতাব্যঞ্জক এখনও কিছু বলেন নাই ; আর যদি বলেন যে উহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল না, তবে হেতুদ্বারা তাহাদের প্রাদুর্ভাব কিরূপে সম্ভব, কারণ আপনারাই তো বলিয়া থাকেন "যাহা নাই তাহা হইতে পারে না" (অসদকরণাৎ, সাং. কা. ৯)।

* সাংখ্যকারিকা ২০ দ্রষ্টব্য। ** এইরূপ ক্লিষ্টার্থ অবশ্যই অগ্রাহ্য।

এ পর্য্যন্ত "সদকরণাৎ"* এই হেতুর সমর্থন করা হইল। এইবার উপাদানগ্রহণাদি হেতুচতুষ্টয়েরও (বৌদ্ধমত) সমর্থক ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলা হইতেছে :—

নাতঃ সাধ্যং সমস্তীতি নোপাদানপরিগ্রহঃ।
নিয়তাদপি নো জন্ম ন চ শক্তির্ন চ ক্রিয়া ॥ ২১ ॥

অর্থাৎ, সাধ্যবস্তুই যদি না থাকে তবে উপাদান সংগ্রহেরও কোন সার্থকতা নাই ; আমাদের জন্ম পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে ; আসলে আমাদের শক্তি বা ক্রিয়া কিছুই নাই। (শান্তরক্ষিতকে এখানে সাংখ্যমত খণ্ডন করিবার জন্য কিছুই করিতে হইল না ; সাংখ্যকারিকার "অসৎ"এর স্থলে "ন সৎ" পাঠ করাতে "উপাদান গ্রহণাৎ", "সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ" এবং "শক্তস্য শক্যকরণাৎ" তাঁহার স্বপক্ষের যুক্তিতে পরিণত হইল।)

সাধ্যবস্তুর অভাবে পদার্থের কারণভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না,—ইহাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

সর্ব্বাত্মনা চ নিষ্পত্তের্ন কার্য্যমিহ কিঞ্চ ন।
কারণব্যপদেশোঽপি তস্মান্নৈবোপপদ্যতে ॥ ২২ ॥

অর্থাৎ, সকল বস্তুই যদি পরিপূর্ণরূপেই বর্ত্তমান থাকে তবে জগতে কোন কার্য্যই আর থাকিবে না ; সুতরাং কারণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইবে না। (ইহা অবশ্য "ন কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্"—ঈশ্বরকৃষ্ণের বচনের এই বিকৃতীকৃত রূপেরই ব্যাখ্যা। কমলশীল পঞ্জিকায় মাত্র বলিয়াছেন যে এতদ্দারা "কারণ-ভাবাৎ" এই হেতুর সমর্থন হইল।)

অতঃপর অন্য উপায়ে সৎকার্য্যবাদ খণ্ডনোদ্দেশ্যে বলা হইল :—

সর্ব্বং চ সাধনং বৃত্তং বিপর্য্যাসনিবর্ত্তকং।
নিশ্চয়োৎপাদকং চেদং ন তথা যুক্তিসঙ্গতম্ ॥ ২৩ ॥**

---

* ইহা অবশ্যই সাংখ্যকারিকার-বিকৃত পাঠ। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাংখ্যগণকে কটূক্তি করিলেও বৌদ্ধগণ ঈশ্বরকৃষ্ণের বচন কোথাও অগ্রাহ্য করিতেছেন না।

** এখন হইতে কেবল কারিকাগুলিরই অনুবাদ ও প্রয়োজন স্থলে ব্যাখ্যা করিয়া যাইব। ভাষ্যের অনুবাদ যখন করা হইতেছে না তখন কারিকাগুলিও মূল সংস্কৃত আকারে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

অর্থাৎ, যখনই কিছু প্রমাণ করা হয় তাহার উদ্দেশ্য হয় ভ্রান্তির নিরসন অথবা সন্দেহ স্থলে নিশ্চয়তা সাধন। সুতরাং আপনাদের মত যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ২৩ ॥

(সাংখ্যমতে) সন্দেহ ও ভ্রান্তি (সম্পূর্ণরূপে) দূর করা যায় না, কারণ (ইহা চৈতন্যাত্মকই হউক আর বুদ্ধিস্বভাবই হউক),—সর্ব্বকালেই ইহার স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সমস্তই ব্যর্থ ॥ ২৪ ॥

আর যদি স্বীকার করেন যে পূর্ব্বে যে নিশ্চয়তা ছিল না প্রমাণ বলে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইল—তাহা হইলেও (সৎকার্য্যবাদ সমর্থনের জন্য আপনি যাহা বলিয়াছেন) সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৫ ॥

যদি বলেন যে যাহা পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল তাহাই (হেতু সহযোগে) ব্যক্ত হইয়া পড়ে, (তাহা হইলে প্রশ্ন করিব) অভিব্যক্তি কাহাকে বলে ? ইহা যে অতিরিক্ত কোন কিছুর উৎপত্তি নয় (ন রূপাতিশয়োৎপত্তিঃ) তাহা নিশ্চিত কারণ তাহা হইলে (পূর্ব্বনিশ্চয়তার সহিত সম্পৃক্ত হওয়ায় এক্ষেত্রে) অসঙ্গতি (ঘটিবে) ॥ ২৬ ॥

কোন বিষয়ের সংবিত্তিকে (অভিব্যক্তি বলা যায়) না, সংবিত্তির বাধক কোন কারণের উচ্ছেদকেও (অভিব্যক্তি বলা যায় না) ; কারণ (সাংখ্যমতে) সংবিত্তি নিত্য (যাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে) ; (এবং যাহা নিত্য তাহার উচ্ছেদও) অসম্ভব ॥ ২৭ ॥

এতদ্দারা সৎকার্য্যবাদের নিরসন হইল। এইবার অসৎকার্য্যবাদ সমর্থনের জন্য বলা হইতেছে :—

ত্রৈগুণ্য হইতে অভিন্ন না হইলেও যেমন প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর কারণ হইতে পারে না, সেইরূপ অসৎকার্য্যপক্ষেও যে কোন বস্তু সর্ব্ব বিষয়ে উৎপাদক হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

এখন সাংখ্য বলিতেছেন :—

আপনার (মতে) শক্তি প্রতিনিয়ত (determined) নয়, কারণ (আপনার মতে) তাহার কোন অবধি নাই। সৎকার্য্যপক্ষে কিন্তু শক্তি প্রতিনিয়ত, এবং ইহাই কি যুক্তিসঙ্গত নহে ? ॥ ২৯ ॥

ইহার উত্তরে বৌদ্ধ :—

তাহা নহে। অবধি না থাকায় (অনিষ্পত্যা) শব্দ-প্রয়োগ সম্ভব না হইতে পারে (কারণ শব্দ অবধিব্যঞ্জক)। কিন্তু সর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিত হওয়ায় বস্তুর তাহাতে ক্ষতি নাই ॥ ৩০ ॥

সাংখ্য—তাহা হইতে পারে। কিন্তু যেখানে শব্দপ্রয়োগ সম্ভব নহে সেখানে বস্তুর স্বভাবও নিবৃত্ত হইবে (এই কথাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে) :—

বস্তুর নামই তাহার রূপ নহে, যেহেতু বিভিন্ন অভ্যাসবশতঃ একই শব্দ ও বিকল্প * বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

(এই কারিকার টীকায় কমলশীল বহু প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন।)

বৌদ্ধ :—বস্তুর অস্তিত্বই তাহার উৎপত্তি, ইহা সৎ বা অসতের সহিত সম্বদ্ধ নহে ; ইহার সম্বন্ধ কেবল মাত্র একটি কল্পনার সহিত (কল্পিকয়া ধিয়া) যাহার কিন্তু অস্তিত্ব নাই ॥ ৩২ ॥ (অর্থ অস্পষ্ট)।

এই কল্পনার বীজ কি তাহাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

পৃথিবীতে যেহেতু বস্তুর রূপ একটির অব্যবহিত পরে আর একটি করিয়া পরিলক্ষিত হয় (একানন্তরমীক্ষ্যতে), সেই জন্যই মনে হইয়া থাকে যাহা পূর্ব্বে ছিল না (তাহা উৎপন্ন হইতেছে) ; (উৎপদ্যমান বস্তু) পূর্ব্বেই বর্ত্তমান থাকিলে এরূপ মনে হইত না ॥ ৩৩ ॥

পরবর্ত্তী কারিকায় সৎকার্য্যবাদের বিরুদ্ধে নূতন যুক্তি আনয়ন করা হইতেছে :—

(আপনারা) যে বলিয়া থাকেন, ক্ষীরাদির মধ্যেই দধ্যাদি শক্তিরূপে বর্ত্তমান (তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ) দধ্যাদি যদি দুগ্ধের মতই দেখায় তবে আর "শক্তি" রহিল কোথায় ॥ ৩৪ ॥

(পূর্ব্ববস্তু) যদি অন্যই হয় তবে এক বস্তু বর্ত্তমান থাকিতে অপর বস্তুর কথা বলা হয় কেন ? সত্ত্বগুণের সদ্ভাব দ্বারা কি দুঃখ ও মোহের সদ্ভাব বুঝায় ? ** ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বে এই বলিয়া সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করা হইয়াছিল যে বস্তুসকল বিভিন্ন

---

* বিকল্প— mental construction.

** প্রথমার্দ্ধে "অন্য" কথাটি তিনবার এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে "সৎ" কথাটি তিনবার ব্যবহার করিয়া শ্লোকটিকে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে।

হইলেও তাহাদের মধ্যে অন্বয় পরিলক্ষিত হয় ; এক্ষণে এই যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে :—

সত্ত্বাদি (ত্রৈগুণ্য) হইতে যে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি একথা আমাদের মতে আদৌ সিদ্ধ নয় ; কারণ সুখাদি অন্তরস্থিত। একথা সহজেই বুঝা যায় ; স্বসংবিৎ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি ॥ ৩৬ ॥

শব্দাদিময় (বাহ্য জগৎ) যদি বা একত্র (homogeneous) হয়, তাহা হইলেও স্পষ্টই দেখা যায় যে (বিভিন্ন) অভ্যাস ও অভিলাষাদি নিয়তই উদ্ভূত হইতেছে ; (সুতরাং শব্দাদি সুখাদিরূপ হইতে পারে না) ॥ ৩৭ ॥

যদি সর্ব্বত্র একই বস্তুর (অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যের) অনুপাতিত্বে কার্য্য হয় তবে সংবিতের বৈচিত্র্য কিরূপে সম্ভব ? যদি বলেন যে অদৃষ্ট বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে তবে উত্তরে বলিব (সংবিৎ তাহা হইলে) বস্ত্বনুযায়ী হয় না ॥ ৩৮ ॥

(আপনাদের মতে) বস্তুর রূপ ত্র্যাকার (অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যময়) অথচ তাহার অনুভূতি একই প্রকার। তাহা হইলে (বস্তুর সহিত) অনুভূতির সামঞ্জস্য রহিল কোথায় ? ॥ ৩৯ ॥

যোগীদের (উপলব্ধি অনুযায়ী) একই পুরুষে প্রসাদ, উদ্বেগ ও নিরোধ ঘটিয়া থাকে ; এইরূপ পুরুষ অবশ্যই বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত নহে ॥ ৪০ ॥

যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে ব্যক্ত জগৎ ত্রিগুণাত্মক, তথাপি তদ্দ্বারা প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। (জগতের) কারণ যদি এক হইত তবে (জগৎও) একজাতীয়ই হইত ॥ ৪১ ॥

জগতে দেখা যায় যে ব্যক্তিসকল লৌহশলাকার মতই (পরস্পর পৃথক্) এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ক্রমোৎপাদদ্বারাই সম্ভব হইয়াছে (ক্রম-সঙ্গত-মূর্ত্তয়ঃ), এবং তাহাদের উপর একটি কাল্পনিক আত্মা আরোপ করা হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

নানা মৃৎপাত্রের মধ্যে যে ভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহাকে ঐকজাত্য (বলিয়া স্বীকার করা যায়) না ; কারণ তাহাদের নিমিত্তও এক নহে, যেহেতু বিভিন্ন মৃৎপিণ্ড হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

পুরুষ চৈতন্যাদি (নানা গুণ) সম্পন্ন, আপনারা বলেন না যে তাহা একটি

মাত্র (কারণ) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে (নৈকপূর্ব্বম্বমিত্যতে)। (যদি বলা যায় চৈতন্যাদিসমন্বিত) পুরুষ মুখ্য নহে তাহা হইলে (ব্যক্ত জগতের) পক্ষেও পুরুষ গৌণ হইবে না কেন ? ॥ ৪৪ ॥

এতদ্দ্বারা সাংখ্যকারিকোক্ত "সমন্বয়াৎ" এই হেতুর প্রতিষেধ হইল। এখন অবশিষ্ট হেতুদূষণার্থে বলা হইতেছে :—

প্রধানই হেতু না হইলেও দেখা যাইতেছে সমস্তই কল্পনা করা যায়। শক্তির ভেদ বশতঃই কেবল কার্য্যকারণতাদিরূপ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥৪৪ ॥

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

ভারতপথে*

(৫)

মিসেস্ মূর কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, ক্লাবের বাইরে বেরিয়ে তাঁর চমক ভাঙল। তিনি তাকিয়ে দেখছিলেন চাঁদ উঠছে, আর তারই সোনালি আলোর ছোঁয়া লেগেছে সারা আকাশের বেগুনি রঙে। দেশে চাঁদ মনে হ'ত যেন প্রাণহীন আর মানুষের নাগালের বাইরে ; এখানে পৃথিবীর মাটি আর আকাশ-ভরা তারা সবশুদ্ধ তিনি রাতের সঙ্গে হয়েছিলেন একাকার। ক্ষণেকের তরে অকস্মাৎ তার মনে হ'ল এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাঁর পরমাত্মীয়, তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ, আর চৌবাচ্চার ভিতর দিয়ে জলের ধারা ব'য়ে গেলে যেমন তা নির্ম্মল হয়ে ওঠে, তাঁরও মনে হ'ল তেমনি সরস নির্ম্মল হয়ে উঠেছে তাঁর দেহ মন। 'কাজিন কেট' বা জাতীয় সঙ্গীত (গড্ সেভ্ দি কিং) আর তাঁর কানে খারাপ লাগছিল না, তাদের সুর হারিয়ে গিয়েছিল নতুন আর এক সুরে, ঠিক যেমন সিগার আর ককটেল পরিণত হয়েছিল না-দেখা সব ফুলে। রাস্তার মোড় ফিরতেই সেই লম্বাগোছের গম্বুজহীন মন্দিরটি যেই চক্চক্ করে উঠল তিনি অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই তো—এইখানে আমি এসেছিলাম—ঠিক এই জায়গায়।"

"এখানে এসেছিলে ? কখন ?" তাঁর ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

"অভিনয়ের ছুটো অঙ্কের মাঝামাঝি।"

"কিন্তু, মা, ওরকম করা তো চলবে না।"

"চলবে না মানে ?"

"মানে এ দেশে সত্যি ওসব কেউ করে না। ধর না কেন সাপখোপের ভয় তো আছে, অন্ধকারে সব বেরোয়।"

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSACE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পঃ সঃ

"ওখানে সেই ছেলেটিও তাই বলছিল বটে।"

মিস্ কেষ্টেড ব'লে উঠলেন, "খুব রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে"। মিসেস্ মূরকে তাঁর ভয়ানক ভালো লাগত, তাই মিসেস্ মূরের ভাগ্যে এমন একটা বাঁধন-ছেঁড়ার অভিজ্ঞতা ঘটাতে তিনি ভারি খুশি হয়েছিলেন। "মসজিদে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল আপনার, অথচ আমাকে কিছু বললেনই না, বেশ!"

"আমি তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম, এডেলা, এমন সময় আর একটা কি কথা উঠল, আর আমি সেরেফ ভুলে গেলাম। দিন দিন কি যে মন হচ্ছে আমার।"

"ছেলেটি কেমন ব্যবহার করল, বেশ ভালো?"

একটু থেমে খুব জোর দিয়ে মিসেস্ মূর বললেন, "চমৎকার"।

রনি জিজ্ঞাসা করল, "লোকটি কে?"

"নাম জানি না—ডাক্তার।"

"ডাক্তার! চন্দ্রপুরে অল্পবয়সের ডাক্তার কেউ আছে ব'লে জানি না তো। আশ্চর্য! লোকটি কি রকম?"

"ছোটখাটো দেখতে, অল্প অল্প গোঁফ আছে, আর খুব তীক্ষ্ণ চোখ। মসজিদের অন্ধকার ভিতরটায় আমি যখন ছিলাম ও চেঁচিয়ে আমায় ডাকল—আমার জুতোর কথা বলতে। এই ক'রে আমাদের আলাপ শুরু। ও ভেবেছিল আমার পায়ে বুঝি জুতো আছে, কিন্তু ভাগ্যি ভালো, আমার ঠিক মনে ছিল এসব জায়গায় জুতো পরতে হয় না। আমাকে ওর ছেলেপিলের কথা সব বলল, তারপর একসঙ্গে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ক্লাব পর্যন্ত এলাম। তোমাকে ও বেশ ভালো ক'রে জানে।"

"কেন দেখিয়ে দিলে না? আমি বুঝতে পারছি না কে।"

"ক্লাবের ভিতরে ও আসেনি, বলল যে ওদের নাকি আসার হুকুম নাই।"

রনি এতক্ষণে ব্যাপার বুঝে ব'লে উঠল, "তাই বলো! মুসলমান তো! এক নেটিভের সঙ্গে তোমার হয়েছে আলাপ—তা বলতে হয়। আমি একেবারে ভুল বুঝেছিলাম।"

মিস কেষ্টেড একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন, "মুসলমান! কি ভয়ানক মজা! আচ্ছা, রনি, তোমার মা ছাড়া একরম কাণ্ড কে করবেন বলো! আমরা

ব'সে ব'সে শুধু বকছি সত্যিকারের ভারতবর্ষ দেখতে হবে, আর উনি কি না সটান গিয়ে দেখে এলেন, তারপর গেলেন ভুলে!"

রনি কিন্তু একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। মার কথায় প্রথমটা ওর মনে হয়েছিল বুঝি বা ঐ ডাক্তার গঙ্গাপারের মাথিন্স্, আর অন্তরঙ্গোচিত প্রীতিতে ওর মন গদগদ হ'য়ে উঠেছিল। কি বিষম ভুল! আসলে যে উনি একজন এদেশী লোকের। কথা বলছেন কথার ভঙ্গীতে এমন কোন আভাষ কেন দেননি? এলোমেলো কিন্তু জবরদস্ত ভাবে রনি মাকে জেরা করতে শুরু করল! "লোকটি মসজিদে তোমাকে ডেকেছিল, না? কেমন ক'রে? বেয়াড়ার মতন? ওরই বা অত রাত্রে ওখানে কি কাজ ছিল?—না, ওটাতো নমাজের সময় না।"—এ হোলো মিস কেষ্টেডের প্রশ্নের জবাব; এই ব্যাপারে তাঁর ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না—"তোমাকে তা'হ'লে তোমার জুতোর কথা বলবার জন্যে ডেকেছিল। ও হোলো একটা পুরোনো কারসাজি। তোমার পায়ে জুতো থাকলেই ছিল ভালো।"

"বেয়াদবি হ'তে পারে কিন্তু কারসাজি মনে হয় না"—মিসেস মূর বললেন। "ওর মনটা খুব চঞ্চল ছিল, গলার স্বরেই তো বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আমার জবাব পেতেই কিন্তু ও বেশ প্রকৃতিস্থ হোলো।

"তোমার উচিত ছিল জবাব না দেওয়া।"

তর্কবাগীশ মেয়েটি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। "একজন মুসলমানকে যদি গির্জার ভিতরে টুপি খুলে ফেলতে বলো, তাহলে কি তোমরা চাও না সে জবাব দেয়?"

"সে হোলো আলাদা কথা, তুমি বুঝতে পারছ না।"

"বুঝি না তা তো জানি, আর তাই তো চাই বুঝতে। তফাৎটা কি হোলো শুনি?"

রনির মনে হোলো এডেলা কেন আবার ফোড়ন দিতে আসে। মার কথায় কিছু আসে যায় না—তিনি ভবঘুরে লোক, দুদিনের জন্য এডেলাকে আগলাতে এসেছেন, যা খুশি তাই ধারণা মনে নিয়ে তারপর আবার না হয় ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। কিন্তু এডেলা যে এদেশেই জীবন কাটাবে মনস্থ করেছে; এখন থেকেই সে এই নেটিভদের ব্যাপার সম্বন্ধে এমন সব বেখাপ্পা ধারণা ক'রে

"ওখানে সেই ছেলেটিও তাই বলছিল বটে।"

মিস্ কেস্টেড বলে উঠলেন, "খুব রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে"। মিসেস্ মুরকে তাঁর ভয়ানক ভালো লাগত, তাই মিসেস্ মুরের ভাগ্যে এমন একটা বাঁধন-ছেঁড়ার অভিজ্ঞতা ঘটাতে তিনি ভারি খুসি হয়েছিলেন। "মসজিদে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল আপনার, অথচ আমাকে কিছু বললেনই না, বেশ।"

"আমি তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম, এডেলা, এমন সময় আর একটা কি কথা উঠল, আর আমি সেরেফ ভুলে গেলাম। দিন দিন কি যে মন হচ্ছে আমার।"

"ছেলেটি কেমন ব্যবহার করল, বেশ ভালো?"

একটু থেমে খুব জোর দিয়ে মিসেস্ মুর বললেন, "চমৎকার"।

রণি জিজ্ঞাসা করল, "লোকটি কে?"

"নাম জানি না—ডাক্তার।"

"ডাক্তার? চন্দ্রপুরে অল্পবয়সের ডাক্তার কেউ আছে ব'লে জানি না তো। আশ্চর্য্য। লোকটি কি রকম?"

"ছোটখাটো দেখতে, অল্প অল্প গোঁফ আছে, আর খুব তীক্ষ্ণ চোখ। মসজিদের অন্ধকার দিকটায় আমি যখন ছিলাম ও চেঁচিয়ে আমায় ডাকল—আমার জুতোর কথা বলতে। এই ক'রে আমাদের আলাপ সুরু। ও ভেবেছিল আমার পায়ে বুঝি জুতো আছে, কিন্তু ভাগ্যি ভালো, আমার ঠিক মনে ছিল এসব জায়গায় জুতো পরতে হয় না। আমাকে ওর ছেলেপিলের কথা সব বলল, তারপর একসঙ্গে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ক্লাব পর্য্যন্ত এলাম। তোমাকে ও বেশ ভালো ক'রে জানে।"

"কেন দেখিয়ে দিলে না? আমি বুঝতে পারছি না কে।"

"ক্লাবের ভিতরে ও আসেনি, বলল যে ওদের নাকি আসার হুকুম নাই।"

রণি এতক্ষণে ব্যাপার বুঝে ব'লে উঠল, "তাই বলো! মুসলমান তো? এক নেটিভের সঙ্গে তোমার হয়েছে আলাপ—তা বলতে হয়। আমি একেবারে ভুল বুঝেছিলাম।"

মিস কেস্টেড একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন, "মুসলমান? কি ভয়ানক মজা। আচ্ছা, রণি, তোমার মা ছাড়া এরকম কাণ্ড কে করবেন বলো? আমরা

ব'সে ব'সে শুধু বক্‌ছি সত্যিকারের ভারতবর্ষ দেখতে হবে, আর উনি কি না সটান গিয়ে দেখে এলেন, তারপর গেলেন ভুলে।"

রণি কিন্তু একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। মার কথায় প্রথমটা ওর মনে হয়েছিল বুঝি বা ঐ ডাক্তার গঙ্গাপারের মাগিন্‌স্, আর বন্ধুজনোচিত প্রীতিতে ওর মন গদগদ হ'য়ে উঠেছিল। কি বিষম ভুল। আসলে যে উনি একজন এদেশী লোকের৹ কথা বলছেন কথার ভঙ্গীতে এমন কোন আভাষ কেন দেননি? এলোমেলো কিন্তু জবরদস্ত ভাবে রণি মাকে জেরা করতে সুরু করল! "লোকটি মসজিদে তোমাকে ডেকেছিল, না? কেমন ক'রে? বেয়াড়ার মতন? ওরই বা অত রাত্রে ওখানে কি কাজ ছিল?—না, ওটাতো নমাজের সময় না।"—এ হোলো মিস কেস্টেডের প্রশ্নের জবাব; এই ব্যাপারে তাঁর ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না—"তোমাকে তা'হ'লে তোমার জুতোর কথা বলবার জন্যে ডেকেছিল। ও হোলো একটা পুরোনো কারসাজি। তোমার পায়ে জুতো থাকলেই ছিল ভালো।"

"বেয়াদবি হ'তে পারে কিন্তু কারসাজি মনে হয় না"—মিসেস মূর বল্‌লেন। "ওর মনটা খুব চঞ্চল ছিল, গলার স্বরেই তো বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আমার জবাব পেতেই কিন্তু ও বেশ প্রকৃতিস্থ হোলো।

"তোমার উচিত ছিল জবাব না দেওয়া।"

তর্কবাগীশ মেয়েটি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। "একজন মুসলমানকে যদি গির্জ্জার ভিতরে টুপি খুলে ফেলতে বলো, তাহলে কি তোমরা চাও না সে জবাব দেয়?"

"সে হোলো আলাদা কথা, তুমি বুঝতে পারছ না।"

"বুঝি না তা তো জানি, আর তাই তো চাই বুঝতে। তফাৎটা কি হোলো শুনি?"

রণির মনে হোলো এডেলা কেন আবার ফোড়ন দিতে আসে। মার কথায় কিছু আসে যায় না—তিনি ভবঘুরে লোক, দুদিনের জন্য এডেলাকে আগলাতে এসেছেন, যা খুসি তাই ধারণা মনে নিয়ে তারপর আবার না হয় ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। কিন্তু এডেলা যে এদেশেই জীবন কাটাবে মনস্থ করেছে; প্রথম থেকেই সে এই নেটিভদের ব্যাপার সম্বন্ধে এমন সব বেখাপ্পা ধারণা ক'রে

ব'সে তা'হলেই হবে মুস্কিল। ঘোড়ার রাশ টেনে রণি ব'লে উঠল, "ঐ যে তোমাদের গঙ্গা।"

ওদের চোখ পড়ল সেই দিকে। হঠাৎ যেন নীচের জায়গাটি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। জল বা চাঁদের আলোর জ্যোতি এ নয়; এ যেন ঘুটঘুটে অন্ধকার বাগানের মাঝখানে আলোর কেয়ারি। রণি বলল ওখানে নতুন চড়া পড়ছিল, জায়গাটির মাথায় ঐ অন্ধকার মতন অংশটি হোলো সব বালি, কাশী থেকে যত মড়া ঐখান দিয়েই ভেসে যায়—অর্থাৎ যদি কুমীরেরা ছেড়ে দেয়। "চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মড়াগুলোর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না।"

"কুমীর থাকে ওখানে, কি ভয়ানক!" রণির মা এই কথা বললেন। শুনে তরুণ তরুণী দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে হাসলেন। বুড়ীর এরকম একটু ভয়-টয় পেলে ওদের বেশ মজা লাগত আর ফলে দুজনের আবার ভাব হ'য়ে যেত। "কি ভীষণ নদী! কি অপরূপ নদী।" বুড়ী এই কথা ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। চাঁদ বা বালি যাহোক একটা স'রে যাবার জন্যে এরই মধ্যে জ্বলজ্বলে জায়গাটি একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল; একটু পরেই ঐ আলোর কেয়ারিটা মিলিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা গোল মতন জায়গা শুধু ফাঁকা স্রোতের ওপর চকচক করবে, তারপর তাও যাবে বদলে। শেষ পর্য্যন্ত এই বদল দেখে যাবেন কি না মহিলা দুটি তাই আলোচনা করছিলেন, কিন্তু নিঃস্তব্ধতার মাঝখানে এখানে ওখানে কেমন যেন সব আওয়াজ হতে লাগল আর ঘোড়াটি কাঁপতে সুরু করল। সুতরাং তাঁরা অপেক্ষা না করে গাড়ি হাঁকিয়ে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ি পৌঁছে মিস কেষ্টেড গেলেন শুতে, মিসেস মূর ছেলের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইলেন।

মসজিদের সেই মুসলমান ডাক্তারটি সম্বন্ধে রণি একটু খোঁজ করতে চাইল। সন্দেহজনক লোকদের সম্বন্ধে সরকারে খবর দেওয়া ছিল তার এক কাজ; এই লোকটি হয়তো কোনো বদমায়েশ হাকিম, বাজার থেকে এসে জুটে থাকবে। লোকটি মিন্টো হাঁসপাতালে কাজ করে মা'র মুখে এই খবর শুনে রণি আশ্বস্ত হ'য়ে বলল, তা'হলে ওর নাম নিশ্চয় আজিজ হবে, আর লোকটি কিছু খারাপ নয়, ভাবনার কিছু নাই।

"আজিজ! কি সুন্দর নাম!"

"তাহলে ওর সঙ্গে তোমার আলাপসালাপ হয়েছে। কি রকম ভাব দেখলে—বেশ ভালো?"

এই প্রশ্নের মানে ঠিক বুঝতে না পেরে মিসেস মূর জবাব দিলেন, "প্রথমটা একটু যেন কেমন, তারপর বেশ ভালোই।"

"আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম মোটামুটি ওর ভাব কেমন। আমরা হলাম কিনা হৃদয়হীন বিজেতা, হাড়ে-ঘুন-ধরা শাসক-সম্প্রদায়—আমাদের ও সহ্য করতে পারে কি না?"

"মনে তো হোলো পারে—ক্যালেণ্ডারদের ছাড়া, ক্যালেণ্ডারদের ও বিশেষ পছন্দ করে না।"

"বটে! তোমাকে তা'হলে সে কথা বলা হয়েছে? মেজর সাহেব শুনলে খুসি হবেন। আমি ভাবছি আসলে কি উদ্দেশ্যে ও এই কথা বলেছে।"

"রণি, তুমি তাই বলে মেজর ক্যালেণ্ডারকে এই কথা বলতে যাবে না।"

"তা বোধ হয় বলতে হবে। বোধ হয় আর কেন, নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু, শোনো,—"

"মেজর যদি শোনেন আমার অধীন কোনো নেটিভ আমাকে পছন্দ করে না, আশা করি তিনি আমাকে তা জানাবেন।"

"কিন্তু এ তো একেবারে নিজেদের মধ্যের কথাবার্ত্তা।"

"ভারতবর্ষে নিজেদের মধ্যে বলে কিছু নাই। আজিজ তা' জেনেই তোমাকে যা বলবার বলেছে, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। নিশ্চয় একটা কিছু মৎলব ছিল। আমার মনে হয় সত্যি ও তা ভাবে না।"

"মানে?"

"মেজর সাহেবকে ও গাল দিয়েছে কেবল তোমার কাছে বাহাদুরি নেবার জন্যে।"

"কি বলছ কিছু বুঝছি না।"

"লেখাপড়া-জানা নেটিভদের এই হ'ল এখনকার ফন্দি। আগে তারা ছিল একেবারে যোহুকুম, কিন্তু নব্য দল চায় নিজেদের তেজ জাহির করতে। ওরা ভাবে যে পার্লামেন্টের সভ্য যাঁরা এদেশে হাওয়া খেতে আসেন তাঁদের কাছে

এতেই বেশি সুবিধা হবে। কিন্তু হাতজোড়ই করুক বা আস্ফালন করুক, নেটিভরা বিনা মৎলবে একটি কথা বলে না—মৎলব একটা থাকবেই, নিদেন পক্ষে নিজেদের ইজ্জৎ বাড়ানো। অবিশ্যি এর অন্যথা যে হয় না, তা নয়।"

"দেশে কখনো এভাবে মানুষকে বিচার করতে তোমায় দেখিনি।"

"ভারতবর্ষ নিজের দেশ নয়"—একটু তিরিক্ষি ভাবে রণি এই জবাব দিল। মার মুখ বন্ধ করার জন্য রণি যে-সব বুলি বলছিল তা ওর নিজের নয়—প্রবীণ সাহেবসুবাদের কাছ থেকে শেখা, তাই ও নিজের মনে খুব জোর পাচ্ছিল না। 'অবিশ্যি, এর অন্যথা হতে পারে'—এই কথা ও শুনেছিল টার্টন সাহেবের কাছে, আর 'ইজ্জৎ বাড়ানো' একেবারে মেজর ক্যালেণ্ডারের মুখের কথা। ক্লাবে এই সব বুলির চল্ ছিল, কিন্তু মিসেস মূর চালাক লোক, ওর আশঙ্কা হচ্ছিল তিনি ধ'রে ফেলেন যে এসব কথা ওর নিজের নয় আর ওকে চেপে ধরেন প্রমাণের জন্যে।

উনি শুধু বল্লেন, "আমি একথা বলি না যে তুমি যা বলছ তার কোনো মাথামুণ্ডু নাই, কিন্তু ডাক্তার আজিজ সম্বন্ধে যা বলেছি মেজর ক্যালেণ্ডারকে তুমি তা কিছু বলতে পারবে না কিন্তু।"

রণির মনে হোলো বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তবু সে মাকে কথা দিল ক্যালেণ্ডারকে এ বিষয়ে কিছু বলবে না, আর তার বদলে মাকে অনুরোধ করল এডেলার সঙ্গে আজিজের বিষয় কথা না বলতে।

"আজিজের বিষয় কথা বলব না, কেন ?"

"ঐ দেখো, মা, আবার তোমার সেই আবদার—সব কিছু তোমায় বুঝিয়ে বলা চলে না। আসল ব্যাপার, আমি চাই না এডেলাকে ভাবাতে—আমরা নেটিভদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি কি না এই সব বাজে কথা নিয়ে ও হয়তো মাথা ঘামাতে সুরু করবে।"

"কিন্তু মাথা ঘামাবে বলেই তো ও এসেছে। সারা জাহাজ ও এই বিষয়ে আলোচনা করেছে। এডেনে জাহাজ থেকে নেমে ডাঙায় গিয়েও এই বিষয়ে আমাদের অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছিল। ও বলে কি জানো ? তোমাকে ও দেখেছে শুধু খেলাধূলোর সময়ে, সত্যিকারের কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার পরিচয় ও পায়নি ; আর তোমরা দুজনেই পরস্পর সম্বন্ধে শেষমেষ ঠিক করার আগে যাতে

সেই পরিচয় হয়, এই উদ্দেশ্যেই ও এসেছে। খুব নিরপেক্ষ ওর মন বলতে হবে—খুবই।"

হতাশভাবে রণি বলল, "তাতো জানি।" গলার স্বরে ওর ছিল উদ্বেগ, তাইতে ওর মার মনে হোলো ও ছোটছেলের মতনই থেকে গেছে, যা আবদার করবে তা ওকে পেতেই হবে, তাই ওর কথামত চলতে উনি রাজি হ'য়ে সে রাতের মতন যে-যার ঘরে শুতে গেলেন। কিন্তু আজিজ সম্বন্ধে ভাবতে তো ও মানা করেনি, নিজের ঘরে শুয়ে তাই আজিজের কথাই ওঁর বারবার মনে হ'তে লাগল।

মসজিদের ব্যাপার সম্বন্ধে ছেলের ধারণা ঠিক কি ওঁর নিজের ধারণা ঠিক তা বোঝার জন্যে উনি রণির কথামত আবার ব্যাপারটি আনুপূর্ব্বিক মনে মনে গড়ে তুললেন। হ্যাঁ, বিশ্রী একটা কিছু এর থেকে ভাবা চলে বটে। ডাক্তারটি সুরু করে ওঁকে ধমক দিয়ে। মিসেস ক্যালেণ্ডারকে ও প্রথমে বলে খুব ভালো, তারপর যেই বুঝল ভয় নাই অমনি ওর মত বদলে গেল। একবার মিসেস মূরকে দেয় আশ্বাস, আবার পরমুহূর্ত্তে নিজের দুঃখের কথা বলতে ওর যায় বুক ফেটে—ক্ষণে ক্ষণে ওর মতের পরিবর্ত্তন হয়। একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য লোক, তার উপর নিজের সম্বন্ধে দেমাকের অন্ত নাই, আর পরের কথা জানবার তেমনি ওর কৌতূহল। হুঁ, এ সবই সত্যি, কিন্তু আসল লোকটি সম্বন্ধে তবু কিছুই তা' খাটে না,—এতে আজিজের ভিতরকার মানুষটি একেবারে পড়ে মারা।

গায়ের ওভারকোট দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে গিয়ে ওঁর চোখে পড়ল পেরেকের ঠিক মাথার ওপর একটা ছোট্ট বোলতা। দিনের বেলায় এই জাতের কিম্বা এরই জ্ঞাতি বোলতা তিনি দেখেছিলেন। মোটেই এরা বিলিতি মৌমাছির মতন নয়, ওড়বার সময়ে এদের লম্বা হলদে রঙের পা পিছনে ঝুলতে থাকে। বোধ হয় বোলতাটা পেরেককে মনে ক'রে থাকবে একটা গাছের ডাল। ভারতবর্ষের জন্তু জানোয়ারগুলোর ভিতর-বাহির জ্ঞান নাই ; ইঁদুরবাদুড় পোকা-মাকড় পাখিফাখি সব বাড়ির বাইরে যেমন তেমনি ভিতরে এসে বেমালুম বাসা বাঁধে। ওরা বোধ হয় ভাবে বাড়ির ভিতরটা জঙ্গলেরই একটা অংশ—বাড়ি আর গাছ, গাছ আর বাড়ি, এই হোলো সনাতন স্থিতিবৃদ্ধির রীতি। বোলতাটা দিব্যি পেরেকটি আঁকড়ে ছিল ঘুমিয়ে ; বাইরে মাঠে ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শেয়ালের দল হুক্কাহুয়া ধ্বনিতে জানাচ্ছিল তাদের মনের বাসনা।

মিসেস মূর বোলতাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাছারে!" তেমনি ঘুমিয়ে রইল বোলতাটি, কিন্তু ওঁর গলার স্বর ভেসে গেল বাইরে, রাত্রির অশান্তি বাড়ানোর জন্যে।

(৬)

কালেকটার সাহেবের যেমন কথা তেমনি কাজ। পরদিনই তিনি একগাদা এদেশী ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন—ক্লাবের বাগানে মঙ্গলবার বিকালে পাঁচটার থেকে সাতটার মধ্যে তিনি হবেন 'এ্যাট্ হোম্', আর তাঁদের বাড়ির মেয়েরা যাঁরা পর্দা মানেন না তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং তাঁর গিন্নি থাকবেন হাজির। বেশ একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল, দিকে দিকে চল্‌ল এই নিয়ে আলোচনা।

মামুদ আলি টিপ্পনি কেটে বললেন, "ছোটলাটের হুকুম, ঠেলায় না পড়লে টার্টন সাহেব এরকম করার পাত্রই নয়। লাটবেলাটের কথা আলাদা—ওঁদের দরদ আছে, ওঁদের কাছে আমরা নিশ্চয় ভালো ব্যবহারই পেতাম, কিন্তু ওঁরা থাকেন এতদূরে আর আসেন এত কম যে—"

প্রবীণ এক ভদ্রলোক দাড়ি নেড়ে বল্‌লেন, "দূর থেকে দরদ দেখানো সোজা। তার চাইতে কাছে এসে দুটো মিষ্টি কথা বললে তার দাম অনেক বেশি। কারণ যাই হোক না কেন, টার্টন সাহেব মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন, আমরাও শুনেছি, বাস্, আর তর্কাতর্কির কি দরকার?" এই ব'লে কোরাণের দু'চারটে বাণী তিনি আওড়ালেন।

"নবাব বাহাদুর, আমাদের না আছে আপনার মত মোলায়েম স্বভাব, না আছে আপনার বিদ্যে।"

"ছোটলাটের সঙ্গে আমার দস্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর উপর কোনো জুলুম তো আমি করি না—'নবাব বাহাদুরের মেজাজ শরিফ তো?' 'বিলকুল—সার গিলবার্ট, আপনার?' এই যথেষ্ট। কিন্তু টার্টন সাহেবকে আমি নাকাল করতে পারি। তবু, নিমন্ত্রণ যখন তিনি করছেন, আমিও তা গ্রহণ করছি, আর এর জন্যে অন্য কাজ মুলতুবি রেখে দিলখুসা থেকে আমি আসব।"

ছোটখাটো কালো মতন একটি লোক হঠাৎ ব'লে উঠল, "ফলে কেবল আপনার নিজেরই দর কমবে।"

একটা আপত্তির সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। কে এই ভুঁইফোড় ছোটলোক, জেলার সব চাইতে বড় জমীদারের কথার উপর যে কথা বলে! মনে মনে সায় থাকলেও মামুদ আলি প্রতিবাদ না ক'রে পারল না। কোমরের উপর দুই হাত রেখে শক্ত হ'য়ে সামনে ঝুঁকে সে বলল, "রামচাঁদবাবু!"

"মামুদ আলি সাহেব!"

"শুনুন রামচাঁদবাবু, কিসে দর কমে না কমে আমরা যাচাই না ক'রে দিলেও নবাব সাহেব তা সম্বন্ধে চল্‌তে পার্‌বেন।"

লোকটি যে বে-কায়দা কাজ করেছে নবাব সাহেব তা বুঝেছিলেন, আর যাতে বেচারিকে এর জন্য লাঞ্ছনা পেতে না হয় সেই জন্যে খুব মোলায়েম গলায় তিনি বললেন, "আশা করি আমার দর কমে এমন কিছু করব না।" মনে হয়েছিল একবার বলেন, "হ্যাঁ, দর তো নিজের কমবে ব'লেই মনে করছি।" কিন্তু একটু কড়া শুনাবে ব'লে আর এরকম জবাব দিলেন না। "এতে দর কমার কি আছে, দর কেন কমবে? নিমন্ত্রণ-পত্র যা এসেছে বেশ ভদ্রলোকেরই মতন তো।" সমাজের এক স্তরের লোক তিনি, তাঁর শ্রোতৃবর্গ আর এক স্তরের। এই দুইয়ের মাঝখানে এর চাইতে বেশি যোগাযোগ তাঁর সাধ্যাতীত তা উপলব্ধি ক'রে তাঁর নাতিকে পাঠালেন তিনি তাঁর গাড়ি ডাকতে; এই কায়দা-দুরস্ত ছেলেটি ঠাকুর্দার সঙ্গেই ছিল। গাড়ি এলে যা' যা' আগে বলেছিলেন সব কথা আরো ফলাও ক'রে আর একবার সকলকে শুনিয়ে তিনি শেষ এই ব'লে বিদায় নিলেন, "তাহলে, ভাই-সাহেবরা, আবার সেই মঙ্গলবারে আশা করি ক্লাবের ফুল-বাগিচায় সবার সঙ্গে দেখা হবে।"

নবাব বাহাদুরের কথায় বিশেষ কাজ হোলো। তিনি ছিলেন মস্ত জমীদার, তার উপর দয়ালু পরোপকারী লোক, মতামতও ছিল তাঁর খুব স্পষ্ট। ঐ তল্লাটের সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। বন্ধুবাৎসল্য ছিল তাঁর গভীর, যাঁদের সঙ্গে বনত না তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় তিনি করতেন না, আর অতিথিসৎকারে ছিলেন তিনি অদ্বিতীয়। 'দান কোরো কিন্তু ধার দিয়ো না; মরলে পরে কে গুণগান করবে?'—এই ছিল তাঁর প্রিয় বুলি।

দেদার টাকা রেখে মরাকে তিনি খুব হেয় মনে করতেন। এহেন ব্যক্তি বিশ মাইল হাওয়া গাড়ি হাঁকিয়ে এসে কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে করমর্দ্দন করতে রাজী হওয়াতে, এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম হ'য়ে দাঁড়াল। কেন না, অন্য যে-সব বড়া আদমি আসব ব'লে শেষমেষ চম্পট দেন আর ফলে বে-কায়দায় পড়ে যত চুনোপুঁটির দল, নবাব সাহেব তাদের মতন ছিলেন না। আসব একবার বললে নিশ্চয় তিনি আসবেন, তাঁর অনুচরদের তিনি কখনই মুস্কিলে ফেলবেন না। এতক্ষণ যাদের তিনি উপদেশ দিলেন সবাই পরস্পরকে এই পার্টিতে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি সুরু করল, যদিও মনে মনে তারা স্থির বুঝেছিল, তাঁর পরামর্শ মোটেই বিহিত নয়।

নবাব বাহাদুর কথা কইছিলেন আদালতের কাছে ছোট একটা ঘরে, উকীলের দল মক্কেলের আশায় যেখানে বসে থাকত। মক্কেলরা বসত বাইরে মাটির উপর। তারা অবশ্য টার্টন সাহেবের নিমন্ত্রণ পায় নাই। আর তাদের থেকেও দূরে ছিল অন্য সব লোকেদের দল—নেংটিছাড়া কিছু যারা পড়েনা এমন সব লোক, আর যারা তাও পড়েনা, যারা শুধু লাল পুতুলের সামনে দুটো কাঠি ঠুকে দিন কাটায়—স্তরের পর স্তর এরা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পেরিয়ে চ'লে গেছে এত দূরে যে সংসারের কোনো নিমন্ত্রণেই এদের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব।

বোধ হয় সব নিমন্ত্রণের একমাত্র উৎস স্বর্গ। মানুষের পক্ষে নিজেদের মধ্যে ঐক্যসাধনের চেষ্টা বোধ হয় মূঢ়তামাত্র, ফলে বোধ হয় শুধু ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। অন্তত প্রবীন পাদরি গ্রেস্‌ফোর্ড সাহেব এবং তাঁর নবীন সহচর সর্লের এই কথা মনে হয়েছিল। এই দুই নিষ্ঠাবান কর্ম্মী থাকতেন কসাইখানার পিছনের দিকে, ট্রেণে থার্ডক্লাশ ছাড়া তাঁরা চড়তেন না, ক্লাবের চৌকাঠ ভুলেও কখনো তাঁরা মাড়াতেন না। তাঁরা প্রচার করতেন, মানুষের অগণিত বিরোধী সম্প্রদায়ের আশ্রয় ও শান্তি পাবার একমাত্র স্থান পরম পিতার আলয়, যেখানে প্রকোষ্ঠের অন্ত নাই। কালা আদমি হোক, শাদা আদমি হোক, বারান্দার চাকর দারোয়ান কাউকে সেখান থেকে হাঁকিয়ে দেবে না, আগ্রহ ক'রে যারা আসবে তাদের কাউকে ঢোকবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু পরম পিতার আতিথ্যের কি এখানেই শেষ? যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে বানরকুলের কথা একবার ভেবে দেখা যাক। তাদের জন্য কি প্রকোষ্ঠ থাকতে পারে না?

বৃদ্ধ গ্রেসফোর্ড জবাব দিতেন, না তা নাই, কিন্তু উদারমত তরুণ সর্লে সাহেব বলতেন, আছে; মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বানরেরাও যে পরম পিতার প্রসাদের ভাগ পাবে না, একথা তাঁর অযৌক্তিক মনে হ'ত, আর হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে তিনি বানরদের পক্ষ হ'য়ে এই বিষয়ে আলোচনা করতেন। আর শৃগালকুল? অবশ্য সর্লে সাহেব শেয়ালদের আর একটু নীচু স্তরের মনে করতেন, কিন্তু তিনি স্বীকার করতেন যে যেহেতু ভগবানের করুণা অসীম, অতএব স্তন্যপায়ী জীবমাত্রই তার ভাগী হ'তে পারে। আর বোলতারা? বোলতাদের কথা উঠলে তিনি আমতা আমতা ক'রে কথা ঘুরিয়ে দিতেন। আর কমলানেবু, শেওড়া, স্ফটিক, কাদা? আর সর্লে সাহেবের দেহাভ্যন্তরের বীজাণু? না, না, অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়; এই প্রসাদ বিতরণের সভায় একেবারে কাউকে যদি বাদ না দেওয়া যায়, তা'হ'লে আমাদের ভাগে যে কিছুই জুটবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ঝড়কে ডানায় পুষে

সমুদ্রের বুকে ঝিকিমিকি।
বুনোহাঁসের পালক বেয়ে ঝরঝর জ্যোছনা ঝরছে।
রাত বুঝি দুপুর,
তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

আজ চাঁদের রাতের জোয়ার,
দেখ, সমুদ্র উঠ্‌লো ফুলে।
কিন্তু উল্লাস নেই,
নেই বালুবেলায় আছড়ে পড়া।
আজ সমুদ্র স্থির।
শুধু তার অশান্ত জিজ্ঞাসা
গম্ভীর ওঙ্কারে আকাশের বুকে গিয়ে লাগ্‌লো,
ফিরে এলো প্রতিহত হয়ে।

ঘুম, ঘুম, ঘুম।
ঘুমপুরীর সকল কটা খোলা আগল দিয়ে
নাম্‌লো ঘুমের জাদু তোমার চোখে।

বুনো হাঁসের ডানার ফাঁকে
অশান্ত ঝড়ের বাসা,
দুর্দম ঝড়ের।
আজ তারা কি স্থির হোলো ঝড়কে ডানায় পুষে?
রাত যে দুপুর,—
বুনো হাঁসের গায়ের মতো ধবধবে সাদা তোমার বুক,
আমার বুকে বাঁধা। দুহাত আমার গলায়।
অগোছালো চুলের গোছায় আমার চোখ ঢাকা।
ঘুমপুরীতে কোথায় তোমার নাগাল পাব?

দোহাই তোমার,
আজ রাতে জেগো না তুমি,
আজ রাতে জাগে না যেন কেউ।
আজ আমাকে ভালোবাসতে দাও, তোমায় দাও,
এই রাত দুপুরে,
আজকে যখন বুনোহাঁস ঠাণ্ডা হোলো
ঝড়কে ডানায় পুষে।

পিছলে গিয়ে হাঁসের রঙীন গলায়
ফুলঝুরীর মতো ঠিকরে পড়ছে জ্যোছনা।
সমুদ্র শান্ত,
ক্ষীণ হয়ে আসছে তার গম্ভীর জিজ্ঞাসা।

চাঁদের আলোয় ডাক্‌লো যে বান
তাতে দিলো বুঝি পাড়ি বুনোহাঁস,
ওই খুললো তার পালক।
অশান্ত ঝড় মেললো ডানা,
ওই হোথা, ওই অ-লোকে।

কিন্তু দোহাই তোমার,
দাও আমাকে দাও, তোমায় দাও,
ভালোবাসতে দাও,—
রাত যে দুপুর, আর,

মনীশ ঘটক

তুমি ও আমি

(কুয়ান তোয়া শেঙ)

তুমি আর আমি
পরস্পর এত ভালোবাসি, যেন
একটি মাটির তাল ছুটি ভাগ করে'
গড়া হোল তোমার প্রতিমা
আমারও আকৃতি।
আনন্দের বিহ্বল সংঘাতে
একটি পলকে
ভাঙি মোর মূর্ত্তি ছুটি চূর্ণ চূর্ণ করি ;
মিশাইয়া জলে
নাড়া দিয়ে চট্‌কিয়ে গড়ি যে আবার
তোমার প্রতিমা, আমারও আকৃতি।
সে মুহূর্ত্ত-কালে
তোমারে পাইবে তুমি আমার মাঝারে,
আমারেও পাবো আমি অন্তরে তোমার।

বিচ্ছেদ

(যান সট্‌থায়)

যে প্রেমে বিচ্ছেদ নাহি তার প্রতি নাহি মোর লোভ :
চুমো ও ছোঁয়ার
সূচী-বিন্দু তারাময় আগ্নেয় উৎসবে
গাঢ়তম তৃপ্তি মেলে না ত ;
মেলে যাহা আনন্দের স্মরণে ও প্রতীক্ষায়—
অন্তরের আন্তস্তার মহাশূন্যাকাশে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়।

চীনের প্রতিরোধ

প্রায় ছ' মাস হয়ে গেল জাপান চীনকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। জলে, স্থলে, আকাশে জাপানের ক্ষমতা চীনের চেয়ে ঢের বেশী। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া কেউই চীনকে যুদ্ধ-প্রকরণ পাঠিয়ে বা অন্য উপায়ে সাহায্য করছে না। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসার দেখে অন্যান্য সাম্রাজ্যতন্ত্রীদের ঈর্ষার উত্তাপ বাড়ছে বটে, কিন্তু এখনই জাপানকে চটাবার তাদের সাহস বা ইচ্ছা নেই। তারা জাপানের প্রতিপত্তির চেয়ে চীনের জাগরণকে ভয় করে অনেক বেশী। পরস্পর বিরোধ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যতন্ত্রগুলির অন্তত এক বিষয়ে মিল আছে, আর তা হচ্ছে গণ-আন্দোলনের ভয়। চীনে জাপানের কাছে ইংরেজ প্রায়ই জব্দ হচ্ছে দেখে আমাদের খুশী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক হলেও একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে চীনে যে বিরাট আন্দোলন সম্প্রতি গড়ে উঠেছে, তার সাফল্যকে ভয় করে বলেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানের হাতে অপমান সহজেই হজম করতে সঙ্কোচ করছে না। চীনে যে সংগ্রাম আজ চলেছে, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণশক্তির সংগ্রাম।

সব চেয়ে বড় আশার কথা এই যে এবার আর পূর্ব্বের মত চীনের অন্তর্বিবাদ তার প্রতিরোধকে পঙ্গু করতে পারে নি। বিদেশীদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে কখনও আজকের মত দৃঢ় সঙ্কল্প ও ঐক্য চীনে দেখা যায় নি। বিদেশী "বর্ব্বর"দের দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়ার পর চীনকে তাদের হাতে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। পৃথিবীর কোনো জাত চীনাদের মত ক্ষত্রিয়-বলকে ঘৃণা করে নি ; ক্ষত্রিয়বল আর বণিক-বুদ্ধি মিলে তাই বারবার চীনের অঙ্গচ্ছেদ করে এসেছে, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করেছে। এতদিন লোলুপ বিদেশীদের সাহায্য করেছে চীনের গৃহবিবাদ। আজ সেই গৃহবিবাদ দূর হয়ে যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, তারই ভয়ে সম্প্রতি জাপানের প্রধান মন্ত্রীকে বলতে হয়েছে যে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চালাবার জন্য দেশকে প্রস্তুত হতে হবে। ১৯৩১-৩২ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় যে সহজ সাফল্য লাভ করেছিল, এবার আর তার আশা নেই। জাপানকে সেবার সাহায্য করেছিল শুধু পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলির

জঘন্য ঔদাসীন্য নয়, চীন সরকারের কাপুরুষতা আর দেশের মধ্যে দলাদলি জাপানের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়েছিল। এখন সেই দলাদলি গেছে, গণশক্তি সম্মিলিত হয়েছে। নির্ব্বান্ধব চীন তাই আজ পরাজয় মানছে না, জীবনপণ করে শত্রুকে প্রতিরোধ করছে।

কয়েকদিন আগে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর কাছে জেনারল চু-তে ভারত-বাসীদের সাহায্য চেয়ে এক চিঠি লিখেছেন। চু-তে ছিলেন চীন লাল ফৌজের ('রেড্ আর্মি') প্রধান সেনাপতি ; কয়েক মাস আগেও চিয়াং-কাই-শেক তাঁকে পাকড়াও করার জন্য প্রচার করেছিলেন যে জীবিত বা মৃত অবস্থায় চু-তেকে (এবং অন্য কয়েকজন কম্যুনিষ্টকে) আনতে পারলে বিশেষ পুরস্কার মিলবে। কিন্তু আজ জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চীনের লাল ফৌজ জাতীয় সেনাদলের সঙ্গে মিলেছে, চু-তে তাদের একজন প্রধান অধিনায়ক। চীনে সম্মিলিত গণশক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশরক্ষা। কম্যুনিষ্ট নেতা মাওৎসে-তুং বলেছেন যে চীনের স্বাধীনতা গেলে সেদেশে সাম্যবাদের আলোচনাই নিরর্থক হয়ে পড়বে। তাই আজ জাপানের কবল থেকে দেশ রক্ষা যাঁরা করতে চান, তাঁরা সবাই একত্র হয়েছেন। ফ্রান্সে বা স্পেনে মোটের ওপর বামপন্থীরা মিলে যে 'পপুলার ফ্রণ্ট্' সৃষ্টি করেছে, চীনের বর্ত্তমান উদ্যোগ তার চেয়ে ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই জাতীয় ঐক্য-আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হলে প্রায় পনেরো বৎসর আগেকার কথা স্মরণ করা দরকার। মহাযুদ্ধের পর চীনের অবিসংবাদী নেতা সুন্-ইয়াৎ-সেন দেশের শিল্পোন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শক্তিদের সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু চীনের স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-তন্ত্রীদের মনঃপূত নয় বলে তারা সুন্-ইয়াৎ-সেনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের চিরাভ্যস্ত রীতি অনুসারে ব্যবসা চালাতে থাকে। একমাত্র রুষদেশ প্রাক্ বিপ্লব যুগে চীনে তার যে অন্যায় অধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল তা সমস্তই চীন সরকারকে প্রত্যর্পণ করে সুন্-ইয়াৎ-সেনের বন্ধুতা লাভের চেষ্টা করে। চিচেরিণ, জফ্, কারাখান, প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে সোভিয়েট আর চীনের যে মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ দেবার কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই। শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে একবার যখন সুন্-ইয়াৎ-সেনকে কয়েকজন

তাঁর রুষ পরামর্শদাতা বরোদিনের আসল নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বলেন, "বরোদিনের নাম হচ্ছে লাফেইয়েৎ।" (লাফেইয়েৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশ থেকে গিয়ে আমেরিকান বিপ্লবীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন)। আরও মনে রাখা দরকার যে যখন চীনের আহ্বানে কয়েকজন বলশেভিক এসেছিলেন, তখন ইংলণ্ড আপত্তি করে বেয়াদবি দেখাতে পেছ্‌পাও হয় নি, আমেরিকা আর জাপানও অপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ করেছিল।

১৯২৫ থেকে ১৯২৭, এই কয়েক বৎসর চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্‌টাং আর চীনের কম্যুনিষ্ট দল একত্র হয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম চালিয়েছিল। গণশক্তির এই ঐক্য অর্থবান্‌দের যে একেবারেই পছন্দ হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। তাই তাদের প্রতিনিধি সেনাপতি চিয়াং-কাই-শেক ১৯২৭ সালে এই ঐক্য ভেঙে দেবার চেষ্টায় লাগেন। চিয়াংএর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীরা উহানে কুয়োমিন্‌টাং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানকিং শহরে এক নতুন শাসনতন্ত্রের পত্তন করে। বহু বামপন্থী কুয়োমিন্‌টাং সভ্যেরাও কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধি দেখে বিচলিত হয়ে পড়ছিল। এই সময় তাদের নেতা ওয়াং চিং ওয়াইকে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি মানবেন্দ্রনাথ রায় চাষীদের ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে একটি গোপনীয় প্রস্তাব বিনা অনুমতিতে দেখানোর ফলে তাদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের বিচ্ছেদ আর আটকানো গেল না। বরোদিন আর চীনা কম্যুনিষ্ট দল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই দারুণ অবিমৃষ্যকারিতার কথা জানিয়ে মস্কোতে খবর পাঠানোর ফলে রায়কে চীন থেকে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু কুয়োমিন্‌টাং আর কম্যুনিষ্টদের মিলন আর টিঁকতে পারল না। দক্ষিণ-পন্থীরা এই সুযোগে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন চালান। ১৯২৭এর জুলাই মাসে কুয়োমিন্‌টাং থেকে কম্যুনিষ্টরা বহিষ্কৃত হল ; আগষ্ট মাসে কম্যুনিষ্ট দল পর্য্যন্ত বে-আইনী বলে ঘোষিত হল। ডিসেম্বরে ক্যাণ্টন সহরে একটা ছোটখাট বিপ্লব হয়েছিল, কিন্তু তা সরকারী দল সহজেই দমন করল। চিয়াং-কাই-শেক হলেন চীনের প্রধান নেতা, কুয়োমিন্‌টাংএর বামপন্থীরা ক্রমেই পেছিয়ে গেলেন। সরকারী দমননীতি এমনই বিকটরূপে দেখা দিল যে সে কথা এখন মনে করতেও আতঙ্ক হয়। কুয়োমিন্‌টাংএর বহু সভ্য বহিষ্কৃত হলেন, প্রগতিবাদ দেশ থেকে নির্ম্মূল করার দারুণ চেষ্টা হতে লাগল। কিন্তু

শত চেষ্টা সত্ত্বেও চিয়াং-কাই-শেক গণ-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ দমন করতে পারলেন না।

১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ফুকিয়েন আর কিয়াংসি প্রদেশে সোভিয়েট শাসন স্থাপিত হয়েছিল। চীনের বিখ্যাত লাল ফৌজের পত্তন সেখানে প্রথম হয়েছিল। ১৯৩১ সালে জাতিসঙ্ঘ থেকে চীনদেশে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গেছল, আর তাদের রিপোর্টে দেখা গেল যে চীনের প্রায় এক চতুর্থাংশ সোভিয়েট শাসনের অন্তর্ভুক্ত, আর তাদের শাসন-শৃঙ্খলা কুয়োমিন্‌টাংএর তুলনায় ভাল বই মন্দ নয়। লিটন কমিশন বলতে দ্বিধা করেনি যে চীনা সোভিয়েট নানকিং সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

১৯৩১ সালে চীনের কম্যুনিষ্ট দল নানকিং সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছিল যে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু নানকিং সরকার তখন কম্যুনিষ্ট "দস্যু"দের দমন করতে আর বিশ্বের সাম্রাজ্যতন্ত্রের কাছে বাহবা পাওয়ার কাজে এতই ব্যস্ত ছিল যে দেশরক্ষার কাজটা দরকারী মনে করে নি। ১৯৩২-এর প্রথম দিকে কম্যুনিষ্টরা বলে যে তারা শাংহাইয়ে সরকারী সৈন্যদলে মিশে জাপানের সঙ্গে লড়তে চায়। তখন তাদের কথায় নানকিং কান দেয় নি। এর কিছু পরেই চীনের সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর সেনাপতি ফেং-চি-মিংএর অধিনায়কত্বে লালফৌজের একদল উত্তর চীন অভিমুখে অগ্রসর হয়। জাপানী সৈন্যদের আক্রমণরোধ করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাপানীদের লড়ার আগেই নানকিং থেকে বিরাট এক বাহিনী এসে তাদের আক্রমণ করে; সেনাপতি ফেং-কে নানকিং-এর যোদ্ধারা বন্দী করে ফাঁসি দিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। চীনের স্বাধীনতা রক্ষার চেয়ে কম্যুনিষ্ট দমন ছিল নানকিংয়ের কাজ।

দারুণ অত্যাচার সত্ত্বেও চীনা কম্যুনিষ্টরা ১৯৩৩ সালে দুবার প্রস্তাব করে যে জাপানকে আটকাবার জন্য তারা যে কোন সৈন্যদলের সঙ্গে সহযোগিতায় রাজী আছে। কিন্তু সমস্ত জাতিকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া চাই। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্য সকলকে অস্ত্র দেওয়া চাই। দেশের সাধারণ লোক এ প্রস্তাবে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। 'নাইনটিন্‌থ্ রুট্ আর্মি' লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। কিন্তু

নান্‌কিংএর মত এ হল মহাপাপ আর তাই সরকারী সৈন্যদের বিশেষ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আন্দোলনকে নানকিং আর বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। ১৯৩৪ সালের অগষ্ট মাসে মাদাম্ সুন্ ইয়াৎ সেন প্রমুখ ৩০০০ বিখ্যাত ব্যক্তি একটি ইস্তাহারে এক রকম কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাব সমর্থন করেন। সমস্ত জাতিকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংগঠন করার আন্দোলনকে আর আটকানো যাচ্ছিল না। কম্যুনিষ্টরা আরও প্রস্তাব করে যে যুদ্ধের জন্য সকল দলের একত্র হওয়া দরকার—শাসন এক হওয়া চাই, আর সৈন্যদলের নেতৃত্বেও ভেদনীতি দূর করতে হবে। সাহিত্যিক, শিল্পী, ছাত্র সকলেই এই জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিল। তাদের মধ্যে অনেকে নান্‌কিংএর কর্ম্মপন্থার প্রতিবাদ করে শাস্তি পেল।

ভবী ভোল্‌বার নয়; তখনও নান্‌কিং জাতীয় আন্দোলনের যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে নি। নান্‌কিংএর নিষ্ঠুর দমননীতি এড়াবার জন্য আর মিত্রশক্তির নিকটে থাকার আশায়, ১৯৩৪-৩৫-এর শীতকালে চীনা সোভিয়েট দক্ষিণ চীন থেকে শেচুয়ান আর কান্‌সু পার হয়ে উত্তর শান্‌সিতে অধিষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে চীনা লাল ফৌজ যে অসাধ্যসাধন করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তাদের প্রায় ৪০০০ মাইল ধরে যে বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল সেরকম পৃথিবীর অন্যত্র মেলে কি না সন্দেহ। কত দুর্গম পর্ব্বত, কত বিপৎসঙ্কুল নদী অতিক্রম করে চু-তের নেতৃত্বে লাল ফৌজ অগ্রসর হয়েছিল, তার সংখ্যা নেই। এ ছাড়া নান্‌কিংএর আক্রমণ-ভয় তো সর্ব্বদাই ছিল। লাল ফৌজের এই কীর্ত্তির কাছে হানিবলের আল্‌প্‌স্ অতিক্রমণ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

উত্তর পশ্চিমে সোভিয়েট সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার পর জাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও বৃদ্ধি পায়। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধদের বাদ দিলে তখন প্রায় সকলেই ঐক্য আন্দোলনকে সমর্থন করছিল। জাপানী সরকারের তাই ভয় হয়ে গেল যে হয়তো নানকিংএরও মত বদ্‌লাবে, হয়তো জাপানকে চীনে কিছু বেগ পেতে হবে। ১৯৩৬-এ জাপান তাড়াতাড়ি জার্ম্মানীর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করল। চীনের উত্তর পশ্চিমে তখন জাপানী-দস্তের উপযুক্ত

উত্তর দেবার উদ্যম চলেছে ; বহুদূরে কোয়াং টুং আর কোয়াংসি প্রদেশে নান্‌কিং-এর অকর্ম্মণ্যতার জন্য বিদ্রোহ পর্য্যন্ত হল। কিন্তু এবার পূর্ব্বের মত নানকিং সরকার নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমন করতে সাহস পায় নি ; নান্‌কিং ক্রমে বুঝছিল যে দেশের এই সমবেত আন্দোলনকে অবহেলা করা আর সহজ নয়।

এর পরে প্রধান ঘটনা হল ১৯৩৬এর ডিসেম্বর মাসে। তখন সিয়ান্‌ ফুতে চিয়াং-কাই-শেককে চাংসুলিয়াং আর ইয়াংহুচেন বন্দী করে পনেরো দিন আটকে রাখে। চিয়াংকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানকিংএর নীতি পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে হয়। চিয়াং অবশ্য প্রকাশ্যে কোন কথাতেই রাজী হন নি। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বুঝলেন যে জাপানের আক্রমণ রোধ করার জন্য দেশের লোক কৃতসংকল্প হয়েছে। আরও বোঝা গেল যে ক্রমাগত কম্যুনিষ্টদের দমন করা আর জাপানের অহঙ্কারী দাবী মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক ; দেশের লোক তাঁকে হয়তো বা অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারে। চিয়াং-কাই-শেক আরও বুঝলেন যে কম্যুনিষ্টরা এতদিন জাপানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য যে ঔৎসুক্য দেখিয়েছে, তার মধ্যে কোন ধাপ্পাবাজী নেই। লাল ফৌজের পক্ষে সিয়ান্‌ফুতে এসে চিয়াংকে পাকড়ানো আর বহুদিনের নানা অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া একেবারে শক্ত ছিল না। কিন্তু লাল ফৌজ আর চীনা কম্যুনিষ্টদের জন্যই চিয়াংএর মুক্তি অত সহজে হয়েছিল। কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্য ছিল দেশে অন্তর্বিবাদকে যে কোন উপায়ে বন্ধ করা ; চিয়াংকে শাস্তি দিলে আবার দেশের মধ্যে দলাদলি আর লড়াই বাধ্‌ত, জাপানের আনন্দের সীমা থাক্‌ত না। সিয়ান্‌ফুর ঘটনার আগে চিয়াং-কাই-শেক কখনও কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু সেখানে তাঁর পুরোনো ধারণা বদলে গেল। নান্‌কিংয়ে ফিরে চিয়াং সিয়ান্‌ফুর বিদ্রোহীদের কোন রকম শাস্তির ব্যবস্থা করেন নি। বরং এক রকম বুঝিয়ে দেন যে জাপানের কাছ থেকে উত্তর চীন পুনরধিকারের জন্য কুয়োমিনটাং সাগ্রহে তৈরী হবে।

সিয়ান্‌ফুর ঘটনার পর থেকে চীনের জাতীয় ঐক্য-আন্দোলন অনেকটা এগিয়েছে। লাল ফৌজের একজন বিশিষ্ট নেতা চু-এন্‌-লাই কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধবিভাগে কাজ করছেন ; মাওৎ-সেতুং প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট নেতা দেশরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাম্যবাদ প্রচার আপাতত বন্ধ আছে ; এখন

প্রধান কাজ হচ্ছে জাপানকে পরাজিত করা ; আর জাপানের পরাজয় হবে পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যতন্ত্রের একটা বিষম পরাজয়। জাতীয় ঐক্য-আন্দোলনে কম্যুনিষ্টদের বহুদিনের চেষ্টা সফল হয়েছে ; সে আন্দোলন তারাই আরম্ভ করেছিল। কিন্তু পরে অন্যান্য প্রগতিকামী সকলেই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এসেছে। কম্যুনিষ্টরা অবশ্য জানে যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে এমন এক সময় আসতে পারে যখন বুর্জোয়া শ্রেণী একটা মিটমাটের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়বে। সেই সংগ্রামকে সফল করতে হলে বিপ্লবী মজদুর আর কিষাণদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আপাতত সব চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে চীনের গণশক্তিকে সম্মিলিত করা, জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের হুমকিকে অগ্রাহ্য করা। তাই চীনে আজ যে বিরাট দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চলেছে, তার সাফল্যের জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে রয়েছি।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

বাঙলা কাদম্বরী—প্রবোধেন্দু ঠাকুর

কাদম্বরীর একটি যথার্থ বাঙলা অনুবাদ দেখবার লোভ আমার অনেকদিন থেকে ছিল। এর কারণ কাদম্বরী আমার একখানি প্রিয় কাব্য।

মূল কাদম্বরী যাঁরা পড়তে পারেন না, অথবা ঈষৎ কষ্ট করে পড়েন না, তাঁরাও যাতে কাদম্বরীর রস আস্বাদন করতে পারেন, তার জন্যই আমি রাঙলা কাদম্বরীর সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিলুম। আর আশা ছিল যে, একদিন না একদিন কোন নূতন লেখক আমাদের সঙ্গে কাদম্বরীর পরিচয় করিয়ে দেবেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনুবাদ আমার সে আশা পূর্ণ করেছে।

কাদম্বরীর অনুবাদ ইতিপূর্ব্বেই করা হয়েছে। পণ্ডিত তারাশঙ্করের অনুবাদ অনেকের কাছেই পরিচিত। সে অনুবাদ অতি সংক্ষিপ্ত ও নীরস। উক্ত কাব্যের গল্পাংশ নগণ্য। পণ্ডিত মহাশয় সেই নগণ্য অংশটিই আমাদের শোনাতে চেয়েছেন। কাদম্বরীর বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে "কথারস" নয়, কথার রস। এ রসে পণ্ডিত মহাশয়ের কাদম্বরী সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

জনৈক বিখ্যাত ফরাসী ক্রিটিক বলেছেন যে, যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা যায়, সে ভাষার বিশেষ জ্ঞান দরকার নেই; কিন্তু যে ভাষায় অনুবাদ করা যায়, সে ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার না থাকলে অনুবাদ সন্তোষজনক হয় না।

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান নিশ্চয়ই অসামান্য ছিল, কিন্তু মাতৃভাষার উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। সুতরাং তাঁর অনুবাদকে কোন হিসাবেই কাব্য বলা চলেনা।

শ্রীমান প্রবোধেন্দুর অনুবাদ প্রথমত সংক্ষিপ্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ভাষা বাঙলা। অতএব তা যথার্থ বাঙলা কাদম্বরী। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, মূল কাদম্বরী অনেকে পড়েন না, কেননা পড়তে পারেন না। লোকের বিশ্বাস যে, কাদম্বরী সহজবোধ্য নয়। কোন সংস্কৃত কাব্যই আমাদের কাছে সহজবোধ্য নয়,—মেঘদূতও নয়, রঘুবংশও নয়। তবে কি কারণে যে কাদম্বরী অপরাপর সংস্কৃত কাব্যের চাইতে অধিক দুর্গম হল, তা বুঝতে পারিনে।

কাদম্বরীর ভাষা দীর্ঘ-সমাসবহুল বলে?

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ঐ পুস্তকের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। সে ভূমিকা সংস্কৃত গদ্যের ইতিহাস। তিনি বলেছেন যে, "লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃত অনেক সুগম"। বোধহয় লৌকিক সংস্কৃতের সমাসবহুল্যই তার দুর্গমতার কারণ। এ অনুমানের কারণ এই যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গদ্যের ইতিহাস এক রকম সমাসের ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস। কিন্তু সমাস-ছুট বৈদিক ভাষা কি কারণে সমাসবহুল সংস্কৃত ভাষার রূপ গ্রহণ করলে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি। যে ভাষা লোকে বলে, সে ভাষায় সমাসের স্থান নেই। কিন্তু যে ভাষা লোকে লেখে, সেই ভাষাতেই সমাসের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষা যখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়, তখনই সমাসের বৃদ্ধির সাক্ষাৎ মেলে। আমার মনে হয় এর অন্য কারণও আছে; এ প্রবন্ধে তার বিচার করব না। এক কথায়, সংস্কৃত ভাষার inflection-এর হাত থেকে মুক্তির কামনা সমাসবহুলতার মূল। কাদম্বরীর ভাষা ব্যাকরণের জটিল বন্ধন এড়িয়ে অভিধানের আশ্রয় নিয়েছে। আমরা সকলেই দীর্ঘ সমাসের বিরোধী। এর কারণ দীর্ঘ সমাস বাঙলাতেও নেই, ইংরাজীতেও নেই; অর্থাৎ যে দুই ভাষা নিয়ে আমাদের কারবার, সে দুই ভাষাতেই নেই। দু-কথার সমাস ইংরাজীতেও আছে, বাঙলাতেও আছে; কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি কম। সুতরাং এ দুই ভাষায় সমাসের আমদানি করা বালিশতা।

তবে "লৌকিক সংস্কৃত সমাসবহুল" বলে যে দুর্গম, একথা আমি স্বীকার করিনে।

আমি যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে মূল কাদম্বরী পড়ি, তখন কাদম্বরীর ভাষা আমার কাছে খুব দুর্বোধ ঠেকেনি। তখন আমি সামান্য সংস্কৃত জানতুম, যেমন আজও জানি। অর্থাৎ ও ভাষার ব্যাকরণ জানিনে; তবে তার বহু শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আর যিনি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে পরিচিত, তাঁর পক্ষে সমাসের পদচ্ছেদ করাও সহজ। বাণভট্ট চেয়েছিলেন কথার মুক্তার মালা গাঁথতে,—যার প্রতি দানাটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, অথচ সমগ্র মালাটির দেহে একটি লাবণ্যের ঢেউ খেলে যায়। একে শব্দের স্তূপ মনে করা ভুল। বাণভট্ট নিজের মুখে বলেছেন যে, "নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ সুজাতয়ো মহাস্রজশ্চম্পক কুড্মলৈরিব।" এখানে

শ্লেষঘন অর্থ ঘনসন্নিবিষ্ট। আর আমি যে মালাকে মুক্তার মালা বলেছি, স্বয়ং বাণভট্ট তাকে চম্পককলিকার মালা বলেছেন। কিন্তু এ মালা বিনি সুতোয় গাঁথা। এ মালার কথার সঙ্গে কথার বন্ধন,—পরস্পরে অদৃশ্য আসক্তি। তারপর এ ভাষাকে গতিহীন মনে করাও ভুল। কাদম্বরীর ইংরাজী অনুবাদক বলেছেন যে,—"In Sanscrit the unending compounds suggest the impetuous rush of a torrent"। আমি এ মতের নীচে ঢেঁরাসই করতে প্রস্তুত। শ্রীমান প্রবোধেন্দু এই সমস্ত ভাষাকে ব্যস্ত করেছেন, অর্থাৎ বাঙলা করেছেন ; তাতে বাণভট্টের ভাষার উচ্ছ্বাস রক্ষা হয়নি। আমাদের ভাষায় গদ্যে বান ডাকানো যায়না ; সমতল বাঙলা ভাষার গতি শান্ত।

বাঙলা কাদম্বরীতে সংস্কৃত ভাষার কল্লোল না থাকলেও, বাণভট্টের কাব্যের অপর গুণগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। বাণভট্ট যে চিত্রশিল্পী, সে বিষয়ে বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাণভট্টের চিত্র বর্ণাঢ্য। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে—চিত্রকর্ম্মে তিনি বর্ণসঙ্কর। অন্য কবিদের চিত্র-কর্ম্মে বর্ণ দরিদ্র ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু বাণভট্টের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ পৃথিবীর বিচিত্র রঙের ঐশ্বর্য্য ধরা পড়েছে। ফুলের রঙ, ফলের রঙ, পাখীর রঙ ইত্যাদি কোন রঙই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। যে রঙের নাম নেই, সে সব রঙ তিনি উপমার সাহায্যে আমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছেন। আর আকাশের রঙ যে কত বিচিত্র, তাও তাঁর মুখস্থ। আমি অন্যত্র বলেছি যে,—The visible universe existed for him। এই বাঙলা কাদম্বরী পড়লে সকলেই দেখতে পাবেন যে আমার কথা সত্য।

বাণভট্ট কেবল যে landscape এঁকেছেন, তা নয় ; তিনি সংস্কৃত কাব্যে অপূর্ব্ব portrait painter। তিনি শবর সেনাপতি, বৃদ্ধ চণ্ডাল, চণ্ডাল বালক, কাদম্বরীর বীণাবাদক ও দ্রাবিড় ধার্ম্মিকের যে ছবি এঁকেছেন, সে সব ছবি স্মৃতিপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকে। এসব ছবিকে realist artএর সংস্কৃত নিদর্শন বললে অত্যুক্তি হয় না। দ্রাবিড় ধার্ম্মিকের প্রকৃতি যেমন জঘন্য, তাঁর আকৃতিও তদনুরূপ জুগুপ্সিত।

আর্টিষ্ট হিসেবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব হচ্ছে রমণীর রূপবর্ণনায়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও আমাদের দেখিয়েছেন,—সে হচ্ছে Dream of Fair Women।

ইংরাজ কবি Tennysonএর কবিতায় fair womenএর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, এবং তিনি কোন সুন্দরীর স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি ইতিহাসের ও কাব্যের পাতার অন্তর থেকে প্রসিদ্ধ নারীদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এঁদের নাম আছে, কিন্তু রূপ নেই। Helen একটি মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তি, ও Cleopatraর চোখ কালো। এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকে real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি।

Venus প্রভৃতি গ্রীক রমণীদের মত এঁরা real। অর্থাৎ মানসীমূর্ত্তি রূপ-সর্ব্বস্ব হলে যে মূর্ত্তি ধারণ করে, সেই মূর্ত্তিই বাণভট্ট গড়েছেন। এই রূপ হচ্ছে realityর পরাকাষ্ঠা। প্রাচীন ফরাসী কবি Villonও fair womenএর স্বপ্ন দেখেছিলেন ; কিন্তু তিনিও ইউরোপের ইতিহাসবিখ্যাত রমণীদের রূপের কোন বর্ণনা করেন নি। তিনি তাঁদের সকলের রূপবর্ণনা এক কথায় সেরে দিয়েছেন। তাঁর কথা এই :—Qui beaulte èt trop plus qu' humaine।' বাণভট্টের মনঃকল্পিত নারীদেরও সকলেরই সৌন্দর্য্য মর্ত্ত্যনারীর অতিরিক্ত।

বাণভট্টের বর্ণিত রমণী সবই তাঁর মনঃকল্পিত,—কেউ ঐতিহাসিক নারী নয়। তিনি এঁদের "স্মৃত্যা দদর্শ ন চক্ষুষা। চিন্তয়া লিলেখ ন চিত্রতুলিকায়" ; অতএব এঁরা সব ধ্যান ধারণার বস্তু, অথচ এঁদের প্রত্যেকের রূপ বিশিষ্ট। আমি এখন এঁদের চার পাঁচটি রমণীর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম মাতঙ্গকুমারী, তারপর পত্রলেখা, তারপর মহাশ্বেতা, তারপর তরুণিকা, সর্ব্বশেষে কাদম্বরী।

গ্রীক শিল্পীদের প্রধান গুণ এই, তাঁরা শুধু রেখার সৌন্দর্য্য সাকার করেছেন। কারণ তাঁরা গড়েছেন প্রস্তরমূর্ত্তি—ছবি আঁকেননি। তাঁদের হাতের প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তিগুলির গায়ে রঙ নেই। বাণভট্টের রঙের চোখ প্রস্ফুটিত ; সেই সঙ্গে রেখার সুষমা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। এ সব রমণী অবশ্য পরস্পর সবর্ণ নয়। মহাশ্বেতা তুষারগৌরী, মাতঙ্গকুমারী নীলমণি দিয়ে গড়া। কিন্তু সকলেই কিশোরী,—পূর্ণ যুবতী নয়। পূর্ব্ব কবিদের কল্পিত রমণীরা সকলেই যুবতী। অতিপ্রবৃদ্ধ স্তনজঘনের ভারে তাঁরা গজেন্দ্রগামিনী। তাঁদের রূপের চাইতে যৌবনই পূর্ণতর বিকশিত। বলা বাহুল্য অঙ্গবিশেষের স্থূলতায় সমগ্র দেহের রেখার সুষমা নষ্ট হয়, সমস্ত দেহের ছন্দ বিপর্য্যস্ত হয়। তাই বাণভট্টের

রূপসীরা অচিরোপারূঢ় যৌবন, তাই তাঁরা আলেখ্যগতামিব দর্শনমাত্রফলম্—স্পর্শসহ নয়। স্পর্শনে তাঁদের রূপ কলুষিত হয়।

এই সব অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া আলেখ্যগতা কুমারীদের মধ্যে "পত্রলেখা" আমার নয়নমনকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তার রূপবর্ণনার লোভ আমি সম্বরণ করতে বাধ্য ; কেননা ইতিপূর্ব্বে 'বিচিত্রা'য় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি সে বর্ণনা করেছি। তার পুনরুক্তি করতে চাইনে।

এক কথায়, বাণভট্ট এই সব কুমারীদের কামলোক থেকে রূপলোকে তুলেছেন। সেকালের চিত্রকরেরাও এই একই সাধনা করেছেন। ভারতীয় কলাশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ জনৈক ফরাসী পণ্ডিত বলেছেন যে, এযুগে "nous sommes ici dans les plus hauts regions de l'ame aryenne."

কাদম্বরীর সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা আর্য্যমনের এই উর্দ্ধলোকের সঙ্গে পরিচিত হব। কারণ বাণভট্টের কাব্যে অনার্য্য মনোভাবের লেশমাত্র নেই। এ কবির বুদ্ধি পরিষ্কার, হৃদয়বৃত্তি অপূর্ব্বসুকুমার, এবং ইন্দ্রিয় সজাগ। এই কারণে আমি পাঠকদের বাঙলা কাদম্বরী পড়তে অনুরোধ করি।

বাঙলা কাদম্বরীর একমাত্র দোষ তার দাম। পাঁচ টাকা দিয়ে বাঙলা বই কেনায় আমরা অভ্যস্ত নই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

Hitler's Drive to the East—by F. Elwin Jones (Gollancz)

মধ্য ইউরোপে হিটলারী জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও সাম্রাজ্যলিপ্সার প্রয়াস সম্বন্ধে তথ্য-প্রকাশই বইখানির মূল উদ্দেশ্য। পশ্চিম ইউরোপে ফ্যাশিষ্ট নীতির কীর্ত্তি স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব ইউরোপের দিকেই নাৎসী-জার্ম্মাণীর লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ। বহুপূর্ব্বেই "Mein Kamf"-এ হিটলার বলিয়াছিলেন, "We stop the eternal march to the South and West of Europe and turn our eyes towards the lands in the East"। বর্ত্তমান ইউরোপের অবস্থায় ও ঘটনাচক্রে এই হিটলারী দূরদর্শিতার পরিচয় ও প্রকাশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটু সম্যক উপলব্ধি

করিলেই জার্ম্মাণী ও ইটালী প্রমুখ ফাশিষ্ট শক্তিগুলির নীতির প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান এই ফাশিষ্ট ত্রিশক্তিকে সমগ্র পৃথিবীর ২, ২৯৭, ৮৪৮ বর্গমাইলের মধ্যে ২৫২,০০০,০০০ সংখ্যক লোকের ভরণ পোষণ করিতে হয়, ইহার মধ্যে অবশ্য মাঞ্চুকুয়ো ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি অধীনস্থ দেশগুলিকেও ধরা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া নিজেদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, ফ্রান্সও প্রায় তাহাই। গ্রেটব্রিটেনকে শতকরা ৪৯ ভাগ খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয় বটে কিন্তু ইহার বেশী ভাগই সাম্রাজ্যের দেশগুলি হইতে সরবরাহ হয়। জাপান খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে প্রায় স্বাধীন—ইটালীও তদ্রূপ, কিন্তু জার্ম্মাণীকে অনেকগুলি খাদ্যদ্রব্যই বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। "The Strategy of Raw Materials" পুস্তকে Mr. Brooks Emeny দেখাইয়াছেন যে জার্ম্মাণীর কাঁচামাল সংগ্রহ সম্পর্কে অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন। জার্ম্মাণীকে তৈল, তামা, গন্ধক, তুলা, রবার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বাইশটি এইরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে, জাপানের চৌদ্দটির অভাব, ইটালীর পনেরটির, কিন্তু জার্ম্মাণীর অভাব আঠারটির। এইজন্যই জার্ম্মাণীর প্রসার প্রায়োজনীয় এবং উপনিবেশ না হইলে চলে না। একদিকে বাল্টিক হইতে আড্রিয়াটিক ও অন্যদিকে রাইন হইতে ড্রুইস্তার (Druister) পর্য্যন্ত ইউরোপের অংশকে জার্ম্মাণীর করতলগত করিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা করিতে পারিলে পূর্ব্ব ইউরোপের রাশিয়া ও পশ্চিমের ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা বিচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। "The Future of German Foreign Policy"-তে Dr. Rosenberg স্পষ্টই বলিয়াছেন, "The knowledge that the German people, if they do not want to perish in the truest sense of the word, need land for themselves and their descendants ; the realistic knowledge that this land can no longer be conquered in Africa, but must be acquired in Europe and chiefly in the East—this knowledge lays down the organic principles of German foreign policy for centuries to come"। ইহাই জার্ম্মাণীর স্বপ্ন। ইতিমধ্যে গুজব উঠিয়াছে যে পাশ্চাত্য ইউরোপের

শক্তিবর্গ জার্ম্মাণীর সহিত মিতালি পাকা করিতে ব্যস্ত। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর অধীনস্থ দেশ ও উপনিবেশগুলি প্রত্যর্পণের জন্য জার্ম্মাণী দাবী করিবে না ও তাহার পুরস্কার স্বরূপ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মাণীর কার্য্য-কলাপে কোন আপত্তি করিবে না। নাৎসী প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবার ইহাই বোধ করি প্রথম অধ্যায় এবং Mr. Jones এই পুস্তকে এই প্রচেষ্টা কতদুর অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন।

এই কার্য্যে হিটলারের প্রধান সহায়ক দুইজন—একজন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারক Dr. Goebbels ও অপরটি কূট অর্থনীতিবিদ্ Dr. Schacht। "National work inside another nation"-এ Dr. Goebbels সিদ্ধহস্ত ও পূর্ব্ব ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশগুলিতেই বার্লিনের চরগুলি দলগঠন করিয়া ফেলিয়াছে, হিটলারী দালালরা সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও বিভীষণতুল্য রাজনীতিজ্ঞ-দের হস্তগত করিতে ব্যগ্র। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে হিট্‌লারের কল্যাণে স্পেনীয় নাটকের পুনরভিনয় হওয়া খুবই সম্ভব। এইবার Dr. Schachtএর কৃতিত্বের কথা ধরা যাউক। ১৯৩১ সালের অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার পর "the Balkans were thrown on their own bankrupt resources, and disaster overtook one country over another."। কৃষিজাত ও খনিজ পদার্থ বিক্রয়ের উপরেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের অধিবাসীদের অর্থাগম হয় ও জার্ম্মাণীর এইগুলির প্রয়োজন যে খুবই অধিক তাহাও বলা হইয়াছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিবন্ধন Balkan বাণিজ্যের দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া জার্ম্মাণী এই সমস্ত দেশ হইতে উপরোক্ত সর্ব্ববিধ পণ্য আমদানী সুরু করিয়া দেয়। তৎপরিবর্ত্তে এই সমস্ত দেশে জার্ম্মাণী তাহার শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া লয়। জার্ম্মাণী এই সমস্ত দেশে উপরন্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদি বিক্রয়ের প্রসার সাধন করে। উদ্বৃত্ত বল্কান পণ্য সুলভ মূল্যে বিদেশে বিক্রয় করতঃ জার্ম্মাণী বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিদেশ হইতে তামা ও রবার ক্রয় করিয়া নিজ সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। The collapse of collective security of the re-armament race had strengthened Dr. Schacht's hand and............the need for arms was made to appear capable of indefinite expansion।

এইরূপে বল্কান দেশগুলিকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া জার্ম্মাণী তাহাদিগকে নিজ আয়ত্তে রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছে। যে সমরসঙ্কট ইউরোপের বক্ষে চাপিয়া বসিয়াছে তাহারই আশঙ্কায় পূর্ব্ব ইউরোপীয় দেশগুলি অস্ত্রশস্ত্রের জন্য জার্ম্মাণীর মুখাপেক্ষী। ইহাই নাৎসী সাম্রাজ্যলিপ্সার অভিযান ও হিটলারের অভিপ্রায়ের অনুকূল অবস্থা। এই সমস্ত দেশগুলিকে জার্ম্মাণীর করতলগত করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে জার্ম্মাণীর আপ্রাণ প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রমাণ Mr. Jones তাঁহার এই পুস্তকে দিয়াছেন। জার্ম্মাণী আশা করে "the Third Reich, having exchanged shells for corn, will be able to dictate to the creditors (the Balkans), Dr. Schacht has enslaved"। জার্ম্মাণীর এই প্রচেষ্টার মূলে হয়ত প্রশ্ন ওঠে যে জার্ম্মাণী কি কোনরূপ সামরিক দাবানল প্রজ্জলিত করিতে কিম্বা তাহার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত? হয়ত জার্ম্মাণী তাহা নয় কিন্তু সে জানে যে "it is possible to run a local, imperial war, without drawing on a world war"। ইটালীই তাহাকে আবিসীনীয়ার দৃষ্টান্তে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত যদি প্রয়োজন হয় তবে জার্ম্মাণী একটু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া propaganda ও economic penetration-এর অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারে। পূর্ব্ব ইউরোপেই জার্ম্মাণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ কারণ দক্ষিণে তাহার বিশেষ সুবিধা হইবে না। Mediterranean Power হইবার ইচ্ছা তাহার নাই কারণ সুবিধা মোটেই নাই। পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মাণীর এই প্রচেষ্টায় প্রথম ক্ষতি চেকোশ্লোভাকিয়ার এবং এই স্থানের জার্ম্মাণ অধিবাসীদের সংখ্যা ৩,৩০০,০০০ ও চেক ও শ্লোভাক অধিবাসীদের মোট সংখ্যা ৯,৫০০,০০০। বর্ত্তমানে চেকো-শ্লোভাকিয়ার গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ অধিবাসীদের সন্তুষ্ট করিতে তৎপর যাহাতে তাহাদের মধ্যে নাৎসী-আন্দোলন প্রবল না হয়। কিন্তু হিটলারের অনুগ্রহ হইতে রক্ষা পাইবার বা ইহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই যদি বৃটেন বা ফ্রান্স তাহাদের সমর্থন না করে। পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মাণীর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে যদি জার্ম্মাণী বৃটেন ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সামান্যও আশ্বাস পায়। পূর্ব্ব ইউরোপে এই নাৎসী অভিসন্ধি ও হিটলারীয় অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য Mr. Jones এই পুস্তকখানিতে দিয়াছেন।

মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হিসাবেও পুস্তকখানি খুবই মূল্যবান। ফাশিষ্ট লালসা ও কূটনীতি পূর্ব্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে যে কিরূপে গ্রাস করিবার প্রয়াস পাইতেছে তাহার নিদর্শন এখানেই পাওয়া যায়।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

মানুষের মন—শ্রীজীবনময় রায় প্রণীত (ভারতী ভবন) মূল্য ৩৲

প্রয়াগের মেলায় হারিয়ে যাওয়া বধূটিকে পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে রহস্যপুঞ্জ এই গ্রন্থখানিকে চারিশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী অবয়ব প্রদান করেছে তার সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা দেখছি সহজসাধ্য নয়। গ্রন্থকার প্রবীণ এবং উপন্যাস রচনা তাঁর এই প্রথম হলেও কাব্যরচয়িতা ও সমালোচক হিসাবে তিনি ইতি-পূর্ব্বেই সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। ভাষার উপর সেই অসামান্য আধিপত্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কল্পনার খোলা হাওয়ায় অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিপক্ব অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হওয়ায় সৃষ্ট চরিত্রগুলি শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে। তথাপি বলতে হচ্ছে যে ছিদ্রান্বেষণ করে যে বহু সংখ্যক ত্রুটি সংগ্রহ করেছি সেগুলি রস-প্রতিপত্তির এতখানি অন্তরায় হয়েছে যে স্থানে স্থানে রীতিমত বিসদৃশ মনে হয় এবং আক্ষেপের বিষয় সে ত্রুটির অধিকাংশ শোধনীয় ছিল।

উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন পূর্ব্বতন নামকরণ "মানুষের মন" মধ্যপথে "ত্রিবেণীতে পরিবর্ত্তিত হয়। এটা এবং অন্যান্য ইঙ্গিতের সন্নিবেশে আমার ধারণা হয়েছে যে যে ত্রুটির কথা উপরে উল্লেখ করলাম এবং পরে উদাহরণ দেবার ইচ্ছা রইল তার প্রধান কারণ রচনাটি অর্দ্ধপথে মুদ্রিত হতে আরম্ভ করেছে এবং পরিবর্দ্ধিত হয়েছে পূর্ব্বতন প্রকাশিত অংশের পদানুগমন করে। যেটুকু সামান্য সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও অবদমন গ্রন্থখানির উপসংহারে পরিলক্ষিত হয় তার দ্বারা প্রধান চরিত্রদ্বয়ের স্বাভাবিক ওজঃ বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে কিন্তু গ্রন্থকারের উচিত ছিল পূজার বাজারের মায়া পরিত্যাগ করে আদ্যন্ত রচনাটিকে পরিমার্জ্জিত করে প্রকাশ করা, বিশেষ করে যখন স্থিতিশীল সাহিত্যসৃষ্টির অভীপ্সা তাঁর চেষ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট। পূর্ব্বে জানতে

পারলে অগ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও গলস্‌ওয়ার্দ্দীর জীবনী পড়ে ধৈর্য্য শিক্ষা করতে অনুরোধ করতাম। অবশ্য প্রকাশিত গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেই এত কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আলোচ্য গ্রন্থখানির রচনাভঙ্গীকে নিবিড়ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয় এবং সেই সঙ্গে পরিকল্পনার ঘনত্ব ও প্রসার, আবহাওয়ার সহিত ভাষার ছন্দ পরিবর্ত্তন, চক্ষুষ্মান্ কবির অন্তরঙ্গ দিনপঞ্জিকার ঝরা পৃষ্ঠার মত ছোট ছোট পার্শ্বচিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রশস্তির মৌলিক ও উপভোগ্য পরিবেশন হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ ধনাঢ্য জমিদার। কুম্ভ মেলার ভীড়ের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রী ও একমাত্র শিশু পুত্রকে হারিয়ে বিরহাতুর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত শান্ত করবার মানসে বিলাত ভ্রমণ কালে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে লুপ্তচৈতন্য হয়ে পড়ে। লণ্ডন নিবাসী, ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষা দীক্ষায় পরিমার্জ্জিত বিদুষী বাঙ্গালী যুবতী পার্ব্বতী ঘটনা ক্রমে তার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করতে আহূত হয়ে রোগীর প্রেমে পড়ে যায় গভীর ভাবে; অথচ জ্ঞাপন করে না কারণ সে জানতে পারে যে তার দয়িত তদীয় পত্নীর স্মরণার্থে তাজমহল সমতুল্য বিরাট নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় ঐকান্তিকভাবে আবিষ্ট। রোগমুক্ত কৃতজ্ঞ শচীন্দ্রনাথ রমণীটির গুণে আকৃষ্ট হয়ে, তাকে এই পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকারী করে তোলবার ভার গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করে। পার্ব্বতীর অন্তরের নিগূঢ় প্রেম তাকে এই বৃহৎ যজ্ঞের সমিধ মাত্র হয়ে থাকতে শক্তি দেয়। তারপর চার বছর তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আর শচীন্দ্রনাথের অজস্র অর্থের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে যে পত্নী কমলাকে স্মরণ করে এই বিরাট উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে সেই বিপুল আয়োজনের অন্তরালে নিশ্চিহ্ন সমাধি লাভ করল এবং সেই সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের চিত্তে পার্ব্বতী জীবন্ত প্রত্যক্ষতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রেম নিবেদনও হল একটি তরল সন্ধ্যাকালে—কিন্তু এই চির-ঈপ্সিত মুহূর্ত্ত যখন এল পার্ব্বতী ভুল করে বলে ফেললে যে দিনে দিনে, তিলে তিলে যার স্মৃতি শচীন্দ্রের সমস্ত জীবন, সমগ্র অস্তিত্বকে পূর্ণ করেছে, সার্থক করেছে, একটি মাত্র মুহূর্তে তার মহা অবসান ঘটতে পারে না—অতএব এ নিশ্চয় করুণার প্রকাশ। শচীন্দ্র তখন বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কার করল হয়ত' কৃতজ্ঞতাকেই প্রেম মনে করেছে।

কিন্তু পার্ব্বতী লগ্নটি অবহেলা করবার পর মনে প্রাণে বুঝল সে-প্রেম প্রেমই। তখন থেকে সে যে-প্রসাধন সম্বন্ধে কোনদিন তার রুচিতে আগ্রহের ছোঁয়াচ লাগাবার অবসর দেয়নি, সেই প্রসাধন সম্বন্ধেও নিজের অজ্ঞাতসারে সজাগ হয়ে উঠল। বাঙ্গালী পরিবারের গৃহস্থালি সম্পর্কে গল্পের ছলে আশ্রমের মেয়েদের কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল। এদিকে বহু উত্তেজনাপূর্ণ বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে কমলাকে পুত্র সমেত পাওয়া গেল। এই রূঢ় সংবাদের আঘাতে পার্ব্বতী সচেতন হয়ে সাড়ম্বরে পূজার চেয়ে বিসর্জ্জনের উৎসবকে বড় ভেবে অঙ্গীকার করে নিল। গল্পের শেষ এখানে হল না। শচীন্দ্রের অত্যধিক উচ্ছ্বাস-বেগের সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করে চলা কমলার পক্ষে দায় হয়ে উঠল। সে এত অধীর হয়ে হৃদয়ের বহুদিন-পরিত্যক্ত তৃষিত মধুচক্রকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ করে তুলতে গেল যে স্বভাবত শান্ত ও অন্তর্ম্মুখী কমলা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ক্রমে পার্ব্বতীর কাছে নিজেকে নিবেদন করবার আকুলতা শচীন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে ধরল। একদিন সে আর সংযম রক্ষা করতে না পেরে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে পার্ব্বতীর আশ্রম-কক্ষে উপনীত হল। এবার তার প্রেম-নিবেদন ও দেহের নিবিড় স্পর্শ সাদরে গৃহীত হল—কিন্তু সে যখন শ্রান্ত, বীততাপ ও পরিতৃপ্ত হয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ল, পার্ব্বতী শেষ রাত্রের লগ্নযোগে জন্মের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। পড়ে রইল তার প্রথম ও শেষ প্রেমপত্র—'তোমাকে পাওয়া আমার পূর্ণ হয়েছে আজ। কমলার মধ্যে, আমাকে পাওয়া তোমার আজ থেকে সুরু হোক।'

পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন নর নারীর প্রেম ব্যাপার লিপিজগতে বহু বর্ষণের ফলে মামুলী হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে বোধ করি উপরি উক্ত সংক্ষিপ্তসারটুকু কৌতুহলের উদ্রেক করবে না—সেই জন্যেই বিশেষ করে ব্যক্ত করতে চাই যে গ্রন্থকার যে আবেগ প্রকাশ করেছেন স্থানে স্থানে তার মধ্যে আত্ম-স্মৃতির চিরন্তন মহত্ব প্রচ্ছন্ন আছে বলে মনে হয়।

গ্রন্থখানির মধ্যে আর একটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে সীমা ও নিখিলনাথকে অবলম্বন করে। সত্যবান নামক জনৈক বিশিষ্ট সন্ত্রাসবাদী নেতার মৃত্যু শয্যা হতে প্রতিহিংসার বহ্নিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে এল শ্যামাঙ্গী যুবতী সীমা। শাণিত তীরের মত—তেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি ক্ষিপ্র, তেমনি সঙ্গীহীন, তেমনি অমোঘ

তার লক্ষ্যপথে গতি। সন্ত্রাসবাদে আস্থাহীন দেশভক্ত ডাঃ নিখিলনাথ মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেল কিন্তু তাদের পরস্পর-বিরোধী মতবাদ এত উগ্র হয়ে রইল যে বাহ্যিক ভদ্রতা সত্ত্বেও মিলনের কোন সম্ভাবনা রইল না। মেয়েটি সর্ব্বদা তর্কের তাড়নে তার সুকুমার মনোবৃত্তিগুলিকে তটস্থ রাখত। এমন সময় আদিম বোমারু দলের কোন কোন নায়কের মতো দুর্দ্ধর্ষ কিছু একটা করে দেশময় হুলুস্থূল বাধাবার মনোভাব নিয়ে রঙ্গলাল নামে এক উপনেতা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সীমার মৃত্যু ঘটাল। পুলিশ যখন দমদমার বাড়ী ঘেরাও করেছে, বিপদ আসন্ন জেনেও সীমা তার প্রেমাস্পদের জন্যে সযত্নে পরিপাটি করে বিছানা প্রস্তুত করে হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের এনার্কিষ্ট বলেই চিনে রেখেছেন—ভিতরের মানুষটির প্রতি আপনাদের চোখ পড়ে না—না?" তারপর রান্না শেষ করে গভীর রাত্রে স্নান সেরে শুচি হয়ে একখানি কৌষেয় বস্ত্রে দেহলতাটিকে আবৃত করে এসে দাঁড়াল। যেন এই এক রাত্রে আনন্দে তার সমস্ত জীবন যৌবন তার নিখিল ভুবন নারীত্বের গৌরবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর পুলিশের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মঘাতী হল।

এই কাহিনীটির সঙ্গে সঙ্গে শচীন্দ্র-পার্ব্বতীর হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারের যোগ স্থাপনা করা হয়েছে জোর করে। বোধ করি গ্রন্থকার কয়েকটি অস্থিরমতি পুঞ্জীভূত বক্তব্যকে ব্যক্ত করবার আগ্রহাতিশয্যে দুইটি পৃথক গ্রন্থের সামগ্রী একত্রে গ্রথিত করে ফেলেছেন। প্রথাগত পদ্ধতি অবজ্ঞা করে একটি আধারে দুইটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রচনার বিন্যাস করলে কোন আপত্তি থাকত না। কিন্তু সময়ের কার্পণ্য করে গ্রন্থকার নিখিলনাথ ও সীমার মানসিক ভাবের আদান প্রদান এমন ভাসা ভাসা ছন্নছাড়া ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে কতকগুলি ভাব-বিলাস কবিকল্প ভাষা সত্ত্বেও উৎকট রূপে উগ্র হয়ে প্রকাশ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে তর্কালোচনাগুলি পীড়াদায়ক ভাবে প্রকট থেকে গেছে। গ্রন্থকার যখন এই জটিল ও সুকঠিন সাময়িক সমস্যাটি অবলম্বন করে আখ্যায়িকাটিকে সমৃদ্ধ করবার প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর উচিত ছিল অন্তত উত্তর কালের পাঠকদের প্রণিধান কল্পে এই সকল ভ্রান্ত পথচারীদের দুঃখের কাহিনী আরও নিবিড় ও সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত করা।

ছোট খাট প্রমাদ অনেক রয়েছে। পার্ব্বতী এক স্থানে কমলাকে মৃত

বলে উল্লেখ করেছে। প্রথমত শচীন্দ্রের কাছে এ উক্তি অশোভন হয়েছে ; দ্বিতীয়ত পরে পার্ব্বতী তাকে স্বপ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করতে দেখে বিকল হয়েছে এবং শচীন্দ্র একবার সীমাকে কমলা বলে ভ্রম করেছিল ; এতৎব্যতীত কথিত আছে যে কমলা তার স্বামীর আশু অনুসন্ধানের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিল—স্বামীর নাম ঠিকানা যখন স্মরণ হতে লুপ্ত হয়েছে, মৃত্যু সম্ভাবনা আশঙ্কা হবে না কেন ? নিখিলনাথ সীমাকে সন্ত্রাস-চিন্তা হতে বিমুখ করতে না পেরে আশা করেছিল কমলার শান্ত স্থির বুদ্ধির আকর্ষণে সে বুঝি ক্রমে ধরা দেবে। এই সামান্য আশাটি নিখিলনাথ এবং সীমা উভয়েরই চরিত্রকে অকারণে খর্ব্ব করতে চেষ্টা করেছে। নিখিলনাথ কেমন করে অনুমান করলেন সীমা ও কমল পুরী গিয়েছিল পরিষ্কার বোঝা যায় না। অপহৃত শিশুকে দেখে সীমার বক্ষে মাতৃস্নেহ উদ্বেল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক হলেও তার আন্তরিক সমস্যাগুলিকে যখন বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নি তখন এই ঘটনাটিকে উহ্য রাখাই সমীচীন ছিল। পার্ব্বতীর সঙ্গে কথা বার্ত্তায় সীমার এতখানি রূঢ়তার কোন সঙ্গত কারণ পাইনি। শচীন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে সীমার পারদর্শিতা মেধার আতিশয্য মনে হয়েছে। উনষাট পৃষ্ঠায় পার্ব্বতীর স্থানে মালতী মুদ্রিত হয়েছে ভ্রম ক্রমে। প্রতিষ্ঠানের উপনেত্রীর স্নায়বিক উত্তেজনা অপ্রীতিকর হয়েছে।

রচনাটির প্রতিকূলে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। কমলা, মালতী, ভোলানাথ, শিশু ও বালক অজয়, ভুসু দত্ত, মায় 'নেছে নেছে মামা'টি পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। ছোট ছোট পার্শ্বচিত্রের বর্ণনায় গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত ;—ষ্টেশন ঘরের অক্ষক্রীড়ারত বৃদ্ধের দল, নারী প্রতিষ্ঠানটির পরিদর্শন, সারেঙ-এর গল্প, বুলডগের থাবা, অন্ধ গায়কের গ্রেফতার ইত্যাদি এক একটি দৃশ্য মনোরম খণ্ডচিত্রের মত মনে গেঁথে যায়। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই-এর উৎকর্ষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

A Date with a Duchess—by Arthur Calder-Marshall

(Jonathan Cape)

আর্থার কলডর্-মার্শেল নব্য ইংরেজ লেখকদের অন্যতম। বামপন্থী সাহিত্যিক হিসেবে ভারতীয় অনেকেই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত আছেন। কলডর্-মার্শেলের উপন্যাস 'পাই ইন্ দি স্কাই'এ তাঁর ক্ষমতার পরিচয় লাভে যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন তাঁদের 'এ ডেট্ উইথ্ এ ডাচেস্' হতাশ করবে না। এ বইটি ছোট গল্পের সমষ্টি। দু'তিনটি বড় গল্প ছাড়া অধিকাংশই মাঝারি এবং ছোট। আয়তনের কথাটা উল্লেখ করতে হল কারণ কয়েকটি গল্প মাত্র দু'তিন পাতায় সম্পূর্ণ। এত ছোট গল্পে ভারসাম্য বজায় রাখাটা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। চরিত্র অঙ্কনে, বিভিন্ন লোকের মনস্তত্ত্বে কলডর্ মার্শেলের অসামান্য দখল ; সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রায় ও স্বতন্ত্র ভাব-ভঙ্গীতে তাঁর মত স্বচ্ছ অথচ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বিরল। অনেকদিন পরে একজন লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হল যিনি মর্বিডিটি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। কলডর্-মার্শেল মরবিড নন বলেই তাঁর ভাষায় এত বৈচিত্র্য, বিষয় এত বিভিন্ন, কারণ স্বভাবের ছায়া ভাষা এবং বিষয়-নির্ব্বাচনে পড়ে। স্থানকালপাত্র ভেদে ভাষার স্বচ্ছন্দ পরিবর্ত্তন, কয়েকটি পংক্তিতে একটি স্বচ্ছ ছবি চোখের সামনে আনা, ছোট একটি কথোপথনে একটি চরিত্র বর্ণনা, ইত্যাদি ক্ষমতা অধিকাংশ গল্পেই বর্ত্তমান। 'এ ডেট্ উইথ্ এ ডাচেস্' পড়ার সময় contrast হিসেবে উপহাস-রসিক হাক্স্লি, কিম্বা জয়েসের কথা মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। কলডর্-মার্শেলের মত স্বাস্থ্য তাদেরই থাকতে পারে মানুষের ভবিষ্যতে যাঁদের আস্থা আছে। উন্নাসিক অবিশ্বাস এবং তার শেষ ফলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হাক্স্লি। লরেন্সের লেখায় অসাধারণ ক্ষমতার ছাপ আছে, কারণ সমসাময়িক সমাজযাত্রার উপর তীব্র বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যে ধরণের মানুষকে তিনি বিশ্বাস করতেন তার অস্তিত্ব আকাশ পাতালে নেই। শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গঠিত পৃথিবীতে অতি পুরাতন কোনো সমাজের আদর্শ খাড়া করাটা আপাতসুন্দর হলেও অবান্তর, এবং একধরণের মরবিডিটিরই নামান্তর।

প্রথমে বলেছি কলডর্-মার্শেল বামপন্থী লেখক। কিন্তু মামুলি প্রচার-কার্য্যের ভারে তিনি পীড়িত নন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধারণ মানুষ সামাজিক বৈষম্য ও অনাচারের কথা যে ভাবে, যে ভঙ্গীতে উপলব্ধি করে সেই ভাব ও ভঙ্গী তিনি প্রকাশ করেছেন। এ সূত্রে "One of the Leaders" এবং "The Smuggler's Wife" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেরই ধারণা আছে যে উৎপীড়িত শ্রেণীকে নিয়ে সস্তা কান্নাকাটি করলেই তা বামপন্থী সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়তে বাধ্য। কলডর্-মার্শেলের লেখা তাঁদের ভুল ভাঙ্গাতে, এবং সাহায্য করতে পারে। এ কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে সস্তা, বাক্যবাগীশ সহানুভূতি পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তিরই প্রকাশক। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নতুন যুগের সাহিত্যের ভিত্তি, এবং এর থেকে প্রসূত সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি সাহিত্যেও অন্তর্দৃষ্টির সংযম আনে।

সমর সেন

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৪৪

পরিচয়

বুদ্ধভক্তি

(জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা ক'রে বুদ্ধমন্দিরে পুজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।)

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট-দর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির,
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

গর্জ্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রাম পল্লীর র'বে ভস্মের চিহ্ন ;

হানিবে শূন্য হতে বহ্নি আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ,
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

হত আহতের গনি' সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিঃশ্বাস,
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাংখ্যের সাংপরায়

১

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন :—

ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্—কঠ, ২।৬

"যাহারা প্রমত্ত, বিত্তমোহে মূঢ়—'সাংপরায়' তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না।"

সাংপরায়=পরলোকতত্ত্ব—'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে'—এই প্রশ্নের সদুত্তর। দুইটি গ্রীক্ শব্দ যোগ করিয়া 'সাংপরায়'কে পশ্চিমে বলা হয় 'Eschatology'—'the doctrine of the last or final things, as death, judgment, the state after death'

'সাংপরায়' সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। চার্ব্বাকের মত যাঁহারা জড়বাদী (Materialist), 'Survival of Man'-এ অবিশ্বাসী—তাঁহাদের নিকট সাংপরায়ের প্রশ্নই উঠে না—তাঁহাদের পক্ষে 'the grave is but his goal'। কিন্তু যাঁহারা জীববাদী (Spiritualists), তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন উঠিবে—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি? অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?

নিশ্চয়ই নাস্তিত্ব (annihilation) হয় না,—কারণ, জীববাদীর মতে—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—জীব-রিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

জড়বাদী বলেন বটে, চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র। জীববাদী কিন্তু জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ বন্ধু! 'Consciousness is the absolute world-enigma' (James)—সম্বিৎ বিশ্বের প্রধানতম প্রহেলিকা। সেই অদ্ভুত আজব ব্যাপারকে তুমি এক নিঃশ্বাসে সমাধান করিয়া

ফেলিলে! জান না কি? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer)—অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যানের মত বিরাট্ বিয়াকুবি আর নাই।

আত্মার কি জন্ম-মৃত্যু আছে? ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে জীববাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসি?—'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি, কিন্তু তাহার কি গতি হয়?' ইহার দ্বিবিধ উত্তর—প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক,—দ্বিতীয় উত্তর জন্মান্তর। প্রথম উত্তর প্রচলিত খৃষ্ট-মতাবলম্বীদের উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ eternal retribution in heaven or hell-এ বিশ্বাসবান্। অধুনা কিন্তু অনেক খৃষ্টান কার্য্যকারণের ঐরূপ বিপুল অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। সেইজন্য জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ নরক স্বীকার করা অনাবশ্যক। তদপেক্ষা 'যথা-কর্ম্ম যথা-শ্রুতম্'—যেমন কর্ষণ তেমনি ফলন—'as you sow so shall you verily reap'—যিশুখৃষ্টের এই সার উপদেশই শিরোধার্য্য করা সঙ্গত।

সে যাহা হ'ক, 'সাংপরায়' সম্পর্কে সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত কি? মহাভারতকার বলিয়াছেন—নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানম্। অতএব এ বিষয়ে সাংখ্যমত নির্ধারণ মন্দ নয়।

সাংখ্যেরা বিশ্বের বিশ্লেষণের ফলে এক চরম দ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ। এই তত্ত্বদ্বয় অত্যন্ত 'বি-রূপ'—'দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী'। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন; পুরুষ বিষয়ী, প্রকৃতি বিষয়; পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্য; পুরুষ নির্গুণ, প্রকৃতি ত্রিগুণ; পুরুষ কূটস্থ, প্রকৃতি পরিণামী; পুরুষ অকর্ত্তা, প্রকৃতি কর্ত্রী—এক কথায়, পুরুষ চিৎ, অজড়, Spirit—আর প্রকৃতি অচিৎ, জড়, 'মাতর্' (Matter)—

'an undifferenciated manifold, containing the potentialities of all things'. 'It (প্রকৃতি) is the prius of all creation—the one homogeneous substance, the basis of the world of becoming.'

—Prof: Radha Krishnan

প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ অঙ্গীকারের সার্থকতা কি? এক কথায় ইহার উত্তর এই—

'The consolidation of our experiences into a synthetic whole, is due to the presence of the Self (পুরুষ), which holds the different conscious states together'.

পুনশ্চ—

'The Ego is the psychological unity of that stream of conscious experiencing which I know as the inner life of an empirical self'.

এই পুরুষের স্বরূপ কি? সাংখ্যমতে পুরুষ—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবস্য তদ্‌যোগঃ তদ্‌যোগাদ্ ঋতে—সাংখ্যসূত্র, ১।১৯

অর্থাৎ পুরুষ নিত্য, পুরুষ শুদ্ধ, পুরুষ বুদ্ধ, পুরুষ মুক্ত-স্বভাব। পুরুষ যখন নিত্য, তখন তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই—ক্ষয় বৃদ্ধি নাই—উদয়াস্ত নাই। এক কথায় পুরুষ নিরাকার, নির্বিকার ও নিরাধার। পুরুষ যখন শুদ্ধ, তখন তিনি অপাপবিদ্ধ—পাপতাপহীন,—নির্মল, নির্গুণ, নির্লেপ, নিঃসঙ্গ, কেবল, উদাসীন, সাক্ষীমাত্র।

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বঞ্চ ঔদাসীন্যং চেতি—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১-৩

পুরুষ যখন বুদ্ধ, তখন তিনি চিদ্রূপ, জ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিঃ, প্রকাশ-স্বভাব।

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৫

পুরুষ যখন মুক্তস্বভাব, তখন তিনি বন্ধহীন, (without limitations) অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, সর্ব্বব্যাপী।

পুরুষঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ ব্যাপী চেতনঃ—গৌড়পাদ।

যিনি বিভু, পূর্ণ,—তাঁহার কোন ক্রিয়া বা চেষ্টা থাকিতে পারে না। সেই জন্য পুরুষ নিরীহ বা নিষ্ক্রিয়।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৪৯

পুরুষ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন অবশ্যই তিনি অ-কর্ত্তা।

অহংকারঃ কর্ত্তা, ন পুরুষঃ—৬।৫৪

অথাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। পুরুষঃ অনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতশ্চেতনঃ অগুণোনিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাংকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদ্ অমলঃ অপ্রসবধর্ম্মীতি—আসুরি-ভাষ্য।

'পুরুষ কিরূপ ? পুরুষ অনাদি, পুরুষ সূক্ষ্ম, পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, পুরুষ চেতন, পুরুষ নির্গুণ, পুরুষ নিত্য, পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, পুরুষ অকর্ত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।'

এই সকল কথা সংগৃহীত করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

Purusa is without beginning or end, without any qualities, subtle and omnipresent, an eternal seer beyond the senses, beyond the mind, beyond the sweep of intellect, beyond the range of time, space and causality, which form the warp and woof of the mosaic of the empirical world. It is unproduced and unproducing.

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন এই পুরুষ এক নয়, বহু।

পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৫

যিনি চিরন্তন, সনাতন, সর্ব্বব্যাপী, যিনি বিভু—তিনি বহু হইবেন কিরূপে ? এ মত লইয়া প্রচুর বাদ-বিবাদ আছে ; কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা করিতে চাই না। সাংখ্যের 'সাংপরায়' বুঝিতে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তবে এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের কয়েকটি সারগর্ভ কথা উদ্ধৃত করিয়া দিই—

An absolute, immortal, eternal and unconditioned *Purusa* can not be more than one. If each *Purusa* has the same features of consciousness—all-pervadingness—if there is not the slightest difference between one *Purusa* and another, (since they are free from all variety), then there is nothing to lead us to assume a plurality of *Purusa.*

সে যাহা হউক, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক পুরুষই শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব—তখন পুরুষে পুরুষে ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে ? সাংখ্যমতে প্রত্যেক পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি স্বতন্ত্র 'লিঙ্গ'-শরীরের সহিত সংযুক্ত। এই লিঙ্গশরীর তাঁহার Psychic Apparatus। এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষের স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির চিহ্ন (mark) বা লিঙ্গ বলিয়া উহার নাম 'লিঙ্গ' শরীর। এই 'লিঙ্গ'-শরীর পুরুষের Persona এবং তদুপহিত পুরুষই জীব (Soul)।

জীবত্বং প্রাণিত্বং—তচ্চাহঙ্কারবিশিষ্টপুরুষস্য ধর্ম্মো ন তু কেবল পুরুষস্য—বিজ্ঞানভিক্ষু

বিশিষ্টস্য জীবত্বম্ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৩

বৃত্তিকার অনিরুদ্ধেরও ঐ মত—ইন্দ্রিয়-সংযোগেন বিশিষ্টস্য এব জীবত্বম্

The empirical self (জীব) is the mixture of free spirit (পুরুষ) and mechanism (লিঙ্গ শরীর)—Radha Krishnan.

কোথাও কোথাও এই 'লিঙ্গ' শরীরকে 'চিত্ত' বলা হইয়াছে। এভাবে প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিত্তের সহিত অনাদিকাল হইতে সংযুক্ত।

চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু। বাচস্পতি মিশ্রও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—অনাদিত্বাচ্চ সংযোগপরম্পরায়াঃ।

এই লিঙ্গশরীর ছাড়া পুরুষের আর একটি শরীর আছে—স্থূল শরীর। অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদে শরীর দ্বিবিধ। অস্থি-মাংস-মজ্জা-মেদ-নির্ম্মিত শরীর—যাহা আমরা পিতা-মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাদের স্থূল শরীর। ইহা যাট্‌ কৌশিক। সাংখ্যেরা এই শরীরকে মাতাপিতৃ-জ বলেন। এই শরীর বিনাশী,—কিন্তু লিঙ্গশরীর, তাঁহাদের মতে নিয়ত (নিত্য বা কল্পান্ত-স্থায়ী) এবং পূর্ব্বোৎপন্ন (primeval)।

সূক্ষ্মাঃ, মাতাপিতৃজাশ্চ * *

সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে—সাংখ্যকারিকা, ৩৯

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরৎ ন তথা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭

ত্রিপিটকের আলোচনা করিলে দেখা যায় বুদ্ধদেবও স্থূলদেহ (রূপকায়) ছাড়া সূক্ষ্মদেহ স্বীকার করিতেন—স্যার অলিভার লজ যাহাকে Ether-Body বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের পরিভাষায় ঐ সূক্ষ্মদেহের নাম—নামকায়।

He distinguishes between নামকায় and রূপকায়—these terms designating the mental and the material body (Grimm)

দীর্ঘনিকায়ে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, ধ্যানযোগী ঐ নামকায়কে রূপকায় হইতে নিষ্কাষিত করিতে পারেন—মুঞ্জা হইতে যেমন ঈষিকা নিষ্কাষিত করা যায়।

With his mind thus concentrated, he (the yogi) directs it to the calling up of the mental body. He calls up from this body (স্থূলশরীর) another body, having form made up of thought-stuff, having all limbs and parts, just as if a man were to pull out a reed from its sheath.—দীর্ঘনিকায়

বলা বাহুল্য, স্থূলশরীর এবং 'লিঙ্গ'শরীর উভয়ই প্রাকৃতিক (material)-অর্থাৎ প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষায়—পুরুষেণ সংসৃষ্টা ইয়ম্ অনাদিকাল-প্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ। অর্থাৎ, ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতির একখণ্ডকে বা ভগ্নাংশকে পুরুষ অনাদিকাল হইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন—পুরুষ স্বামী—এই চিত্ত তাঁহার স্ব। লিঙ্গশরীরের গঠন সম্বন্ধে সূত্রকার লিখিয়াছেন—

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্—৩।৯

একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ।

অহংকারস্য বুদ্ধৌ এব অন্তর্ভাবঃ।—বিজ্ঞানভিক্ষু

অর্থাৎ, বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের মিলনে লিঙ্গশরীর। এসম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

মহদহংকার একাদশেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্তং। এষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্মশরীরম্।

এই লিঙ্গশরীর সাদা শ্লেঠ নহে—ইহাতে জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সংস্কারের হিজি-বিজি আছে।

ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০

অনাদি বাসনানুবিদ্ধং চিত্তম্ (ব্যাসভাষ্য)

কারণ,—উহা তদ্‌অসংখ্যেয়-বাসনাভিঃ চিত্রম্ (যোগসূত্র, ৪।২৪)

অসংখ্যেয়াঃ কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশ-বাসনাশ্চ চিত্তম্ এব অধিশেরতে—ব্যাসভাষ্য

পুনশ্চ ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন—ন বিনা ভাবৈঃ লিঙ্গম—৫২ কারিকা, 'লিঙ্গশরীর ভাব-রহিত হইতে পারে না'। ভাব কি ? ভাব ধর্মাধর্মাদি চিত্ত-সংস্কার।

দেহান্তে লিঙ্গশরীরের কি গতি হয় ? ইহার উত্তর—সাধারণ জীবের পক্ষে, মৃত্যুর পর লিঙ্গশরীরের 'সংসৃতি' হয়—

পুরুষার্থং সংসৃতিঃ লিঙ্গানাম্—সাংখ্যসূত্র ৩।১৬

সংসৃতিঃ—দেহাৎ দেহান্তরসঞ্চারঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

ঐ লিঙ্গ-শরীরের স্থূলদেহের সহিত সংযোগই জন্ম, এবং বিয়োগই মৃত্যু। ইহারই নাম 'সংসার'। কারিকা বলিতেছেন—

সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ—৪৫ কারিকা

এক কথায়, সর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যতে। ইহারই নাম জন্মান্তর। কেন জন্মান্তর হয় ? ইহার উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।

অর্থাৎ, যখন স্থূলশরীর ব্যতীত লিঙ্গশরীর ভোগহীন, তখন সংসার অবশ্যম্ভাবী—যতঃ ষাট্‌-কৌশিষং শরীরং বিনা সূক্ষ্ম-শরীরং নিরুপভোগং, তস্মাৎ সংসরতি—(তত্ত্বকৌমুদী)।

বলা বাহুল্য, পুরুষ যখন বিভু ও নিশ্চল, তখন পুরুষের সংসৃতি হয় না, হইতে পারে না—

তস্মাৎ ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ (পুরুষঃ)—৬২ কারিকা

তবে সংসৃতি হয় কাহার ? প্রকৃতির—অর্থাৎ জীবের উপাধিভূত লিঙ্গশরীরের—সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ। এই সংসৃতির প্রকার ও প্রণালী সম্পর্কে কারিকা বলিতেছেন—নটবৎ অবতিষ্ঠতি লিঙ্গম্। ইহার গৌড়পাদভাষ্য এইরূপ—

লিঙ্গম্ সূক্ষ্মৈঃ পরমাণুভিঃ তন্মাত্রৈরুপচিতং শরীরং ত্রয়োদশবিধ-করণোপেতং মানুষ-দেব-তির্যগ্ যোনিষু ব্যবতিষ্ঠতে। কথং ? নটবৎ।

নটবৎ কেন বলিলেন ? ইহার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—যেমন রঙ্গভূমিতে নট ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে—কখনও পরশুরাম হয়—কখনও অজাতশত্রু হয়—কখনও বৎসরাজ হয়—সেইরূপ লিঙ্গশরীর বিবিধ ও বিচিত্র স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া কখনও দেব, কখনও মনুষ্য, কখনও পশু, কখনও পাদপ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যথাহি নটঃ তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরশুরামো বা অজাতশত্রুর্বা বৎসরাজো বা ভবতি, এবং তৎ-তৎ-স্থূলশরীর গ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশুর্বা বনস্পতি র্বা ভবতি সূক্ষ্মশরীরম্।

—তত্ত্বকৌমুদী

সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর-উপহিত জীবের চতুর্ব্বিধ জন্ম হইতে পারে—দেব, মনুষ্য, নরক ও তির্যগ্। এ সম্পর্কে যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে প্রাচীন ঋষি জৈগীষব্যের মুখে আমরা শুনিতে পাই—

জৈগীষব্য উবাচ—দশসু মহাসর্গেষু ময়া নরক-তির্য্যগ্-ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন যৎকিঞ্চিদনুভূতম্ তৎ সর্ব্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি।*

বুদ্ধদেবও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তবে তিনি ঐ চতুর্ব্বিধ জন্মের অতিরিক্ত পৈশাচ জন্মও স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মতে স্থূলদেহের নাশের সহিত সূক্ষ্ম-শরীর-উপহিত জীবের বিনাশ হয় না কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার দৈব কিম্বা মানুষ কিম্বা নারক কিম্বা পৈশাচ কিম্বা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর হয়। মজ্ঝিমনিকায়ে রক্ষিত তাঁহার কথা এই—Five in number, Sariputta, are the fates which may befall after death, namely these ;—passage into the hell world, the animal kingdom, the realm of shades, the world of men or the abodes of the gods.

(M. N. I. p. 73)

সূক্ষ্মশরীরের সংসৃতির কি বিরাম নাই? সংখ্যেরা বলেন, বিরাম আছে—লিঙ্গশরীর যখন নিবৃত্ত হইবে, তখনই সংসৃতির বিরাম ঘটিবে।

লিঙ্গস্য আবিনিবৃত্তেঃ—৫৫ কারিকা

দুঃখপ্রাপ্তৌ অবধিঃ আঙা কথ্যতে—লিঙ্গং যাবৎ ন নিবর্ত্ততে তাবৎ ইতি—তত্ত্বকৌমুদী

কাহার সংসার নিবৃত্ত হয়? কুশলস্য অস্তি সংসারক্রমসমাপ্তিঃ ন ইতরস্য (৪।৩৩ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্য) অর্থাৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে—ইতরস্তু জানিষ্যতে।

অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞানী—যাঁহার তৃষ্ণা অবসিত হইয়াছে—যিনি কুশল পুরুষ—তাঁহারই জন্মান্তর নিবৃত্ত হয়। এখানেই সাংপরায়ের শেষ। কিন্তু সে অনেক কথা, আগামী বারে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* ব্যাসভাষ্যের অন্যত্রও ঐরূপ কথা আছে—ন হি দৈবং কর্ম বিপচ্যমানং নারকতির্য্যগ্‌মনুষ্য-বাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং সম্ভবতি। কিংতু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারকতির্য্যগ্‌মনুষ্যেষু চৈবং সমঃ্নশ্চর্চঃ।

ৎসিগান্

'বুগ্' নদীর ধারে যেমন তেমন করিয়া ছড়ানো কয়েকখানা চাষার ঘর লইয়া যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহার সরকারী নাম কাহারো জানা নাই। নদী হইতে গ্রামে উঠিবার পথে একখানা লৌহফলকে ঐ গ্রামের বিবরণ সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: পুরুষসংখ্যা ২৮, স্ত্রীসংখ্যা ৩৩, শিশুসংখ্যা ১৯। এই নগণ্য মানবগোষ্ঠীর একমাত্র অধিনায়ক বৃদ্ধ ম্লিনারচিক্ কিছুদিন হইল আমেরিকায় দ্বাদশ বর্ষ প্রবাসের পর আপন বাপ্-দাদার কবরের পাশে স্থান লইবার জন্য তাহার বহুকষ্টে অর্জ্জিত ডলারের পুঁজি লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। তাই এ গ্রামের নির্ল্লজ্জ দারিদ্র্যের মাঝে ম্লিনারচিকের ইট, কাঠ ও টালির বাড়ীখানাকে উলঙ্গ ব্যক্তির বাহারে টুপির মত দেখায়। ম্লিনারচিকের আস্তাবলে ঘোড়া, গোহালে গরু, শূয়ারখানায় শূকর, গুদামভরা গম, রাইশস্য, মটর, কাশা,* আলু ও সারা আঙ্গিনা ভরিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ বিচালীর গাদার আশেপাশে নানা রংবেরঙের অসংখ্য হাঁস, মুরগী ও পেরু খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেরে।

একদা শীতের রাত্রে পৃথিবী যখন বৈধব্যের শ্বেতবসনে আবৃত হইয়া উপুড় হইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, তখন ধরার এক অভুক্ত সন্তান বাইবেল ও খ্রীষ্টের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ধনী প্রতিবেশী ম্লিনারচিকের শস্যপরিপূর্ণ কোষাগারে প্রবিষ্ট হইল। পরদিন দ্বিপ্রহরবেলায় কোন্ এক দূর গ্রাম হইতে আনীত হিংস্র-স্বভাব ৎসিগান্ ম্লিনারচিকের আজীবন-অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের প্রহরী-রূপে নিযুক্ত হইল।

গুদামঘরের একপাশে মেঝের মাটি ধসিয়া একটি গুহার মত গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে করোগেডের টিনের দেয়াল আর মাটির মাঝখানে যে ফাঁক দিয়া ম্লিনারচিকের শস্যসম্পদের কয়েকটি মাত্র কণা অপহৃত হইয়াছিল, সেইখানেই এই নবানীত যক্ষের আস্তানা নিরূপিত হইল। খড় ও চট বিছানো গর্ত্তের মধ্যে

* বালি-জাতীয় একপ্রকার শস্য দেখিতে কতকটা মুগের ডালের মত। প্রায় সমস্ত স্লাভ-দেশে পরিচিত।

ঘোলা অন্ধকারে ৎসিগানের নেশাখোরের মত রাঙা চোখ দুইটি এক হিংস্র নির্ব্বুদ্ধিতায় জ্বলজ্বল করিত।

বহু রক্তের সংমিশ্রণে ৎসিগানের জন্ম, তাই তাহার আকৃতিতে কোনো বিশেষ জাতির প্রকট চিহ্ন দেখা যাইত না। কান দুইটী ঝোলা ঝোলা, থ্যাব্ড়া মুখটী কতকটা বুলডগের মত, এবং মাথাটা ইডিয়টের মত চ্যাপ্টা। রং কালো ও স্থানে স্থানে নানা মেশানো রঙের ছিট্। তাহার মুখের ভিতরটি কুচ্কুচে কালো ও দাঁতগুলা ড্রাগনের দাঁতের মত। দাঁত ছাপাইয়া তাহার খর জিভটি অজগরের জিভের মত এক আলস্য জড়িত লালসায় সর্ব্বদাই লক্ লক্ করিত। তাহার শরীরের সমস্ত অংশের মধ্যে তাহার বলিষ্ঠ জঙ্ঘা দুইটি এক উনস্বাভাবিক ঐন্দ্রিকতার পরিচয় দিত, এবং তাহার এই অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-ক্ষুধাকে অভুক্ত রাখিয়া তাহার হিংস্রতাকে শানাইয়া তুলিবার জন্য তাহাকে অষ্টপ্রহর বাঁধিয়া রাখা হইত।

রংটি কালো বলিয়া তাহার নাম ছিল † ৎসিগান্, কিন্তু ৎসিগান্ বলিয়া হাজার বার ডাকিলেও সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিত না, যেন মানুষের দেওয়া কোনো নামকেই সে গ্রাহ্য ক'রে না। আপন মস্তিষ্কের এক গহন কোণে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি ধোঁয়াটে রকমের ধারণাকে স্মরণ রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, আর কখনো কখনো গভীর রাত্রে দূর পথে চলা কাহারো পায়ের খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া জংলী জানোয়ারের মত এক অদ্ভুত ভাঙ্গা ফাঁপা গলায় চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিত। তাহার সেই স্বর উন্মাদের অর্থহীন চীৎকারের মত রাত্রিভেদ করিয়া দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইত। তাহাতে তাহার সে অন্ধ রোষ যেন শতমাত্রায় বৃদ্ধি পাইত এবং সে আপনা আপনি গজ্রাইয়া গজ্রাইয়া অস্থির হইত।

শীত কাটিয়া বসন্ত আসিল, এবং ম্লিনারচ্যিকের সারা আঙ্গিনায় যেন উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। শূকরের ছানা ও হাঁস ও মুরগীর বাচ্চাগুলা দুরন্ত শিশুর মত আনাচে-কানাচে হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এমন কি পোষা খরগোশের বাচ্চা কয়টি পর্য্যন্ত দু'একবার চৌকাঠের বাহির হইয়া উকিঝুঁকি দিল। দেয়ালের ফাঁক দিয়া জীবজগতের এই অকারণ আনন্দের পানে চাহিয়া

† ইউরোপের অধিকাংশ দেশে বেদেরা ৎসিগান্ নামে পরিচিত।

ৎসিগানের মনটা যেন কিসের এক অব্যক্ত বেদনায় টন্টন্ করিয়া উঠিল। রৌদ্রের দিকে পিট দিয়া এবং সামনের পা দুইটির উপর মাথা রাখিয়া সে দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখিতে বসিল।

দূরে ঐ যে মানুষের মত কী একটি চলা ফেরা করিতেছে, ও বুড়ী ম্লিনার-চ্যিকভা, নয়? হ্যাঁ, সেই রকম গন্ধ পাইতেছি বটে, মানুষের গন্ধের সঙ্গে গরুর গন্ধ মেশানো একটী অদ্ভুত জীব। জীবটি করিতেছে কী? বুঝিয়াছি, এইবার খাবার দিবার সময়। হাতে ঐ পাত্রটিতে কী? ইস্ সেই পুরানো দৈনন্দিন খোরাক! আলুসিদ্ধ চটকানো, তাহাতে একটু পচা দুধ মেশানো আর খানিকটা নুন! যেদিন হইতে এ বাড়ীতে পা দিয়াছি সেই দিন হইতে এ খোরাকের একটুও বদল হয় নাই। গরু-ঘোড়াগুলা চক্ষু মুদিয়া শুক্নো ঘাসের রস উপভোগ করে দেখিয়াছি, তবে ওগুলা জন্তুমাত্র, উহাদের আবার খাওয়া! তাছাড়া সারাদিন তাহারা মাঠে মাঠে চরিয়া বেড়ায় এবং গাছপালা আগাছা যাহা পায় তাহাই গোগ্রাসে গিলিয়া ফেলে। উঠানের শোর-মুরগীগুলা পর্য্যন্ত একটু বৈচিত্র্য পায়। ঐ দেখ না, ঐ কালো মোরগটি একটি মস্ত কেঁচো কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল। থুঃ, কী কদাকার রুচি! "চিপ্-চিপ্-চিপ্—চীপ্!" ম্লিনার-চ্যিকভা মুরগী ও পেরুগুলাকে ডাকিতেছে। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নির্ব্বোধ জানোয়ারগুলা কীসের লোভে ছুটিতেছে! সেই ত অপরূপ আলু চট্কানো!

"মালুৎকী—মালু-মালু-মালু-মালু—উ।" এ শব্দটি শোরের বাচ্চাগুলার জন্য। আরে বাস্! সব কয়টি একসঙ্গে কোথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া ছুটিয়া আসিল। একটি আমার কান ঘেঁসিয়া ছুটিয়া গেল, একটু সজাগ থাকিলে ধরিতে পারিতাম। আহা হা, বড় ফস্কাইয়া গেল! অমন ছোট্ট গোলগাল চেহারাটি, বোধ করি একটুও হাড় নাই, আর যদিও বা থাকে ত একেবারে কচি নরম তুল্তুলে। আমার দাঁত শানাইবার মত একদম নয়, তবে নিশ্চয়ই ভারী মুখরোচক। কয়দিন হইল না, দুইটাকে মারিয়া বুড়া-বুড়ী কতকগুলা অপরিচিত মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত করিল! কৈ হাড় একটাও ত কোনো-খানে দেখিলাম না, এত শোঁকা-শুঁকি করিলাম! বহুদিন আগে পূর্ব্বের প্রভুর বাড়ীতে একটু ছাড়া পাইয়া যে খরগোশের বাচ্চাটিকে ধরিয়া এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিয়াছিলাম, শোরের ছানাগুলা নিশ্চয়ই খাইতে সেইরূপ হইবে। ঐ যে

বুড়ী আসিতেছে এইদিকে। ইস্ কী বোট্‌কা গন্ধ! আমায় ডাকিতেছে বোধ করি—ৎসিগান্, ৎসিগান্! আমি কিন্তু একটুও নড়িব না। রাখিয়া যাক্ না খাবার ঐ বাটিটাতে, যতক্ষণ ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকিতে পারি ততক্ষণ উহা আমি মুখে তুলিব না, এই শপথ করিতেছি। ৎসিগান্ ৎসিগান্, কেন রে বাপু অমন আদরের ডাক! ঐ অপরূপ খাদ্য সামগ্রীটি যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান করো না মা! কোন্‌দিন হয়তো মেজাজ হারাইব, একটি খুনোখুনী কাণ্ড হইবে! ঐ ত খাবার, তাহাও যদি একটু শ্রদ্ধা করিয়া দিত, সব জানোয়ারগুলাকে খাওয়াইয়া তবে আমাকে! ইহারা সজ্জাতের সম্মান করিতে জানে না। শুধু তাই নয়, আমি না থাকিলে ঐ জন্তুগুলা থাকিত কোথায়! এই ত সেদিন রাত্রে অন্ধকারে একটা অজানা মানুষের গন্ধ পাইলাম ঠিক মুরগীগুলার ঘরের কাছে। একটু ডাকাহাঁকি করাতে লোকটি উধাও হইল, গন্ধটি এখনও যেন আমার নাকের ডগায় পাইতেছি। জগতে কৃতজ্ঞতা কি আছে? যাক্ বুড়ী খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, বাঁচিলাম যেন! মাঝে মাঝে মেজাজটাকে সাম্‌লাইতে ভারী কষ্ট হয়, তাহার উপর রাগ চাপিয়া অতি ভদ্রভাবে আমার ঐ অবশিষ্ট ল্যাজের একটুখানি নাড়িতে যেন আমায় মাথাটা একেবারে কাটা যায়। হ্যাঁ, কী যেন ভাবিতে ছিলাম না! তাই ত হুঁ, জন্তুগুলা খাবার শেষ করিয়া আবার এই দিকে আসিতেছে। সারা আঙ্গিনায় তিল ধরিবার ঠাঁই নাই, শোরের ছানা, মোরগ, মুরগী, পেরু, হাঁস—কতগুলা হইবে? ঐ একটি, ঐ একটি, ঐ একটি, ইস্ অনেকগুলা! সেই হল্‌দে রঙের মোরগটিকে দেখিতেছি না কেন? সেই যেটা ভোর হইতেই বেড়ার উপর বসিয়া সারা উঠানটাকে যেন তাহার চাঁচা গলার ডাকে চিরিয়া ফেলিত। মাথায় ছিল তাহার প্রকাণ্ড ঝুঁটি, কী একটা অন্য পাখীর মত। আর ঠ্যাং দু'খানা, মনে পড়িলে আমার ভিতরটা যেন পাক্ দিয়া উঠে। একদিন সেটা আমার বাটি হইতে খানিকটা খাবার চুরী করিতে আসিয়াছিল। আমি রোদে পড়িয়া ঘুমাইতেছিলাম, জাগিয়া দেখি প্রায় সমস্ত খাবার সে খাইয়া শেষ করিয়াছে। চোখ দুইটি আধোভাবে খুলিয়া তাহার ঘাড়টার দিকে তাগ করিতেছি, এমন সময়ে সে কী ভাবিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল, লজ্জায় নয়, ভয়ে। আশ্চর্য্য, কে যেন আমার মৎলবটা তাহাকে ইসারায় জানাইয়া দিল। কে, কে জানে, অথচ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, অতটা

বুদ্ধি তাহার ঐ তিল পরিমাণ মগজে কোনোমতেই জোগাইত না। যাহা হউক তাহাকে আজ দেখিতেছি না কেন? হুঁ, বুঝিয়াছি, কাল সেটা কর্ত্তার পাতে পড়িয়াছে, কারণ কাল সকালে কর্ত্তাগিন্নীতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাত ও মাথা নাড়িয়া খুব খানিকটা চেঁচামেচি করিল। এ রকম প্রায়ই হয়, যেন দুইটা মোরগে ঝগড়া করিতেছে। কর্ত্তা যত চেঁচায়, গিন্নী তাহার শতাধিক। এবং সেইদিনই বিকালের দিকে একটা না একটা মোরগ বা মুরগীকে দেখা যায় না, সুধু উঠানের পাশে দু'একটা রক্তমাখা পালক পড়িয়া থাকে, আর হাতগুলা যায় কোথায় কে জানে! আচ্ছা, দু'একখানা হাড়ও কি আমায় দিতে নাই যে দু'দণ্ড কিছু চিবাইতে পাই! ইস্, হাড়ের নামেও যেন আমার দু'পাটি দাঁতের প্রত্যেকটি আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসে! শেষবার যে হাড়টিকে পাই সেটাকে পাথর বলিলেই হয়। আমিই সেটিকে কানাচের মাটি খুঁড়িয়া বাহির করি, সেটি কিসের হাড় মনে নাই, মুরগীর কখনই নয় কিন্তু তাহাতে মুরগীর পায়ের মত অনেকগুলা আঙুল ছিল। সেটাকে দু'একবার মাত্র চুষিয়াছি, এমন সময়ে তাহাতে কর্ত্তার নজর পড়িল। আর তাহা লইয়া যে কেলেঙ্কারীটা হইল তাহা ভাবিতেও প্রবৃত্তি হইতেছে না। সেদিন মনে হইয়াছিল, বুড়ার শুক্‌নো চামড়া-ঢাকা হাড় ক'খানা ঠিক এমনি করিয়া চিবাইয়া ফেলি! কিন্তু আমার শরীরের সমস্ত শক্তিকে আমার গলার শিকলটা যে মুঠা করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। কোন্‌দিন ওটাকে সত্যই ছিঁড়িয়া ফেলিব। ইস্, বেরালটা ঐ রক্তমাখা পালকগুলা চাটিতেছে, এই বন্দী অবস্থায় হাঁক দিয়া করিব কী, সে অমনি ছেনালী করিয়া আরো দেখাইয়া দেখাইয়া টুকিয়া টুকিয়া খাইবে! বেরাল জাতটাকে দেখিলে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া ওঠে। ছোট জাত, অথচ মানুষের কাছে তাহার আদর কম নয়। আমার পাওনা হাড়-মাংসগুলা নিশ্চয়ই সে ফেলিয়া ছড়াইয়া আপন ইচ্ছামত খাইয়া বেড়ায়। একবার ছাড়া পাইলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি সে পাইবেই পাইবে। ইস্ কাঁচা রক্ত, একটা বিন্দুও যদি জিভে দিতে পারতাম। এই এত বড় গুদাম ঘরটায় একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত একবার উঁকি দেয় না। ইঁদুরের রক্ত, মনে করিলে গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে। কিন্তু রক্ত, সে সব সমান, কাঁচা লোনা রক্ত! এই যা, রক্তের কথা মনে করিতে করিতে জিভের জলে মাটিটা পর্য্যন্ত ভিজিয়া গেছে।

থুঃ! যাক্ ওসব কথা ভাবিয়া কাজ নাই। একটু কিছু খাইলে হইত। বাটির আলু চটকানোটার দিকে তাকাইতেও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু মুরগীগুলা কী আনন্দেই না কপ্ কপ্ করিয়া তাহা গিলিয়া ফেলে! খানিকটা ত খাইলাম, বাকিটা পরে চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে। এখন একটু আরাম করিয়া শোওয়া যাক্। ছোট্ট হাঁসের বাচ্চাটা বেপরোয়াভাবে অন্ধের মত এদিকে আসিতেছে। আর একটু আগাইয়া আসুক না। নাঃ, কিছুদূর আসিয়াই থামিয়া গেল। সমস্ত জানোয়ারগুলো আমার চারিপাশে একেবারে গা ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে, যেন তাহারা দল বাঁধিয়া আমায় ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। একবার ছাড়া পাইলে সমস্ত গুলার ঘাড় ছিঁড়িয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিতাম। একটার পর একটার টুঁটি টিপিয়া সমস্ত তাজা রক্ত পান করিয়া লইতাম, তারপর মাংস ও পেশীসংলগ্ন হাড়গুলাকে দিনের পর দিন ধরিয়া চিবাইতাম। কিন্তু এই শিকলটা, যেদিকে ফিরি ওটা সর্ব্বক্ষণ আমার গলা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। ওটাকে কী করিয়া কাবু করা যায় সেই সম্বন্ধে কয়দিন ধরিয়া ভাবিতে-ছিলাম, না? তাইত, কী করিয়া উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! ওটাকে ছাড়াইবার জন্য যখন সেদিন রাগের মাথায় মক্ষমভাবে কামড়াইয়া ধরিলাম, তখন আমার জিভ কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। উহার সর্ব্বাঙ্গে দাঁত, সেই দাঁতগুলা মেলাইয়া সেদিন সে আমার দিকে চাহিয়া খুব খানিকটা হাসিল। মাথাটা নীচু করিয়া দুই পা দিয়া আস্তে আস্তে ওটাকে কানের উপর দিয়া হয় তো গলাইয়া দেওয়া যায়। না, কান পর্য্যন্ত আসিয়াই আবার ওটা ঝনাৎ করিয়া ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। টিনের দেয়ালটার উপর ঘসিলেও ওটাকে কাবু করা যায় না! কিন্তু সেই ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঐ দাঁতগুলাকে আমার গলার উপর সে অতি নির্ম্মমভাবে কস্‌কসে করিয়া বসাইতে থাকে। কিন্তু—এইবার একটা বেশ রীতিমত মৎলব মাথায় আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে যেন ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। দাঁড়াও দেখি, এই শিকলটা ত ঐ আংটাটার সঙ্গে বাঁধা, আর আংটাটা? ওটা মাটির মেঝের সঙ্গে কী এক অদ্ভুত উপায়ে আটকানো। হাত পায়ের নখগুলো কি একেবারে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঐ আংটাটার চারিপাশে খুঁড়িলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু অতি সন্তর্পণে কাজটা করিতে হইবে। এখন ঠিক সুবিধা হইবে না, বুড়ী আবার

খাবার লইয়া এখনই আদিখ্যেতা করিতে আসিবে। একটু গা ঢাকা মত হইয়া আসুক, এবং জন্তুগুলা সব শুইতে যাক্। কিন্তু কাজটা আজই রাত্রে শেষ করা চাই। ঐ শাদা মোরগটাকে আগে খতম করিব, তারপর ঐ চোকাগোছের হাঁসটাকে, তারপর ঐ খোঁড়া পেরুটাকে, তারপর, তারপর একে একে সব কয়টাকে সাবাড় করিতে হইবে। হুঁ, কিন্তু জন্তুগুলাকে রাখিব কোথায়? গুদাম ঘরে রাখিলে কর্ত্তা কালই আসিয়া সেগুলাকে টানিয়া বাহির করিবে এবং একটা কেলেঙ্কারী হইয়া যাইবে। না না, এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় নয়, কিন্তু কোথায় রাখা যায়? খুব দূরে কোথাও যেখানে মানুষের যাওয়া আসা নাই। ঐ দূরে ঝাউবনটার যেখানে ওপাড়ার ফীগার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেখানে পুঁতিয়া রাখিলে কেমন হয়? কেন সে ত খাসা মৎলব, কেহ টের পাইবে না। ফীগাটার সম্প্রতি কতকগুলা এণ্ডাবাচ্চা হইয়াছে, তাহার দেমাকে সে পাড়ার কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে সুধু ঐ কেঁচোর মত বাচ্চাগুলাকে লইয়া না কি রোদে একপাশে পড়িয়া থাকে। ফীগাকে লইয়া তাহার এক অনুগামীর সঙ্গে একদিন বেশ একটু মন কসাকসি হইয়াছিল মনে আছে। দুই জনে যখন ফীগার মন কাড়িবার জন্য রীতিমত মল্লযুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময়ে ঐ বোট্‌কা গন্ধওয়ালা বুড়ীটি একটি চ্যালাকাঠ লইয়া আমাকে শাসাইল, এবং পরে কর্ত্তা আসিয়া জোর করিয়া আমাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। ইহাতে উক্ত অনুগামীটি ফীগাকে ইসারা করিয়া একটু দূরে লইয়া গেল, এবং আমার চোখের সুমুখে যে দৃশ্যটি অভিনীত হইল তাহা মনে করিলেও আমার ভিতরটায় কিসের একটা ভোঁতা ব্যাথার মত বেদনা অনুভব করি। আজ রাত্রে একবার ওপাড়ায় যাইব নাকি? ফীগা সারা রাত ছাড়া থাকে, রাত্রির নিঃসঙ্গতায় হয় তো আজ আমায় সে প্রত্যাখ্যান করিবে না। আর প্রত্যাখ্যান করিলেই বা ক্ষতি কী, আপন জঙ্ঘার পেশীগুলা ত আজও শিথিল হইয়া যায় নাই! ফীগাই ত কত ছল করিয়া আমার আস্তানার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিত, তবে সে ঐ অপগণ্ডগুলা জন্মাইবার কিছু পূর্ব্বে। কিন্তু আজ সে পাঁচ ছেলের মা হইয়া উঠিয়া এমন কাহার কি মাথা কিনিয়াছে! ফীগা যদি প্রত্যাখ্যান করে, লেডী আছে, আর লেডীরও যদি মন না উঠে ত মাঠের মাঝখানের ঐ বাড়ীটার নরাও ত

আজ বাঁচিয়া আছে, যদিও তাহার বয়স কম হয় নাই এবং দাঁতগুলা রীতিমত আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছে। কাজ আরম্ভ করিব না কি? না, একটু অপেক্ষা করা যাক্। ইস্, শিকলটার দিকে তাকাইয়া যেন তর সহিতেছে না। ঐ যে বুড়ী আসিতেছে। ৎসিগান্, ৎসিগান্! ভালো মানুষের মত একটু মাথাটা তুলিয়া ল্যাজটাকে বার দু'এক নাড়া যাক্। বুড়ী খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বেশ একটু গা ঢাকা মত হইয়া আসিয়াছে। জানোয়ার-গুলাকে খাওয়াইয়া বুড়ী ঐ ঘরটায় বন্ধ করিল। একটা শোরের বাচ্চার বোধ করি খোঁজ মিলিতেছে না। বুড়ী ডাকিল, "মাৎলুকী, মালু—মালু—মালু—উ।" ডাক শুনিয়া আধো-খোলা দরজা দিয়া ভিতরের সব শোরের বাচ্চা কয়টা বাহির হইয়া আসিল। ঐ যে হারানো বাচ্চাটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। সব কয়টাকে একসঙ্গে ঘরে পুরিয়া বুড়ী অন্ধকারে মিশিয়া গেল। তাহার মাথায় বাঁধা শাদা রুমালটি এখনও দেখা যাইতেছে। এইবার সে আপন ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল, হুড়্‌কার আওয়াজ পাইলাম না!

সন্ধ্যা হইবার কিছু পরেই সারা গ্রামখানা যেন অন্ধকারে একেবারে হারাইয়া যায়। শুধু ম্লিনারচিকের অতুল বৈভবের সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার বাড়ীর একটা জানালা দিয়া খানিকটা আলো বিজন সমুদ্রের মাঝে জনহীন আলোকস্তম্ভের মত জাগিয়া থাকে। রাত একটু গভীর হইয়া আসে, বুড়াবুড়ী শুইতে যায়, জানালার আলোটা ক্রমে মুমূর্ষুর চোখের মত নিস্তেজ হইয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া যায়। তখন এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর শেষ চিহ্নরূপে গ্রামের পথটা ভদ্‌কা-খোরের মত ধূলায় লুটাইয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে।

সেদিন আকাশে একটিও তারা নাই, গভীর রাতে হঠাৎ মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। ম্লিনারচিকের বাড়ীর চারিপাশের তপলা-গাছগুলা পরস্পরের গায়ে পড়িয়া সির্‌সির্ শব্দে কী একটা বিষয় লইয়া কানাকানি করিতে বসিল। ঐ ঝাউবনটির দিক হইতে মাঝে মাঝে একটা চাপা গোঙানীর শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসে, যেন কে কাহার গলাটা আলু ছাড়াইবার ছুরী দিয়া পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতেছে। বুড়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া স্বামীকে জাগাইল। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কান পাতিয়া শুনিল, এবং একে একে সমস্ত সন্তগণের নাম করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। হু হু করিয়া বৃষ্টি নামিল, এবং

ঝড় ও বৃষ্টিতে ম্লিনারচিকের সারা আঙ্গিনাটায় দুইটা শকুনীর মত ঝটাপটি করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে শূয়ারখানা হইতে শিশুর কান্নার মত একটা শব্দ শোনা যায়, হাঁস ও মুরগীর ঘরটায় অনেকগুলা পাখা একসঙ্গে ঝাপটাইয়া উঠে, আবার সব থামিয়া যায়, এবং থাকিয়া থাকিয়া ঐ বনটা হইতে গোঙানীর শব্দটা বৃষ্টিকে ছাপাইয়া উঠে। মানুষের স্নায়ুগুলাতে ভয় বলিয়া যে পদার্থটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া থাকে তাহা যেন এই দুর্য্যোগের রাতে ছাড়া পাইয়া প্রেতের মত হা হা করিয়া বেড়াইতেছে।

ভোরের দিকে বৃষ্টি থামিল, এবং সকাল হইতেই ম্লিনারচিকের আঙ্গিনাটি রোদে ভরিয়া উঠিল। বুড়ী দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াই হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। দুয়ারের কাছে ভিজা ঘাসের উপর দুইটি হাঁস ও একটা মোরগ ঘাড় নেতাইয়া পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি হাঁস ও মুরগীর ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল, দেখিল দুয়ার খোলা, শুধু একটা মুরগী এক কোণে বসিয়া ডিমে তা দিতেছে, তাহার মুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ লাগিয়া আছে। ডাকিল, "মালুৎকী—মালু—মালু—মালু—উ। কিন্তু একটা শূকরশাবকও সে ডাকে ছুটিয়া আসিল না। ছুটিয়া গিয়া সে স্বামীকে ডাকিয়া আনিল। ম্লিনারচিকের মাথায় যেন সেইদিনের বসন্তের ঐ আকাশখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার আজীবন সঞ্চিত ডলারের পুঁজির যে দশগুণ সুদের হিসাব সে মনে মনে কষিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মনের সেই হিসাবের খাতাখানা কে এক মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল। যে প্রতিবেশী তাহার এই সর্ব্বনাশ করিল তাহার রক্তদর্শন করিয়া তবে সে জলগ্রহণ করিবে এই রকম কী একটা শক্ত-গোছের শপথ করিল। কিন্তু উঠানের কাদার উপর কিসের একটা চিহ্ন দেখিয়া সে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল। সারা আঙ্গিনাটায় কে যেন শিকলের মত কী একটা টানিয়া টানিয়া বেড়াইয়াছে। হাঁস ও মুরগীর ঘর হইতে রেখাগুলা আঁকিয়া বাঁকিয়া আলুর ক্ষেত পার হইয়া বনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি একাজ করিয়াছে সে যে বহুবার আনাগোনা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দাগগুলা স্থানে স্থানে স্পষ্ট শিকলের। কী ভাবিয়া ম্লিনারচিক্ হাঁকিল, "ৎসিগান্"। কোনো উত্তর আসিল না। আবার ডাকিল, "ৎসিগান্, ৎসিগান্!" ৎসিগান্ আপন গহ্বর হইতে মুখ বাড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। "ৎসিগান্, আয় এদিকে!" ৎসিগান্ এবার লজ্জার মাথা খাইয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আংটায় বাঁধা শিকলটা তাহার চির-পুরাতন সঙ্গীর মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ম্লিনারচিক্ গর্জ্জাইয়া উঠিল, "ৎসিগান, তোর এমন কাজ!" ৎসিগান যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়া মাথাটা নীচু করিয়া নিতান্ত সঙ্কোচভরে তাহার অবশিষ্ট ল্যাজটুকু নাড়িতে নাড়িতে শাস্তির প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ম্লিনারচিক্ উঠান হইতে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর ধুরা কুড়াইয়া লইয়া ৎসিগানের লজ্জাবনত মাথার উপর তাহার আজীবন সঞ্চিত ডলারের পুঁজির ধ্বংসসাধনের প্রতিশোধ লইল। ৎসিগান্ যেমন হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া ছিল তেমনই তাকাইয়া রহিল, শুধু তাহার মাথার মধ্যস্থল ফাটিয়া কয়েক বিন্দু রক্ত তাহার মুখের উপর গড়াইয়া পড়িল। শিকলটাকে লইয়া সে ঐখানেই ঐ ভিজা মাটির উপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

সমীর রায়

কথা ও সুর

কল্যাণীয়েষু— শান্তি নিকেতন

গানে কথা ও সুরের স্থান নিয়ে কিছুদিন থেকে তর্ক চলেছে। আমি ওস্তাদ নই, আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় এ বিষয়টা সম্পূর্ণ তর্কের বিষয় নয়; এ সৃষ্টির অধিকারগত অর্থাৎ লীলার। জপতপ ক'রে মন্ত্রতন্ত্র আউড়িয়ে হয়তো কৃচ্ছ্রসাধক যথানিয়মে ভবসমুদ্র পার হোতে পারে, কিন্তু যে সরল ভক্তির মানুষ বলে, ভজন পূজন জানি নে মা জানি তোমাকেই, সেই হয়তো জিতে যায়। সে আইনকে ডিঙিয়ে গিয়ে মানে লীলাকে, ইচ্ছাকে,—সেই বলে ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, সে বলে সকলের উপরে আছেন যিনি, তিনি নিজে হতে যাকে বেছে নেন তার আর ভাবনা নেই। যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সেই সকলের উপরওয়ালা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। এই আনন্দ যখন রূপ নেয় তখন সেই রূপেই তার সত্যতার প্রমাণ হয়, আইনকর্তার দণ্ডবিধিতে নয়। উড়ুক্কু পাখির পালকওয়ালা ডানা থাকে জানি, কিন্তু সৃষ্টির বড়ো খেয়ালির মর্জি অনুসারে বাদুড়ের পালক নেই—শ্রেণীবিভাগওয়ালা তাকে যে শ্রেণীভুক্ত ক'রে যে নামই দিন সে উড়বেই। প্রাণী বিজ্ঞানের কোঠায় তিমিকে মাছ নাই বলা গেল আসল কথা হচ্ছে সে জলে ডুব সাঁতার দিয়ে বেড়াবেই। অন্যান্য লক্ষণ অনুসারে তার ডাঙায় থাকাই উচিত ছিল কিন্তু সে থাকেনি, সে জলেই রয়ে গেল। সৃষ্টিতে এমন অনেক অভাব্য ভাবিত হয়ে থাকে, হয় না জড়ের কারখানায়। কথা ও সুরে মিলে যদি সুসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেটা হয়েছে ব'লেই তার আদর, সেই হওয়ার গৌরবেই সৃষ্টির গৌরব। এই মিলিত সৃষ্টিতে যে রস পাই তর্কের দ্বারা তাকে যে যা বলে বলুক সেটা বাহ্য, কিন্তু সৃষ্টির খাতির উড়িয়ে দিয়ে তর্কের খাতিরে যারা ব'লে বসে রসই পেলুম না এমনতরো অভ্যাসগ্রস্ত আড়ষ্টবোধসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই, কী সাহিত্যে,

কী সংগীতে, কী শিল্পকলায়। অভ্যাসের মোহ থেকে, আইনের পীড়ন থেকে তারা মুক্তিলাভ করুক এই কামনা করি কিন্তু সেই মুক্তি হবে, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

তেলে জলে যেমন মেলে না কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয়—মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না—কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই। এই আসক্তি একটি শক্তিবিশেষ, বিশ্ববিধাতার দৃষ্টান্তে গুণীরাও এই প্রবল শক্তিকে সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দেন—এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই শক্তি মনকে বিচলিত ক'রে তোলে। এর থেকেই উদ্ভূত হয় বিশ্বের সব চেয়ে প্রবল রস, যাকে বলে আদিরস। এই যুগলমিলন-জাতীয় সৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর কি না হিন্দুস্থানী কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে তার বিচার চলবে না, তার বিচার তার নিজেরই অন্তর্গূঢ় বিশেষ আদর্শের উপর। মাদুরার মন্দিরে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের প্রভূত তানমানসম্পন্ন যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই তারই নিরন্তর পুনরাবৃত্তিতেই স্থাপত্যসাধনার চরম উৎকর্ষে নিয়ে যাবে তা বলতে পারি নে, তার চেয়ে অনেক সহজ সরল শুচি আদর্শ আছে যার বাহুল্যবর্জিত শুভ্র সংযত রূপ হৃদয়ের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে একখানি গীতিকাব্যেরই মতো। যেমন চিস্তির শ্বেতমর্মরের সমাধিমন্দির। মাদুরার মতো তার মধ্যে বারংবার তানের উৎক্ষেপবিক্ষেপ নেই ব'লেই তাকে নিচের শ্রেণীতে ফেলতে পারব না। আনন্দ সম্ভোগ করবার সহজ মন নিয়ে কৃত্রিম কৌলীন্যের মেলবন্ধন না মেনে সৃষ্টির রসবৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে নিতে দোষ কী।

রসসৃষ্টির রাজ্যে যাদের মনের বিহার তাদের মুশকিল এই যে, "রসস্য নিবেদন"টা রুচির উপর নির্ভর করে, সেই রুচি তৈরি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অভ্যাসের উপর। এই কারণে শ্রেণীবিচার সহজ, রসবিচার সহজ নয়।

নিয়তি নিয়মকে রক্ষা করবার খবরদারিতে বাঁধা পথে বারংবার ষ্টীম রোলার চালায়, ইতিমধ্যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ঝরনাকে বইয়ে দিতে থাকেন তারই স্বকীয় গতিবেগের বিচিত্র শাখায়িত পথে—এই পথে কথার ধারা একলা যাত্রা করে, সুরের ধারাও নিজের শাখা ধ'রে চলে, আবার সুর ও কথার স্রোত মিলেও যায়। এই মিলে এবং অমিলে দুয়েতেই রসের প্রবাহ—এর মধ্যে যাঁরা কম্যুনাল

বিচ্ছেদ প্রচার করেন, সেই শ্রেণীমাহাত্ম্যের ধ্বজাধারীদেরকে সৃষ্টিবাধাজনক শান্তিভঙ্গের উৎপাত থেকে নিরস্ত হোতে অনুরোধ করি। ইতি—৮।১০।৩৭

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এত বড়ো চিঠি লিখে ভাঙা শরীরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। কিন্তু রোগদৌর্বল্যের আঘাতের চেয়েও বড়ো আঘাত আছে, তাই থাকতে পারলুম না। কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়, উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে; রসসৃষ্টিতে এদের পরিণয়কে হেয় করতে হবে যেহেতু সাংগীতিক মনুসংহিতায় এ'কে অসবর্ণ বিবাহ বলে, আমার মতো মুক্তিকামী এটা সইতে পারে না। সংগীতে চিরকুমারদের আমি সম্মান করি যেখানে সম্মানের তারা যোগ্য, কিন্তু কুমার কুমারীদের সুন্দর রকম মিলন হোলে আনন্দ করতে আমার বাধে না। বিবাহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে শক্তি হ্রাস করে একথা সত্য হোতেও পারে, না হোতেও পারে, এমন হোতেও পারে একরকম শক্তিকে সংযত করে, আর একরকম শক্তিকে পূর্ণতা দেয়।

* শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

"নিতুই নব"

নিত্য তোমা দেখিতেছি নিত্য নব অভিনব রূপে
প্রতিদিন মনে হয়, হেন রূপ কখনো দেখিনি
এই বুঝি দেখিনু প্রথম।
আমার যৌবন-বন উজলিয়া পূর্ণিমা নিশীথে
ফুটায়ে কুসুম রাশি মধু গন্ধে ভরি দশদিশি
মন্দানিলে নব আবির্ভাব,
এই বুঝি প্রথম তোমার।
এতদিন এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম একেলা বসি।
একান্তে কেটেছে রাত্রি, অন্ধকার রাত্রির বাসর
একেলা জেগেছি আমি বনোপান্তে স্তব্ধ নিরালায়।

তারার প্রদীপ জ্বালি আকাশের রুচির ডালায়
সন্ধ্যারাণী নামিয়াছে,
শুকতারা-দীপ্ত-দীপে কী সে রূপ অনবগুণ্ঠিত ;
অপসারি কুজ্ঝটিকা তুমিও কি আসিলে সুন্দরী
বালার্ক কিরণ রেখা উদ্ভাসিত শারদ প্রভাতে ?
সেই কি তোমার রূপ ?
সলজ্জিত দৃষ্টিপাতে তুমিই কি ডাকিলে আমারে
মৌন ধ্যান ভাঙ্গিল আমার ?
মনের কল্পনা দিয়ে গড়েছিনু যে রূপ-কুমারী
সেই এসে দিল ধরা
বসন্তের চঞ্চল ইঙ্গিতে ?
বেলা চামেলির গন্ধে সুরভিত শিথিল অঞ্চল।

আবার দেখিনু ঘন মেঘময়ী গম্ভীর মূরতি
ক্ষণ বিদ্যুতের শিখা ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জ্বলে
ক্ষণে নিভে যায়—
সে রূপও যে চিত্তবিমোহিণী
সে রূপও তোমার রূপ, মেঘছায়া সঞ্চারিণী মায়া।
উদয় তারার সাথে এসেছিলে, আসিলে সন্ধ্যায়
দীপ্তদীপালোকে তব চেলাঞ্চলে তরঙ্গ রূপের,
আলোছায়া দোলনায় শ্যামাঙ্গিনী করিলে যে খেলা,
নিশীথ রাত্রির সখী—কমনীয়া কামিনী সুন্দরী
মদির নয়নে মাখা সুন্দরের অতনু মহিমা
কি সুন্দর আহা মরি মরি !
দিনে দিনে রূপময়ী পলে পলে সুন্দরী মোহিনী
তিলে তিলে প্রস্ফুটিত তনু দেহে সৌন্দর্য্য তোমার
যেন তুমি নবীনা কিশোরী—
জাগালে আমার দেহে নোতুনের নব শিহরণ
তোমা পানে যত চাহি, দেখি তুমি নিতুই নবীনা।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অব্যক্ত

বোবা সমুদ্র আছ্‌ড়ে পড়ে কী যেন বল্‌তে চায়,
কী যেন বল্‌তে চায়
আদিম রহস্যে ভারি ঐ কালো মেঘ।

বকেদে'র ঝিলমিলে হাতছানি
আর জেলে ডিঙ্গির আব্‌ছা ইসারা
দিগন্তের প্রান্তে।

অজানার মোহ—
রক্ত দুলে ওঠে
টলে ওঠে বুদ্ধির বাঁধ।

শুনতে পাই আজ অব্যক্ত মর্ম্মর
সেই শাশ্বত রহস্যের ;
তবু বুঝিনে' কিছু,
রাত কেটে যায়—
আব্‌ছা বোবা রাত।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতপথে

(৭)

ব্রিজ-পার্টি তেমন সুবিধার হোলো না, অর্থাৎ সুবিধার পার্টি বলতে মিসেস মূর ও মিস কেষ্টেড্ যা বুঝতেন, ঠিক তেমনটি নয়। তাঁদেরই জন্যে এই পার্টি, তাই একটু সকাল সকাল তাঁরা এসেছিলেন, কিন্তু এদেশী যত অতিথি তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন আরো আগে, আর এসে সব চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন টেনিস খেলার মাঠের একপ্রান্তে জড় হ'য়ে। টার্টন-গিন্নি বললেন, "এই সবে পাঁচটা। একটু পরেই উনি আফিশ থেকে এসে পার্টি আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমাদের কি যে করতে হবে কিছুই জানি না। ক্লাবে এই প্রথম এই রকম পার্টি আমরা দিচ্ছি। আচ্ছা, মিষ্টার হিস্‌লপ্, আমি ম'রে ট'রে গেলে আপনিও কি এই রকম সব পার্টি দেবেন? বাবা! সাবেকি বড় সাহেবরা এর নামে পরলোকেও চমকে উঠবেন।"

রনি খুব সমীহ করে একটু হাসল, তারপর মিস্ কেষ্টেডের দিকে ফিরে বল্‌ল, "আপনিই তো চেয়েছিলেন শুধু দেখতে জমকালো এমন কিছু না হয়, আমরাও সেইরকম ব্যবস্থা করেছি। মাথার হ্যাট্, পায়ে 'স্প্যাট', আর্য্য ভাইদের এখন লাগছে কেমন?"

মিস কেষ্টেড্ বা রনির মা কেউ একথার জবাব দিলেন না। ম্লান মুখে তাঁরা টেনিস খেলার মাঠের ওপার তাকিয়ে ছিলেন। না, দেখতে জমকালো একেবারেই না। এ যেন প্রাচী তার রাজসিক সমারোহ ত্যাগ করে গভীর এক উপত্যকায় অবরোহণ করছে, তার অপর প্রান্ত মানুষের দৃষ্টির বহির্ভূত।

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আগাগোড়া সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পঃ সঃ

"আসল কথা এই মনে রাখতে হবে এখানে যারা এসেছে তারা সবাই বাজে লোক, যারা বাজে নয় তারা কেউ এসব পার্টিতে আসে না। কি বলেন, মিসেস্ টার্টন ?"

"একেবারে খাঁটি কথা।" ঈষৎ পিছনে হেলে পরম মহিমাময়ী টার্টন-গিন্নি এই জবাব দিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে তিনি নিজেকে 'বাঁচিয়ে' চলছিলেন, আসন্ন অপরাহ্ণের বা আগামী সপ্তাহের কোনো ব্যাপারের জন্যে নয়, কিন্তু কবে কোন্ লাটবেলাট আবির্ভূত হবেন আর তখন হবে তাঁর সত্যিকারের শক্তিপরীক্ষা—সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যাপারে তিনি এইভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেন।

রনি তাঁর অনুমোদনে আশ্বস্ত হয়ে ব'লে চল্‌ল, "যদি গণ্ডগোল কিছু বাধে, এই সব শিক্ষিত ভারতবাসীদের দিয়ে আমাদের কোনোই উপকার হবে না। ওদের তোয়াজ করা পণ্ডশ্রম, তাই বলছিলাম ওরা বাজে লোক। যাদের দেখছেন এদের বেশির ভাগ মনে মনে রাজদ্রোহী আর বাদ বাকি কাপুরুষ। তবে চাষী—তার কথা আলাদা। আর মানুষ যদি বলো তো পাঠান। কিন্তু এই লোক-গুলো—এদের দেখে ভাববেন না যেন ভারতবর্ষ দেখছেন।" এই ব'লে আঙুল দিয়ে রনি দেখিয়ে দিল টেনিস কোর্টের ওধারে কালো কালো লোকের সার; তাদের কেউ চশমাটা একবার ঠিক করে নিচ্ছে, কেউ একবার জুতো খস্‌খস্ করছে, যেন ওর মনের ভাব তারা ঠিক ধরতে পেরেছে। কুষ্ঠ মহামারীর মতন বিলিতি পোষাক এদের উপর ভর করেছিল। পুরো-পুরি বাবু হয়েছিল এমন লোক ছিল অল্প, কিন্তু এমন একটিও ছিল না যাকে এই রোগের ছোঁয়াচ লাগে নি। রনির কথা শেষ হ'তে মাঠের দুধারে কারও মুখে আর একটি কথা ছিল না। ইংরেজদের দলে ক'টি মেম এসে জুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মুখের কথা আরম্ভ হ'তে না হ'তেই যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল। মাথার উপর উড়ছিল ক'টা চিল—একেবারে পক্ষপাতশূন্য; চিলগুলোর উপর ছিল প্রকাণ্ড একটা শকুনি, আর সব চেয়ে পক্ষপাতশূন্য আর সবার উপর ছিল আকাশ, রঙ খুব গাঢ় নয়, কিন্তু জ্বলজ্বলে আভা, আর তার সমগ্র বিপুল পরিবেশ থেকে উপচে পড়ছিল আলো। মনে হয় না কিন্তু যে আকাশ একেবারে সবার উপর, আকাশেরও বাড়া কি কিছু নাই, যা আকাশের চেয়েও পক্ষপাতশূন্য ? আর তারও উপরে…

কাজিন কেটের কথা হচ্ছিল। জীবন সম্বন্ধে ওদের যা মতামত ওদের চেষ্টা ছিল রঙ্গমঞ্চে তাই ফুটিয়ে তোলা, আর ওরা যে-মধ্যবিত্ত ইংরেজ-সমাজের অন্তর্গত ঠিক সেই ভাবে নিজেদের জাহির করা। পরের বছর আর একটা কিছু করা যাবে—কোয়ালিটি ষ্ট্রীট্ বা ইওমেন্ অফ্ দি গার্ড। বছরে এই একবার বাদে সাহিত্যের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ছিল না। কেন না পুরুষদের ছিল সময়াভাব আর মেয়েরা পুরুষদের বাদ দিয়ে কিছু করত না। শিল্পকলা সম্বন্ধে ওদের অজ্ঞতার অন্ত ছিল না, আবার পরস্পরের কাছে জাঁক ক'রে তা বলা হ'ত। বিলিতি পাবলিক স্কুলের এই হোলো ধারা; কিন্তু বিলেতের চাইতে এদেশেই তার জোর বেশি। ইণ্ডিয়ানদের কথা বলা মানে চাকরির কথা বলা, আর শিল্পকলার কথা উত্থাপন হোলো রুচিবিরুদ্ধ; তাই রনির মা তাকে তার ভায়োলা বাজনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে তাড়াতাড়ি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল—ভায়োলা একটা ব্যসন বিশেষ, ভদ্রসমাজে আলোচনার যোগ্য জিনিষ একেবারেই নয়। রনির মা বেশ লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর ছেলের মতামত কি রকম গতানুগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কি রকম সে সবার মন জুগিয়ে চলত। ইতিপূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে কাজিন কেট্ দেখে রনি যাচ্ছেতাই বলেছিল আর এখন, পাছে কারও মনে লাগে, তাই সে কাজিন কেটের তারিফ করত।

স্থানীয় সংবাদপত্রে অভিনয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছিল; মিসেস লেসলির মতে কোনো ইংরেজের পক্ষে এরকম লেখা ছিল অসম্ভব। নাটকটির সুখ্যাতি করা হয়েছিল, মোটামুটি পরিচালক ও অভিনেতাদেরও, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কটি কথাও ছিল: "যদিও মিস ডেরেককে তাঁর ভূমিকার বেশ ভালোই মানিয়েছিল, কিন্তু মনে হোলো তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাই, আর মাঝে মাঝে তিনি কথা ভুলে যাচ্ছিলেন।" এইটুকুমাত্র সত্যিকারের সমালোচনা, কিন্তু এতেই মিস ডেরেকের বন্ধুরা খাপ্পা হ'য়ে উঠেছিলেন। অবশ্য মিস ডেরেক কিছুই মনে করেন নি—কেন না তিনি ছিলেন নিতান্ত কাঠখোট্টা। কিন্তু যাই হোক, তিনি চন্দ্রপুরের লোক নয়। দিন পোনেরোর জন্যে বেড়াতে এসে পুলিশ বিভাগের ম্যাকব্রাইডদের বাড়ি উঠেছিলেন, আর একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে লোক না জোটায় অভিনয়ে নামতে রাজি হয়েছিলেন—কি চমৎকার ধারণা তিনি নিয়ে যাবেন চন্দ্রপুরের লোকদের আতিথ্য সম্বন্ধে!

(৮)

কালেক্টার সাহেব স্ত্রীর কাঁধে হাতের ছড়িটা ছুঁইয়ে বললেন, "মেরি, এবার কাজে লাগো, আর কেন?"

ধড়ফড় ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে টার্টন-গিন্নি বল্লেন, "কি করাতে চাও আমাকে দিয়ে? ও, ঐ যেসব পর্দ্দানসিন মেয়েরা আছে! ভাবি নি ওরা কেউ আসবে। গেরো!"

খেলার মাঠের তৃতীয় এক প্রান্তে এক মণ্ডপের কাছে কয়েকটি এদেশী মেয়ে জড় হয়েছিল, আর তাদের মধ্যে যারা একটু লাজুক তারা ইতিপূর্ব্বেই একেবারে মণ্ডপটির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। বাদ বাকি মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল অন্য সকলের দিকে পিছন ফিরে, একগাদা ঝোপঝাপের মধ্যে প্রায় মুখ গুঁজে। একটু দূরে তাদের পুরুষ আত্মীয় স্বজনেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের এই অভিযান লক্ষ্য করছিল। দেখবার মতন ব্যাপার বটে, স্রোতে ভাঁটা পড়ায় যেন জলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে এক দ্বীপ, ক্রমশ তার আয়তন যাবে বেড়ে।

"ওদেরই উচিত আমার কাছে আসা।"

"মেরি, এস না, চুকিয়ে দাও।"

"নবাব বাহাদুর ছাড়া আর কোনো ছেলের সঙ্গে আমি হ্যাণ্ডসেক টেক করতে পারব না বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

"এ পর্য্যন্ত কার সঙ্গেই বা আমরা করেছি?" তারপর ভিঁড়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টার্টন সাহেব বললেন, "হুঁ, ঠিক যা ভেবেছি। ঐ লোকটি এসেছে কেন তাতো বোঝাই যাচ্ছে—সেই কনট্রাক্টের ব্যাপার, আর ঐ লোকটি চায় মহরমের জন্য আমাকে হাতে রাখতে, আর ঐ সেই গণৎকার, মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ি তৈরির আইন ফাঁকি দেওয়ার মৎলব, আর ঐ সেই পার্শি, আর ঐ লোকটি—দ্যাখো, দ্যাখো, আর একজনের কাণ্ড—একেবারে ফুলগাছের উপরে গিয়ে যে হাজির—ডান দিকের লাগাম টানতে গিয়ে বাঁ দিকেরটা টেনে বসেছে—যা ঘটে থাকে।"

মিসেস টার্টন বললেন, "ওদের ভিতরে গাড়ি নিয়ে আসতে দেওয়াই উচিত

হয় নি।" মিস কেষ্টেড্ ও একটি সারমেয় সমভিব্যাহারে মিসেস্ মূর বাগানের ঐ মণ্ডপটির দিকে অবশেষে অগ্রসর হ'তে সুরু করেছিলেন। "কেন যে ওরা আসে বুঝি না। আমাদের যেমন খারাপ লাগে ওদেরও ঠিক তেমনি। মিসেস্ ম্যাকব্রাইড্‌কে জিজ্ঞাসা করুন না, ডাক্তার সাহেবের তাড়নায় পরদা-পার্টি দিতে দিতে তিনি শেষকালে বেঁকে বসলেন।"

মিস কেষ্টেড্ তাঁর ভুল শুধরে বললেন, "কিন্তু এটা তো পর্দ্দা-পার্টি নয়।"

উদ্ধত কণ্ঠে জবাব এল, "তাই নাকি?"

মিসেস্ মূর জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, এই মেয়েরা সব কারা, বলুন না।"

"যারাই হোক না কেন আপনার চাইতে এরা অনেক নিচু স্তরের তা ভুলবেন না যেন—এদেশে সবাই আপনার চেয়ে নিচু স্তরের, দু'একজন রাণীটানি ছাড়া, আর তারা হোলো সমান সমান।"

একটু এগিয়ে তিনি সবার সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক' ক'রে উর্দ্দুতে দু'একটি মিষ্টি কথা বললেন। উর্দ্দু তিনি একটু শিখেছিলেন—চাকরদের সঙ্গে কথা বলার মতন, ভদ্র বুলিটুলি কিছু জানতেন না, আর ক্রিয়াপদের বিদ্যে ছিল শুধু চাকরদের হুকুম করবার মতন। বক্তৃতা শেষ ক'রেই তিনি সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই তো আপনারা চেয়েছিলেন?"

"এঁদের বলুন না আমার খুব ইচ্ছে করে ওঁদের ভাষায় কথা কইতে, কিন্তু সবে এসেছি, তাই পারি না।"

ঐ মেয়েদের মধ্যে একজন ইংরাজিতে বললেন, "আপনাদের ভাষা আমরা একটু-আধটু হয় তো বলতে পারি।"

মিসেস্ টার্টন অমনি মন্তব্য ক'রে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য, উনি দেখছি আমাদের কথা বোঝেন।"

আর একটি মেয়ে ব'লে গেলেন, "ইষ্টবোর্ণ্, পিকাডিলি, হাইডপার্ক কর্ণার।"

"তাই বলুন, ওঁরা ইংরেজি বলতে পারেন।"

উদ্ভাসিত মুখে এডেলা বলল, "কি মজা! তাহ'লে তো এখন বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারি।"

"উনি প্যারিসের কথাও জানেন"—দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজন এই কথা বললেন।

"নিশ্চয় প্যারিস ওদের পথে পড়ে"—এমন ভাবে মিসেস্ টার্টন এই কথা বললেন যেন তিনি দেশান্তরগামী পাখীদের বর্ণনা করছেন। অতিথিদের মধ্যে অনেকে বিলিতি ভাবাপন্ন জানতে পারা মাত্র তিনি কি রকম গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলেন, পাছে ওরা বিলিতি আদর্শে ওঁকে বিচার করে এই ভয়ে।

দর্শকটি বললেন, "ঐ যে ছোটখাটো লোকটি, উনি আমার স্ত্রী, মিসেস্ ভট্টাচার্য্য। আর ঐ লম্বা—উনি হচ্ছেন আমার বোন—মিসেস্ দাশ।"

লম্বা ও বেঁটে দুইজন মহিলাই সাড়িটা একটু হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে মৃদু হাসলেন। তাঁদের ধরণধারণের মধ্যে কি রকম যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাব ছিল, যেন তাঁরা এমন একটা রীতি খুজছেন যা না দেশী না বিলিতি। মিসেস্ ভট্টাচার্য্যের স্বামী কথা বলার সময়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, কিন্তু অন্য ছেলেদের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে তাঁর কিছুমাত্র সঙ্কোচ হচ্ছিল না। সকলেরই এই অবস্থা, ঠিক কি করতে হবে কেউ যেন বুঝে উঠতে পারছে না, এক একবার ভয় পাচ্ছে তারপর আবার সামলে নিয়ে খিলখিল ক'রে হাসছে, যা কিছু কথা সবেতেই অদ্ভুত মুখভঙ্গী করছে, আর ঐ কুকুরটাকে দেখে একবার পালাচ্ছে আর একবার তাকে আদর করছে। মিস্ কেষ্টেড্ তো এই রকম সুযোগই চেয়েছিলেন, একদল বন্ধুভাবাপন্ন ভারতবাসী একবারে সম্মুখে উপস্থিত, তিনি বিধিমত চেষ্টা করছিলেন যাতে তারা মন খুলে কথাবার্ত্তা বলে। বৃথা চেষ্টা—ওদের ভদ্রতার নিরেট দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বারবার ফিরে আসছিল ওঁর কথার প্রতিধ্বনি। যা কিছু বলেন ফলে শুধু হয় একটা অস্পষ্ট প্রতিবাদের গুঞ্জন, একবার তাঁর হাতের রুমাল মাটিতে পড়ে যেতেই এই গুঞ্জন পরিণত হোলো একটা ব্যস্ততার সাড়ায়। ওরা কি ক'রে দেখবার জন্যে তিনি কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ রইলেন, তেমনি চুপচাপ রইল ওরা। মিসেস্ মূরের অবস্থাও তথৈবচ। নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিসেস্ টার্টন দেখছিলেন এঁদের অবস্থা। প্রথম থেকেই তো তিনি জানতেন ব্যাপারটা একেবারেই ভুয়ো।

বিদায় নেবার সময় মিসেস্ মূর হঠাৎ উচ্ছ্বাসভরে মিসেস্ ভট্টাচার্য্যকে ডেকে বললেন, "আচ্ছা, আপনার ওখানে একদিন যদি যাই, সুবিধা হবে তো?" মিসেস্ ভট্টাচার্য্যের মুখ ওঁর বড় পছন্দ হয়েছিল।

মধুর হেসে মিসেস্ ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে?"

"যেদিন সুবিধা।"

"রোজই সুবিধা।"

"বৃহস্পতিবার।"

"নিশ্চয়।"

"আমাদের খুব ভালো লাগবে, সত্যি, কি মজা! আচ্ছা, কোন সময়ে?"

"যে-কোনো সময়ে।"

"কোন সময়ে হ'লে আপনার সুবিধা? নতুন এদেশে এসেছি, কোন সময়ে আপনাদের বাড়ি লোকজন আসে তা তো জানি না।"—মিস্ কেষ্টেড্ এই কথা বললেন।

কিন্তু মিসেস্ ভট্টাচার্য্যও তা জানেন ব'লে মনে হোলো না। যেন এই ভাব যে যবে থেকে পৃথিবীতে বৃহস্পতিবারের সুরু, তিনি ধ'রে রেখেছেন যে কোনো না কোনো সপ্তাহে ঐ দিনে ইংরেজ মহিলা-অতিথি আসবেন তাঁর বাড়িতে—তাই ঐ দিনে তিনি সব সময়ে বাড়ি থাকতেন। সবেতেই তিনি খুসি, কিছুই তাঁর অদ্ভুত লাগে না। হঠাৎ তিনি বললেন, "আমরা আজই কলকাতা যাচ্ছি।"

প্রথমটা এই কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে এডেলা বল্ল, "তাই নাকি?" তারপর হঠাৎ সে ব'লে উঠল, "তাহলে যে আমরা গিয়ে দেখব আপনারা বাড়ি নেই।"

মিসেস্ ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু দূর থেকে তাঁর স্বামী ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় আসবেন কিন্তু বৃহস্পতিবার।"

"কিন্তু আপনারা তো কলকাতায় থাকবেন।"

"না, না, এখানেই থাকব।" তারপর তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে বাংলায় কি ব'লে—"বৃহস্পতিবার কিন্তু আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।"

মিসেস্ ভট্টাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত বল্লেন, "বৃহস্পতিবার..." মিসেস মূর তখন না বলে পারলেন না—"আপনারা আমাদের জন্য কলকাতায় যাওয়া পিছিয়ে দিলে কিন্তু ভয়ানক অন্যায় হবে।"

হাসতে হাসতে ভট্টাচার্য্য ম'শয় জবাব দিলেন—"না কখনই না, আমরা ওরকম লোক নয়।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাই করছেন। সত্যি, করবেন না—আমার কি রকম যে খারাপ লাগছে বলতে পারি না।"

সবাই ততক্ষণ হাসতে সুরু করেছিল, তবে তাঁরা যে একটা বেসামাল কাজ করেছেন এমন কোনো ঈঙ্গিত এর মধ্যে ছিল না। এলোমেলো রকমের আলোচনা সুরু হোলো, সেই সুযোগে আপন মনে হাসতে হাসতে টার্টন-গিন্নি দিলেন চম্পট। শেষ পর্য্যন্ত রফা হোলো যে তাঁরা বৃহস্পতিবারই আসবেন, কিন্তু সকাল সকাল, যাতে ভট্টাচার্য্যদের আগেকার ব্যবস্থার যতটা সম্ভব কম নড়চড় হয়, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওঁদের আনতে গাড়ি পাঠাবেন, তার সঙ্গে চাকর থাকবে, পথ দেখাবার জন্য। কিন্তু ওঁরা কোথায় থাকেন তা কি উনি জানেন? অবশ্য, সবই জানেন, ব'লে আবার উনি হাসলে। তারপর সবার মুখের হাসি আর মিষ্টি সম্ভাষণ কুড়িয়ে ওঁরা নিলেন বিদায়। মণ্ডপের মধ্যে ছিল তিনটি মেয়ে, এপর্য্যন্ত এদিকে তারা ঘেঁসে নি, হঠাৎ তিনটি ঝকমকে রঙীন পাখীর মতন দমকা বেরিয়ে এসে তারা ওঁদের সেলাম করল।

ইতিমধ্যে কালেক্টার সাহেবও ঘুরে ঘুরে আলাপ পরিচয় ও মাঝে মাঝে দুএকটি রসিকতা করছিলেন, আর সবাই উচ্চৈস্বরে তা তারিফ করছিল। কিন্তু তাঁর অতিথিদের প্রায় প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটা না একটা খারাপ কিছু তিনি জানতেন, তাই এ কাজে তাঁর বিশেষ গা ছিল না। যারা ওদের মধ্যে জোচ্চোর নয় তাদেরও একটা কিছু গলদ আছে—নেশা বা স্ত্রীলোক বা আরো খারাপ কিছু, আর ওরই মধ্যে যারা ভালো তারাও চায় ওঁর কাছে থেকে কিছু আদায় করে নিতে। তবু, 'ব্রিজ-পার্টিতে' ফলে মোটের উপর উপকারই হয়, এই ছিল ওঁর বিশ্বাস, না হলে উনি পার্টি দিতেনই না। কিন্তু তাই ব'লে বড় রকম একটা কিছু হবে এরকম প্রত্যাশা উনি করতেন না। যাহোক, যথাসময়ে উনি মাঠের ওপারে নিজেদের দলে গিয়ে ভিড়লেন আর এ পক্ষে বিবিধ জনের মনে হোলো বিবিধ রকমের ভাব। অনেকে, বিশেষ যারা একটু নিচু স্তরের আর বিলেতি চাল যাদের কম, তাদের মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গিয়েছিল। স্বয়ং হাকিম সাহেব এসে

তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন—এ তো চিরকাল মনে রাখার মতন জিনিষ। কিছু হোক বা না হোক, দাঁড়িয়ে আছে তো তারা দাঁড়িয়েই আছে—অবশেষে সাতটার সময়ে তাদের বিদায় করে দিতে হোলো। আরো অনেকের মনে কৃতজ্ঞতা যে হয়নি তা নয় কিন্তু তার মধ্যে একটু বাচবিচার ছিল।

আর নবাব বাহাদুর—নিজের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন, খাতির ক্বাতিরের ধার তিনি ধারতেন না, কিন্তু তবু এই নিমন্ত্রণের মধ্যে যে সহৃদয়তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মনকে তা স্পর্শ না ক'রে পারে নি। কেন না, তিনি জানতেন কত বাধা কাটিয়ে এই রকম একটি ব্যাপার হ'তে পারে। কালেক্টার সাহেব যে তাদের সঙ্গে বেশ ভালোই ব্যবহার করেছেন একথা হামিদুল্লারও মনে হয়েছিল।

কিন্তু মামুদ আলির মতন কেউ কেউ জিনিষটাকে দেখেছিল খুব সন্দেহের চোখে। তাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে টার্টন সাহেব পার্টি দিয়েছিলেন শুধু উপরওয়ালাদের চাপে আর তাই ভিতরে ভিতরে সারাক্ষণ তিনি দগ্ধে মরছিলেন। এই মতের ছোঁয়াচ লেগেছিল এমন অনেককে যারা এমনি হয় তো বেশ সহজভাবে জিনিষটাকে নিত। কিন্তু তবু মামুদ আলি ভাবছিল এসে ভালোই হয়েছে। তীর্থস্থানমাত্রই দেখতে লাগে ভালো, বিশেষত যেগুলি সচরাচর দেখার সৌভাগ্য ঘটে না। সাহেবদের ক্লাবের বিধিবিধান মামুদ আলির কাছে একটা মজার ব্যাপার—আরো মজার, পরে বন্ধুবান্ধবের কাছে রঙ চড়িয়ে তার বর্ণনা।

এই পার্টি-সংক্রান্ত কর্ত্তব্যসম্পাদনে সরকারি কর্ম্মচারীদের মধ্যে টার্টন সাহেবের পরেই স্থান দিতে হয় গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্‌সিপাল মিষ্টার ফিলডিংকে। জেলা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই অল্প, আরও অল্প জেলার অধিবাসীদের সম্বন্ধে, তাই তাঁর মন টার্টন সাহেবের মতন সকলের সম্বন্ধেই সন্দেহে ভরা ছিল না। এই সদানন্দ লোকটি এখানে ওখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়ে এমন সব বেসামাল কাজ করছিলেন যা ঢাকবার জন্যে তাঁর ছাত্রদের অভিভাবকেরা একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন, কেন না তিনি ছিলেন এদের বিশেষ প্রিয়পাত্র। খাবার সময় তিনি নিজেদের দলে না ভিড়ে খানিকটা ছোলা ভাজা খেয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেললেন। লোকের সঙ্গে আলাপে

বা খাওয়াতে তাঁর বাচবিচার ছিল না। দরকারি অদরকারি অনেক খবরই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে ইংল্যাণ্ড থেকে আগত মহিলা দুটি সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন আর মিসেস ভট্টাচার্য্যের বাড়ি তাঁরা যে যেতে চেয়েছিলেন তাতে তাঁদের সৌজন্যে শুধু তিনি নয় যে কেউ এ খবর শুনছিল সেই খুসি হয়েছিল। মিষ্টার ফিলডিংও খুসি হয়েছিলেন। মহিলা দুটিকে তিনি বিশেষ চিনতেন না, তবু ওঁদের ব্যবহারে সকলে কি রকম যে আনন্দ লেগেছে সে কথা ওঁদের জানাবেন ঠিক করলেন।

তরুণীটিকে তিনি একলা পেলেন। মনসার বেড়ার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মিস কেষ্টেড্ দূরে মারাবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—সূর্য্যাস্তের সময় মনে হত যেন এই পাহাড়গুলি এগিয়ে এসেছে, বোধহয় অনেকক্ষণ ধ'রে সূর্য্য অস্ত গেলে তারা একেবারে সহরের উপর এসে পড়ত, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্য্যাস্ত প্রায় চক্ষের নিমেষে ফুরিয়ে যায়। যাহোক, ফিলডিং সাহেব এঁর কাছে যে খবর দিতে এসেছিলেন তা দিলেন। শুনে তরুণীটি আনন্দে এরকম গদগদ হয়ে উঠলেন যে মিষ্টার ফিলডিং এঁদের দুজনকেই চায়ে নিমন্ত্রণ ক'রে ফেললেন।

"তা, আমার তো খুবই আসতে ইচ্ছা—আর বলতে পারি মিসেস মূরেরও তাই।"

"আমি প্রায় সন্ন্যাসী মানুষ, জানেন তো?"

"এরকম জায়গায় সন্ন্যাসী হওয়াই প্রশস্ত।"

"কাজ ফাজের জন্যে ক্লাবে টাবে আসা বেশি হয় না।"

"খুব জানি—আর আমরা আবার ক্লাব ছেড়ে কোথাও যাইনা। আপনি এদেশী লোকদের সঙ্গে এত বেশি থাকেন ব'লে হিংসা হয়।"

"দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়?"

"নিশ্চয়—খুব। আমি তো তাই চাই। আজকের এই পার্টি এমন বিশ্রী, সত্যি রাগ ধরে। মনে হয় এখানে আমার দেশের লোক যাঁরা আসেন একেবারে উন্মাদ। লোকদের ডেকে তারপর এরকম ব্যবহার—কি কাণ্ড বলুন তো? নিতান্ত যেটুকু ভদ্রতা নইলে নয় তাও করেছেন বোধহয় শুধু আপনি আর মিষ্টার

টার্টন আর বোধ হয় ম্যাকব্রাইড সাহেব। বাদবাকিদের ব্যবহারে সত্যি লজ্জা করে—আর ক্রমশ তা যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

(৯)

এই ফিলডিং সাহেব ভারতবর্ষের খর্পরে পড়েছিলেন হালে। বম্বের ভিক্‌টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনকে ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বার বলা যেতে পারে; সারা পৃথিবীতে খুঁজলেও বোধ হয় এমন অদ্ভুত প্রবেশদ্বার আর কোথাও মিলবে না। এই ভিক্‌টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে ফিলডিং সাহেব প্রথম পা দেন চল্লিশ পেরিয়ে। সেখানে এক সাহেব টিকিট ইন্‌স্‌পেক্‌টরের হাতে কিছু গুঁজে তার মালপত্র সব নিজের কামরাতেই তিনি তোলেন—এমনি ক'রে এই দেশে তাঁর ট্রেণে চড়ার সুরু। এই ট্রেণ-যাত্রা তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। সঙ্গী ছিল দুজন। একটি ছোকরা, তাঁরই মতন এদেশে প্রথম সে পা দিচ্ছে। আর একটি তাঁর সমবয়সী এক সাহেব—ভারতবর্ষের জলবায়ুতে পরিপক্ক। এই দুটির একটির সঙ্গেও তাঁর আদৌ মিল ছিল না। তিনি এত জায়গায় বেড়িয়েছিলেন ও এত লোক দেখেছিলেন যে প্রথমটির মতন থাকা বা দ্বিতীয়টির মতন হ'য়ে ওঠা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। কত কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল, কিন্তু সে সব মোটেই মামুলি ধরণের নয়। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জন্ম—এই ছিল তাঁর ধারা, যখন ভুল করতেন তখনও। ভারতবাসীদের ইটালি-বাসী ব'লে মনে করাটা খুব মারাত্মক ভুল নয়, মামুলি তো নয়ই। ফিলডিং সাহেব প্রায়ই ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখতেন ইতিহাস-বিশ্রুত ভূমধ্যসাগরের সলিলবিধৌত ক্ষুদ্রতর কিন্তু সুন্দরতর আর একটি দেশের।

মিষ্টার ফিলডিং-এর জীবন বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত হ'লেও তাতে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না; এমন কি উচ্ছন্নে যাওয়া ও তার জন্যে পরে অনুশোচনাও তাঁর অভিজ্ঞতায় বাদ যায় নি। কিন্তু এখন প্রবীণ বয়সের কাছাকাছি এসে তিনি বেশ একজন পাকাপোক্ত লোক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মেজাজ বেশ ভালোই,

বুদ্ধিশুদ্ধি ও যথেষ্ট ছিল, আর ছিল শিক্ষায় আস্থা। শিক্ষার পাত্র যেই হোক না কেন, তাতে তাঁর কিছু এসে যেত না ; বিলিতি পাবলিক স্কুলের ছাত্র—সম্ভ্রান্ত বংশের সব সন্তান, বা হাবাগঙ্গার দল, এমন কি পুলিশের লোক—অনেকেরই তিনি মাষ্টারি করেছিলেন। এর পর যদি ভারতবর্ষের লোকেরা আসে আসুক, ক্ষতি কি? বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় চন্দ্রপুরের ছোট কলেজটির প্রিনসিপ্যালগিরি তাঁর জুটে গেল, লাগলও ভালো, অতঃপর তিনি ধ'রে নিলেন যে খুব যোগ্যতার সঙ্গেই তিনি কাজ করছেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর পসার হলো ভালোই, কিন্তু স্বদেশের লোকেদের সঙ্গে যে-ব্যবধান তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন সেই ট্রেণের কামরায়, তা যেন ক্রমশই বেড়ে চল্‌ল। এর জন্যে বেচারি মনে ভারি দুঃখ পেতেন। প্রথমটা তিনি বুঝতে পারতেন না কোথায় ত্রুটি ঘটছে। তিনি যে স্বদেশভক্ত ছিলেন না তা নয়, ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ভালোই বনত, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলেই ইংরেজ। কিন্তু এদেশে তার অন্যথা কেন?

প্রকাণ্ড শরীর, নড়বড়ে হাত পা, নীল চোখ—লোকটিকে দেখলে প্রথমটা ভরসা ক'রে সবাই এগোতো। কিন্তু যেই ভদ্রলোক কথা কইতে সুরু করতেন অমনি লাগত খটকা ; মাষ্টারি পেশা, এমনিই অবিশ্বাস হয়, কথার ধরণে এই অবিশ্বাস ঘুচত না। ভারতবর্ষে এই আপদ—বুদ্ধিমান লোক—না থেকে উপায় নাই, কিন্তু যার কৃপায় এই আপদের বৃদ্ধি হয়—উচ্ছন্নে যাক্ সে! লোকের মনে দিনে দিনে এই ধারণা বদ্ধমূল হোল যে ফিলডিং একটি কালাপাহাড় বিশেষ। এর অবশ্য সঙ্গত কারণ ছিল, কেন না আইডিয়ার মতন সমাজের বাঁধ আর কিছুতে বাঁধে না—আর আইডিয়ার প্রবলতম শক্তি হয় আদান-প্রদানে, যাতে মিষ্টার ফিলডিং ছিলেন সিদ্ধ। অনুশীলন বা প্রচারের ধার তিনি ধারতেন না, পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে ভাবের আদান-প্রদানে তিনি সব চাইতে বেশি আনন্দ পেতেন। তাঁর মনে হোতো এই সংসার মানুষে-ভরা একটা ভূখণ্ড, সবাই সেখানে চেষ্টা করছে পরস্পরের লাগাল পেতে এবং এর প্রশস্ত উপায় মনের সদিচ্ছা আর তার সঙ্গে বুদ্ধি ও সংস্কৃতি। চন্দ্রপুরের মতন জায়গায় এই জাতীয় মত একেবারেই বেখাপ্পা, কিন্তু ফিলডিং সাহেব যে-বয়সে এসেছিলেন তাতে মত বদলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

জাতিবিদ্বেষ তাঁর মনে একেবারে ছিল না। এর কারণ এ নয় যে তিনি অন্য সাহেব সিভিলিয়ানদের থেকে উঁচু দরের লোক ছিলেন ; আসলে তিনি এমন আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন যেখানে সাম্প্রদায়িক ভাব মোটে আমল পায় না। সব চাইতে যে-কথায় ক্লাবে তাঁর কুনাম রটেছিল তা এই যে সাদা আদমিরা তো ঠিক সাদা নয়, আসলে মেটে-গোলাপি। কথাটা তিনি বলেছিলেন শুধু মজা করার জন্যে। "গড সেভ দি কিং" গানের সঙ্গে যেমন কোনো গডেরই সম্পর্ক নাই, 'সাদা' বলতেও তেমনি কোনো রং যে বোঝায় না, আর সত্যি কি বোঝায় তার আলোচনা যে অভদ্রতার চরম—একথা বেচারি মোটেই বুঝে উঠতে পারেননি। যে-'মেটে গোলাপী' মানুষটিকে লক্ষ্য করে তিনি এই কথা বলেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে লাগল ঘা, নিজেদের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ তাঁর চেতনা হোলো—দেখতে দেখতে এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়ল বাকি জাতভায়েদের মধ্যে।

কিন্তু তবু উদার হৃদয় ও বলিষ্ঠ দেহের জন্য সাহেবরা তাঁকে বরদাস্ত করত ; সত্যি বলতে কি তিনি যে খাঁটি সাহেব নন এই আবিষ্কার করেছিলেন মেমেরা। আদৌ তারা ওঁকে পছন্দ করত না। উনিও ফিরে তাকাতেন না মেমেদের দিকে। নারী-প্রগতির পীঠভূমি ইংল্যাণ্ডে এতে কেউ কিছু মন্তব্য করত না, কিন্তু এদেশের ইংরেজ সম্প্রদায়ের মেয়েরা চায় যে পুরুষরা হবে খুব আমোদে আর সর্ব্বদা তাদের সাহায্য করতে উৎসুক। মিষ্টার ফিলডিং ঘোড়া বা কুকুর সম্বন্ধে কাউকে পরামর্শ দিতেন না, কোথাও খানা খেতেন না, ঘোর দুপুরে লোকের বাড়ি হানা দিতেন না, কিম্বা বড়দিনের সময় গিন্নিদের সঙ্গে ছেলেপিলের জন্যে খেলনা সাজাতেন না। ক্লাবে যদি বা আসতেন তা শুধু টেনিস বা বিলিয়ার্ড খেলার জন্যে, খেলা সাঙ্গ হলেই করতেন প্রস্থান। সার কথা এই তিনি বুঝেছিলেন যে একদিকে সাহেব অপরদিকে ভারতবাসী—এই দুয়ের সঙ্গে মানিয়ে চলা যায়, কিন্তু এর উপর যদি মেমদের সঙ্গেও মানিয়ে চলতে হয়, তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গ ত্যাগ না ক'রে উপায় নাই, কিছুতে তা না হলে খাপ খায় না। কিন্তু এর জন্যে বা পরস্পরের নিন্দা করার জন্যে এদের কাউকে দোষ দেওয়া বৃথা। ভালো হোক মন্দ হোক, এই হোলো আসল ব্যাপার—তারপর যে-যাকে চাও পছন্দ ক'রে নাও।

অনেক ইংরেজই পছন্দ করতেন স্বজাতীয় মেয়েদের। এদেশে তাঁরা ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় আসতে সুরু করেছিলেন, ফলে ক্রমে এখানকার ঘরবাড়িও দিনে দিনে বিলিতি ছাঁদের হ'য়ে উঠছিল। কিন্তু ফিলডিং সাহেবের ভালো লাগ্‌ত ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশতে, এই ভালো লাগার মূল্য না দিয়ে উপায় কি? সাধারণত কোনো ইংরেজ মহিলা সরকারি নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ছাড়া কলেজের চৌকাঠ মাড়াতেন না। কিন্তু মিসেস্ মুর ও মিস্ কেষ্টেড্‌কে তিনি চায়ে ডেকেছিলেন এই কারণে যে তাঁরা নবাগতা, সব কিছু তাঁরা ভাসাভাসা হ'লেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবেন, আর তাঁর অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তাঁরা গলার স্বর বিকৃত করবেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

সমালোচনার আলোচনা

বাংলা দেশে সম্প্রতি ওস্তাদী গানের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ হয়েছে, 'পরিচয়ে' প্রকাশিত পৌষ ও মাঘের সংখ্যায় শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালের প্রবন্ধে তার তীব্রতা টের পাওয়া যায়। ওস্তাদদের নিজের পেশা নিয়ে যথেষ্ট খাটতে হয়, এইজন্যে বুদ্ধিমান হ'লেও কাগজে কথার প্যাঁচ সৃষ্টি করার পটুতা অধিকাংশ স্থলেই আয়ত্ত করার অবসর পান না। সুতরাং তাঁরা নির্ব্বিকার চিত্তে এগুলি শোনেন কিম্বা শোনেন না এবং গানবাজনা করতে থাকেন। এইটুকু তাঁরা বেশ বোঝেন যে ওস্তাদী গানের যথার্থ সমালোচনা কেবল ওস্তাদই করতে পারেন। আব্দুল করিম ওস্তাদদের 'ক্যারিকেচার' করতেন, ওস্তাদরা শুনত, কিছু শিখতও, কারণ করিম সাহেব নিজে ওস্তাদ ছিলেন। ওস্তাদী গানে ত্রুটি নেই তা নয়, কিন্তু তার সংশোধন করতে, মাত্র বিদ্রূপ ও নিন্দাই পর্য্যাপ্ত নয়। অন্তর্দৃষ্টি আসে সহানুভূতি ও সাধনা থেকে, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ না থাকলে পরিহাস একান্ত কটূক্তি হয়ে দেখা দেয়।

অমিয়নাথের দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ পড়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে ওস্তাদী গান—তার ধ্রুবপদের আলাপ, তার খেয়ালে অর্থশূন্য স্বরবিস্তার, শোরীর টপ্পার দুর্বোধ্য কথাযুক্ত রূপ তাঁর নিতান্ত মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। গায়কদের 'ধাপ্পাবাজী' ছাড়া এর যে একটা কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, এমন সন্দেহ তাঁর মনে কোথাও জাগে নি। এ ছাড়া এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যার স্বপক্ষে কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের উল্লেখ নেই, সুতরাং মনে হয় সেগুলি তাঁর মনগড়া বা ভুল বোঝার কারণে হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে অবান্তর কূটতর্কের অবতারণা হয়েছে, যার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ এবং যেগুলির নিজের মধ্যেই যথেষ্ট অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সর্ব্বোপরি এই অসঙ্গতিপূর্ণ প্রবন্ধে কিছু রসিকতা আছে এবং এগুলি যুক্তিহীন হলেও পাঠক যদি কিছু হাঁসবার খোরাক পেয়ে থাকেন, তাতেই তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠের সরস মজুরি পাবেন।

এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকতার অভাবে অমিয়নাথের নিজের বলবার ধারা যথাসম্ভব অনুসরণ করে আলোচনা আরম্ভ করা গেল।

১। সাধারণ মতামতের মূল্য।

জনসাধারণ যদি একমত হয় তাদের মত গ্রাহ্য, অবশ্য অমিয়নাথের সুবিধা অনুযায়ী। অর্থাৎ যখন তিলককামোদ রাগিণী (নং ২ দ্রষ্টব্য) তাদের সকলের ভাল লাগে, তাদের মত স্বীকার্য্য, কিন্তু সস্তা গানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের বেলা অন্যত্র দোষার্হ।

উদাহরণ :—"আমাদের দেশের একদল বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা এই শেষোক্ত একমত হওয়ারও কোনও মূল্য স্বীকার করেন না—অর্থাৎ জনসাধারণ, যাহারা রেখাব গান্ধার বুঝে না—তাহাদের আবার মতামত কি ?" (পৃঃ ৫৩৩) "মাইফেলে ভাল না লাগিলে রেডিওতে, তম্বুরার সহিত ভাল না লাগিলে pianoতে বা mandolin-এর সঙ্গে, একক ভাল না লাগিলে chorus, বা duet, না হয় নাচের সঙ্গে—ফল কথা, জনসাধারণের মন যখন যেদিকে যায় তখনই দিগদর্শনীর ইঙ্গিতে গানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সরল ভাষায় সেকালে শ্রোতাদিগের ছিল গরজ ; গায়ক ছিল নবাবতুল্য লোক। এবং আধুনিক যুগে—জনসাধারণই নবাবের মত খেয়ালী এবং গরজ হইয়াছে গায়কের।" (পৃঃ ৫৩৭)

রেখাব গান্ধার না জেনে মতামত দিলে দোষ নেই, কিন্তু কেউ যদি অমিয়নাথের সামনে এসে ওস্তাদী গানের কথা তোলেন, তাঁকে স্বরলিপির পরীক্ষায় ফেলে অপদস্থ করতে হবে।

উদাহরণ :—"কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময়ে আমাদের বৈঠকে এইরূপ একটি সমালোচক আসিয়াছিলেন। আমরা সকলেই গ্রাম্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি আমাদের কিছুক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের 'খেয়াল' প্রভৃতি শিক্ষার ইতিহাস, খেয়ালের ঘরবানার (সম্প্রদায়) উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচয় প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে আব্দুল করিম ওঁকারনাথ অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের গায়ক—অমুক অপেক্ষা অমুক নিম্নশ্রেণীর গায়ক ইত্যাদি। এই সময়ে আমার মনে হইল যে সমালোচক মহাশয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেরূপ তীক্ষ্ণ ইঁহার কান সেরূপ তৈয়ারী কিনা একবার পরীক্ষা করিলে মন্দ হইবে না। এই

ভাবিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম—মহাশয় আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক একটু আধটু গান করি। যাই হোক—আমি পুরিয়া রাগিণীর একটা তান করিতেছি—আপনি দেখুন ঠিক হয় কি না। তিনি অবশ্য আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। পুরিয়া রাগিণী অবলম্বন করিয়া একটি তান করিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে পুরিয়া রাগিণীর বর্জ্জনীয় যে সুর অর্থাৎ পঞ্চমকে লাগাইয়া তানটি করিলাম। একাদিক্রমে তিন চার বার শুনাইয়া তাঁহার উপদেশের প্রতীক্ষা করা গেল। তিনি বলিলেন উক্ত তানটি ঠিক হইয়াছে। তাঁহাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিলাম যে উহা নির্দ্দোষ। তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে—কলিকাতা অঞ্চলে আজকাল পুরিয়াতে পঞ্চম লাগান fashion হইয়াছে কিনা।" (পৃঃ ৫৩৭-৩৮)

ভদ্রলোকটি রাগের স্বরসংগতি নিয়ে কোন মন্তব্য করেছিলেন, উল্লিখিত ঘটনা থেকে তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং তাঁকে ঐ ভাবে অপ্রস্তুত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অমিয়নাথ নিজেকে ওস্তাদ বলেন না (আমরা বাঙ্গালী জনসাধারণ, classical music বুঝিবার শক্তি রাখি না—পৃঃ ৬৪৪) অথচ পুরিয়ার তান নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁকে নিয়ে ওস্তাদরা যদি পুরিয়া ও তার সহধর্ম্মী রাগগুলির বিস্তার ও তুলনামূলক আলোচনা করতে বলেন, তাঁর মনোভাব কি রকম হবে জানতে ইচ্ছে ক'রে। প্রসঙ্গতঃ উক্ত ঘটনায় পুরিয়া-রাগিণী অবলম্বন করে কিউপায়ে তিনি পুরিয়া রাগিণীর বর্জ্জনীয় পঞ্চম স্বর ব্যবহার করলেন তা বোঝা কঠিন, কারণ বর্জ্জনীয় স্বরের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে পুরিয়া-রাগিণী আর অবলম্বন করা যায় না।

আজকাল সঙ্গীতসংক্রান্ত মতামত সাহিত্যিক, ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক, দেশনেতা প্রভৃতি অনেকেই দিয়ে থাকেন। তাঁরা অধিকাংশই বিনয়ী, ব্যাকরণের তর্ক তোলেন না এবং যা বলেন তার মধ্যে অনেক সময় শিক্ষনীয়ও কিছু থাকে। সব বিষয়ের একটা সাধারণ দিক আছে এবং এ কারণে সঙ্গীতেরও আছে, এবং সে দিক থেকে বলবার অধিকারও সকলের আছে। কিন্তু যা জানা নেই বা যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এমন বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে বসলে পেশাদার তার গুরুত্ব দেবে না এবং উপেক্ষা করবে। জনসাধারণ অবশ্য ভুল পথে চালিত হতে পারে। তার হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে

য়ুরোপের মত ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ আলোচক মণ্ডলী গড়ে ওঠার প্রয়োজন হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সমাজ ভারতে গঠিত ও সংঘবদ্ধ হবে, এমন সূচনা দেখা যাচ্ছে।

২। মনোবিজ্ঞান ও সঙ্গীত—

"সাধারণ সম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে আমি এক একটি শ্লোক্ ইচ্ছামত স্বরযোজনা দ্বারা গান করিতে আরম্ভ করিব, কিন্তু যদি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ শ্লোকটি শুনিতে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আমাকে অন্যপ্রকার স্বরযোজনার সাহায্য লইতে হইবে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ শ্লোকটি সকলের ভাল লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বরযোজনার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।...ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তেওরার ছন্দে ধ্রুবপদের প্রণালী অবলম্বন করিয়া খাম্বাজ রাগিণীকে আহূত করা গেল। শ্রোতারা একমতে বলিলেন—ভাল লাগিল না (যতীন্দ্রবাবু স্বতন্ত্র)। ইহার পর বাহার রাগিণী সাহায্যে গান করা হইল। তাহাও ভাল লাগিল না। এইরূপ পরে পরে কেদারা, বেহাগ ও পঞ্চম রাগিণী সাহায্যে experiment করিয়াও একই ফল হইল। এই অবস্থায় অবশ্য আমি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং নিজের অক্ষমতার জন্য লজ্জিতও বোধ করিতেছিলাম ; মনে মনে যতীন্দ্রবাবুর মতেরই সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—হঠাৎ আর একটি রাগিণী মনে পড়িল। দেখা যাউক ইহা দ্বারা শ্রোতাদের মনস্তুষ্টি হয় কি না। সেই রাগিণী তিলক-কামোদ। যখন ইহার সাহায্যে ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি গান করিলাম তখন সকলের মধ্যেই একমত এবং সকলেরই খুব ভাল লাগিল এইরূপ মত শোনা গেল।...... ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি বলিতে আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, বোধ হয় খাম্বাজ, বাহার কি কেদারার সহিত তাহার সমন্বয় হয় না ; এবং তিলককামোদের (ঐ বিশিষ্ট স্বরযোজনার) সহিত হয়ত তাহার কোনও গূঢ় সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য আছে ;—না থাকিলে একসঙ্গে এতগুলি লোকের ভাল লাগে কিরূপে ?" (পৃঃ ৫৩৩-৩৪)

'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে' শ্লোকটি শুনলে যে ভাবের উদয় হয়, অমিয়নাথের মনে হয়েছে তিলককামোদের সঙ্গে তার কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে এবং তার প্রমাণ তিনি ভেবেছেন, একঘর লোকের একসঙ্গে ভাল লাগা। তিলককামোদে

শৃঙ্গাররসাত্মক গানই বেশী এবং সেগুলি যাদের ভাল লেগেছে এমন লোকের সংখ্যা কোটির কাছাকাছি পৌছবে। তাহলে এই দুই মতের সামঞ্জস্য কি করে হবে ? বালিগঞ্জে 'আলেয়া' সিনেমার সামনে দলে দলে লোক বসে মাইক্রোফোন সাহায্যে যে গ্রামোফোনের রেকর্ডগুলি শোনে, সেখানে একমতা-বলম্বী জনতা থেকে কি মেনে নিতে হবে যে প্রত্যেক রেকর্ডে কথার ভাবানুযায়ী সুর সন্নিবেশিত হয়েছে ?

এ প্রকার পরীক্ষা কি ভাবে করা হয় তার একটা ভাল পরিচয় অমিয়নাথ Effects of Music—Edited by Max Shoen (International Library of Psychology, Philosophy and Scientific method) বইতে পাবেন। এ পর্য্যন্ত এ সব পরীক্ষায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নি। আমার Problems of Hindustani Musicএ এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

আর একটি কথা এই সূত্রে মনে হয়—'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র' নিয়ে এ পরীক্ষা হল কেন ? গীতার শ্লোক রাগে গীত হতে এ পর্য্যন্ত শুনি নি, গীতা স্তোত্রের সুরেই পাঠ করা হয়। বাংলা গান নিয়ে কি ভাবানুযায়ী সুর নিরূপণ চলত না ? তারপর 'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে'র সঙ্গে তিলককামোদের সমন্বয় একটু অদ্ভুত ঠেকে না ? শ্রোতার এখানে যদি হাস্যরসের উদ্রেক হয় সেটা কি দোষণীয় বিবেচিত হবে ? অমিয়নাথ যদি গম্ভীর ভাবে এ জায়গাটা না লিখতেন, তাঁর অন্যান্য রসিকতার মধ্যে একে ধরায় খুব বাধা ছিল না।

৩। কূটতর্কের দৃষ্টান্ত।

(ক) "Classic কথাটি ইউরোপীয় সমালোচকদিগের একটি অর্থসমন্বিত শব্দ। গ্রীক্ রসশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ইউরোপীয় সমালোচকগণ যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই যে Classic বলিতে একটি বিশেষরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ধারা বুঝাইবে যাহার পরিকল্পনা সরল, রচনা (form) সরল এবং বিষয়নির্বিশেষে রচনাপ্রণালী একই নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী এবং ছন্দবিশিষ্ট হইবে এবং অলঙ্কার বর্জ্জনীয়। বিষয় ভিন্নরূপ হইলেও রচনা ও ছন্দ একটি বিশেষ শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকিবে। এই Classic-এর বিরুদ্ধে যে জন্মবিখ্যাত প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল যাহা Romanticism নামে ইউরোপীয় সমালোচকদিগের

নিকট পরিচিত তাহারই মূল কথা এই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বিষয়ে কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকিতে পারে না……একমাত্র ধ্রুবপদ গানের রচনাই (এমন কি হোরী ও ঝাঁপতালের গানও নহে) সঙ্গীত জগতে Classicism-এর দাবী করিতে পারে—কারণ Classic-এর নিয়মানুবর্ত্তিতা ইহার মধ্যে আছে ; রচনার সরলতা, প্রকাশে ও গতিতে গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কারের প্রতি ঔদাসীন্যও একমাত্র ধ্রুবপদ গানেই পাওয়া যায়।" পৃঃ ৫৪১-৪২

অমিয়নাথ Classic-এর মূল সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও বিশদ হত। এখানে ভঙ্গী, ছন্দ, অলঙ্কার বলতে কি ধরা হয়েছে বোঝা দুষ্কর। উদ্ধৃত অংশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে শুধু গ্রীক নয়, পরবর্ত্তী যুগের Classic-ও এর মধ্যে এসে পড়েছে। তাই যদি হয়, Shakespeare বা Dante-র লেখায় কি ধরে নিতে হবে যে একই ভঙ্গী ও ছন্দ বর্ত্তমান এবং অলঙ্কার সেখানে বর্জ্জিত হয়েছে? আমার মনে হয় Classic-এর অনুরূপ অর্থ করা উচিত "And of the real greatness and supremacy of other bodies of literature—of the Greek drama, for example, and the plays of Shakespeare, and the work of Dante and Milton — we have similar evidence almost as everwhelming. These works, then, so tried and so proved, we may accept as "classics" ; for a "classic" may be simply defined as a book which has stood the test of time, and by its stability and permanence, and the universality and persistency of its appeal, has given unmistakable assurance of immortal life"—The Study of Literature (Hudson), P. 411. Classical কথাটি ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে তার অর্থ এই যে বহুকাল ধরে এগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণ্য উচ্চসঙ্গীত হয়ে আছে। অমিয়নাথ কথাটি নিয়ে নানা পরিহাস করেছেন। আমার মনে হয় ইংরাজিতে এই অর্থে যদি সাধারণ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাতে কোন মারাত্মক পাপ স্পর্শায় না।

ধ্রুবপদ সম্বন্ধে অমিয়নাথ সর্ব্বত্র একটি সাংঘাতিক ভুল করে গিয়েছেন। শুধু গানটি গাইলে ধ্রুবপদ গাওয়া হয় না। তার সঙ্গে রাগের একটি আলাপ

সর্ব্বদাই প্রথমে যোগ করা হয়। আলাপে কিছু অলঙ্কার (অলঙ্কারের পারিভাষিক সাঙ্গীতিক অর্থ প্রাচীন শাস্ত্রে ভিন্ন) থাকেই। হোরী বা ধামার ধ্রুবপদ জাতীয় বলেই একাল পর্য্যন্ত জানা ছিল, অমিয়নাথ কেন অন্যমত পোষণ করেন বোঝা যায় না।

(খ) "কিন্তু লিখিত সমালোচনায় (বিশেষতঃ যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে পাঠকবর্গ লেখা পাঠ করিয়া তাহার অর্থ গ্রহণ করুন) একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা উচিত নহে। শব্দশাস্ত্র-বিদ পণ্ডিতগণ শব্দার্থের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিবার প্রারম্ভে সংক্ষেপতঃ তিনটি বিষয় আলোচনা করিতে বলেন। তাহা এই —যথা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, নৈতিক সার্থকতা এবং বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বলিতে বুঝায়, বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে কি না—অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রামাণ্য। সার্থকতার অর্থে—পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা যাহার প্রামাণিকতা বিচার হয়। এবং বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি অর্থে—ব্যাকরণগত বা অন্যপ্রকারে লব্ধ কিন্তু মাত্র একটি বিশিষ্ট অর্থ বা ভাবকে গ্রহণ করা বুঝায়। এই তিন প্রকারের প্রমাণ দ্বারা শব্দের যদি একই অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি ভিন্ন প্রকারের অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রকাশ হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকগণ সেই অর্থটি লইবেন যেটি একার্থ নির্দ্দেশক এবং বিশিষ্ট অভিধাসম্পন্ন। যেমন ইংরাজী ভাষায় matter কথাটির নানা অর্থে ব্যবহার সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে মাত্র একটি অর্থেই ব্যবহার করেন।" পৃঃ ৬২৮

এইটে পড়ে এই কথা মনে হয় যে অমিয়নাথ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু এতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা কি তাঁকে সাহায্য করবে বুঝতে পারলাম না। প্রথমত শব্দের ইতিহাসে ধীরে ধীরে অথবা সহসা অর্থ পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য পাওয়া যায় (Jespersen—Language, Shifting of Meanings. p. 174)। দ্বিতীয়তঃ নতুন শব্দ যা তৈরি হচ্ছে সেগুলি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তারপর অভিধানে অনেক কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়, সেগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অমিয়নাথের মতে অবলম্বন করা উচিত? বাক্যে (sentence) পদের (word) সংস্থান থেকে মানে বোঝা কঠিন নয়। Matter পদের যদি একই প্রবন্ধে

বৈজ্ঞানিক matter has extension বা the fact of the Matter বা it does not matter প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করেন, কোন অনর্থের সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা হয় না।

(গ) "অন্যান্য যন্ত্রও যেরূপ স্বেচ্ছায় বাজে না—কণ্ঠও সেরূপ কোনও স্বকীয় ইচ্ছায় বাজে না ; যাহার ইচ্ছায় বাজে সে ব্যক্তি অন্য লোক। অন্যান্য যন্ত্র হইতে যেরূপ বাক্যাদি বাহির হয় না কণ্ঠযন্ত্র হইতেও তদ্রূপ স্বর ব্যতীত আর কিছু বাহির হয় না। ব্যঞ্জন বর্ণাদির উচ্চারণ মুখগহ্বর হইতে হয়, উহাতে কণ্ঠযন্ত্রের কোনও কারিগরি নাই।

অন্যান্য যন্ত্রাদি যেমন অচেতন, কণ্ঠও তদ্রূপ অচেতন। কণ্ঠের যে চেতনা আছে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। আমাদের দেশের দার্শনিকেরা বলেন না যে কণ্ঠ চেতন বস্তু। ইহা চেতনাবিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি দ্বারা চালিত,—অথচ সেই চালককে দেখা যায় না বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় যে কণ্ঠ চেতন পদার্থ।

কণ্ঠকে যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেই—মাত্র কণ্ঠোদ্ভূত স্বর বা স্বরাদিকে অন্য যন্ত্রবাদনের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্রবাদনই মনে করা উচিত। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ ও বাক্যাদির উচ্চারণ না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরোৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও উহাকে যন্ত্রবাদনের ন্যায় মনে করা উচিত।" পৃঃ ৬৩৯

অর্থাৎ বাংলা টপ্পায় 'সই তারে ভুলিব কেমনে' যতক্ষণ কথা গাওয়া হবে, ততক্ষণ কণ্ঠ থাকল কণ্ঠ, কিন্তু তার মধ্যে 'ই', 'তা', 'কে' তে স্বরবর্ণ আশ্রয়ী তানের সময় কণ্ঠ হয়ে যাবে যন্ত্র। যাত্রায় গায়ক যদি 'সখিরে' ব'লে অন্তিম অক্ষরে টান দেন, টানের জায়গায় বুঝতে হবে কণ্ঠ অচেতন। ওস্তাদী কথাশূন্য আলাপে ও তরাণায় কণ্ঠ সম্ভব জড়ত্বে পরিণতি লাভ করবে। যুক্তিটি কৌতুকপ্রদ। কণ্ঠটা স্বেচ্ছায় বাজে না, যার ইচ্ছায় বাজে সে অন্য লোক এবং সেই অন্যলোকের কণ্ঠ আছে কি না অমিয়নাথের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। এর পরে গলায় ডিপথিরিয়া হলে লোকে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বলতে পারবে যে মাত্র অচেতন কণ্ঠই রুদ্ধ হয়েছে, কণ্ঠাতীত লোকটা সুস্থ আছে। (মানুষ বা তার অঙ্গ যে যন্ত্র নয় তার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি Thomson—Biology for Every man. vol II. p. 1284 দ্রষ্টব্য)।

দার্শনিকেরা কণ্ঠ চেতন একথা না বলতে পারেন, কিন্তু কণ্ঠ অচেতন একথা

কি বলেছেন ? তা যদি না বলে থাকেন, তাহলে এই সামান্য কথার জন্য দার্শনিকদের দিয়ে টানাটানির কি প্রয়োজন ছিল ? দার্শনিকেরা অনেক কিছু সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নি কিন্তু সেই না বলাটা যে কোন তুচ্ছ মতামত চালিয়ে নেবার সহায়ক হয় না।

কণ্ঠ ও যন্ত্রোদ্ভূত ধ্বনি যে এক নয়, একথা তবলার বোল সম্বন্ধে বাংলাদেশের একজন প্রকৃষ্ট সঙ্গীতসমালোচক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীতসারে (১৮৬৮ খৃঃ) বলে গিয়েছেন অতি অল্পকথায়—"তা, দিৎ, থা, কি ইত্যাদি বাক্যের বোলগুলি যে বাদকদিগের কল্পিত তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু কেবল ধ্বন্যাত্মক নাদ হইতেই বাদ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ধ্বন্যাত্মক নাদ হইতে তা, থা, গি ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাদ কখনই সম্ভবে না।" আলাপ বা তরাণাতেও অর্থহীন স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার হয়, যন্ত্রতে এটা সম্ভব নয়। সব বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধেই একথা খাটে।

(ঘ) "গানকে একটি ভোগ্য পদার্থ বলিয়া মনে করিলে ভরসা করি কিছু দোষ হইবে না। এবং অন্যান্য যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের মত গান বস্তুটিও যে সমালোচনার যোগ্য ও অধীন, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ—অর্থাৎ গানের সমালোচনা স্বাভাবিক কার্য্য।" (পৃঃ ৫৩২)

অর্থাৎ আমরা সঙ্গীতে নানারকম উপভোগ করি, সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করি এবং এদের আলোচনা করি। যখন সন্দেশ খাই, চিনি ও ছানার অনুপাত ভোগ করি এবং ময়রাকে সমালোচনা করি। রাস্তার পাশে খোলা ড্রেনের গন্ধ যখন উপভোগ করি, তখন নাগরিক-ব্যবস্থার সমালোচনা করি। গানের সমালোচনা পৃথিবীর আর দশটা সমালোচনার মধ্যে একথা বলার কি প্রয়োজন ? হরি'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে জানা গেল যে হরি সংসারের অন্যান্য লোকের মধ্যে একজন এবং এইটুকুর সম্বন্ধে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে হরি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(ঙ) "সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ" বলা হইয়াছে ; এই "রঞ্জয়তি" অর্থ—বাক্যকে রঞ্জিত করে (মনুষ্যের মনকে নহে কারণ সঙ্গীত ব্যতিরেকে আরও অনেক কিছু কল্পনা করা যায় যাহা দ্বারা মনোরঞ্জন হয় অতএব তাহারাও রাগ—ইহা উদ্ভট ব্যাখ্যা) ; বাস্তবিক পক্ষে স্বরাদি

দ্বারা আমরা শব্দ ও বাক্যকে রঞ্জিত করিলে তবে গানের রূপ হয়।" (পৃঃ ৬৩৮)

'রঞ্জয়তি' অর্থে সমস্ত গ্রন্থকার ও টীকাকার মনোরঞ্জন বুঝেছেন এবং তার যথেষ্ট হেতুও আছে। রাগের প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় প্রায় চতুর্থ শতকে লিখিত বৃহদ্দেশীতে। মতঙ্গ বলেছেন

যোঽসৌ ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ॥

এখানে ধ্বনি=সুর, স্বর=সরিগমপধনি সপ্তস্বর, বর্ণ=আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী, সঞ্চারী। শ্লোকটি থেকে যে কোন মনোরঞ্জক জিনিষের কোন কথাই উঠতে পারে না। যে সুর মনোরঞ্জন করে তারি কথা এখানে বলা হয়েছে। সমস্ত গ্রন্থে কেবল সুর আর তার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হয়েছে, কোথাও গানের বাক্যের উল্লেখ মাত্র নেই। সুতরাং বাক্যকে রঞ্জিত করে তাকে রাগ বলে এই অভিনব অর্থই হল এখানে যথার্থ উদ্ভট অর্থ।

৪। ঐতিহাসিক তথ্যের উদাহরণ।

(ক) "উক্ত বিশেষজ্ঞ বন্ধুর সাহায্যে, গ্রন্থের টীকার মধ্যে যেটুকু ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম তাহা দ্বারা মনে হয় যে—যে প্রকার স্বরবিন্যাস রাগ অবলম্বনে গাওয়া হইত তাহা প্রায় আধুনিক ভৈরবীর মত।"—পৃঃ ৬৩৬ (সামগান সম্বন্ধে)

(খ) "যাঁহারা সঙ্গীতের ইতিহাস বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট জানা যাইতেছে যে দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক কথকতা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। ঐ কথকতার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গীত সন্নিবিষ্ট থাকিত এবং গাওয়া হইত এবং উহাদিগকে ধ্রুবপদ নাম দেওয়া হয়। ধ্রুবপদ অর্থে যাহার পদগুলি ধ্রুব অর্থাৎ স্থায়ী। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই ধ্রুবপদ গানের অন্তর্গত ভাবকেই স্থায়ীভাব বা রসাত্মক ভাবরূপে পোষণ করিয়া এই ভাবেরই আনুগত্যে পরবর্ত্তী "কথা" আবৃত্তি করা হইত। "ধ্রুব" অর্থে নির্দ্দেশক (Indicator) মনে করিলে ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এই ধ্রুবপদ গানের প্রধানতঃ দুইটি ভাগ ছিল—স্থায়ী ও সঞ্চারী। মিঞা তানসেনের ধ্রুবপদ গানের মধ্যেও যখন এই প্রকার ভাগের কথা পাওয়া

যাইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ প্রকার ভাগ করার প্রথা অনেকদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই স্থায়ী ভাবকে দুই ভাগ করিয়া স্থায়ী ও অন্তরা এবং সঞ্চারী ভাগকে দুই ভাগ করিয়া সঞ্চারী ও আভোগ, সর্ব্বশুদ্ধ চারি ভাগ করা হইয়াছিল। বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।" (পৃঃ ৬৩১)

এই অভিনব তথ্যগুলি অমিয়নাথ যদি গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও প্রমাণসমেত বাংলা ও ইংরাজীতে প্রকাশিত করেন, তা'হলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত সমালোচকেরা তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকবেন এবং দক্ষিণ ভারতীয়গণ তাঁদের সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা আবিষ্কারের কথা জানতে পারবেন। তখন এর প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হবে।

৫। কথা ও সুর।

আলাপ, খেয়াল ও শোরীর টপ্পায় কথা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে অমিয়নাথের ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে। ঠুংরীতে ঠিক কি হয় তিনি কিছু বলেন নি তবে তাঁর লেখা দেখে মনে হয় ঠুংরীতে কথার মর্য্যাদা রাখা হয়। ঠুংরী যা পশ্চিমে শোনা যায়, তার দু'একটি খবর তাঁকে আমি দিতে পারি। ঠুংরী গায়ক বা গায়িকা প্রথম দু'এক লাইনের বেশী কেউ বড় একটা যেতে রাজী হন না। লক্ষ্ণৌ'র একজন খ্যাতনামা ঠুংরী-গায়ক প্রথম লাইনের বেশী কোন গানই গাইতে চাইতেন না এবং প্রথম লাইনটিও কখন কখন অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। 'ওরি ননদিয়া' নিয়েই ঠুংরীর সমস্ত কারুকার্য্য হয়ত শেষ হয়েছে, শ্রোতাদের সজল চক্ষু দেখে মনে হয় নি যে রসের পরিবেশনে কোন ব্যাঘাত ঘটেছে। বাইজীরা 'সাঁচি কহো মোসে বতিয়াঁ' বা 'ধীরেসে জাগায়ে লায়িরে' প্রভৃতি পদ নিয়ে নানা স্বরবিস্তার ও ভাবের (ভাব বত্লানা) উপলক্ষ্যে ঘণ্টাখানেক অনেক সময় দু'একটি পদেরই বিস্তার করেন। লক্ষ্ণৌতে কথক শ্রেণীর গায়ক ও ভাঁড়েরা (এদের মধ্যে বেশ ভাল ভাল গাইয়ে আছে) সাধারণতঃ এই পদ্ধতি ঠুংরী গাইতে অবলম্বন করেন। গানটি পুরো গাইবারও কোন বাধা নেই, কিন্তু কথা সম্পূর্ণ না করলেও কেউ ক্ষোভ করে না, কারণ ওস্তাদী হিন্দি গানগুলি মাত্র যে কয়টি বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি হয়, সেগুলি সর্ব্বজনপরিচিত। (১) মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, বাতাস পুরোবৈয়াঁ, বিরহিণী প্রিয়কে স্মরণ করে;

(২) নায়িকা অভিসারে চলেছেন, নূপুরধ্বনি নিঃশব্দ-যাত্রায় বাধা দেয়, কারণ ঘরে ননদিনী, শাশুড়ীর গঞ্জনা আছে ; (৩) শ্রীমতী গাগরী নিয়ে জল ভরতে চলেছেন, কানাইয়া পথে উপদ্রব করেন, বাঁশির সুরে মনোহরণের চেষ্টা করেন ইত্যাদি এমনই কয়েকটি বিষয় নিয়ে উত্তর ভারতে অনেক গান তৈরি হয়েছে। 'ননদিয়া' কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা ও গায়কের স্মরণে সমস্ত বিষয়টি উদিত হয়। গায়ক তার গান শেষ করল না বলে কেউ তাকে ধাপ্পাবাজ বলে না। কিন্তু সমস্ত হিন্দি গান এই ধরণের নয়, গজল, ভজন, গ্রামগীতিতে গান শেষ করতে হয়, কথাও স্পষ্ট উচ্চারণের দরকার। যাঁর কথা ভাল লাগে তিনি এই গান বেছে নিন, কারুর আপত্তি থাকতে পারে না। কথা ও সুর পুরোপুরি এক জায়গায় উপভোগ করা যায় না।

কিন্তু এইখানে একটা মস্ত ভুল করা হবে যদি গানের কথা ও কবিতার কথা এক বলে ধরা হয় (এই প্রসঙ্গের উদাহরণযুক্ত বিস্তারিত আলোচনা গত অগ্রহায়ণের বঙ্গশ্রীতে আমার 'কথা ও সুর' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)। ছাপার অক্ষরে গান কবিতার মত ছাপা হয় বলে এ ভুল সহজ হয়েছে। কথা গানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হয় নানা কারণে। তার অক্ষরগুলি (syllables) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও ইচ্ছামত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে, গজলে, ভজনে কম হয়, কিন্তু ওস্তাদী বিলম্বিত খেয়ালে বিচ্ছেদ এত দীর্ঘ হয় যে কথার কথাত্ব প্রায় থাকে না বল্লেই হয়। তারপর কাব্যের নিজের একটা সুর ও ধ্বনিমাধুর্য্য আছে, যা আবৃত্তি ও অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যের সুর গানে স্বরলিপির দৌত্যে গানের সুরে পরিণত হয়। এর ওপর তান, গমক, মিড় প্রভৃতি সুরের নানা অলঙ্কারে কথা আচ্ছন্ন হয়ে নিতান্ত বিকৃত হয়ে পড়ে। গানে কথার বিকৃতি এখন খুব আশ্চর্য্য ঠেকতে পারে, কিন্তু বৈদিক ও পরবর্ত্তী যুগের বৈয়াকরণিকেরা এটি স্বাভাবিক বলে সমর্থন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্চসঙ্গীতের বিস্তার, মিড়, তান, গমক বাদ দিয়ে গান রচনা করেছেন, কাজেই কাব্যধর্ম্ম সামান্য থাকে। তান ও বিস্তারযুক্ত বাংলা গানে কথা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ওস্তাদী হিন্দি গানে একই কথায় স্বরবর্ণের পরিবর্ত্তনের জন্য কথা আরও অর্থভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং গানেতে কাব্যের রস খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। সাহিত্যসমালোচনার অবসরে

Greeming Lamborn সাহেব বলেছেন" The practice of setting poems as songs is a very different matter. If that can be justified at all it is not on the ground that it illustrates and emphasizes the beauty of poetry : a poem, such as 'Crossing the Bar', has its own music of the *speaking* voice, and was never conceived as *sung* sound nor meant to be translated into it ; to my mind their could be no worse example of 'wasteful and ridiculous excess' ; it is at least as bad as to paint a lily. I understand that Shelley's 'West Wind' has been set as a song. I hope I may never hear it.—The Rudiments of Criticism. P. 113.

কিন্তু গানে সুরকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দিতে এত নারাজ কেন বোঝা দুষ্কর। মনে হয় কোন কোন সাহিত্যিক কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে গানেও কথা একাধিপত্য করে এই রকম কোন দুরাশা পোষণ করেন। সত্যি কথা বলতে গেলে কোন গানেই আমরা কথা সমস্ত শুনতে পাই না এবং শোনবার খুব একটা প্রয়াসও করি না। গায়কের মুখে, রেডিয়োতে, বা গ্রামোফোনের রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের কোন গান (যা পূর্ব্বে শোনা বা জানা নেই) কেউ যদি বুঝতে চেষ্টা করেন, দেখবেন যে অসম্ভব মনোযোগ দিয়েও সব কথা ধরা যায় না এবং এ রকম অধ্যবসায়ী শ্রোতা গীত-রসিকের মধ্যে না থাকারই সম্ভাবনা। এইখানে কাব্যরসিক আপত্তি করতে পারেন যে সব কথার মানে বোঝবার কাব্যেও কোন জরুরী তাগিদ নেই। তা নাই বা থাকল কিন্তু কথাগুলি চোখ ও কানের সামনে থাকা চাই। অতি বড় কবিরও কবিতায় মাঝে মাঝে দরকারী কথা অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের জন্য যদি পড়া না যায়, অতি নিষ্ঠাবান কাব্যরসপিপাসুও মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাবেন। কাব্যে বিকৃত কথার সেতু অতিক্রম করে কথাতীতকে উপলব্ধি করা যায় না, খিলেন যদি বেমজবুত থাকে, মাঝদরিয়ায় কাব্যের ভরাডুবি হয়। য়ুরোপে কণ্ঠসঙ্গীত এখনও কথাকে বাদ দিয়ে তৈরি হয় নি (ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের তান, বিস্তার প্রভৃতি শীঘ্র য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আবির্ভূত হবে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় গানে তা ক্রমেই সূচিত হচ্ছে) কিন্তু তাদের কাছেও এই সত্যটি প্রতিভাত হয়েছে :—

"With us to day a song is primarily regarded as a musical composition in which the words are a secondary consideration, and the composer is at liberty to give to each syllable any quantity of duration he may choose.—Gray—History of Music. p. 10.

গানের সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে যা কণ্ঠ দ্বারা গীত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতশাস্ত্র রচয়িতা, আধুনিক গায়ক ও সাধারণ লোকে এই অর্থে গান শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। 'আলাপ' স্বয়ম্ভু নয়, গান থেকেই তার উৎপত্তি (Problems of Hindustani Music দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক গানে অর্থশূন্য কথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা গানে কথা যদি বলা হয় পাঁচ মিনিট এবং কথাশূন্য বিস্তার হয় দশ মিনিট, তাকে কি গান বলা হবে না? কীর্ত্তনে, এমন কি বাউল ও কবিওয়ালার গানেতে মাঝে মাঝে 'তা, না, না'র গুঞ্জন শোনা যায়। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা দিয়ে গান করতে পারে (Jespersen—Language. p 435)। আমি হিমালয়ে পাহাড়িয়াদের দু একটি স্বরবর্ণের আশ্রয়ে গান করতে শুনেছি। সুতরাং দেখা যায় যে, কথা ছাড়া জটিল ও সহজ গান জগতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুর ছাড়া গানের কোন অর্থ বা অস্তিত্ব থাকে না, অতএব গানের প্রধান উপাদান হচ্ছে সুর।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

বর্ষশেষ

চিত্রাঙ্গদা

শোনো, শিশুর কান্নার মত পাখির শব্দ।

চলো তবে যাই, তুমি আর আমি,
যতদিন ক্লান্তি না আসে ততদিন
স্নিগ্ধ বুকের মধ্যরাত্রে বন্দী রাখো।
তুমি ত জান না, আমি জানি,
আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ,
গণিকার প্রেম আমাদের উজ্জ্বল পৃথিবী।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে আসন্ন বসন্তের গান।

* * *

ক্লীবের কুণ্ডল কানে, বিজয়ী অর্জ্জুন আজ
পণ্যযুবতী-সঙ্কুল পথে সঙ্গোপনে ঘোরে,
কালের ক্ষুধিত ক্ষত ম্লান মুখে।

* *

এবার ফিরাও মোরে

পড়ন্ত রোদে নগর লাল হল।
বহুদূর দেশে,
পাহাড়ের ছায়া প্রান্তরে পড়ে;
সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধ নদীর
মদির ক্লান্ত টান।

মেম্‌ননের স্তব্ধ মূর্ত্তি।
রাত্রি হয়ে এলো শেষ,
এবার ফিরাও মোরে।

সংক্রান্তি

মরা গরু রাস্তায়। রাত্রিশেষে
ক্লান্ত নীল আকাশে
নতুন নাগর লাল নখ-চিহ্ন আঁকে ;
বৃদ্ধ সহরে পীত বসন্ত।

ক্ষয়রুগীর কাশি পাগলের হাসি আকাশে ভাসে।
আর এই সর্পিল সময়ের দুর্ভাবনা
বন্ধ্যা আলস্যের কারাগারে প্রতিদিন প্রহার করে,
কণ্টকিত মুহূর্তগুলি আলোড়িত করে
কঙ্কাল মৃত্যুর বন্যা।
মাঝে মাঝে ধানের সবুজ অগ্নিরেখা দেখি
সুদূর প্রান্তরে ;
তারপর আসন্ন ভবিষ্যৎ
পঙ্গপাল সর্বনাশে বিদীর্ণ ধূসর।

ফিলিস্তিন্

বসন্তের বজ্রধ্বনি কালের পাহাড়ে ;
আজ বর্ষশেষে,
পিঙ্গল মরুভূমির প্রান্ত হ'তে
ক্লান্ত চোখে ধানের সবুজ অগ্নিরেখা দেখি
সুদূর প্রান্তরে।

সমর সেন

সোমলতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮)

গৌরহরির রূপ দেখে ললিতা অবাক !

মাথার বড় বড় চুল ধূলায় ধূসর, হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে। পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা। বহির্ব্বাস মলিন। মুখ শুকনো, চক্ষু কোটরগত। জ্বালাময় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যেন বেলাশেষের শ্রান্তি ও বেদনার ছায়া নেমেছে।

ললিতা ঘাটে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। কাঁখের ঘড়া উঠানে নামিয়ে বললে, তুমি কোত্থেকে দাদা ?

গৌরহরি শ্রান্তভাবে হেসে বললে, অনেক দূর থেকে। ঘুরতে ঘুরতে আসছি।

দাওয়ায় উঠে মেঝের উপরই গৌরহরি ধুপ ক'রে বসল। আর একবার মুখে হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করলে, সে কোথায় ? রসময় ?

ললিতা উত্তর দিলে না। উদ্বিগ্নভাবে এসে দাদার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াল। গৌরহরি কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বল তো ?

—ব্যাপার আবার কি ?

—তবে ?

—কিছুই ব্যাপার নয়।

এবং সেই কথাটা জানাবার জন্যে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

কিন্তু অত সহজে ললিতাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তবে মাথার চুল শুকনো তালপাতার মতো উড়ছে কেন ? মুখ শুকনো কেন ?

বিব্রতভাবে গৌরহরি বললে, বা রে! চান নেই, আহার নেই, মুখ শুকনো হবে না ?

—কত দিন খাও নি ? খাও নি কেন ?

প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত গৌরহরি হতাশভাবে বললে, শোন কথা ! খাই নি কেন ! পাই নি, তাই খাই নি।

অশ্রু গোপন করবার জন্যে ললিতা মুখ ফিরিয়ে দুম দুম ক'রে রান্নাঘরে গেল। পা ধোবার জন্যে জল এনে ঘটিটা সজোরে মেঝের উপরে রাখলে। কাঁধের গামছাখানা পা ধোবার জায়গায় দড়ির উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর রান্নাঘরে ঘটি বাটির ঠুং ঠাং শব্দ শোনা যেতে লাগল।

গৌরহরি আপন মনে একটু হেসে পা ধুতে গেল।

এমন সময় রসময়ের খড়মের শব্দ পাওয়া গেল। গৌরহরিকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে উঠান থেকেই চ্যাচাতে আরম্ভ করলে,—

—আরে, এই যে ! বড় বাবু যে ! হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

গৌরহরি ভিজে গামছায় গা মুছতে মুছতে সহাস্যে উত্তর দিলে, হঠাৎ না তো কি তোমার বাড়ীতে টেলিগেরাপ ক'রে আস্‌তে হবে না কি ? অ্যাঁ ?

নিজের মূল্যবান রসিকতায় গৌরহরি অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

কিন্তু তার কাছে এসে রসময় থমকে দাঁড়াল। বললে, এ কি হে ! মড়া পুড়িয়ে আসছ না কি ?

ললিতা একটা ছোট বাটিতে ক'রে গুড় আর জল নামিয়ে রেখে দিলে।

ঢক ঢক ক'রে এক গ্লাস জল খেয়ে সুস্থ হ'য়ে দাড়ি মুছতে মুছতে গৌরহরি বললে, মড়া পোড়ানোর মতোই চেহারা হয়েছে নাকি ?

রসময় বললে, আয়নায় একবার চেহারাটা নিজের দেখ না হয়। একেবারে রূপের মাধুরী খেলছে !

গৌরহরি হাসলে। বললে, ভালো কথা মনে পাড়িয়ে দিয়েছ ! ওহে, বিনোদিনীর বড় কঠিন অসুখ। বাঁচে কি না সন্দেহ।

—তাই নাকি ? কি হয়েছে ?

—তা কি আমি জানি ? পথে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, তাই শুনলাম।

বিনোদিনীর উপর রসময়ের স্নেহ কম নয়। কিন্তু গৌরহরির মুখের দিকে চেয়ে একটা রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না।

বললে, সেই জন্যেই বুঝি এই রকম চেহারা ? তাই বল।

গৌরহরি লজ্জিতভাবে বাধা দিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু রসময় বাধা দিয়ে গেয়ে উঠল :—আহা !

ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জলিয়া উঠয়ে তনু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

ললিতা দাদার জন্যে তেল নিয়ে আসছিল। রসময়ের অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান শুনে সে উঠান থেকেই ছুটে ফিরে পালাল।

তার পালান দেখে রসময়ের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বুঝলে হে গৌরহরি। প্রেমের জ্বালা বড় কঠিন জ্বালা। আমিও অনেক দিন ভুগলাম কি না ! কই গো, তেল আনছিলে, কি হ'ল ?

দাদার আড়ালে ললিতা একটা সকোপ ভ্রূভঙ্গি করলে, তাতেও তৃপ্ত না হয়ে রসময়কে ভেংচি কাটলে, কিল তুলে শাসালে।

অগত্যা রসময় নিজেই গিয়ে তেল নিয়ে এল।

বললে, আর দেরী ক'র না ভাই। সমস্ত দিন আহার নেই, তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এস।

ললিতাকে বললে, কিছু আছে টাছে ? না গুড়-জল দিয়েই সারবে ? ঘটি-বাটি নিয়ে ঘটর-ঘটর তো করছ খুব।

ললিতা অস্ফুটস্বরে গর্জ্জন করলে, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

—না হ'লেই ভালো।

গৌরহরি তেল মেখে স্নান করতে যাবার জন্যে উঠল। রসময় ব'সে ছিল, হঠাৎ বললে, চল তোমার সঙ্গে নদীর ধার দিয়ে একটু ঘুরেই আসা যাক।

আমবাগানের কাছে এসে গৌরহরি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

বললে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে রসময়। এইখানে একটু বসা যাক।

ললিতার ভয়ে রসময় তাড়াতাড়ি বললে, সে সব খেয়ে-দেয়ে হবে। সমস্ত দিন খাও নি, আগে খাওয়া হোক, তারপরে।

গৌরহরি ঘাড় নেড়ে বললে, উঁহুঁ। এখনই সুবিধা। ব'স।

দু'জনে একটা আমগাছের নীচে ঘাসের উপর বসল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গৌরহরি আস্তে আস্তে বললে, বিনোদিনী বাঁচবে না বোধ হয়।

—বাঁচবে না ?

—না।

—কেন ?

—সে পাষাণ হ'য়ে গেছে।

—পাষাণ হ'য়ে গেছে ?

রসময় অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। একটু ভয়ও হ'ল। গৌরহরি পাগল হ'ল নাকি ?

গৌরহরি কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। আপন মনে ঘাসের একটা কচি পাতা দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে বললে, হুঁ। অহল্যা পাষাণী হয়ে গিয়েছিল জান তো ?

—শুনেছি।

—তেমনি। তবে বিনোদিনী আর বাঁচবে না।

রসময় কিছুই বুঝতে না পেরে ওর চিন্তিত মুখের দিকে তেমনি ভাবেই চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে সেই মুখ বহু রেখায় কুটিল হয়ে উঠল।

—ঘটনাটা বলি তোমাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌরহরি একে একে গোড়া থেকে সব কথা বলতে লাগল। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার, শেষ রাত্রি; বিনোদিনীদের সুনির্জ্জন খিড়কির ডোবা; তারপরে···

সমস্ত শেষ ক'রে গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি বল ?

রসময়ের বলবার কিছু নেই। সে বিশ্বাস করতেই পারছিল না।

বিনোদিনীকে সে ভালো ক'রেই জানে। অত বড় তেজস্বিনী মেয়ের সান্নিধ্যে আসার শক্তিও যে কোনো পুরুষের আছে, তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না। তার সন্দেহ হ'ল, মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে গৌরহরি প্রলাপ বকছে না তো ? বিনোদিনী সম্বন্ধে এ দুর্ব্বলতা কেই বা বিশ্বাস করতে পারে ?

বললে, ওঠ, ওঠ। চান করতে চল। ওদিকে আবার তোমার ভগ্নি খাঁড়া ধ'রে বসে আছে।

গৌরহরি উঠে বললে, হ্যাঁ চল।

তারপর একটু হেসে বললে, এই বিনোদিনীর জন্যে কি যে না ক'রেছি তার ঠিক নেই। এখন হাসিও পাচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে।

—কেন ?

—তার দরকার ছিল না।

—তার মানে ?

—মানে বিনোদিনীকে আমি ভালোবাসি না।

গভীর বিস্ময়ে রসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, বল কি ?

গৌরহরি ধূর্ত্তের মতো হাসলে। মাথা দুলিয়ে বললে, হুঁ। তখন জানতাম না।

—তারপর ?

—এখন জেনেছি।

ওর কথা রসময় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারলেও বিনোদিনী সম্বন্ধে এই হালকা উক্তিতে মনে মনে বিরক্ত হ'ল। কিন্তু সে বিরক্তি চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে ?

তেমনি ভাবে হেসে গৌরহরি বললে, তা বলতে পারব না। কিন্তু ওকে যখন পেলাম তখন মনে হ'ল, ও যেন বিনোদিনী নয়।

—তবে ?

কথাটা ব'লেই রসময় যেন একটা আলো দেখতে পেলে। উৎসাহের সঙ্গে বললে, অন্য কেউ নয় তো গৌরহরি ? অসম্ভব কিছুই নয়। যে রকম অন্ধকার তাতে,

রসময় থামল।

কিন্তু হো হো ক'রে হেসে গৌরহরি বললে, না না, বিনোদিনীই বটে, কিন্তু যেন অন্য রকম।

—কি রকম ?

গৌরহরি ঠিক বোঝাতে পারছিল না। যে কথা সে বলতে চাইছিল, সে কথা গুছিয়ে বলতেও পারছিল না।

বললে, বিনোদিনীকে যখন থেকে জানি তুমি তো সবই জানো।

রসময় ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—সেই কথাই বলছিলাম।

—তাতে কি হয়েছে ?

—হয় নি কিছুই। মানে ও যেন বদলে গিয়েছে। যেন অন্য মেয়ে। বুঝলে না ?

ওর এলোমেলো কথায় রসময় বিরক্ত হয়ে উঠল। ওদিকে খিড়কির দরজায় ললিতা ওদের দেরী দেখে অসহিষ্ণু ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় রসময় আরও বিব্রত হয়ে উঠল।

বললে, বুঝেছি, বুঝেছি। চল।

গৌরহরি আর কথা বললে না। চিন্তিত ভাবে স্নান ক'রতে নামল।

ললিতা ইতিমধ্যেই দু'টি ভাতে-ভাত তৈরী ক'রেছিল। ও বেলার বাসি ভাত অবশ্য ছিল। কিন্তু এই শীতের অবেলায় সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গৌরহরির সে ভাত খেতে কষ্ট হ'ত।

তার ক্ষুধাও পেয়েছিল প্রচুর। স্নান ক'রে এসে সমস্ত দিনের অনাহারের পর সেই ধূমায়মান অন্ন অমৃতের মতো বোধ হ'ল। সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

রসময় হুঁকোটি হাতে ক'রে সামনে ব'সে খাওয়া তদারক করছিল। ওপাশে হেঁসেলের কাছে ললিতা মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে ব'সে।

রসময় হেসে বললে, তোমার খাওয়াটা কিন্তু ঠিক বিরহীজনের মতো হচ্ছে না ভাই।

ললিতা একটা কোপ-কটাক্ষ হেনে পিছন ফিরে বসল।

গৌরহরি অন্যমনস্কভাবে খাচ্ছিল। রসময়ের কথা ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে, কি রকম ?

—কি রকম শুনবে ? আহা !

রসময় সুর ক'রে গাইতে লাগল ঃ

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো॥
খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥

ললিতা হাসি চাপতে না পেরে উঠে পালাল।

গৌরহরি হেসে ধমক দিলে, থাম, থাম। আর গান গাইতে হবে না।

রসময় মুখ টিপে হেসে বললে, না, গান গাই নি। তোমার অবস্থাটা কি রকম তাই বলছি।

আহারান্তে গৌরহরি দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে তামাক খেতে লাগল। রসময় নিমতলার উঁচু বেদীর উপর ব'সে গুণ গুণ ক'রে ভজন গাইতে লাগল। সন্ধ্যায় উপাসনায় বসবার আগে এমনি ক'রে নিজেকে সে প্রস্তুত করে। গৌরহরির সে সব পাঠ নেই। সে একেবারেই সহজিয়া। খায়-দায়, ভগবানের নাম গান ক'রে, ব্যস্ চুকে গেল।

উপাসনা সেরে রসময় যখন বেরিয়ে এল, গৌরহরির তখন নাক ডাকছে। সমস্ত দিন হেঁটে এসে বেচারা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শোওয়া মাত্র ঘুম, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা গর্জ্জন।

রসময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে ওর নাসিকা গর্জ্জন শুনতে লাগল। ললিতা তাকে তদবস্থায় দেখে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখছ ?

—দেখছি না, শুনছি।

—শোন। নিজের নাকডাকা তো শুনতে পাও না। এইটে শুনে বোঝ, কি ক'রে আমার রাত কাটে।

রসময় অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে লাগল। নাসিকাধ্বনির জন্যে ললিতার কাছে তাকে প্রায়ই গঞ্জনা শুনতে হয়।

হেসে বললে, ওরে পাগল, সে কি নাক ডাকা ! বুকের মধ্যে যে ব্রজরাখাল আছেন, তিনিই থেকে থেকে বংশী বাজান।

ললিতাও হেসে বললে, হ্যাঁ, তাঁর তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। রাত ভোর তোমার নাকের মধ্যে বংশী বাজান।

তারপর চোখ নাচিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, দাদার ব্যাপারটা কি বল তো? কিছু ঘটনা আছে না কি?

—চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না?

—বুঝছি ব'লেই তো সুধুচ্ছি।

এমন সময় চুপি চুপি সুদাম এসে বললে, বাবাজি আছ নাকি?

—আছি বই কি ভাই, তোমাদের ছেড়ে আর যাব কোথায়?

সুদাম হেসে ফেললে। বললে, একটু তামাক খেতে এলাম বাবাজি। প'ড়ে প'ড়ে মুখটা এমন তেতো হয়ে গিয়েছে যে ভাবলাম,

—বেশ ক'রেছ। তা এখন এলে কি ক'রে? বোর্ডিং ছেড়ে দিয়েছ না কি?

ললিতা হেসে বললে, ও ছাড়ে নি। বোর্ডিংই এলে দিয়েছে।

মুখ বিকৃত ক'রে সুদাম বললে, দিয়েছে! কি রকম ক'রে বেড়া ডিঙিয়ে যে পালিয়ে এসেছি, জানতে পারলে দেবে ঠিক ক'রে। একেবারে রাষ্টিকেট।

রসময় হেসে বললে, ওর কথা তুমি শোন কেন সুদাম সখা। তামাক পেয়েছ?

—পেয়েছি। এখানে শুয়ে কে?

—ও আমাদের একটি বন্ধু লোক।

সুদাম গুণ গুণ ক'রে গান গেয়ে তামাক সাজতে বসল।

ও বন্ধু গো, ওপার থেকে দিলে ডাক
এপার ওঠে হেসে,
কি কাল ক'রেছি বন্ধু গো, তোমায় ভালোবেসে।

ললিতা মুখ টিপে হেসে বললে, সুদাম সখা কেমন ভালো ভালো গান শিখেছে শুনছ তো?

রসময় হেসে বললে, শুনছি।

তারপর সুদামকে বললে, বিয়ে-থা'র কিছু ঠিক হ'ল না কি সুদাম সখা?

—বিয়ে কার?

—তোমার?

সুদাম ক'লকেয় ফুঁ দিতে দিতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কথা বললে না।

ললিতা বললে, ওর বাপ-মায়ের কি আক্কেল আছে? ছেলে ইস্কুলে পড়লে কি হবে, বয়েস তো হয়েছে। 'বন্ধুর গান' গাইতেও শিখেছে। সে দিকে তো খেয়াল নেই। তুমি এক কাজ করতে পার সুদাম সখা?

—কি কাজ?

—বাড়ী গিয়ে দিন কতক 'বন্ধুর গান' গাইতে পার?

—কেন বল তো?

—তাহ'লে নিশ্চয় তোমার বাপ-মায়ের আক্কেল হবে।

সুদাম হাসতে লাগল।

বললে, বেশ আছ। আমার এদিকে পরীক্ষার পড়া। কি ক'রে পাস করব সেই ভাবনা।

—তা আর নয়। ভেবে ভেবে দেহ আধখানা হয়ে গেল!

ললিতা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

রসময় জিজ্ঞাসা করলে, রাধারাণীকে ক'দিন দেখি নি মনে হচ্ছে যেন।

—সে ছোঁড়া দিন রাত পড়ছে, মাথায় গামছা দিয়ে।

ললিতা বললে, তার বোধ হয় তোমার মতো অতখানি পরীক্ষার ভাবনা হয় নি।

—কেন বল তো?

—তাই জিগ্যেস করছি। তামাক খেতে আসে না কি না তাই।

সুদাম হো হো ক'রে হেসে উঠল।

বললে, তার কথা আর ব'ল না। ছোঁড়ার উৎপাতে ঘরে ঢোকবার উপায় নেই।

—কেন?

—বিড়ির ধোঁয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘর অন্ধকার।

ব'লে একটা হাত বিস্তৃত ক'রে সুদাম অন্ধকারের বিশালতা দেখিয়ে দিলে।

ললিতা হেসে বললে, তা তুমিও তো বাপু বোর্ডিংএর বেড়া টপকে পালিয়ে না এসে বিড়ি খেলেই তো পার।

হুঁকোর জল খানিকটা পিচ্ ক'রে ফেলে সুদাম বললে, আরে রামোঃ! তুমি মেয়ে-মানুষ, তামাক আর বিড়ির তফাৎ তুমি কি বুঝবে?

ললিতাকে সুদাম এই প্রথম মেয়েমানুষ ব'লে অবজ্ঞা করলে। তাতে সে যেন বেশ দ'মে গেল। বললে, কি তফাৎ ?

সুদাম ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললে, পাগল! গোঁফ বেরুনোর পরে কি আর বিড়িতে শানায়! কি বল বাবাজি ?

ব'লে মুরুব্বির মতো হাসতে লাগল।

তার এই আত্মপরিচয়ের পর ললিতা যেন আর আগের মতো তেমন সহজভাবে রসিকতা করতে পারলে না। দাদার নিদ্রিত মুখের দিকে একবার চেয়ে সে নিজের কাজে মন দিলে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে রসময়ের মুখে গৌরহরির সকল কথা শুনে ললিতা হেসে আর বাঁচে না। বিনোদিনীর এই অধঃপতনে ললিতা যে খুব খুশী হয়ে উঠেছে, রসময় অন্ধকারেও তা বুঝতে পারলে।

বললে, হাসছ যে!

—হাসব না? ছুঁড়ির বড় বাড় হয়েছিল। এইবারে অংখার অনেকটা কমবে।

—তাতে তোমার লাভ?

—দাদাকে আমার ভালোমানুষ পেয়ে বড় কষ্ট দিয়েছে গো। এইবার নিজে একটু ভুগুক।

রসময় বললে, কিন্তু তোমার দাদা যে এখন শিকলি কেটে পালাবার চেষ্টায় আছে!

ললিতা হেসে বললে, দাদার বড় সাধ্যি! পালালেই হ'ল। তবে আমি আছি কি করতে ?

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রসময় জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, ব্যাপারটা সত্যি বটে তো? তোমার বিশ্বাস হয় ?

ললিতা হঠাৎ যেন দমে গেল।

কিন্তু প্রকাশ্যে বললে, বিশ্বাস আবার হবে না কেন ?

রসময় বললে, আমার তো বিশ্বাস হয় না।

—কেন ?

—বিনোদিদির মতো মেয়ে যে,

ললিতা এবার রসময়ের অজ্ঞতায় খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, মেয়েমানুষই তো, বাঘ তো আর নয়।

—তা বটে।

—বুঝেছ তো।

ললিতা অন্ধকারেই একটা গূঢ় কটাক্ষ হানলে। সে-কটাক্ষ দেখতে না পেলেও ওর কণ্ঠস্বরে রসময় তার গূঢ়তা উপলব্ধি করলে।

বললে, বুঝেছি।

কিন্তু কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে ললিতা লজ্জিত হ'ল। আর রসময় অতীত দিনের সহস্র কথা স্মরণ ক'রে অন্ধকারে মনে মনে হাসতে লাগল।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রসময় বললে, কিন্তু এর পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছ ?

—কি পরিণাম ?

—বিনোদিদি আমাদের সমাজের নয় যে মালাবদল হবে। কি ক'রে ওরা মিলতে পারে তা ভেবেছ ?

ললিতা কিছুক্ষণ ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করলে। শেষে বললে, আমার দায় প'ড়েছে। যাদের গরজ তারা ভাবুক গে।

রসময় হেসে বললে, তাই তো!

ললিতা গুটিসুটি রসময়ের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, না তো কি! আমি অত পারি না।

একটু পরে ললিতা বললে, চল একদিন গিয়ে বিনোদিনীকে দেখে আসি।

—কি হবে দেখে ?

—ছুঁড়ি কি করছে, দেখতে বড় মন হচ্ছে।

রসময় বললে, তার তো জ্বর।

—সে তো বাইরে। তার মনের খবরটা নেবার ইচ্ছা।

রসময় চুপ ক'রে রইল।

সে রাত্রে আর কোনো কথা হ'ল না। পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, গৌরহরির ঘরের দরজা খোলা। সে নেই।

বোধ হয় নদীর ধারে গেছে মনে ক'রে কেউ কোনো কথা বললে না। কিন্তু ক্রমেই বেলা হচ্ছে, অথচ সে ফিরছে না দেখে ললিতা এবং রসময় দু'জনেই চিন্তিত হয়ে উঠল।

ললিতা বললে, এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে ব'সে আছে একবার খবরটা নিলে না?

—তাই তো।

রসময় বাইরে গিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে একবার দেখে এল। নদীর ধারে, বটগাছতলায় জনমনুষ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

সে ফিরে এসে বললে, সেবারকার মতো এবারও আবার পালাল না তো?

সে আশঙ্কা ললিতার মনেও অনেকক্ষণ থেকে উদয় হয়েছে। বলতে সাহস পাচ্ছিল না। সে উদ্বিগ্ন মুখে শুধু বললে, কি জানি।

রসময় এখানে ওখানে আরও খোঁজ ক'রে এল। কোথাও পাওয়া গেল না। কেউ তাকে দেখেও নি। ঘর খুলে দেখা গেল গৌরহরির একমাত্র সম্বল যে ভিক্ষার ঝুলি, তাও নেই। তখন আর কারও মনে সন্দেহ রইল না যে, সে চলেই গেছে। নিশ্চয় রাত থাকতেই গেছে। নইলে গ্রামের কারও না কারও সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হ'ত।

ভয়ের কারণ অবশ্য কিছুই নেই। ললিতা এবং রসময় গৌরহরির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে অনেক হাসাহাসি করতে লাগল।

অবশেষে ললিতা আবার বললে, চল যাই। বিনোদিনীকে একবার দেখেই আসি।

তার মনে কৌতূহল বড় প্রবল হয়েছে।

রসময় বললে, সেখানে যেতে তোমার সাহস হয়?

ললিতা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। ওদের গ্রাম থেকে একদা রাত্রে সে রসময়ের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ হয়। ফলে গ্রামে এমন ঘোঁট উঠেছিল যে, কতকটা সেই লজ্জাতেই গৌরহরিকে গ্রামত্যাগ করতে হয়েছিল। সে কাহিনী এখনও পুরানো হয়ে যায় নি।

কিন্তু সকল দ্বিধা সবলে ঠেলে ফেলে ললিতা বললে, ভয় আবার কি? কেউ মারবে না তো।

রসময় চুপ ক'রে রইল।

ললিতা বললে, আমি বলছিলাম, নতুনডাঙ্গার মেলায় তো যাবই। সেই সঙ্গে একটু ঘুরে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে গেলে কি হয়?

রসময় একটু চিন্তা ক'রে বললে, বেশ তাই হবে।

সেই রকমই স্থির হ'ল। কিন্তু গৌরহরির কথা যখনই ওঠে, দু'জনে হেসে আর বাঁচে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

'শিবের গীত'

অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে।

এবং আমরাও পড়িয়াছি। অবশ্য প্রেমে নয়, বিপদে। কেন না ইহাই জগতের নিয়ম। কেহ প্রেমে পড়ে, কেহ বিপদে। অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে, আমরা বিপদে পড়িয়াছি। অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়াই আমরা বিপদে পড়িয়াছি।

আপনাদের মধ্যে যাঁহাদের বুদ্ধির অভিমান আছে তাঁহারা হয় তো ভাবিতেছেন, 'ছাই পড়িয়াছ! টিপিক্যাল একটি প্রেমের গল্প আরম্ভ করিতেছ আর কি! মুখবন্ধেই একটু কায়দা করিয়া লইতেছ, এই যা।'

সত্যই, ঠিকই ধরিয়াছেন! কিন্তু ও কায়দাটুকু আপনাদেরই জন্য। একটু কায়দা না করিলে সোজা কথা আপনাদের মনেই ধরিবে না। নতুবা সে প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া সত্যই কিছু আর আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা নয়। বরঞ্চ তাহার বিপরীতই হইবার কথা। অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যাই হ'ক তবু একটা প্রেমের গল্প লিখিতে পারিব, লেখকের পক্ষে ইহা কি নিরানন্দের বিষয়?

এইবার হয় তো ভাবিতেছেন, 'তা গোড়াতেই বুঝিয়াছি। নায়ক তো গল্পের আরম্ভেই প্রেমে পড়িয়া বসিয়া আছে, এইবার বেণী-দোলান, সোহাগী-আঁচল-ঝোলান, স্কুল-যাওয়া এক চ্যাটারবক্স ফাজিল নায়িকা আসিবে, ইংরাজী-ফোড়নদার কথার ফোয়ারা খুলিবে, ন্যাকামি করিবে, অবশেষে হয় দুজনের বিবাহ হইবে, নয় বিচ্ছেদ।'

তা মহাশয়, বাস্তবিকই তাহাই। প্রেমের গল্প লিখিতে হইলে যেখান হইতে হউক অন্ততঃ একটি মেয়ে এবং একটি ছেলেকে টানিয়া আনিতে এবং যেমন করিয়াই হউক দুজনকে পরস্পরের—নিদেনপক্ষে একজনকে অপরের—প্রেমে পড়াইতে হইবেই; তা তাহারা শেষে বিবাহিতই হউক অথবা বিচ্ছিন্নই হউক। হাওড়ার 'পোল' ও কুতবমিনারের মধ্যে কিছু প্রেমে পড়াপড়ি চলিতে পারে না।

বলিতে পারেন, 'প্রেমের গল্প না লিখিলেই পার!' সত্য বলিতে কি মহাশয়, তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া যাই। কল্পনার বন-বাদাড় এমন করিয়া আর ঠেঙ্গাইয়া ফিরিতে হয় না। প্রেমে-পড়া লইয়া থোড়-বড়ি-আলু ও আলু-বড়ি-থোড় করা থেকে অন্ততঃ বাঁচিয়া যাই।

কিন্তু ওদিকে আপনাদেরও তো আবার বাঁচা প্রয়োজন! প্রেমের গল্পের যত নিন্দাই করুন না কেন, তাহা না পড়িয়া আপনারা বাঁচিতে পারিবেন কি? পারিবেন না। প্রেমের গল্প আছে বলিয়াই আপনারা বাঁচিয়া আছেন, আর আপনারা আছেন বলিয়াই প্রেমের গল্প বাঁচিয়া আছে। এবং খুব সম্ভব, উভয়কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই অমরেশ রায়কে আজ প্রেমে পড়িতে হইয়াছে।

আসল কথা, অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে। এখন আপনাদের উচিত, কথাটা শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিয়া লওয়া। কেন না আমরা তাহাই করিয়াছি। কথাটা শুনিয়াছি এবং শুনিবামাত্র বিশ্বাস করিয়াছি। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, সকলেই তাহা করে। করা স্বাভাবিক। কারণ, বিশ্বাস করাটাই যেখানে প্রয়োজন, সেখানে সন্দেহের প্রশ্ন অবান্তর।

কথাটা পরীক্ষাসিদ্ধ। আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যাহাকেই বলা হউক না কেন যে, অমুক লোক—বিশেষ, মেয়ে—প্রেমে পড়িয়াছে, সে কোন দিনই সন্দেহ প্রকাশ করিবে না। উল্টে ফিস্‌ফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, 'হাঁ মহাশয়, কাহার সহিত?' মুখের ভাব দেখিলে মনে হইবে, যেন মাত্র এই কথাটুকু বিশ্বাস করিবার জন্যই এত দিন কোন্‌ও মতে প্রাণ ধরিয়া সে বাঁচিয়া আছে। কাজেই, ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিয়াছি, বর্ত্তমানে এ কথা প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই যে, অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে।

তা ছাড়া সে মডার্ণ। বরঞ্চ হাইপর মডার্ণ। তাহার গোঁফ নাই; সে বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে সিনেমা তারকাদের কুলজি অধ্যয়ন করে। সে 'শালা' অথবা 'বেটা' বলিয়া বন্ধুবান্ধবদের প্রেম-সম্বোধন করে, 'বাপ' শব্দটিকে ইংরেজী ব্যাকরণসম্মত রীতিতে বহুবচনান্ত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে, কাহারও কথায় অবিশ্বাস জানাইতে হইলে বলে, 'জমাচ্চিস মাইরি!'

এ হেন অমরেশ রায় যে প্রেমে পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কাহার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, এখন তাহাই প্রশ্ন।

প্রেম-প্রবণতা মানবমনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এ কথা প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ চরম অস্বাভাবিক ব্যাপার এই যে, কোনও ব্যক্তি প্রেমে পড়িয়াছে শুনিলে তাঁহারাই আবার বিকট মুখব্যাদানপূর্ব্বক 'তাই না কি!' বলিয়া পরম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বসেন। আমরাও, দুঃখের বিষয়, তাহাই করিয়াছি। বরঞ্চ, বলিতে গেলে, কিছু বাড়াবাড়িই করিয়া ফেলিয়াছি। অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে শুনিবামাত্র বিস্ময়ে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কাহার সহিত সে যে প্রেমে পড়িয়াছে সে কথাটুকু পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

অবশ্য তাই বলিয়া কিছু চুপ করিয়া বসিয়া থাকি নাই। আমরা বাঙ্গালী; তেমন স্বভাবদোষ আমাদের থাকিতেই পারে না। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, অমরেশের প্রায় সব বন্ধুরই একটি বা একাধিক তরুণী ও অনূঢ়া ভগ্নী আছে; এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতরূপে সে তাহার জনৈক ছাত্রীকেও নাকি পড়াইতে গিয়া থাকে।

আমাদের এক বন্ধু মনে করেন, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। মনে করি না বলিয়াই অনুসন্ধান বাড়াইয়া দিয়া আরও জানিয়াছি, ছাত্রীটি আগামী বারেই ম্যাট্রিক দিবে, এবং তাহার প্রেপ্যারেশন ভাল নয় বলিয়া অতঃপর অমরেশের নাকি দুই বেলাই তাহাকে পড়াইতে যাওয়ার প্রয়োজন।

আমাদেরও প্রয়োজন বিশ্বাস করা। সে কথা আগেই বলিয়াছি। আশা করি আপনারাও বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই ছাত্রীটির প্রেমেই অমরেশ রায়ের পা পিছলাইয়াছে।

অমরেশ রায় কাহার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, অতঃপর এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার মুখ আর আপনাদের রাখিলাম না। এখন শুধু ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেমন করিয়া অমরেশ রায় প্রেমে পড়িল।

সৌভাগ্যবশতঃ এ কথার উত্তর দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। কেন না সে যুগ আর নাই; এ যুগে ব্যাপারটা অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তির স্তর নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি বুদ্ধিবিভ্রমকর খটমটে সব বিচিত্র কথার ফেরে আর আমাদিগকে পড়িতে হইবে না। সোজাসুজি এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ছাত্রীটিকে পড়াইতে গিয়া প্রথমে অমরেশের তাহাকে মায়া করিতে ইচ্ছা করিল। পরে স্নেহ, গভীরতর স্নেহ, ভাল-লাগা প্রভৃতির ক্রমপর্য্যায়ে দ্রুত পদক্ষেপপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত অমরেশ রায় অবশেষে তাহার ভালবাসা বা প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

আসলে ঠিক তাহার পরই আমাদের গল্পের আরম্ভ।

কিন্তু তাহারও আগে একটি কথা আপনাদিগকে বলা প্রয়োজন। কথাটা হঠাৎ আমাদের মনে পড়িয়া গিয়াছে।

দেখুন, ছাত্রীটির প্রেমে সে নাও পড়িয়া থাকিতে পারে। কেন না অমরেশের বোনের বিবাহ-রাত্রে আমরা স্বচক্ষে তাহাকে একাধিক কিশোরীর পিঠে হাত দিয়া বলিতে শুনিয়াছি, 'কে, অমুক না কি? আই সী! গ্রোন কোআইট এ লেডি! চেনাই দায় অলমোস্ট!'

একটু নিরিবিলিতে দু-একটি মেয়ের তো সে প্রায় চিবুকেই হাত দিয়া ফেলিয়াছিল;—'তুই কে রে, অমুক না? মেলাই বড় হয়ে গেছিস তো!'

আপনারা হয় তো বলিবেন, 'বাঃ, ইহা তো স্বাভাবিক! ইহা তো অহরহ ঘটিয়া থাকে!' কিন্তু মহাশয়, প্রেম তো ততোধিক স্বাভাবিক, তাহা তো আরও অহরহ ঘটিয়া থাকে!

তা ছাড়া—ঠিক!—আরও একটি কথা আমাদের মনে পড়িয়া গিয়াছে।

সেই রাত্রেই একটি তন্বী কিশোরী মরালগমনে সেই বিয়েবাড়িরই একটি বারান্দার এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিল। আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি, অমরেশ পিছন হইতে আসিয়া মেয়েটির বেণী টানিয়া দিল। বলিল, "এই, সামনের দিকে ঘুরিয়ে নে বেণীটা; ভিড়ের মধ্যে কেউ হ্যাঁচ ক'রে টেনে দিলেই চিৎপাত হয়ে মরবি।"

বেণীতে টান পড়িতেই মেয়েটি যে ভাবে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভয়ে আমাদের বুক ঢিপ করিয়া উঠিয়াছিল সত্য। ভাবিয়াছিলাম, গেল

এইবার !—মারা পড়িল অমরেশ ! কিন্তু আশ্চর্য্য, মেয়েটি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "ও-ও,—তুমি !"

কিন্তু তাহাই বা হইবে কেন শুনি। অমরেশ কি পেঁড়োর পীর, না মক্কার ফকির ? এখন আপনারাই বলুন, এক প্রেম ছাড়া তাহার প্রতি মেয়েটির এই পক্ষপাতিত্বের আর কি কারণ থাকিতে পারে।

ছি ছি, অন্যায় করিয়াছি। মেয়েটির নাম রীণা—অমরেশের মাসতুতো বোন। কথাটা এতক্ষণে আমাদের মনে পড়িল।

বাস্তবিক ! এই মনে-পড়াপড়ি ব্যাপারটায়, দেখিতেছি, মানুষের একটুও আয়ত্তি নাই। নতুবা আরও একটি কথা ইতিপূর্ব্বেই আমাদের মনে পড়া উচিত ছিল। কথাটি এই যে, অমরেশের প্রতিবেশী গণেশ গোসাঁইয়ের টুটা নাম্নী আট বৎসর বয়স্কা একটি সুন্দরী ভাগ্নী আছে; এবং অমরেশ প্রায়ই তাহাকে ভাল ভাল ফুলের তোড়া উপহার দিয়া থাকে।

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় তো এইবার বিরক্ত হইতেছেন। ভাবিতেছেন, লেখকের মনে পাপ ঢুকিয়াছে। আমাদের জনৈক বন্ধুর সম্বন্ধে আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিয়াছিলাম। কেন না ঘটনাটির প্রতি তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেন। আমাদের বিস্ময় দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, মেয়েদের ওসব 'ছোট বড়' নাই; ফুস-মন্ত্রের চোটে এক নিশ্বাসেই নাকি তাহারা বড় হইয়া যাইতে পারে। আজ সন্ধ্যায় যে ফ্রক-পরা মেয়েটিকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়াই বিছানায় উঠিতে দেখা গেল, কিছুই আশ্চর্য্য নয়, কাল ঘুম থেকে উঠিয়াই হয় তো দেখা যাইবে, অবিলম্বেই মেয়েটির জন্য একখানি শাড়ি কিনিয়া আনা প্রয়োজন।

বলিয়া রাখা ভাল, ভাষাটা আমাদের বন্ধুর এবং কথাটা তিনি সাধারণ ভাবেই বলিয়াছিলেন। মোট কথাটি এই যে, টুটার আরও এক বোন আছে; যাহার বয়ঃক্রম আট নহে, আটের দ্বিগুণ।

পাঠিকারা না করিলেও পাঠকেরা ইহার পরও প্রশ্ন করিতে পারেন, একজনকে ফুলের তোড়া দেওয়া এবং অপর একজনের বয়স ষোল হওয়ার মধ্যে কি অর্থসংযোগ থাকিতে পারে। এই নির্বোধ প্রশ্নটা, স্বীকার করিতেছি, আমাদেরও মনে জাগিয়াছিল। উত্তরে সত্যেন দত্তের এই লাইন দুইটি বন্ধুবর আবৃত্তি করিয়াছিলেন,—

"আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে যায়,
আমাকে ফুল দেয় তবু সব দিদির দিকেই চায়।"

করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্লিয়ার ?"

আশা করি ব্যাপারটা পাঠকদের নিকটেও এতক্ষণে 'ক্লিয়ার' হইয়া গিয়াছে। তা সত্য বলিতে কি মহাশয়, সেসব দিনের কথাগুলা আমরা এমন করিয়া আদৌ তলাইয়া দেখি নাই। আজ নানা মেয়ের সঙ্গে অমরেশের আচরণের কথা যতই ভাবিতেছি, ততই তাহা গূঢ় অর্থপূর্ণ মনে হইতেছে। মনে হইতেছে সব মেয়েরই সঙ্গে অমরেশ রায়ের প্রেমে পড়িয়া থাকা সম্ভব। এমন কি, সেই বিয়ের রাত্রে ভোজে বসিয়া যে প্রগল্‌ভা কিশোরীগুলি পরিবেশনরত অমরেশের নিকট হইতে প্রায় কাড়াকাড়ি করিয়া মিষ্টান্ন প্রার্থনা করিতেছিল, তাদের সঙ্গেও।

না হইবেই বা কেন, নিশ্চয়ই তাহাই। সব মেয়েরই সঙ্গে অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। নীলা, ইলা, খেন্তি, খাঁদী—সব ! প্রেমে পড়িতে সে বাধ্য। প্রেমে পড়িবার জন্যই সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের জনৈক বন্ধুটির ভাষায়, 'হি ইজ এ বর্ন্ লাভার; অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ সেট্‌ল্ড্!'

এইবার মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে। প্রেমে পড়িয়াছে অমরেশ। সকল সন্দেহের অতীত যাহার প্রেম, এবং যাহার প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের গল্পের জীবন।

কিন্তু গল্পটি আরম্ভ করিবার আগে, দেখিতেছি, আরও একটি কথা আপনাদিগকে জানাইতে পারা যায়। কথাটা বলিব না-ই ভাবিয়াছিলাম, তবে কি না, বলিয়া ফেলাই ভাল। কথাটা এই যে, অমরেশ রায়ের আসল নামটা আপনাদের নিকট আমরা গোপন করিয়াছি। কারণ তাহাকে আপনারা চেনেন।

আশ্চর্য্য হইতেছেন তো ? হওয়ারই কথা। কিন্তু সত্যই তাহাকে আপনারা

চেনেন। এবং অনেকে হয় তো খুব ভাল করিয়াই চেনেন। সে একজন গুণী লোক, সর্ব্বত্রই তাহার গতিবিধি, বহু রূপে তাহার প্রকাশ।

আপনি যদি পাঠিকা হন, এবং এখনও যদি আপনার বিবাহ না হইয়া থাকে তো নিশ্চয়ই আপনি ভাবিতেছেন, মানে, বলিতেছি, ভাবা আপনার পক্ষে একান্তই সম্ভব যে, আপনাকে দেখিলেই আপনার দাদার যে বন্ধুটির ঘন ঘন জলতৃষ্ণা, চাতৃষ্ণা অথবা পান খাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া ওঠে; কিংবা কখন্ আপনি আপনার চুলের ফিতাটা, সেলাইয়ের সুতাটা কিনিয়া আনিতে দিবেন এই আশায় যে ছেলেটি নিয়তই 'হা পিত্যেশ' করিয়া বসিয়া থাকে, আমরা হয় তো তাহারই কথা বলিতেছি। উত্তরে বলিব, 'হইতে পারে'। তবে, যে ছেলেটি আপনার চেয়ে আপনার অভিভাবকের তুষ্টিবিধানে অধিক যত্নবান এবং সর্বদাই আপনার সম্মুখে বিনয়ের বৈষ্ণব বনিয়া থাকে, এবং সুবিধা পাইলেই এই বলিয়া অনুযোগ জানায় যে, সর্বদাই আপনার কথা ভাবে অথচ আপনি একবারও তাহার কথা মনে আনেন না, আসলে সেই ছেলেটিই কিন্তু বিশুদ্ধ অমরেশ।

আর আপনি যদি পাঠক হন তো হয় তো ভাবিতেছেন, সেই যে ছেলেটি, প্রায়ই যাহাকে থিয়েটর প্রভৃতি পাব্লিক ফাংসন-এ মেয়েদের ভিড়ে প্রোগ্র্যাম প্রভৃতি বিতরণে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়, অথবা যে ছেলেটি বিবাহ-আদি উৎসব-ভোজে মেয়েদিগকে পরিবেশনাদি করিতে না পাইলে জীবনকে সাহারা মরুভূমির সহিত তুলনা করে, হয় তো সে-ই অমরেশ। উত্তরে আপনাকেও বলিব, 'হয় তো; হইতে পারে'। কিন্তু মনে রাখিবেন, মেয়েদের সর্ব সংশ্রবের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকিয়াও তাহাদের প্রেমে পড়া অমরেশের পক্ষে কিছুই কঠিন কাণ্ড নয়। প্রেমে পড়ার ব্যাপারে সে একজন অসম্ভবকর্মী, সে একজন জিনিয়স।

সে একজন ঐন্দ্রজালিক। আপনার চোখের আড়ালে যখন সে থাকে তখন হয় তো তাহাকে আপনি চিনিতে পারেন; আপনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেও হয় তো তাহাকে চেনা আপনার পক্ষে সম্ভবপর; কিন্তু সে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেই আপনার বিভ্রম জন্মে। মনে হয়, অসম্ভব। এ লোক অমরেশ হইতেই পারে না, হইতেই পারে না কোনমতে।

মহাশয়, এই লোকটিই আসলে নির্জ্জল অমরেশ।

অমরেশ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, অমরেশ একজন মাষ্টারপিস! আমার আপনার আশেপাশে এইখানেই কোথাও সে আছে। এমন কি, হয় তো অতি অনুগ্রহপূর্বক এই দীন লেখকের এই তুচ্ছ লাইনকয়টি শ্রীযুক্ত অমরেশ রায়ই বর্ত্তমানে স্বয়ং পাঠ করিতেছেন। এবং সত্যই যদি আমাদের এমন পরম সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে—হে অমরেশ রায়, তোমায় নমস্কার!

তুমি চিরজীবী হও, তুমি ঘন ঘন প্রেমে পড়িতে থাক; কিন্তু দোহাই তোমার, প্রেমে পড়ার নিত্য নূতন কসরৎ দেখাইতে ভুলিও না।

তুমি আছ তাই আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমরা প্রেমে পড়িবার বহুভঙ্গিম কায়দা, অর্থাৎ আধুনিক বাংলায় যাহাকে বলে ষ্টাইল, বাঁচিয়া আছে বলিয়াই বাংলা কথা-সাহিত্য বাঁচিয়া আছে। ষ্টাইল তোমার একটু একঘেয়ে হইলেই আমরা ভুবন অন্ধকার দেখি; পাঠকপাঠিকাগণ ঠোঁট উল্টাইয়া একবাক্যে বলিতে থাকেন, 'কই, আজকাল তেমন লেখা আর চোখেই পড়ে না।'

* * *

যে কথা বলিতেছিলাম।

বলিতেছিলাম, অমরেশ রায় প্রেমে পড়িয়াছে। সকল সন্দেহের অতীত যাহার প্রেম, যাহার প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের গল্পের জীবন।

কিন্তু ইহার বেশী আর আমরা কিই বা বলিতে পারি! বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক, অসামাজিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি প্রেমের যতরকম ফিক-প্রত্যয়যুক্ত পরিণতি আছে আহার অশেষবিধরূপ বহুমুখ পরিচয়, আর কোন ভাবে না হোক অন্ততঃ বাংলা সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত গল্পের সাহায্যে আপনারা তো অহরহই পাইয়া থাকেন! সেগুলির অধিকাংশ অমরেশ রায়েরই প্রেমকাহিনী। আপনাদের সুবিধা ও অভিরুচি অনুযায়ী অনুগ্রহপূর্বক তাহাদেরই যে কোন একটিকে কল্পনা করিয়া লইবেন।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

শরৎচন্দ্র

আমি 'পরিচয়' পত্রের তরফ থেকে শরৎচন্দ্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। পরিচয় সংঘ হচ্ছে একটি নব-সাহিত্যিক সঙ্ঘ। আমাদের সাহিত্যিকদের যে এ বিষয়ে লোকমতের সঙ্গে মিল আছে সেইটেই স্পষ্ট করে লোক সমাজকে জানানো, এ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার প্রধান কারণ।

আমি পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের জন্য অনুষ্ঠিত একাধিক শোকসভায় এই মত প্রকাশ করেছি যে, আজকের দিন শরৎ-সাহিত্যের ভাষ্য রচনা করবার দিন নয়—কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের অভাবে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করবার দিন। শরৎ-সাহিত্য যে লোক-প্রিয় ছিল, তা আমরা সকলেই জানতুম; কিন্তু সে সাহিত্য যে এতদূর লোক-প্রিয়, তার পরিচয় পেলুম আজকের এই দেশব্যাপী শোকসভার প্রসাদে। বাঙলা-দেশে এ একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার। এর থেকে বাঙালীর একটি মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙালী সমাজ যে বঙ্গসাহিত্যকে আদর করতে শিখেছে ও মান্য করতে শিখেছে, বাঙালীর মনের যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এ আমাদের পক্ষে একটি সুসমাচার। আমরা যারা স্বভাষায় লিখি, আমাদের সকলেরই আন্তরিক বাসনা হচ্ছে নিজের মনের কথা অপরের কানে পৌঁছে দেওয়া আর যখন দেখা যায় যে লেখক-বিশেষের কথা লোকসমাজের মর্ম্ম স্পর্শ করেছে, তখন তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

কাল হঠাৎ চোখে পড়ল মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন যে কোনও শাস্ত্রের ভাষ্য করতে বসলে পঠিত শাস্ত্র আবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। শরৎ-সাহিত্য কাব্য-শাস্ত্র নয়। তবে ভগবান পতঞ্জলির কথা এ ক্ষেত্রেও খাটে। এখন বলা বাহুল্য, সমগ্র শরৎ-সাহিত্য আবার পাঠ করে, তবে ভাষ্য করা—আজকালকার ভাষায় যাকে বলে তার সমালোচনা করা—কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ। অতএব আজ তার সমালোচনা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ তাঁদের পক্ষে, যাঁরা এ বিষয়ে অভ্যস্ত নন্। আজকের দিনে আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কি কারণে শরৎ-সাহিত্য এত লোক-প্রিয় হল? এর অবশ্য নানা কারণ আছে—আমিও আজ শুধু দুটি স্পষ্ট কারণের উল্লেখ করতে চাই।

প্রথম, তাঁর ভাষা। গল্প গড়গড়িয়ে বলা চাই যাতে করে কথাবস্তু পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। ছোট গল্পে বাক্যের কারিগরীর স্থান আছে, বড় গল্পে নেই। শরৎচন্দ্রের ভাষা সহজ সরল ও সচল আর তার flow আছে। আর তাঁর লেখার দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে যে তাঁর নভেল কোন ইংরাজী নভেলের নকল নয়। এই বাঙালী সমাজে যা ঘট্‌তে পারে ও ঘটে তাই তাঁর কথার একমাত্র উপাদান। বর্ত্তমান সমাজ তিনি সাহিত্যিকের চোখে দেখেছেন ও আর পাঁচজনকে দেখিয়েছেন। অবশ্য তাঁর বর্ণিত বাঙালী সমাজ ফোটো নয়, চিত্র।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

পুস্তক-পরিচয়

The Mystic Philosophy of the Upanisads—by Sris Chandra Sen, M. A. pp1—359 (Upper India Publishing House Ltd, Lucknow)

উপনিষদ্‌ই মূল ও মুখ্য বেদান্ত। গ্রন্থ হিসাবে উপনিষদ্‌ বেশ সুপ্রাচীন কিন্তু ইহার প্রজ্ঞা এখনও জরতী হয় নাই। গ্রন্থকারের কথায় বলি—'The old tradition has not lost its compelling force in the modern world'.—সেই জন্য দেখা যায়, দেশে বিদেশে উপনিষৎ সম্পর্কে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। তা' সত্ত্বেও গ্রন্থকার এ গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন কেন? ভূমিকায় গ্রন্থকার ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—'In studying the philosophy of the Upanisads I have followed a new method.'—এই প্রণালীকে তিনি 'noological' method বলিয়াছেন। এ প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে—'It moves inwards to the most central teachings of the Upanisads viz their mysticism, and then proceeds outwards and wholewards.' এই প্রণালীতে সমাধিলভ্য অপরোক্ষ অনুভূতির উপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়—'It accepts the primacy of mystic experience and assigns a subordinate place to the intellect.' বেশ কথা—কিন্তু গ্রন্থকার ইহাকে 'New Method' বলিলেন কেন? এ প্রণালী কি বস্তুতঃ অভিনব? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Rev. J. T. Davies উপনিষৎ সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"No great soul has appeared in India during the last 3000 years that has not accepted the call of the teachings of the Upanisads, the spirit of the oldest and most enduring religious philosophy, *based not on speculation but on real experience* and summed up in these words—Tat Twam Asi"

এখন গ্রন্থকারের কিছু পরিচয় দিই। গ্রন্থকার দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং

লক্ষ্ণৌ সিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। এম্ এ পাশ করিবার পর তিনি 'was sometime scholar of the Universities of Gottingen and Jena'. ঐ সময় প্রখ্যাত প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ Theodore Springmann-এর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চতর সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল—স্বদেশে একজন আনুষ্ঠানিক বৈদান্তিক সাধকের সম্পর্কে আসায়। আলোচ্য গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, গ্রন্থকার উপনিষৎ সাহিত্যে বেশ সুপ্রবিষ্ট। তিনি প্রধান উপনিষদ্‌গুলি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু একথা আমি বলিতে বাধ্য যে এত সত্ত্বেও গ্রন্থকার পাশ্চাত্য প্রভাব একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। গ্রন্থপাঠে স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই। বৃহদারণ্যকে ও কৌষীতকীতে নাকি 'We often find much trashy twaddle by the side of profound philosophy' (p 60)। আমরা জানি বৈদিক সাহিত্য দুই কাণ্ডে বিভক্ত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ লইয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে শুধু অধিকারী-ভেদ—বস্তুতঃ বিরোধ বা বিতণ্ডা নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা Sacrificial cult ও Gnostic cult-এর মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান লক্ষ্য করেন এবং কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে প্রচুর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। আলোচ্য গ্রন্থেও ঐ পাশ্চাত্য মতের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনা যায়—'a transition was effected from the *life-killing ritualism* of the Karmakanda to the gnostic mysticism of the Upanisads'। অবশ্য কর্ম্মকাণ্ড অপরা বিদ্যা এবং জ্ঞানকাণ্ড পরা বিদ্যা—কর্ম্মনা পিতৃলোকঃ বিদ্যয়া দেবলোকঃ। কর্ম্ম নিম্নাধিকারীর জন্য, জ্ঞান উচ্চাধিকারীর জন্য। ঐ অধিকারী-ভেদ অস্বীকার করার ফলে গ্রন্থকার উপনিষদ্‌-বিদ্যাকে সার্ব্বজনীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—The Upanisads do not discriminate between man and man. They promise illumination, freedom and peace *for all* (p 358)। ইহাও সেই পাশ্চাত্য মোহ—all men are born equal—অধিকারী-ভেদ স্বীকার করিলে বাস্তবিক কিন্তু অনুদারতা হয় না। 'What is

meat for men is poison for babes'। সেই জন্য, উপনিষদের স্পষ্ট নিষেধ —বানরের গলায় মুক্তাহার পরাইও না—ইদং বাব তৎ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণাজ্যায় বা অন্তেবাসিনে, নান্যস্মৈ কস্মৈচন (ছান্দোগ্য, ৩।১১।৫)

পাশ্চাত্য প্রভাবের আর একটি নিদর্শন সাংখ্য-মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অভিমত। তিনি বলেন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্রায়ণ প্রভৃতি অর্ব্বাচীন উপনিষদ্ হইতে সাংখ্য-মত সংগৃহীত। অথচ ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত পঞ্চশিখ-বচন হইতে আমরা জানি, সাংখ্য-মতের প্রবর্ত্তক পরমর্ষি কপিল আদি-বিদ্বান্—কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে প্রাদুর্ভূত—আদি-বিদ্বান্ নির্ম্মানচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিঃ আসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ।

সে যাহা হউক বর্ত্তমান গ্রন্থে mystic experineoe বা সমাধিলভ্য অপরোক্ষ অনুভূতি সম্পর্কে গ্রন্থকার বেশ নিপুণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ আলোচনার ফলে ঋষিদিগের অবলম্বিত সত্যসন্ধানের organon সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ঐ organon-কে লক্ষ্য করিয়া ঋষিরা এক কথায় বলিয়াছেন—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ—পরমাত্মা (যিনি সত্যস্য সত্যম্)—তাঁহাকে দর্শন করিবার উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

> শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্য উপপত্তিভিঃ।
> মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন-হেতবঃ॥

ঐ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (Book I) অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে—বিশেষতঃ যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে। কিরূপে চিত্তশুদ্ধি করিয়া ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করা যায়, কিরূপে psycho-physical apparatus-এর সংযম সাধন করিয়া মনের 'অমনীভাব' দ্বারা সমাধি বা super-trance-এ আরূঢ় হওয়া যায়—অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ গ্রন্থ হইতে তৎসম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করিবেন। অনেকের ধারণা, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলির যোগসূত্রেই যোগপ্রণালী প্রথমতঃ উপদিষ্ট। এ ধারণা ভিত্তিহীন। গ্রন্থকার নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রাচীনতম উপনিষদেও যোগপ্রণালীর উপদেশ আছে। বস্তুতঃ পতঞ্জলির যোগসূত্র যোগানুশাসনম্ মাত্র—শিষ্টের শাসন = অনুশাসন।

এ গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদ (৬১ ও ২৪৪-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থকার বলেন, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং বটেন কিন্তু 'within this sole Reality, two aspects are clearly distinguished—one is the aspect of essence (স্বরূপ) and the other is the aspect of energy (শক্তি)—which exists in two states—sometimes in a potential or latent state and sometimes in a kinetic or active state'—দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ (শ্বেত)। শক্তির kinetic অবস্থায় সৃষ্টি—ব্রহ্মের সবিশেষ সগুণ ভাব এবং শক্তির potential অবস্থায় প্রলয়—ব্রহ্মের নির্বিশেষ নির্গুণ ভাব। এই কুঞ্জি (key) প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার বৈদান্তিক বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদের বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন। শক্তিবাদ বেদান্তের অপরিচিত নহে—সর্ব্বোপেতা চ তর্দ্দর্শনাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩০)—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (শ্বেতাশ্বতর)। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম—পুনশ্চ—বিচিত্রশক্তি-যুক্তং পরং ব্রহ্মেতি। রামানুজেরও ঐ কথা—অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। ঐ শক্তিই ব্রহ্মের মায়া—মায়িনং তু মহেশ্বরম্। তিনি যখন অমায়ী—তখন তিনি static—নির্বিকল্প নিরুপাধি নির্বিশেষ নির্গুণ—আর যখন মায়ী—তখন তিনি kinetic—সবিকল্প সোপাধি সবিশেষ সগুণ। সগুণ নির্গুণ বিভিন্ন তত্ত্ব নয়—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই দ্বিবিধ বিভাবমাত্র।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—ঐ নির্গুণ ও সগুণ উভয়বিধ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে শ্রুতি 'অথাত আদেশঃ নেতি নেতি' বলিলেন কেন? এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশস্থলে নঞ-এর এত ছড়াছড়ি করিলেন কেন? 'অস্থূলম্ অণণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্' ইত্যাদি। যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা যাইতে পারে, যিনি 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্', যিনি 'সত্যংজ্ঞানমনন্তম্'—তিনি অজ্ঞেয় অমেয় অতর্ক্য কিসে?

উপনিষদের যত কিছু আলোচ্য বিষয়, গ্রন্থকার প্রায় সমস্তেরই আলোচনা করিয়াছেন—কিন্তু বৃহদারণ্যক প্রভৃতিতে যে পঞ্চলোকের উল্লেখ আছে—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক—এ গ্রন্থে ঐ পঞ্চলোকের বিশেষ উল্লেখ দেখিলাম না। এই পঞ্চলোক জীবের 'আবসথ' (environments)। পাশ্চাত্যেরা নিম্ন তিনলোক—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও

দেবলোক—অর্থাৎ ভূঃভুবঃস্বঃ-এর সন্ধান পাইয়াছেন—Man lives in three environments—the physical, the etherial and the met-etherial—that which is called the heaven world (Frederic Myers)। এই met-etherial environment-ই উপনিষদের দেবলোক। উহার উপর সূক্ষ্মতর আর যে দুইটি লোক আছে—প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক, পাশ্চাত্যেরা এখনও ঐ দুই লোকের সন্ধান পান নাই। অথচ ঐ পঞ্চলোকের স্পষ্ট ধারণা ভিন্ন জীবের কোশতত্ত্ব এবং দেহান্তে তাহার দেবযান ও পিতৃযান গতি বিস্পষ্ট হয় না। গ্রন্থকার এ সম্পর্কে বেশ নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন, তবে আনন্দময় কোশকে তিনি যে 'Causal Body' ও 'কর্মাশ্রয়' বলিয়াছেন (in which are preserved the seeds of desires, passions and virtues or their opposites)—এ মত আমার মতে সমীচীন নয়। ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার বীজ সংস্কাররূপে 'ভূতসূক্ষ্মে' নিহিত থাকে—আনন্দময় কোশে নয়; এবং আনন্দময় কোশ Bliss Body—'Causal Body' নহে। আর এক কথা—ঐ আনন্দময় কোশের উপর জীবের আরও কোশ আছে—হিরণ্ময় কোশ। কিন্তু এ বিষয়ের এখানে বিস্তার করিব না। উপনিষদের স্থানে স্থানে আরও একটি কোশের উল্লেখ আছে—দরহ কোশ—দরহং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। কোথাও কোথাও ইহার নাম গুহা—গুহা যত্র নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্। আলোচ্য গ্রন্থে এই দহর কোশের কোন উল্লেখ পাইলাম না। গ্রন্থকার কি ইহার সন্ধান পান নাই?

জীবের জন্মান্তর ও পরলোকগতির আলোচনায় গ্রন্থকার ধূমযান ও দেবযান এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। ঐ আলোচনা আমার মনঃপূত হয় নাই। ঐ আলোচনায় much beating about the bush আছে এবং উপনিষদুক্ত পঞ্চ অগ্নিতে যে যে আহুতির পর জীব মাতৃগর্ভে ভ্রূণত্ব প্রাপ্ত হয় তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব দৃষ্ট হয়। তা' ছাড়া উপনিষৎ 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নাম দিয়া যে তৃতীয় স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন (গ্রন্থকার যাহাকে 'fate of the wicked' বলেন) ঐ আলোচনাও ঠিক পথে গিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল না। তৃতীয় স্থান—কৃমিকীটের স্থান—'Place for the wicked' নহে—অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গা যদ্ ইদং দন্দশূকম্

(=দংশমশকাদি)—বৃহ ৬।২।১৬। যাহা হ'ক এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না।

মোটের উপর এই 'Mystic Philosophy of the Upanisads' পাঠ করিয়া আমি বেশ প্রীত হইয়াছি—ইহার ভূয়ঃপ্রচার হয় আমার ইচ্ছা। সে জন্যই এ গ্রন্থের যে সকল ত্রুটী-বিচ্যুতি আমার চক্ষে পড়িল, গ্রন্থকারের গোচর করিলাম—হয় ত' দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

Plato Today—by R. H. S. Crossman. (Allen and Unwin)

অন্যের চোখে নিজেকে দেখা নিশ্চয়ই মজার ব্যাপার, অথচ আত্মজ্ঞানেরও সেটা একটা প্রকৃষ্ট উপায়। এবং সেটা বৃহত্তর আত্মপরের ক্ষেত্রেও সম্যক সত্য। কারণ, যতই আমরা নিরাসক্ত হই না, মহাকালের ছায়ায় হাতীর দাঁতের মিনারেও আমরা দেশকালপাত্রের লীলাপ্রতীকই বটে এবং আমাদের উপাধি অর্জন খানিকটা আমাদের প্রতিজ্ঞার বাইরে। তাই ত, ভলতেয়ারের ইংলণ্ড সম্বন্ধে কৌতূহল ইংলণ্ডেই সমধিক খ্যাতিলাভ করেছিল। আজ তাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ফর্ষ্টরের বা হক্স্‌লির লেখা আমাদের পাঠ্য। তাই আমাদের অবস্থা-সঙ্কেতের বাইরের মনীষিরা আমাদের এই বিংশশতাব্দীকে কি ভাবতেন, তা কল্পনা করে'ও ভাবতে ইচ্ছা করে। এবং আজকের দিনে যখন নিজেদের জগচ্চিত্রই আমাদের বিমূঢ় করে, তখন প্লেটোর মতো প্রখর দৃষ্টির অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যকর নিঃসন্দেহ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য এই পূর্ব্ব-কালের প্রাজ্ঞপুরুষ সিন্‌ক্লেয়ারের খৃষ্টের মতো নিছক লোকাচারের ঐতিহ্য-কল্পনায় অবতীর্ণ নন, অক্‌স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক নামকরা প্লেটো-পণ্ডিতের রচনা-কৌশলেই তাঁর আবির্ভাব। ফলে পণ্ডিতেরাও হয় ত বলবেন যে ক্রসম্যান সাহেব প্লেটো পড়েছেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য, অনিবার্য্য কারণে ক্রসম্যানের প্লেটো আংশিক মানুষ এবং এ কথায় ক্রস্‌ম্যানের সাহিত্যিকসম্ভব প্রাণসঞ্চার-শক্তির অভাব ছাড়া আর কোনো দোষারোপ হয় না। তাই লোএস্ ডিকিন্‌সনের

সঙ্গে তুলনা করলেও হয়ত ক্রস্‌ম্যানের খুব বেশি অসুবিধা হবে না। কারণ, ক্রস্‌ম্যানও নাকি পণ্ডিত-মূর্খদের পরিহার করে' বাস্তব জগতের বিশ্বরূপনির্ণয়ে যথাসাধ্য কালপাত করেন।

তাই খ্রীষ্টসম্ভব করুণা-মৈত্রীর প্রস্তুতি বিনা প্লেটো ১৯৩৭ সালে বিলেতি বেতারবৈঠকে এসে স্তম্ভিত হয়ে' যান, হয়ত একটু খুসিও। প্রজ্ঞাবিচারণার উপাসক তিনি, তাঁর বুদ্ধিতান্ত্রিক ধর্ম্মপ্রচারের উপকার বাইশ শত বছর ধরে' পেয়েও এই উন্মাদ অজ্ঞান তাঁর নৈয়ায়িক হৃদয়ের পীড়াবৃদ্ধি করে। কিন্তু তাঁর নিজের আবিষ্কৃত অরাজ-রাষ্ট্র স্থাপিত না হলে যে এই অসঙ্গতির অনাচার চলবে সেও ত জানা কথা।

শাস্ত্রমতো, প্লেটোও গিয়েছিলেন তাঁর গুরুকে ছাড়িয়ে। সক্রাটিস্ সত্তর বছরের জ্ঞানে শুধু বোঝেন অজ্ঞানের সীমা। তিনি ছিলেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্র। প্লেটো দার্শনিকসুলভ ন্যায়নিষ্ঠায় হয়ে' উঠলেন তত্ত্বপ্রচারক। কিন্তু ইতিহাস ছিল তাঁর অনুকূল, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২৭-এ আথেন্‌সে তাঁর জন্ম, সক্রাটিস্ তাঁর গুরু এবং অসাধারণ তাঁর নিজের মনীষা। ফলে তিনি মোটেই গ্রীকরূপে হেগেলের পূর্ব্বাভাস নয়—অথবা ভারতীয় দার্শনিকপ্রতিনিধি শঙ্কর নয়। ব্যবহারিক জগতে ছিল তাঁর গ্রীকোচিত প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই সমাজরাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর চিন্তা হস্তীতাড়ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে শেষ ত হয়ই নি, এমন কি তাঁর কবিত্বময় রচনাবলী পাঠে ঐতিহাসিক জ্ঞান এত বেশি দরকার যে কলিকাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে প্লেটোর দার্শনিক উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এই ন্যায়োন্মাদ মহাজন স্বেচ্ছায় কখনো তথ্যকে এড়ান নি এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছিল অসাধারণ। তাই আইডিয়ার প্রতিভাস হলেও মানুষ ও তাঁর বিদিত তাদের জীবনযাত্রা তাঁকে নিরন্তর ভাবিয়েছিল। ব্যবহারিক প্রত্যক্ষকে শেষ পর্য্যন্ত যে তাঁকে ন্যায়ের কারণে শেষটা কৈলাসভাবনারূপী আইডিয়ায় পর্য্যবসিত করতে হয়েছিল, সে সমরশান্তি সহজসাধ্য নয়।

ফলে, আমরা যে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে গর্ব্বিত বা উৎসাহী, প্লেটোর কাছে তা হাস্যকর। কারণ এ শিক্ষার অন্তে কি, এ প্রশ্ন তুলে' প্লেটো সক্রাটিসীয় তর্ক উঠিয়ে' বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বসভায় দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে পারেন; শিক্ষার প্রয়োগে সহস্র ত্রুটি না হয় আপাতত নাই বিচার করা হল। তারপরে ধরা

যাক, নরনারীর সমকুলতা। যেখানে এখনো বিবাহপ্রথার মতো অসমসম্ভব সম্পত্তিজনয়িতা ব্যক্তিসর্ব্বস্ব অনুষ্ঠান চলে—এবং রসেল্, লিন্‌সে প্লেটোর ভক্ত নন আর রুশিয়ায় যে বিবাহের চেয়ে বড়ো একটা নবপ্রথার কথা শোনা যেত, সেটা নাকি খানিকটা অতৃপ্তরতির গল্প ও খানিকটা ষ্টালিন্ বন্ধ করেছেন, সেখানে সমতা কি করে' সম্ভব? এমন কি দীর্ঘকাল ধরে' যে শিল্প সাহিত্যের মারফৎ প্রেমমাহাত্ম্য গঠিত হয়েছে, সেটাও কি ন্যায়সঙ্গত বা সমাজসাধনে সার্থক না অর্থ-রাজ-ব্যক্তি-সর্ব্বস্ব পুরুষের সুবিধা করবার জন্যে?

তারপরে ধরা যাক্ ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তার। তার আদি-অন্তই বা কে বুঝে' সুঝে' নির্ণয় করবে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক ন্যায়ধর্ম্ম ব্যতীত এই বিরাট অর্থনীতিও কি মধ্যপদলোপী নয়? আর এই জনগণমনঅধিনায়ক ব্যাপারটায় প্লেটো একান্ত বিস্মিত। প্রতিনিধি পাঠিয়ে কি করে' জনগণ জনতন্ত্র চালায়, বুদ্ধিবিচারে প্লেটো তা ভাবতে পারেন না। বিশেষ করে' ইংরেজী শাসনতন্ত্রের নৈয়ায়িক অসারতা প্লেটো বা ক্রসম্যান আলোচনা করেন। তারপরে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে উৎসাহ, অথচ অধিকারভেদ মানা। শিক্ষা সম্বন্ধে বুলি অথচ পাত্রাপাত্র অবিচারও প্লেটোর দৃষ্টিতে পড়ে।

অবশ্য প্লেটোর অরাজরাষ্ট্রেও শুধু প্রাজ্ঞপুরোধাদেরই বিধিব্যবস্থা। নক্ষত্রভুক্ হলেও মানবস্বভাব তাঁর পরিচিত। তাই সাধারণ মানুষকে তিনি ন্যায়প্রহারের গণ্ডীর বাইরে রাখতে চান। তারা বিবাহ করতে পারে, সম্পত্তিও করতে পারে, চলিত শিক্ষা পাচ্ছে ভেবে আত্মসুখও পেতে পারে, চুপি চুপি হয় ত বা নিজেদের জনগণমন অধিনায়কও ভাবতে পারে। কিন্তু আজ সমাজ সে সুরে চলে না। তাই লোকশিক্ষা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণরাষ্ট্র সম্বন্ধে আপত্তি ওঠে, তাই আমদানি রপ্তানির নব নব শুল্করীতি যুক্তিহীন, স্বার্থপ্রণোদিত, তাই জাতিসঙ্ঘ রসিকতা মাত্র। আর সেই জন্যেই আজও যৌনকামনা, প্রজননেচ্ছা ও বিবাহ লোকে অকারণে একাকার ভাবে; অথচ সমাজরাষ্ট্রে মেয়ে-পুরুষ সমাধিকার তাও বলে।

এর থেকে মনে করা আশ্চর্য্য নয় যে রুশিয়ায় হয় তো প্লেটোর খরদৃষ্টি কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হতে পারে। কিন্তু রুশিয়ায় যে-রাজশক্তির বজ্রকঠিন বিরাট শাসন, তার উদ্দেশ্য ত প্লেটোপন্থী নয়ই, এমন কি তার সাধনমার্গও ভিন্ন।

কাজে কাজেই এ প্রসঙ্গে ক্রসম্যান্ ও তাঁর দেখাদেখি কড্ওএল্ দ্বিধান্বিত হলেও অজ্ঞজনোচিত বিনীত শুভবুদ্ধিতে মনে হয় যে প্লেটো একমেবাদ্বিতীয় নেতার শাসনে বিশ্বাস করেন এ বিশ্বাস অমূলক ও ইতিহাসভ্রান্ত। জীবনের নশ্বর অলীকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে' তিনি চার্ব্বাকৃখৃষ্টীর লোকায়ত ভোগে উৎফুল্ল হবেন ভাবাও তা হলে সঙ্গত।

অবশ্য ক্রসম্যানও মেনেছেন যে অন্তত রুশিয়াবিরোধী নির্ব্বিশেষ শাসনে প্লেটো আহতই বোধ করেন। জর্মানি, ইতালি, জাপান বা মেক্সিকোতে এই সভ্য, বিদগ্ধ, সুকুমার নীতিপরায়ণ দার্শনিকের পক্ষে বাস করা অসম্ভব। বরং রুশিয়ায় তাঁর কৌতূহল অপেক্ষাকৃত অনুকূল। কিন্তু সেখানেও, যাঁর কানে নক্ষত্রসঙ্গীত ও যাঁর চোখে কৈলাসভাবনাদের অশরীরী নৃত্য নিয়ত চল্ছে, তাঁর পক্ষে টেঁকা শক্ত। অর্থঘটিত ব্যাপারেই মানুষ ভাঙে গড়ে, এ-কথা এ নীতি-বিশারদ ধার্ম্মিক নৈয়ায়িকের কাছে অর্থগৃধ্নুতারই নামান্তর। তাই আরিষ্টটলের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে, আবার মার্কস্কথিত সুসমাচারে জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগ বিষয়ে প্রায় তাঁর নিজের কথাই পেয়েও সেকালের এই কবিপ্রাণ মল্লবীর ভগ্নহৃদয়েই একাল থেকে ফিরে' যান।

বইটি পড়ে' তৃপ্তিলাভ করেছি বলে'ই মনে হচ্ছে যে উপযুক্ত পণ্ডিতেরা যদি কন্ফ্যুশিয়াস্, আরিষ্টটল, সাধু টমাস্ ও ভিকো সম্বন্ধে এরকম বই লেখেন ত আমরা শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই পাই।

শ্রীবিশ্বতোষ দত্ত।

চক্রপাক—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী (প্রিয় পাবলিশিং হাউস)

জহুরীর জহর—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল (কথা-ভারতী)

"চক্রপাক" ছোট গল্পের সমষ্টি। দারিদ্র্যের ফলে মধ্যবিত্ত পরিবার কতদূর অধঃপতিত হতে পারে তারই ছবি তিনি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। চিরাচরিত প্রেমের কথা না লিখে যে গ্রন্থকার বর্ত্তমান নানাবিধ সমস্যার দ্বারা গল্পগুলিকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন সেজন্য তিনি প্রশংসার্হ। তবে একথা যে কোনো পাঠকেরই মনে হবে যে, এই গল্পগুলির মধ্যে লেখকের তেমন কোনো মননের

পরিচয় নেই। অর্থাৎ তাঁর অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবন থেকে উদ্ভূত হয় নি, তিনি প্রেরণা পেয়েছেন সেই সব লেখকদের কাছ থেকে, যাঁরা বর্ত্তমান সমস্যা নিয়ে তাঁদের লেখার মধ্যে আলোচনা করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র ইত্যাদি। ফলে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু মোটামুটি এঁদেরই ছায়ায় গঠিত—তাঁর লিখনভঙ্গীও এঁদেরই আয়াসানুকরণে ব্যস্ত। সেইজন্য গল্পগুলির মধ্যে লেখকের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে পাঠকেরা বিভ্রান্ত হন, এবং লেখকের সাধু সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত আর কার্য্যকর হয় না। কষ্টকল্পিত মধ্যবিত্তজীবনের ইতিহাস লিখে লেখক শুধু ফাঁপা রোমান্টিক বৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। Contemporary awareness বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝে থাকি, তা রাধাচরণ বাবুর যৎসামান্যই আছে।

দ্বিতীয় বইটির লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ বাবু থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এঁর লেখার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষুদ্র উপন্যাসটি পড়ে আমাদের হতাশ হতে হ'ল। গল্পটির বিষয়বস্তু দুশ্ছেদ্য হেঁয়ালীতে পূর্ণ, এবং যে মনস্তত্ত্বের অবতারণা গ্রন্থকার করেছেন তারও অস্তিত্ব ভূস্বর্গে কোথাও মেলে কি না সন্দেহ। গল্পের নায়কটি এক ধনবান, সুন্দর ও অশিক্ষিত জহুরী। গল্পের মধ্যে তাকে কোথাও ঠিক চেনা গেল না, কিন্তু লেখকের ভাবে ইঙ্গিতে বোঝা গেল যে লোকটি জাতে ডন্ জুয়ান্। সেইজন্য উচ্চবংশের উচ্চশিক্ষিতা গল্পের নায়িকা ও তাঁর বিধবা পিসিমা জহুরীর অভদ্র কথাবার্ত্তা সত্ত্বেও তাকে ভালবেসে ফেলেন। এমন কি মাত্র তেরো দিনের পরিচয়ে বিবাহিতা, পুত্রবতী ও আসন্নপ্রসবা এক মহিলাও জহুরীর প্রেমে পড়েন। বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত প্রেমের ব্যাপারে লেখক কোনো যুক্তির ধার ধারেন নি। সেইজন্য প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক প্রেমের ঘটনার সামনে পাঠকদের হুঁচোট খেতে হয়। এই গল্পটি পড়তে পড়তে কেবলি মনে হয়, লেখক যেন কি এক বিষম উত্তেজনার মাথায় লিখে চলেছেন। সে উত্তেজনার উৎস লেখকের আত্মার এত গভীরে যে কোনো মনোবিদ্যা তার রহস্য বার করতে সমর্থ নয়। ফলে এই রহস্যই পাঠকের মনে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রবোধবাবুর মত সুদক্ষ লেখকের পক্ষে এ ধরণের অসঙ্গত উপন্যাস লেখা কি করে সম্ভব হল তা ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

The Book of Songs—translated from Chinese by Arthur Waley (George Allen & Unwin Ltd).

প্রাচীন চীনা সাহিত্যের আলোচনা এ পর্য্যন্ত philologist বা চীনা ভাষাবিৎদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের কোন কোন চীনা কবিতা ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিন্তু তা সাহিত্যিকদের দৃষ্টি কতটা আকর্ষণ করতে পেরেছে তা বলা যায় না। Arthur Waley প্রাচীন চীনা সাহিত্যকে philologistদের কবল হতে মুক্ত করে সাহিত্যরস-পিপাসুদের ভোগে লাগাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। সেই জন্যই তিনি এই নূতন অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

প্রাচীন চীনা সাহিত্যের মধ্যে যাকে Classics বলা যায়, এ গ্রন্থ তারই অন্তর্ভুক্ত। এ গ্রন্থের আদি নাম হচ্ছে 'শি-চিং' এবং সে নামের অনুবাদ হচ্ছে Book of Odes অথবা Book of Songs। Waley শেষের অনুবাদটি গ্রহণ করেছেন। শি-চিং পূর্ব্বে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। Waley বলেছেন যে সে সব অনুবাদ নিয়েই তিনি শি-চিং পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান অনুবাদে তিনি প্রাচীন অনুবাদগুলির কতটা সাহায্য গ্রহণ করেছেন তা তিনি বলেন নি।

শি-চিং-এর উদ্ধারকর্ত্তা হচ্ছেন কনফুসিয়স্। কনফুসিয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের লোক। গানগুলি তাঁর পূর্ব্বেই চীনদেশের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। কনফুসিয়স প্রায় ৩০০০ গানের মধ্য হতে ৩০৫টি বেছে নিয়ে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। দু'একটি গানের মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে তা থেকে বোঝা যায় যে গানগুলি কনফুসিয়সের প্রায় ১৫০-২০০ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত। গানগুলির বিষয়বস্তু উপেক্ষা করে কনফুসিয়স ও পরে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা সে গুলিকে যে ব্যবহারে লাগিয়েছিলেন ও সে গুলির যে অর্থনির্ণয় করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অভিনব। সেই কারণে অনেক সময় প্রেম-বিষয়ক কবিতার রাজনৈতিক অর্থ-নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

শি-চিং প্রাচীন চীনা সাহিত্যের যে একখানি প্রধান গ্রন্থ তাতে সন্দেহ নাই। সে গ্রন্থ চীনদেশের সর্বত্র আদৃত এবং শিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য। তার কবিতার ছন্দ সহজ, প্রায় সর্বত্রই চারটি শব্দে একটি পদ এবং Waleyর কথা

মানলে বলতে হবে তার সুরের মাধুর্য্য আছে। Waley বলছেন "And yet as I read them there sprang up from under the tangle of misconceptions and distortions that hid them from me a succession of fresh and lovely tunes. The text sang, just as the lines of Homer somehow manage to sing despite the barbarous ignorance with which we recite them." Waleyর কানে সে সুর এত স্পষ্ট হলেও আমাদের কানে তা হতে পারে না। তার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে চীনা ভাষা। Homer ঠিক সুরে না পড়তে পারলেও প্রাচীন গ্রীক শব্দগুলির উচ্চারণ মোটামুটি জানা যায়। কিন্তু ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বের চীনা শব্দগুলির উচ্চারণ বর্ত্তমানে আনুমানিক ভাবেও জানা সম্ভব নয়। এ সত্ত্বেও Waleyর কানে যে পুরাণো সুর কি করে বেজেছে তা আশ্চর্য্যের বিষয়।

Waley তাঁর অনুবাদে ৩০৫টি গানের মধ্যে ২৯০টি মাত্র অনুবাদ করেছেন। বাকীগুলি অবোধ্য বলে বাদ দিয়েছেন। আর সাহিত্যিকদের যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য যেটুকু philological discussion সেটুকু বইয়ের দ্বিতীয়ভাগে প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক গানের অনুবাদের সঙ্গে Waley একটি ছোট ঐতিহাসিক ভূমিকা দিয়েছেন, যাতে গানগুলির ভাবার্থ সহজে বোঝা যেতে পারবে।

Waleyর অনুবাদ মূলগত কিনা তা নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করি নি। তবে তাঁর অনুবাদ যে সরস তাতে সন্দেহ নাই। এ অনুবাদ হতে প্রাচীন চীনা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়বে। অনুবাদ যে কত সরস তা একটি ছোট নমুনা দিলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

"By the willows of the Eastern gate,
Whose leaves are so thick,
At dusk we were to meet ;
And now the morning star is bright.
By the willows of the Eastern gate,
Whose leaves are so close,
At dusk we were to meet ;
And now the morning star is pale."

ন্যায় দর্শনের ইতিহাস—প্রণেতা শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ত-তীর্থ।
(তীর্থ লাইব্রেরী)—মূল্য ২৲ টাকা।

ন্যায়শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত, প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। এ ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ও আছে। এ বইয়ে শুধু প্রাচীন ন্যায়ের কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন ন্যায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য আর এই ন্যায়ভাষ্যের মধ্যে যে সব সূত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার নাম হচ্ছে 'ন্যায়সূত্র'। এই 'ন্যায়সূত্রের' রচয়িতা হচ্ছেন অক্ষপাদ গৌতম। বাৎস্যায়নের পরে যে সব নৈয়ায়িক খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উদ্দোতকর 'ন্যায়বার্ত্তিক', বাচস্পতিমিশ্র 'ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা' এবং উদয়নাচার্য্য 'ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা-পরিশুদ্ধি', 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। উদয়নাচার্য্যের পর জয়ন্ত 'ন্যায়মঞ্জরী', বর্দ্ধমান 'ন্যায়-নিবন্ধ-প্রকাশ' এবং বিশ্বনাথ 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকদের মধ্যে বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য এবং জয়ন্ত নবম, দশম ও একাদশ শতকের লোক। বর্দ্ধমান ও বিশ্বনাথ পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষপাদ গৌতম, বাৎস্যায়ন ও উদ্দোতকরের কাল সঠিক নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। উদ্দোতকর অনেকের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের লোক এবং তাঁদের মতে বাৎস্যায়নও উদ্দোতকরের বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী নন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার উদ্দোতকরকে চতুর্থ শতকের এবং বাৎস্যায়নকে খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম-অষ্টম শতকের লোক প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস করেছেন এবং সূত্রকার অক্ষপাদ গৌতম ও বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা গৌতমকে অভিন্ন মনে করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে অক্ষপাদ বৈদিকযুগের লোক। সে যুগ গ্রন্থকারের মতে খৃষ্টের জন্মের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে। প্রথম নৈয়ায়িকগণের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কাল-নির্ণয়ের কথা বাদ দিলে গ্রন্থকার ন্যায়শাস্ত্রের অন্য যে পরিচয় দিয়েছেন তা' প্রশংসায় যোগ্য। তিনি উপনিষদ ও পরবর্ত্তী শাস্ত্র হতে নৈয়ায়িক উক্তিগুলি সঙ্কলন করে ন্যায়শাস্ত্রের ধারাবাহিকত্ব প্রতিপন্ন করেছেন এবং প্রাচীন ন্যায়সূত্রের যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, সে বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকের প্রভূত উপকার সাধন করবে। প্রাচীন দর্শন গুলিকে সহজ বাংলা ভাষায় যাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করবেন তাঁরাই যে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করবেন তা' বলা বাহুল্য।

শান্তিপুর পরিচয়—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

এ বইয়ের প্রধান অংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। বাকীটা হচ্ছে পরিশিষ্ট আর এই পরিশিষ্টেই শান্তিপুরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বহু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে শান্তিপুরের স্থান আছে। চৈতন্যদেবের সময় শান্তিপুরের সঙ্গে নবদ্বীপের নিকটসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চৈতন্যদেবের নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে ও প্রচলনে অদ্বৈত গোস্বামী যে সহায়তা করেছিলেন তার প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখনো মেনে চলছে। যাঁরা ভবিষ্যতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্কন করবেন তাঁরা যে এই 'শান্তিপুর পরিচয়' হতে বহু উপাদান পাবেন তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বুদ্‌বুদ্—শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

শবরী—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীঅসিতকুমার হালদার সুপরিচিত। 'বুদ্‌বুদ্' নামক তাঁর পুস্তিকায় ১০১টি কবিতা-কণিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে "খেয়াল-খোয়াব" নামে 'ছন্দা'য় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। মানব-জীবনের নানা দিক্ নিয়ে কবি অসিতকুমার যা ভেবেছেন, তা সরল এবং অনাড়ম্বরভাবে ছন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি কবিতা-কণিকা সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি:

'পুতুল খেলা দেখ্‌বে সবাই
হাটের দিনে রথ তলায়
জান্‌লে না যে কার খেলা ঐ
হচ্ছে তাদের সেই মেলায়
কার্ হাতে যে খেল্‌চি সবাই
ছায়া আলোর ভোজবাজী
বিশ্ব যাহার হেলায় গড়া
তারি খেলার কারসাজি।' (পৃঃ ৫০)

মোটের ওপর, তাঁর কবিতা-কণিকাগুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত হ'লেও সহজ এবং সুন্দর। প্রচ্ছদপটখানির পরিকল্পনা অতি সুন্দর হয়েছে।

বর্ত্তমান যুগে নবীন কবিদের রচনা পড়তে হোলেই ভয় হয়। 'নতুন কিছু' করবার উৎকট প্রয়াস অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সে-দলের পর্য্যায় পড়েন না। তাঁর কোনো কোনো কবিতায় বুদ্ধদেব বসু এবং সমর সেনের প্রভাব পরিলক্ষিত হ'লেও তাঁর 'লিরিক্' কবিতাগুলির স্নিগ্ধতা এবং কমনীয়তা আমাদের তৃপ্তি দেয়। তাঁর এই নতুন কাব্যগ্রন্থে বাইশটি গদ্য-কবিতা এবং দুইটি কবিতা আছে। গদ্য-কবিতার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান না হ'লেও ব্যক্তিগতভাবে আমার এ-জাতীয় বাংলা কবিতা অনেক কারণেই ভালো লাগে না। গদ্য-কবিতার উপযোগী ভাববস্তুর কথা বাদ দিলেও এর আঙ্গিকের দিকে অনেকেরই সজাগ দৃষ্টি নেই। সঠিক এবং নির্ভুল ভাবে ক্রিয়াপদ-গুলিকে ব্যবহার করে বাক্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলে গদ্য-কবিতার আঙ্গিক কতকটা দৃঢ় হ'তে পারে। এই ধরণের কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার অভাব ঘটলে এর আবেদন ব্যর্থ হয়। বিশুদ্ধ 'রোমান্টিক্' দৃষ্টিভঙ্গি গদ্য-কবিতা লেখার অনুকূল কি না, তাও এই সঙ্গে বিচার্য্য।

আশা করি, কামাক্ষীপ্রসাদ এই বিষয়ে ভেবে দেখবেন। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে 'শবরী', 'অভিসার', 'মৃত্যু', 'ঘুম', 'যাত্রী' এবং 'মুক্তি দাও' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সে—মূল্য তিন টাকা
ছড়ার ছবি—মূল্য দেড় টাকা } শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। (বিশ্বভারতী)

'সে'-কে ঠিক মানুষ বলা চলে না, অর্থাৎ আমরা মানুষ বলতে যা' বুঝি। কিন্তু তাই ব'লে অমানুষ 'সে' মোটেই নয়—অতি-মানুষও নয়। মনুষ্যত্বের উপাদানে সে ভরা, অর্থাৎ যে সব দোষে ও গুণে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে সব প্রয়োজনে, সহজ সাধারণ মানুষজীবন গঠিত, এই 'সে'-র মধ্যে পুরোপুরিই তা দেখতে পাওয়া যায়। যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোকতাপ,

এমন কি বিবাহবাসনা। কিন্তু এই সবের উপর 'সে'-র জীবনে আরো কিছু আছে যার পরিমাপ ও নির্দ্দেশ ঠিক সাংসারিক জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে বা ব্যবহারিক বুদ্ধির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। তাই 'সে' লোকচক্ষুর অন্তরালে তার গূঢ় জীবন অতিবাহিত করে এবং চিরকালই করত যদি এক বৃদ্ধ ও এক বালিকা—কবি ও তাঁর 'পুপে দি'—নিতান্ত আবদার করে তাকে আমাদের সম্মুখে হাজির না করতেন। দেখে চমক লাগে। প্রায় আমাদেরই তো মতন, তবু খটকা লাগে—কোথাকার লোক এ! মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত কেন এ ব্যবহার করে? আমাদের দৃষ্টির অতীত কি রহস্যের সন্ধান এ পেয়েছে যার যাদুতে এ বশ করেছে বৃদ্ধ কবি ও তাঁর বালিকা নাংনিকে? এই তিনজনে যখন আসর জমে, তার আবহাওয়া আমাদের চোখে ধাঁধা লাগায়। কি আজগুবি সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের কথা এরা সব আলোচনা করে, আমাদেরই মতন ভাষা, কিন্তু তার অর্থ? কার সাধ্য তা বোঝে! কিন্তু একেবারে যে বুঝি না তাই বা কেমন ক'রে বলি? ক্ষণে ক্ষণে এই আজগুবি আলোচনার মাঝখানে আমাদের চিরপরিচিত আবেষ্টন, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে স্পষ্টতর-রূপে, এই সৃষ্টিছাড়া জগতের অপরূপ আলোকপাতে আমাদের জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা মুহূর্ত্তে হয় মহীয়ান। বোলপুর ষ্টেষণের প্ল্যাটফরম, পুকুরের ধারে আসসেওড়ার ঝোপ, গভীর রাতে খেঁকশেয়ালীর ডাক, বাঘের দাঁত-বের-করা হাসি, তেলেনিপাড়ার দিঘির ঘাট, খরগোশ আর ব্যাঙমার দৌড়—কিছু আমাদের চেনা, কিছু অচেনা, কিন্তু একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এই সব। পুপে দিদি, কবি ও সে, এই তিনজনের অন্তরঙ্গ আবেগের আদান প্রদানে, স্বপ্নের সঙ্গে হয়েছে বাস্তবের সংমিশ্রণ, তারই সম্মোহনে পাঠকের মন হয় আচ্ছন্ন। তাই আমাদের বিচারশক্তি পায় লোপ, মাটি ও আকাশের পার্থক্য যাই ভুলে, উধাও হয় মন তন্দ্রা-তেপান্তর পেরিয়ে, সব কিছু পেরিয়ে, আলোর অতীত আলোর উদ্দেশে।

কিন্তু 'সে' হোলো নিতান্তই মাটির মানুষ—এই সুখেদুঃখে ভরা পৃথিবীর মাটির। যে মাটিতে আমার জন্ম—আর কবির, আর পুপে দিদির, আর সুকুমারের। বেচারি পুপে দিদি! বৃদ্ধ কবি আর সকল বয়সের অতীত 'সে'—এই দুটিকে নিয়ে তার ছোট্ট মনটি তৃপ্তি পায় না। তার চাই সুকুমারকে।

পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দুর মতন তার মন জুড়ে টলমল করতে থাকে এই সুকুমার। ক্ষণে ক্ষণে তা ঝলমল করে ওঠে কবির কথার রশ্মিপাতে, আশ্চর্য্য সব রঙের খেলায় উদ্ভাসিত হয় পুপে দিদির মন। তারপর একদিন অশ্রুবিন্দুরই মতন সুকুমার হয় বিলীন, কোন্ আকাশে তার সন্ধান 'সে' জানে না, কবি না—কেউ না। মাটির মেয়ে পুপে দিদি, তাকে স্পর্শ করে মাটির চিরন্তন বেদনা—দুর্লভ আকাশের অধীর স্বপ্ন। মাটির মানুষ আমরা—বিলীন একটি অশ্রুবিন্দুর পরম স্মৃতি আমাদের শুষ্ক জীবনকে করে সার্থক।

'ছড়ার ছবি' কবিতার বই। নানা বিষয়ের ছড়ায় ভরা। যথা, তালগাছ, আকাশ প্রদীপ, পদ্মানদী, কাশী, ভজহরি এবং আরও অনেক কিছু। মামুলি এই সব বিষয়—মামুলি ভাবেই কবি এগুলিকে দেখেছেন, বিশেষত্ব শুধু তাঁর সাবলীল ছন্দ ও ভাষা, তাঁর বর্ণনার অদ্ভুত ব্যঞ্জনাশক্তি, বস্তু ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে তাঁর উদার একাত্মবোধ। 'ছড়ার ছবি' বইটির আরও একটি বিশেষত্ব আছে—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছড়াগুলির বিষয়োপযোগী চিত্রসমষ্টি। কবির কথার মতন শিল্পীর রেখাতেও ফুটে উঠেছে অতি পরিচিত সব দৃশ্যের এমন অভিনব আশ্চর্য্য রূপ যা কোনোদিন কল্পনাতেও আমরা উপলব্ধি করতাম না।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ঘোষালের ত্রিকথা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। (ডি, এম, লাইব্রেরী)

গল্প-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বতোভাবে তাঁর মনের আভিজাত্য ও বৈদগ্ধ্যের অনুবর্ত্তী। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আন্দোলিত মানব-জীবনের প্রতি তিনি কখনো তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি। বর্ত্তমান ও প্রাচীন সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তাঁর মন দৈনন্দিন জীবন-বৈচিত্র্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করবার অবকাশ পায় নি। কিন্তু অতি-নিকট জীবন-যাত্রার অতীত কোনো কাহিনী যখন তাঁর মনে আসে, তখন তা চৌধুরী মহাশয়ের মনে সাড়া তোলে। সে কাহিনীর রস এম্নি সুন্দরভাবে তিনি তাঁর বিদগ্ধ মনের নানা ঐশ্বর্য্য দিয়ে ঘনীভূত ক'রে তোলেন যে, গল্প একান্তভাবে "আনন্দঘন

ও স্বপ্রকাশ" হ'য়ে ওঠে। চৌধুরী মহাশয়ের গল্পের কৃতিত্ব তাঁর বৈদগ্ধ্যের অনুবর্ত্তী আর্টের সাফল্যে।

"ঘোষালের ত্রিকথা" তিনটি গল্পের সমষ্টি। ঘোষাল হচ্ছে সেই জাতের লোক যারা ঠিক "সামাজিক ও সাংসারিক জীব" নয়,—সমাজে এরা হ'চ্ছে সব "উদ্বৃত্তের দল"। জীবনে যেমন এরা উদ্দেশহীন, কথাবার্তায়ও তেমনি বে-পরোয়া। নিজেকে "হিরো" বানিয়ে নিপুণভাবে নানা আজগুবি গল্প ব'লতে এদের তুল্য গুণী দুর্লভ।—নীল লোহিত ও ঘোষাল এই শ্রেণীর লোক। এককালে যখন বাঙলা দেশে অবকাশ ছিল অপর্য্যাপ্ত, তখন এই ধরণের লোক তাদের মজলিসী গল্পে আসর জমিয়ে তুল্‌তো। এখন আর তাদের দেখা মেলে না, কিন্তু তাদেরই কথা স্মরণ ক'রে চৌধুরী মহাশয় তাঁর গল্পে তাদের এক একটি মডার্ণ টাইপ উদ্ভাবন ক'রেছেন। তাঁর লেখায় যাদের আমরা পাই তারা প্রয়োজন অনুসারে কখনো ফিলজফি আওড়ায়, কখনো সংস্কৃত শ্লোক অথবা ইংরেজি কোটেশন ঝাড়ে, কখনো আবার সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। এছাড়া মুখ থেকে এদের epigram ও শানিত রসিকতা সদাসর্ব্বদাই বেরিয়ে আসে। কিন্তু এ সমস্তই এম্‌নি সংযতভাবে ওজন ক'রে চৌধুরী মহাশয় ব্যবহার করেন যে, কোথাও এগুলি আর্টের সীমা লঙ্ঘন করবার স্পর্দ্ধা দেখায় না;—সর্ব্বত্রই "জায়গা পেয়ে থাকে কোথাও জায়গা জুড়ে বসে না।"

যে ধরণের বে-পরোয়া কাহিনী "ঘোষালের ত্রিকথায়" আছে, তাদের রস বজায় রাখা অত্যন্ত শক্তি-সাপেক্ষ। কারণ, ঘটনাগুলি অতি বেশী অবাস্তব ব'লে তাদের interest পাঠকের কাছে খুবই কম। কিন্তু গল্প এমনি ভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর চিত্তাকর্ষতার ন্যূনতা সত্ত্বেও গল্প সরস হ'য়ে উঠেছে। যে ওজন-বোধে গল্পগুলি চ'লেছে তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলে সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হ'তো।

"ঘোষালের ত্রিকথা"র প্রথম গল্পে ঘোষালকে আমরা মকদমপুরের জমিদার রায় মশায়ের বৈঠকখানায় ফরমায়েসি গল্প বলায় নিযুক্ত দেখি। অরসিক জমিদারের নানা অদ্ভুত প্রশ্নে জর্জ্জরিত হ'য়ে, সভাস্থ সকলের ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান বাঁচিয়ে যে ভাবে তার গল্প সে টেনে নিয়ে গেছে, তাতে তার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের আশ্চর্য্য পরিচয় মেলে। উপবিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে

তর্ক উঠে গল্প অগ্রসরের যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, তা একদিকে যেমন গল্পাভ্যন্তরীণ গল্পটির পৌনঃপুনিক interludeএর কাজ ক'রেছে, অন্যদিকে তেমনি আবার জমিদারী বৈঠকখানার আবহাওয়া সুন্দর ভাবে ঘনিয়ে তুলেছে। একসঙ্গে চৌধুরী মহাশয়কে দুটি কাজ ক'রতে হ'য়েছে—ঘোষালের গল্পের প্রতি পাঠকের মনকে উজ্জীবিত রাখা ও তারই চারদিকে মজলিসী আবহাওয়া রক্ষা করা। গল্প বলার অনুপযুক্ত এই বিশৃঙ্খল আসরে ঘোষালকে সব সংক্ষেপে সারতে হ'য়েছে। কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এম্‌নি মৌলিক ও অস্পষ্টতা-দোষমুক্ত যে, মনের মধ্যে তা পরিষ্কার রেখায় ছাপ ফেলে যায়। একটা নমুনা দিচ্ছি—

"সুন্দরীর দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার ঠোঁটের মত পাতলা।"

"ঘোষালের ত্রিকথার" দ্বিতীয় গল্প "ঘোষালের হেঁয়ালীতে" ঘোষাল জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুরের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। গল্পের সকল সৌন্দর্য্যের মধ্য থেকে "একটি বিধবা—the woman in white", যার দেখা সাক্ষাৎ জমিদার বাড়ীর লোকে বড় একটা পায় না, অথচ যার নীরব প্রভুত্ব সকলেই অনুভব করে ব'লে, ঘোষাল যাকে "বিদেহ আত্মা" ব'লে উল্লেখ ক'রেছে—সেই "ঠাকুরাণী" তার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। আমার নিজের বিশ্বাস তৃতীয় গল্পের "বীণাবাইয়ের" পরিকল্পনার অঙ্কুর এই "ঠাকুরাণীর" মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। আর একদিক থেকেও এ গল্প পরবর্ত্তী গল্পের সূচনাস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। জীবনটাকে ঘোষাল যে "প্রহসনরূপে দেখ্‌তে ও দেখাতে চেষ্টা ক'রে," "যাদের ধন আছে, মন নেই, সেই সব জীবদের মোসাহেবী" ক'রছে, তার কারণ সম্ভবতঃ সংসারে ঢুকেই কোনো একটা ট্রাজেডি তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে—ঘোষাল সম্বন্ধে "ঠাকুরাণীর" এই অনুমান। এ অনুমান যে সত্য, তার জীবনে কোথাও যে একটা গভীর ক্ষত আছে যার ফলে জীবন তার "নৈয়া ঝাঁঝরি অর্থাৎ ফুটো নৌকো"—সত্যিমিথ্যা মেশানো সেই ইতিহাস শেষ গল্পটিতে ঘোষাল ব্যক্ত ক'রেছে। বস্তুতঃপক্ষে "ঘোষালের ত্রিকথা"-র গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ঘোষাল-চরিত্রের ক্রমপরিণতি ফুটে উঠেছে। ঘোষাল-চরিত্রের ক্রমবিকাশের সূক্ষ্মধারা অবলম্বন ক'রে তার চারদিকে যে গল্পগুলি সাজিয়ে তোলা হ'য়েছে তাতে এই

কথাই বারবার মনে জাগে, এ যেন কোনো ক্ষীণস্রোতা নদীর মন্দধারার আশেপাশের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। ঐ সৌন্দর্য্যই মনকে বেশী আকর্ষণ করে, কিন্তু নদীর অনাড়ম্বর মন্দ-গতিও ভালো লাগে।

শেষ গল্প "বীণাবাই" এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। "বীণাবাই"—স্বপ্ন, "ঘুমের ঘোরে বোঝা যায়, কিন্তু জেগে অপরকে বোঝানো যায় না।" "বীণাবাইকে" ঘিরে রোমান্সের এক অপূর্ব্ব মণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তার মধ্য থেকে বীণা তার অলৌকিক জ্যোতি নিয়ে পাঠকের মনকে অভিভূত ক'রে বিরাজ ক'রছে। বীণা প্রথমে দেবী, পরে মানবী—"heaven and earth in one sole name combined"। স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে এই যে দ্রুত বিবর্ত্তন এতে চৌধুরী মহাশয় যে সংযত শিল্প-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। ভার-সাম্যের এতটুকু তারতম্য ঘট্‌লে, সমস্ত গল্পটি মেলোড্রামেটিক হ'য়ে প'ড়ে, "শিব গড়তে বাঁদর গড়ার" মত হ'তো। এতদিন পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রেমের গল্পের পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে এসেছি, তা' হ'চ্ছে—"Love is both a mystery and a joke"। এই জন্য তাঁর প্রেমের গল্পের বিষয়বস্তু ও আবেষ্টনের মধ্যে এইটা mystery থাকলেও তার তলে তলে সর্ব্বদাই একটা লঘু পরিহাসের আভাস পাওয়া যেতো। "বীণাবাইতেই" প্রথম দেখলাম প্রেমকে তিনি শুধুই mystery ব'লে অনুভব ক'রেছেন।

"বীণাবাইয়ের" ভাষাতে একটা যাদু আছে। ভাষায় গতি ও সংহতির সু-সমাবেশে এ যাদু সম্ভব হ'য়েছে। উপরে ঈষৎ-কম্পিত ভাষার অন্তস্তল থেকে গভীর আবেগের আভাস চাপা আগুনের মত ভেসে আসে। একদিকে "বীণাবাই" যেমন রোমান্স, অন্যদিকে তেম্‌নি আবার যথেষ্ট dramatic রসও গল্পটিতে র'য়েছে। এ দুই বিপরীত গুণের সু-সমন্বয় গল্পটির সাফল্যের প্রধান কারণ। গল্প যত শেষের দিকে এগিয়েছে, বীণা যত মানবী হ'য়ে উঠেছে, ততই গল্পের এই dramatic element গল্প ফুটিয়ে তুলতে বেশী সাহায্য ক'রেছে। গল্পের অনেকদূর পর্য্যন্ত বীণা তার অপূর্ব্ব সঙ্গীত, দিব্য মুখশ্রী, সংযত ও আত্মবশ কণ্ঠস্বর নিয়ে পাঠকের কল্পনাতে "একধারে চিত্র ও সঙ্গীত", "অর্দ্ধেক মানবী, অর্দ্ধেক কল্পনা", ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনার ফলে দেখা গেল, বীণার মনের গভীরে অন্ধকার ও আলোড়ন, যদিও বাইরে তার আলো ও

প্রশান্তি। তার মনের এই অজ্ঞাত রহস্য, তার সংক্ষিপ্ত, অসংবদ্ধ ও অসংলগ্ন নানা ছোটো খাটো কথার মধ্য দিয়ে, তার মনের অস্থিরতার পরিচয় দিয়ে, আশ্চর্য্য কৌশলে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হ'য়েছে। যা ছিল শুধুই কেবল শিল্পীর হাতে কোঁদা মূর্ত্তি তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন সঞ্চার হলো ;—বীণা মানবী হ'য়ে উঠলো।—নিবিড়ভাবে বীণার ট্রাজেডি পাঠকের মনে জাগরূক হ'য়ে রইল।

পূর্ণেন্দু গুহ

গত মাঘ সংখ্যায় শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "লক্ষ্মীছাড়া" নামক একটি গল্প 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত গল্পটি শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "লক্ষ্মীছাড়া" নামক গল্পের হুবহু প্রতিলিপি। আমরা শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্লজ্জতায় ও দুঃসাহসিকতায় স্তম্ভিত হইয়াছি। আশা করি আমাদের পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিবেন যে এ-ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায় কারণ সম্পাদকের পক্ষে প্রত্যেক রচনা যাচাই করিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব।—পঃ সঃ।

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্জান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৪৪

পরিচয়

সাংখ্যের সাংপরায়

২

গতবারের 'পরিচয়ে' সাধারণ জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে আমরা সাংখ্য মতের আলোচনা করিয়াছি—আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুর পর জীব স্থূলদেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে, সাধারণতঃ লিঙ্গদেহ অবলম্বন করতঃ সংসৃতি করে—

পুরুষার্থং সংসৃতি লিঙ্গানাম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।১৬

ঐ সংসৃতির প্রকার ও প্রণালী কিরূপ? ইহার উত্তরে কারিকা বলেন—নটবৎ অবতিষ্ঠতি লিঙ্গম্—অর্থাৎ নট যেমন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি লিঙ্গশরীর-উপহিত জীব বিবিধ ও বিচিত্র স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া কখন দেব, কখন মানুষ, কখন পশু, কখন স্থাবর রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

তৎ-তৎ-স্থূলশরীরগ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশুর্বা বনস্পতির্বা ভবতি সূক্ষ্মশরীরম্—বাচস্পতি

সাধারণ মানুষের ইহাই সাংপরায় (eschatology)—কিন্তু যাঁহারা অ-সাধারণ, যাঁহারা 'কুশল,' যাঁহারা সাধনসিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁহারা অতি-মানব—তাঁহাদের পরলোকগতি কিরূপ? এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের সংসৃতির বিরাম হয়—কুশলস্য অস্তি সংসারক্রম-সমাপ্তিঃ অর্থাৎ—'consummation est—it is finished'

ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে—ব্যাসভাষ্য

সাংখ্য-মতে প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত অসংকীর্ণ—দোঁহার মধ্যে কোনই

তাত্ত্বিক যোগাযোগ (relation) নাই। তথাপি অ-বিবেক-জন্য উভয়ের মধ্যে একটি কাল্পনিক সম্পর্ক (fancied relation) স্থাপিত হয়। তদ্‌যোগোঽপি অবিবেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৫৫। এই অবিবেক অনাদি (primeval)—

অনাদিরবিবেকঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১২।

পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই অবিবেককে 'অবিদ্যা' বলিয়াছেন—

তস্য হেতুরবিদ্যা—২।২৪

ঐ অবিদ্যার ফলে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পুরুষ চিত্তবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য (identification)-সিদ্ধি করিয়া নিজকে সুখী দুঃখী, কামী ক্রোধী, কর্ত্তা ভোক্তা জ্ঞাতা—এক কথায় 'বদ্ধ' মনে করে। ইহারই ফলে জীবের সংসৃতি। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষু ১।১৯ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যথা স্বভাবশুদ্ধস্য স্ফটিকস্য রাগযোগো ন জপাযোগং বিনা ঘটতে, তথৈব নিত্যশুদ্ধাদি-স্বভাবস্য পুরুষস্য উপাধি-সংযোগং বিনা দুঃখসংযোগো ন ঘটতে।

অর্থাৎ, যেমন স্বতঃ-স্বচ্ছ স্ফটিক (crystal) জবাফুলের সংযোগ ব্যতিরেকে রাগরক্ত দেখায় না—তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধ পুরুষের অবিদ্যা-উপাধির যোগ ভিন্ন দুঃখাদির সংযোগ ঘটে না।

অবিদ্যাবারণের উপায় বিদ্যা, অবিবেকনাশের উপায় বিবেকসিদ্ধি। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন—

বিবেকতঃ মোক্ষঃ—সাংখ্যসূত্র ৩।৮৪

অবিবেক হইতে যেমন বন্ধ, বিবেক হইতে তেমনি মোক্ষ। সা তু অবিদ্যা পুরুষখ্যাতিপর্যবসানা (ব্যাসভাষ্য)

When Purusa recognises its distinction from the ever-evolving and dissolving Prakriti, the latter ceases to operate towards it.

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবৎ—১।৫৬

অত্রাপি প্রতিনিয়মঃ অন্বয়-ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১৫

অন্ধকারোহি প্রতিনিয়তেন আলোকেনৈব নাশ্যতে ন অন্যসাধনেন ইত্যর্থঃ—ভিক্ষু

অবিবেক অন্ধকারতুল্য এবং বিবেক আলোকতুল্য। অবিবেক তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখে। কিন্তু বিবেক-সূর্য্যের উদয় হইলে সে তমঃ তিরস্কৃত হয়।

অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবৎ চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।*
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্ বিপ্রর্ষে! বিবেকজম্॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৬২

সেইজন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন—অবিদ্যা অনাদি হইলেও অনন্ত নয়—It dissolves on the rise of true knowledge

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগ্যসূত্র, ২।২৬

প্রধানাবিবেকাদ্ অন্যাবিবেকস্য তদ্ হানে হানম্—১।৫৭

অর্থাৎ—প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক জন্য যখন বন্ধন, তখন সেই অবিবেকের হানি হইলেই বন্ধের হানি। সেই জন্য মোক্ষকে অবিবেকরূপ বাধা বা অন্তরায়ের তিরোধান মাত্র বলা হয়।

মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তেঃ—৬।২০

ঐ বিবেকজ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতি যেন লজ্জিতা হইয়াই পুরুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে।

প্রকৃতি র্জ্ঞাত-দোষেয়ং লজ্জয়েব নিবর্ত্ততে—নারদীয় পুরাণ

সাংখ্যেরা নানা ভাবে এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন—

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭০

'যেমন কুলবধূ দোষী বলিয়া প্রতিপন্না হইলে স্বামীর নিকট গমন করে না—প্রকৃতি ও যেন সেইরূপ। তাহার বিকারিত্বাদি দোষ পুরুষ যখন জানিয়া ফেলেন—তখন সে আর পুরুষের ত্রিসীমায় যায় না।'

অন্যভাবে বলা হয়—প্রকৃতি নিতরাং সুকুমারী—সে পুরুষের দৃষ্টি সহিতে পারে না। হঠাৎ যদি কোনও পুরুষ তাহাকে দেখিয়া ফেলে, তবে সে বিশেষ সংকুচিতা হইয়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিতে চায়।

---

* ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জাতং জ্ঞানং দীপবৎ, ন সর্বাত্মনা অজ্ঞান-নিবর্ত্তকং। বিবেকজং তু জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সর্বাজ্ঞান-নিবর্ত্তকম্ ইত্যর্থঃ—শ্রীধরস্বামী

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥ —৬১ কারিকা

ইহার ভাষ্যে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

এবং প্রকৃতিরপি কুলবধূতোঽপ্যধিকা, দৃষ্টা বিবেকেন ন পুনর্দ্রক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ।

পুনশ্চ—

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা। —৬৬ কারিকা

'প্রকৃতি আমার দৃষ্টা হইল'—অতএব পুরুষের উপেক্ষা জন্মে—'পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিল'—অতএব প্রকৃতি উপরতা হয়।

এই অবস্থাকেই সাংখ্যেরা 'প্রসংখ্যান' বলেন—প্রসংখ্যান = প্রকৃষ্ট সম্যক্ প্রজ্ঞান।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥—৬৪ কারিকা

এই জ্ঞান নিঃশেষ জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যিনি এই জ্ঞানে জ্ঞানবান্, যিনি 'কেবলী', যিনি বিবেকখ্যাতিতে নিষ্ণাত—তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে।

জীবন্মুক্তশ্চ—সাংখ্যসূত্র ৩।৭৮
ঐ অবস্থায়—ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ—৪।৩০
অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি,
কুশলাকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ তখন অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং সুকৃত দুষ্কৃত সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। সুতরাং—ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি (ব্যাসভাষ্য)—ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে সাধক জীবন্মুক্ত পদবী লাভ করেন।

তাঁহার সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
উদাসীনবদ্ আসীনং গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥—গীতা, ১৪।২২-৩

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহা নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা—'নিব্বাণস্সেব অন্তিকে'।

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

যে মে দুক্খং উপাদহন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দয়া কোপো ন বিজ্জতি ॥
সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খাপরং ॥ —চর্য্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ, যশঃ ও অযশঃ আমার নিকট তুল্যমূল্য। সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfecton of my equanimity)। ইহাকেই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিলেন—দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একঃ।

যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির ব্যাপার ও বিকার নিবৃত্ত হয়।

মুক্তং প্রতি প্রধান-সৃষ্ট্যুপরমঃ—৬।৪৪ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

অর্থাৎ, প্রকৃতি তখন 'relapses into inactivity'।

বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ—৬।৪৩

এই মর্ম্মে কারিকা বলিয়াছেন—

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥ ৫৯

সূত্রকারও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ—৩।৬৯

অর্থাৎ নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়।

সে অবস্থায় পুরুষ সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে অবস্থান করিয়া 'প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎ (as a spectator) অবস্থিতঃ স্বস্থঃ—(৬৫ কারিকা)

অর্থাৎ, the released Soul is a disinterested spectator of the world-show.

তন্নিবৃত্তৌ শান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৪

পুরুষের এই উদাসীনভাবকে 'অপবর্গ' বলে।

দ্বয়োরেকতরস্য বা ঔদাসীন্যম্ অপবর্গঃ—৩।৬৫

এই অপবর্গের অপর নাম 'কৈবল্য',—কারণ, ঐ অবস্থায় পুরুষ চিত্তবৃত্তির দ্বারা অপরামৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ বা কেবল ভাবে অবস্থিত থাকেন।

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ—যোগসূত্র, ৪।৩৪

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উভয়ই তিরোহিত হয়।

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে—১।১০৭ সূত্র

সে অবস্থায় পুরুষ বুঝিতে পারেন যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই, আমার কোন কিছু ব্যাপার নাই। বলা বাহুল্য, এইরূপ মুক্ত পুরুষের আর বন্ধন হয় না।

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধ-যোগোপি অনাবৃত্তিশ্রুতেঃ—৬।১৭

এইরূপ জীবন্মুক্তের সঞ্চিত কর্মের বিনাশ ও ক্রিয়মান কর্মের অশ্লেষ হইলেও প্রারব্ধ কর্মের সংস্কারাবশেষ দ্বারা কিছুদিন দেহস্থিতি প্রচলিত থাকে।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ

—৬৭ কারিকা

সংস্কার কি?

প্রক্ষীয়মানাবিদ্যাবিশেষশ্চ সংস্কারস্তদ্বশাৎ তৎসামর্থ্যাৎ ধৃতশরীরস্তিষ্ঠতি—বাচস্পতি

সূত্রকারও ঐ মর্মে বলিয়াছেন—

চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ—৩.৮২
সংস্কার-লেশতঃ তৎসিদ্ধিঃ—৩।৮৩

ঐরূপে ধৃত শরীরই তাঁহার অন্তিম দেহ। বুদ্ধদেবের ভাষায়,

সবে অন্তিম সারীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি—ধম্মপদ

ঐরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

গহকারক! দিট্ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি

'হে ঘরামি! এইবার তোমার 'হদিস' পাইয়াছি, তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ! আর নূতন ঘর গড়িতে পারিবে না।'

সংস্কারাবসানে জীবন্মুক্তের ঐ অন্তিম শরীরের পাত হইলে কি হয়? উত্তরে কারিকা বলিয়াছেন, তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন।

প্রাপ্তে শরীর-ভেদে চরিতার্থত্বাৎপ্রধান-বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যম্ আপ্নোতি—৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য লাভ করেন।'

পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তি র্গুণানাম্—৪।৩২
নহি কৃত-ভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রয়াঃ (গুণাঃ) ক্ষণমপি অবস্থাতুম্ উৎসহন্তে
—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণাম-প্রয়োজন (ভোগ ও অপবর্গ) চরিতার্থ হওয়ায়, গুণত্রয় ঐরূপ কৃতার্থ পুরুষের সম্বন্ধে আর পরিণাম-গ্রস্ত হয় না।

অধিকন্তু প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের লিঙ্গশরীররূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও নাশ হয়, অর্থাৎ—'his personality becomes extinguished'। ইহাকেই কারিকা বলিয়াছেন—'লিঙ্গস্য আ-বিনিবৃত্তেঃ'—এই লিঙ্গশরীরই যখন চিত্ত, তখন সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেরও লয় অবশ্যই সাধিত হয়।

ব্যুত্থান-নিরোধ-সমাধি প্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈঃ চিত্তং স্বস্যাং প্রকৃতৌ অবস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে **চেতসি প্রলীনে (পঞ্চ ক্লেশাঃ) তেনৈব অস্তং গচ্ছন্তি—১।৫১ ও ২।১০ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ ব্যুত্থানদশার নিরোধসংস্কার ও সমাধিদশার নিরোধসংস্কার—এতদুভয়ের সহ যোগসিদ্ধের চিত্ত নিজের নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং চিত্ত বিলীন হইলে তদনুবিদ্ধ অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশও তৎসহ অস্তমিত হয়।

এইরূপে চিত্তের লয় হইলে পুরুষ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ স্বচ্ছ

কেবল অবস্থায় চিরকালের জন্য অবস্থান করেন—'remains in a passive state of *eternal* isolation'*

তস্মিন্ (চিত্তে) নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে
—ব্যাসভাষ্য

ইহাই সাংখ্যের মুক্তি।

সাংখ্যমতে মুক্তির স্বরূপ কি ? এক কথায় বলিতে গেলে—

'In Mukti, *Purusas* will be seers with nothing to look at, mirrors with nothing to reflect, and will subsist in lasting freedom from *Prakriti* and its defilements as pure *chits* in the timeless void'.—Prof : Radha Krisnan.

সাংখ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। সূত্রকার বলিতেছেন—

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিঃ তদ্বৎ—৫।৭৫
ন বিশেষগতি র্নিক্রিয়স্য—৫।৭৭

'আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ বা বিশিষ্ট লোকে গতি মুক্তি নহে।'

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদি দোষাৎ—৫।৭৭
ন সর্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্বাদি দোষাৎ—৫।৭৮
এবং শূন্যম্ অপি—৫।৭৯

'বাসনারূপ উপরাগের উচ্ছেদ অথবা সর্ব্বোচ্ছেদ কিম্বা শূন্যতাসিদ্ধি মুক্তি নহে।'

ন দেশাদিলাভোপি—৫।৮০
ন ভাগিযোগো ভাগস্য—৫।৮১

'উৎকৃষ্ট দেশাদিলাভ বা অংশীর সহিত অংশের যোগও মুক্তি নহে।'

নাণিমাদিযোগোপি অবশ্যং-ভাবিত্বাৎ তদুচ্ছিত্তেঃ—৫।৮২
নেন্দ্রাদিপদযোগোপি তদ্বৎ—৫।৮৩

'অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি বা ইন্দ্রাদিপদ-প্রাপ্তিও মুক্তি নহে।'

* প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগস্য আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্—২।২৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

মুক্তি কি কি নহে—আমরা জানিলাম। কিন্তু এই অভাব-নির্দেশ দ্বারা মুক্তির স্বরূপ ত' জানা গেল না। সেই জন্য সূত্রকার বলিলেন—

নিঃশেষ দুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা—৩।৩৮ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা—৬।৫

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তিই মুক্তি।

সাংখ্য মতে পুরুষ চিন্মাত্র—'কেবল' অবস্থায় তাঁহার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্—যোগসূত্র, ৩।৫৫। তদা পুরুষঃ স্বরূপ মাত্র জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ মুক্তির অবস্থায় পুরুষ অমল কেবল হইয়া স্বীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সেই জন্যই মুক্তির নাম 'কৈবল্য'।

Kaivalya—from Kevala (alone)—means the isolation of the soul from the universe and its return to *itself*.—Max Muller's Indian Philosophy. এ মুক্তি অনেকটা গ্রীক্ মনীষী এরিস্টটলের State of blessedness-এর অনুরূপ—which is eternal thinking free from all activity.

কিন্তু বেদান্ত মুক্তিকে যে আনন্দরূপতা ('অতিশ্লীম্ আনন্দস্য') বলেন, তৎসম্পর্কে সাংখ্যের ব্যক্তব্য কি ?

সাংখ্যমতে আত্মা চিৎস্বরূপ মাত্র—

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৫০

সে মতে আত্মা আনন্দরূপ নহেন—

ন একস্য আনন্দ-চিদ্রূপত্বে, দ্বয়োর্ভেদাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৬৬

'অখণ্ড আত্মার একাধারে চিদ্রূপত্ব ও আনন্দরূপত্ব অসম্ভব।' অতএব সাংখ্যকার বলেন—

ন আনন্দাভিব্যক্তি র্মুক্তিঃ নির্ধর্মত্বাৎ—৫।৭৪

অর্থাৎ, আনন্দ যখন আত্মার ধর্ম্ম নয়, তখন আনন্দাভিব্যক্তি মুক্তি হইতে পারে না। অথচ সূত্রকার অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সমাধি, সুষুপ্তি ও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মরূপতা হয়।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা—৫।১১৬

তন্মধ্যে সমাধিতে ও সুষুপ্তিতে বন্ধবীজ রহিয়া যায়, কিন্তু মুক্তিতে ঐ বীজের ধ্বংস হইয়া নিপট ব্রহ্মরূপতা হয়।

দ্বয়োঃ সবীজম্, অন্যত্র তদ্ধতিঃ—৫।১১৭

আমরা জানি, ব্রহ্ম কেবল বিজ্ঞানঘন নহেন, তিনি আনন্দঘন—বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)। অতএব মুক্তিতে জীবের যখন ব্রহ্মরূপতা হয়, সে অবস্থা অবশ্য ভূমানন্দের অবস্থা—যে আনন্দ বাক্যমনের অতীত, ভাষায় যাহার বর্ণনা করা অসাধ্য।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

—তৈত্তিরীয়, ২।৪

সাংখ্যাচার্য্যেরা আর এক জাতীয় মুক্তির কথা বলিয়াছেন—তাহার নাম 'প্রকৃতি-লয়'। আমরা আগামী বারে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মানুষ

বাসের আড্ডার পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা লেকের দিকে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে দক্ষিণে তাকালে রেলের লাইন পার হয়ে গেঁয়ো ছোঁয়াচ পাওয়া যায় বটে কিন্তু এপারে সহর একেবারে দুরন্ত। বাসওয়ালা পাঞ্জাবীদের হৈ চৈ, চায়ের দোকানে অশ্ব-বিলাসীদের চীৎকার আর অনবরত বাস আর ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ। অমন যে চমৎকার পিচ-বাঁধানো চওড়া রাস্তা তাও মোটরের তেল আর কাদায় কদর্য্য হয়ে থাকে। বাসের আড্ডার পাশ দিয়ে চওড়া ফুটপাথ, ফুটপাথের সবুজ ঘাস এদিকটায় হলদে হয়ে এসেছে, মাথার ওপর ঘূর্ণিফলের গাছ। ফুটপাথটায় সম্প্রতি একটা বেতো ঘোড়া আড্ডা নিয়েছে। ঘোড়াটার পিঠের হরেক রকম ক্ষতগুলো যদি তার রোদেপোড়া লালচে চামড়ার সঙ্গে মিশে না থাকত তাহলে তাকে জেব্রা বলা ভুল হোত না। সেই ক্ষতগুলোর ওপর দিনরাত মাছি ভন ভন করে। কুড়ে ঘোড়াটার লেজ নেড়ে মাছিগুলোকে তাড়াবার শক্তি বা ইচ্ছাটুকুও নেই। নেহাৎ অসুবিধা হলে সে মাঝে মাঝে বেতো পা মাটিতে ঠুকে আপত্তি জানায়, তারপরে আবার নির্ব্বিকারে সেই হলদে ঘাসগুলো চিবুতে থাকে।

ঠিক সেই ঘোড়াটার পাশে ফুটপাথের ওপর একদিন দেখা যায় কয়েকটা ময়লা কালচিটে কাঁথা, ভুষোয় কালো হয়ে যাওয়া দুটো কেলে হাঁড়ি আর তিনজন ভিখিরী।

একটা ন্নুলো, একটার ডান হাত কাটা, আর একটা মেয়ে।

তারা সেই ফুটপাথের ওপর ঘূর্ণিফল গাছের তলায় বেতো ঘোড়াটার পাশে সংসার পেতে বসে। ন্নুলো আর হাত-কাটা পুরুষ দুটো যায় ভিক্ষে করতে, মেয়েটা ভিক্ষেও করে সেই সঙ্গে কাঠ কুটো, ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা প্রভৃতি তাদের সাংসারিক আবশ্যকীয় জিনিস জোগাড় করে আনে। মেয়েটা ওদের সংসার-যুদ্ধের নেতা। মেয়েটার বয়স আছে। গায়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ময়লা কাপড় এবং তাতে বাহুল্য নেই। পোষাক জিনিষটা যে লজ্জা নিবারণের জন্য সেটা

মেয়েটাকে দেখলেই বোঝা যায়। আর গায়ে তার জন্মদিনের থেকে ধূলোর প্রলেপ জমা হচ্ছেই। চুল উস্কো-খুস্কো জট পাকান। তবু তার ভেতর দিয়ে যৌবন প্রচার করে নিজেকে। মেয়েটার নাম—ওদের আবার নামের কে খোঁজ রাখে ?

ওদের জীবনে বৈচিত্র্যও আছে গতানুগতিকতাও আছে। যতদিন না বিশেষ প্রয়োজন হয় বা পুলিশে উঠিয়ে না দেয় ততদিন ওরা ওই ফুটপাথে পড়ে থাকবে, সেইটুকুই ওদের জীবনের গতানুগতিকতা। তারপরে আবার অন্যত্র এক গাছতলা, অন্য এক ফুটপাথ।

ওই ফুটপাথের ওপরেই দিন যায়। দিনে তাদের বড় দেখা যায় না। রাতে দেখা যায় ফুটপাথের একপাশে কুচো কাঠের আগুন জ্বলছে, আগুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো আর তার সামনে মেয়েটা বসে আছে নির্ব্বিকার। আগুনের লাল আভায় মেয়েটার নোংরা মুখ আরও কদাকার দেখায়। শুকনো জট-পাকান চুলগুলো ওড়ে, মুখে কোন ভাবের চিহ্ন মাত্র নেই। আরও রাতে নুলোটা আর হাত-কাটাটা ফিরে আসে। বিশেষ কিছু কথা বলার ওদের প্রয়োজন হয় না। কথা ওদের কাছে বাহুল্য। নুলোটা বসে পড়ে, বসে পাশেই এক থাবড়া থুতু ফেলে, তারপরে কোথা থেকে একটা বিড়ি বার করে বলে—একটু আগুন দিস তো কাপাসী। কাপাসী বিড় বিড় করে বলে—হুঁ তোর মুখে দোব। পাশেই বেতো ঘোড়াটা পিঠের পেশী গুলোতে ঝাঁকুনী দেয়। হাত-কাটা লোকটা তাড়া দেয় অকারণে—হঠ্ হঠ্ টি!

খাওয়ার পর সেই ঘূর্ণিফল গাছতলায় কাপড়টা গায়ে টেনে দিয়ে তারা শুয়ে পড়ে পাশাপাশি। ওদের আবার নারী পুরুষের ব্যবধান! নুলোটা তার নুলো হাত দিয়ে একবার কাপাসীকে স্পর্শ করে। কাপাসী শিউরে ওঠে, বলে—ওই পোড়া কাঠ দেখেছিস ত, মুখে গুঁজে দোব একেবারে!

নুলোটা ছাতলা-পড়া দাঁত বার করে হাসে। লেকের ওপরে চাঁদ হেলে পড়ে, নিরালা পথে সার সার ইলেকট্রিক বাতীগুলো জ্বলে মরে, রাত তখন গাঢ় গভীর। ঘুমন্ত ঘোড়াটা শরীরে ঝাঁকুনী দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে।

দিন যায়। সমুদ্রের অবিশ্রাম ঢেউয়ের মত গতানুগতিক দিন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা কাপাসী রাঁধছে, নুলো আর হাত-কাটা লোকটা সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরেছে। আগুনের সামনে কাপাসীর মুখ মেডুসার মৃত মুখের মত নিথর। একটা খোঁড়াকে দেখা যায় এ পথে। বগলে লাঠি ছুটো ভঁর দিয়ে লোকটা এগিয়ে আসে ওদের দিকে। একটা পা তার হাঁটুর নীচে থেকে কাটা। খোঁড়াটা এসে নুলোটার কাছে দাঁড়ায়, একবার কাপাসীর হাঁড়ির দিকে দেখে বলে—শালা পয়সা জোটে ত ভাত জোটে না।

খোঁড়াটা ট্যাঁক থেকে ছুটো বিড়ি বার করে নুলো আর হাতকাটাটাকে দেয়। তারপরে ভাষায় যা প্রকাশ করে তার ভাবার্থ, রোজ ছুটি গরম ভাত, অন্ততঃ একবেলা পেলে, সে এদলে থেকে যেতে রাজী আছে।

নুলোটা বলে—ভাগ, ভাগ্ শালা। হাতকাটাটা হেসে ওঠে, তারপরে নুলোটার দিকে ফিরে বলে—ভাত রাঁধবার জন্যে শালার বিয়ে করলেই হয়। শালা রাজপুত্তুর!

খোঁড়াটাও হেসে ওঠে। আকারে ছোট্ট, গায়ের রংটা তামাটে বলা চলে, লোকটা জানে কখন অপমান গায়ে মেখে নিতে হয়। সে একবার কাপাসীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তার পয়সার বাটিটায় নাড়া দেয়, বলে—পয়সা আছে।

নুলোটা বলে—পথ দেখ না শালা, তখন থেকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করতে লেগেছে।

এতক্ষণে কাপাসী একটা কথা বলে। সেই আগুনের ওপর থেকে মুখ না তুলেই সে বলে—থাক না। নুলোটা গর্জ্জে ওঠে—থাক না! শালীর বেটি শালীর আবার পিরীত জেগে উঠল!

কাপাসী এবার মুখ ছোটায়। সে ভাষা কাগজের সাদা বুকে ওঠান যায় না। একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যায়।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় খোঁড়াটা রয়ে গেল ওদের দলে।

আবার দিন যায়। জীবনের প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রমটুকু খাপ খেয়ে যায় ওদের দিনে। আবার সেই বাঁধা দিন।

খোঁড়াটার ফিরতে একটু রাত হয় কিন্তু রোজগার হয় বেশী। সেদিন হাতকাটাটা ফিরে এসে বলে—শালাকে দেখলুম।

—কাকে রে? মুলো প্রশ্ন করে।

—কাকে আবার? আমাদের রাজপুত্তুর। শালা ভিক্ষে মাঙ্গে মা ত যেন থ্যাটার করে!

"জয় হোক রাজাবাবু, ভগমান আপনার মঙ্গল করবেন, আপনার জয়জয়-কার হবে!" সুর করে দেখিয়ে দেয় হাতকাটাটা।

মুলো হেসে ওঠে। কাপাসী নির্ব্বিকার।

গভীর রাতে যখন মুলোটা আর তার সঙ্গী ঘুমিয়ে পড়ে, খোঁড়াটা জিগ্যেস করে চুপি চুপি—কাপাসী ঘুমুলি?

—না, কেন?

—তোর জন্যে কি এনেছি দেখ।

—কী?

—এই দেখ!

মুলোটাকে ডিঙ্গিয়ে হাতের মুঠোটা সে বাড়িয়ে দেয় কাপাসীর দিকে। কাপাসীর হাতে একটা সোনার দুল চিক চিক করে ওঠে।

—কোথায় পেলি? চুপি চুপি জিগ্যেস করে কাপাসী।

—কুড়িয়ে।

—কুড়িয়ে? মিথ্যেবাদী!

খোঁড়াটা মুখ টিপে টিপে হাসে।

লেকের ওপারে ঘন কালো অন্ধকার। পথ নিরালা।

সকালবেলা ওরা ভিক্ষেয় বেরিয়ে যায়। কাপাসী খোঁড়াটাকে জিগ্যেস করে—তুই গেলি না আজ?

খোঁড়াটা জবাব দেয়—যাব। একটু চা করবি কাপাসী?

—উঃ মুখপোড়া রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর!

খোঁড়াটা হাসে, তারপরে ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা বার করে বলে—যা কাপাসী লক্ষ্মীটি, আমি ততক্ষণ কিছু কাঠ ধরিয়ে ফেলি।

কাপাসী হেসে ফেলে, তারপরে পয়সা দুটো নিয়ে চলে যায়। খোঁড়াটা কাঠ ধরাতে বসে।

কাপাসী যখন ফিরে আসে খোঁড়াটা তখন কাঠের ধোঁয়ায় নাজেহাল হয়ে গেছে, কাপাসীকে দেখে বলে—শালার কাঠ!

কাপাসী হেসে ওঠে—নে নে খুব হয়েছে, এই নে চা।

—তৈরী চা?

—হ্যাঁ রে মুখপোড়া।

—কোথায় পেলি?

—ওই ত পাঞ্জাবীর দোকানে, নে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

—দাঁড়াতে বলেছে কে? তুই খাবি না।

—আমি? না।

—দূর তা কি হয়? তোর সঙ্গে খাব বলেই ত বললুম।

—আ মরণ!

—নে নে একটা ভাঁড় এনেছিস ত? কিছু বুদ্ধি নেই। নে আগে তুই খানিকটা খেয়ে নে, তারপর আমায় দিস।

কাপাসী একবার খোঁড়াটার দিকে তাকায়, তারপরে ভাঁড়টায় চুমুক দিতে সুরু করে।

ভাঁড়টা তাকে দেবার সময় খোঁড়াটা কাপাসীর হাতটা চেপে ধরে তাকে টানে। কাপাসী হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—আ মরণ, মুখপোড়া কত ন্যাকরাই জানে!

খোঁড়াটা বলে—এখানটায় আয় না কাপাসী, কাছে এসে বোস।

—ভাগ্ ভাগ্, কাজে যা।

—তুই যাবি না?

—হুঁ! কাপাসীর সুরে দেখা দেয় শৈথিল্য, তারপরে তারা চুপচাপ বসে থাকে। খোঁড়াটা একটা বিড়ি এগিয়ে দেয় কাপাসীর দিকে। পথের ধারে ঘূর্ণিফলের গাছের ছায়ায় তারা বসে বসে বিড়ি টানে। বেতো ঘোড়াটা পাশে পা ঠোকে। সামনে গর্জ্জন করে বাস আর ট্রামগুলো ব্যস্ত জগতকে বয়ে নিয়ে চলে।

দিন গড়িয়ে রাত আসে। খোঁড়াটার ফিরতে দেরী হয়। সেদিন আরও দেরী হোল। নিস্তব্ধ পিচ-বাঁধান পথে তার বগলের লাটি ছুটো বাজতে থাকে ঠক ঠক…

হাতকাটাটা বলে—ওই যে, শালা আসছে।

খোঁড়াটা এসে বলে—তোরা শুয়ে পড়েছিস? আমার ভাত কই রে কাপাসী?

কাপাসী জবাব দেয়—হাঁড়িতে আছে, নিয়ে খা।

—একটু বসে থাকতে পারিস না বুঝি? খোঁড়াটা উসকে ওঠে।

—পাচ্ছিস খা, শালার আবার রোয়াব—মুলোটা জবাব দেয়।

খোঁড়াটা গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে খেয়ে নেয়।

তারপরে গভীর রাতে কার ঠেলায় খোঁড়াটার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাপাসী।

কাপাসী চুপি চুপি বলে—চুপ, শব্দ করিস নি এখুনি টের পাবে।

খোঁড়াটা মুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে ওঠে, কাপাসীর হাত ধরে টান লাগায় সে—বোস না।

—না, এখানে বড্ড আলো।

—তবে কোথায়?

—আয়, ওই ঘোড়াটার ওপাশে যাই।

খোঁড়াটা উঠে তার লাঠি ছুটো তুলে নিতে যায়। কাপাসী বলে—আবার লাঠি কেন, আওয়াজে যে পাড়াশুদ্ধু জেগে উঠবে। নে আমার কাঁধটা ধর।

কাপাসীর কাঁধ ধরে নেংচাতে নেংচাতে খোঁড়াটা আর কাপাসী মাঠের দিকে এগিয়ে যায়।

মানুষের গায়ের নোংরা গন্ধ, আকাশে চাঁদ, লেকের ওপারে অন্ধকার, সিগ্‌নালের লাল বাতী। ঘোড়াটা অসহিষ্ণু হয়ে পা ঠোকে, সময়ের পাখায় এসেছে গতি।

—শালা বদমাস। খোঁড়াটা বলে।

—কে?

খোঁড়াটা ঘোড়াটাকে দেখিয়ে দেয়। কাপাসী হাসে, সে হাসি বাঁকা চাঁদের মত রহস্যময়। চুপি চুপি চোরের মত এসে ওরা শুয়ে পড়ে। আকাশের

বোবা চাঁদ আর পৃথিবীর বোবা ঘোড়াটা ছাড়া তাদের নিশীথ অভিযানের কোন মুখর সাক্ষী থাকে না।

•

অনেকগুলো দিন যায়, একই ভাবে, একই পথে। খোঁড়াটার দিনগুলো হয়ে ওঠে স্থির অচঞ্চল আর কাপাসীর দেহে শৈথিল্য। জীবন মৃদু পায়ে ছুটে চলে।

একদিন রাতে তেমনি চোরের মত চুপি চুপি উঠে খোঁড়াটা কাপাসীকে জাগায়—উঠে আয়।

কাপাসী সেদিন বলে—না।

—কেন?

—না, শুয়ে পড়্‌গে যা।

—কেন?

—আমি যাব না।

—তবে কাল।

—না।

—কোনদিন আসবি না?

—না।

খোঁড়াটা চিন্তিত মুখে ফিরে যায়। খোঁড়াটা চিন্তিত মনে শুয়ে পড়ে।

তারপরে একদিন রাতে খোঁড়াটা যথারীতি দেরী করে ফেরে। মুলোটা আর হাতকাটাটা বসে বসে বিড়ি টানছিল, খোঁড়াটা তার পয়সার বাটিটা তাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—আজ অনেক হয়েছে।

মুলোটা হঠাৎ বাটিটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, পয়সাগুলো ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। মুলোটা হিংস্রভাবে খোঁড়াটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তারপরে যথাসাধ্য কীল চড় ঘুসী চালায়, হাতকাটাটাও যোগ দেয়।

—শালা বেইমান হারামজাদা বদমাস। বেরো বেরো, শিগ্‌গির।

মুলোটা হাঁফাতে থাকে।

খোঁড়াটা একটা কি বলবার চেষ্টা করে।

৩

—ভাগ্ ভাগ্ শালা, খুন করে ফেলব এখুনি !

খোঁড়াটা একবার কাপাসীর দিকে অসহায় ভাবে তাকায়, তারপরে লাঠি দুটো তুলে নিয়ে পথে নেমে পড়ে। নিস্তব্ধ পিচের রাস্তায় তার লাঠির আওয়াজ ঠক ঠক করে বাজতে থাকে, তারপরে ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়।

কাপাসী নির্ব্বিকার পাথরের মত বসে থাকে।

খানিকটা সময় কাটে। হাতকাটাটা একবার রসিকতার চেষ্টা করে—যাক দলে চারজন ছিল, চারজনই রয়ে গেল, হ্যাঃ হ্যাঃ···

তারপরে মুলোটার কাছে হিংস্র একটা ধমক খেয়ে সে চুপ করে যায়।

শ্রীসুকুমার দে সরকার

ভারতবর্ষ

দুঃখক্লিষ্ট অত্যাচার-জর্জ্জরিত হে আমার দীন জন্মভূমি
তোমারে প্রণাম।
দাঁড়াইয়াছিলে আসি' একদিন রাণী-বেশে তুমি
নিখিল অঙ্গনমাঝে,—সেই বার্ত্তা শুনি অবিরাম।
হয়তো সেদিন বিশ্বে নাহি ছিল নিখিল অঙ্গন,
সাগর-কন্তিত ধরা খণ্ড খণ্ড নিবিড় কানন,
একেলা তোমার মুখে সেদিন প্রভাত আলো আসি'
পড়েছিল হাসি'।

সেকথা ভুলিতে নারে আজি তব দীন পরাজিত
সন্তানের দল।
পূর্ব্ব পুরুষের গর্ব্বে অকারণ অহঙ্কারে স্ফীত,
সেই স্মৃতিভার শুধু আজিকার পথের সম্বল।
সংসারের পদতলে আজি যেথা অপমানে লাজে
সংকোচে দাঁড়ায়ে মোরা রহিয়াছি ভিক্ষুকের সাজে,
তার লজ্জা, তার দৈন্য ভুলিবার একমাত্র পথ
প্রাচীন ভারত।

তাই আজি হেরি যবে অপমান-অবনত শির
ভিখারিণী বেশ,
মোরা স্মরি ঋষিবাক্য, 'এ সংসার অনিত্য অস্থির,
সকলি মায়ার লীলা, দুদিনেই হবে মায়া শেষ'।

পুরাতন ভারতের সভ্যতার গর্ব্ব দিয়ে ঢাকি
যে ক্লীবতা অক্ষমতা অপমান দিল ভালে আঁকি,
যে দারিদ্র্য পলে পলে জীবনেরে করিছে শোষন
নিষ্ঠুর ভীষণ।

পুরাতন ভারতের সে গৌরবগাথা শুনি আজ
লজ্জা লাগে মনে।
যত সত্য সে কাহিনী তত বেশী আমাদের লাজ
পতিত ভারতবর্ষ-অপমান হেরিয়া ভুবনে।
তার দর্প আজি শুধু নিষ্ঠুর সত্যের অস্বীকার,
কাপুরুষ সম স্বপ্নে পলায়ন শুধু বারম্বার।
মোদের দাঁড়াতে হবে ত্যজি চির-অতীত আশ্রয়
নিষ্ঠুর নির্ভয়।

সে অতীত সভ্যতার অহঙ্কার ভাঙিতে চাহিনা
কোন প্রশ্ন করি'।
নিষ্ঠুর কামুক স্বামী—তার সেবা নারী ধর্ম্ম কিনা,
শূদ্র বলি' মানুষের অপমান জন্ম জন্ম ধরি'।
সে অতীত মুছে যাক্ অতীতের ঘনচ্ছায়াতলে,
আমরা শুধাব শুধু, যে দারুণ দুঃখ আজি জ্বলে,
সে দারিদ্র্য, সে অসাম্য ঘুচাবার দেখাল কি পথ
প্রাচীন ভারত ?

বিপুল ভারত ভরি' অনশনে, অর্দ্ধ-অনশনে
লক্ষ নরনারী,
দিন হ'তে দিনান্তরে ক্লিষ্ট ভীত সঙ্কুচিত মনে
চলিয়াছে নিরানন্দ কঙ্কাল শ্মশান-পথচারী।

সেই মৃতপুরী মাঝে জীবনের নবীন সঞ্চার
একমাত্র লক্ষ্য আজি—যত বন্ধ, যত অত্যাচার
চরণে নিগড় সম মানুষেরে রেখেছে বাঁধিয়া
ফেলিতে টুটিয়া।

স্বাধীনতা যদি শুধু পুরাতন নাটকের নব
খোঁজে অভিনয়,
ঐশ্বর্য্যের অসমতা, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য-গৌরব
যদি খোঁজে ছদ্মবেশে নবীন প্রকাশ, নব জয়,—
সে নহে মোদের মুক্তি, সে নহে মোদের স্বাধীনতা,
শ্রমিক কৃষকতরে আনিবে না আনন্দ বারতা,
কঙ্কাল বিশীর্ণ দেহে আনিবেনা নবীন জীবন
হর্ষ উন্মাদন।

দীর্ঘ দিন রৌদ্র তাপে দহি চাষী সোনার ফসলে
ভরিছে ভুবন।
নব শক্তি সৃষ্টি করি' আপনার ক্ষুধার অনলে
রচিছে মজুরদল নব ঋদ্ধি, নবীন জীবন।
সে ফসলে, সে জীবনে তাহাদেরি নাহি অধিকার ?
সে অন্যায় ঘুচাইতে সে অসাম্য করি' অস্বীকার
অত্যাচার-নিপীড়িত সন্তানেরে দেখাইবে পথ
নবীন ভারত ?

বার্লিন, ১৯৩২

হুমায়ুন কবির

‘সঙ্গীত-তরঙ্গ’ ও গানের প্রাচীন ধারা

(১)

বর্ত্তমানে হিন্দুস্তানী বা ওস্তাদী গান নিয়ে যে বাদানুবাদ চলছে তাতে যোগ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন পুথি-পত্র থেকে গানের প্রাচীন ধারা সম্বন্ধে কিছু উপাদান সংগ্রহ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁরা গানের আলোচনা করছেন সে উপাদান হয়ত তাঁদের কথঞ্চিৎ উপকারে লাগতে পারে।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীত-সার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতসূত্র-সার ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ‘হিন্দুস্তানী’ গান বাংলা দেশে তাঁদের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং সে সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থের নাম হচ্ছে ‘সঙ্গীত-তরঙ্গ’। গ্রন্থকর্ত্তা ৺রাধামোহন সেনজ এবং প্রকাশক শ্রীআদিনাথ সেন। প্রকাশক “পুন সংশোধন পূর্ব্বক কলিকাতা কবিতা-রত্নাকর যন্ত্রালয়” হতে ১৭৭০ শকে (১৮৪৮ খৃঃ অঃ) এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রাধামোহন সেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের কত পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন এবং কোন সময়ে এ গ্রন্থ রচনা করেন সে সম্বন্ধে সঙ্গীত-তরঙ্গে আর কোন ইঙ্গিত নাই। এ অনুমান করা অন্যায় হবে না যে সঙ্গীত-তরঙ্গ বিগত শতকের প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিল।

গ্রন্থকার নিজে সঙ্গীত-তরঙ্গকে ভাষা গ্রন্থ বলেছেন। সুতরাং তাঁর সময়েও বাংলা ভাষা ঠিক জাতে ওঠে নাই। সঙ্গীত-তরঙ্গ ২০৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং সমস্ত গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকায় বলেছেন যে সঙ্গীত বিস্তার অনেক গ্রন্থ আছে এবং তিনি সে সব গ্রন্থ অবলম্বন করে সঙ্গীত-তরঙ্গ রচনা করেছেন—

‘অতএব কতকগুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া’ ॥

সঙ্গীত-তরঙ্গে গ্রন্থকার নানা মতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর কথা মানলে বলতে হবে যে সে সময়ে উত্তর ভারতে হনুমান মতই প্রবল ছিল—

হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ।
কলিকাতা অবধি যে বাঙ্গালার শেষ।
হিন্দুস্থানী লোক কি বাঙ্গালী লোক যত।
সকলের অতি গ্রাহ্য হনুমান মত ॥

সঙ্গীত-তরঙ্গে প্রথমে গানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লৌকিক গান দুভাগে বিভক্ত—আকৃতি ও সুকৃতি। আকৃতি ‘ধ্বন্যাত্মক’ এবং সুকৃতি ‘বর্ণাত্মক’। ধ্বনি দু’রকম—‘নার্থ’ অর্থাৎ অর্থশূন্য এবং ‘সার্থ’ অর্থাৎ অর্থযুক্ত। আঘাত, পতন, প্রভৃতি হতে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় সে ধ্বনি অর্থশূন্য এবং বাদ্যাদি হতে যে ধ্বনি হয় যেমন ‘তাধি-ধুন্না কিটিতাক্ ঝমক ঝমক ঝাঁ ঝাঁ ঝন’ তা অর্থযুক্ত। স্বর সাত প্রকার—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ‘কালায়তেরা’ এই স্বরকেই সুর বলেন। সাত স্বরের প্রথম অক্ষর নিয়ে ‘সারিগমধপনি’ তৈরী হয়েছে। কিন্তু ঠিক যে প্রথম অক্ষরগুলি নেওয়া হয়নি তা গ্রন্থকার জানেন এবং কেন তা নেওয়া হয় নি তার কারণও দেখিয়েছেন—

যদি কেহ কহেন ষড়জ শব্দ ছিল।
আদ্য ষকারে কেমনে আকার হইল।
ইহার মীমাংসা এই কর অবধান।
ব্যবহারে আছে যাহা তাহাই প্রমাণ।
সাধিবারে ষরজ অকার ভাল নয়।
আকারে উত্তমরূপে বিস্তরণ হয় ॥

সঙ্গীত-তরঙ্গে ‘আলাপ’ বা ‘আলাপনের’ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেছেন যে সারিগম দ্বারা কখনও আলাপন হয় না কারণ সে স্বরগুলি ‘হেলান দোলান’ যায় না। সেই জন্য আলাপনের জন্য অন্য স্বর গ্রহণ করা হয়েছে। এসব স্বরের সংখ্যা চব্বিশ—‘আনারিণা, নাদারেতোরোম, আনাতানোম, তানা-তানা, নানানা তারি’।

সারিগমপধনি এ বোলতে কখন।
নাহি হয় রাগ রাগিনীর আলাপন।
কারণ দণ্ডায়মান সুরেরা তাবতে।
নাহি যায় হেলান দোলান কোনমতে।

তাঁয়রে কোমলে হবে গমকের কোল।
অতএব আলাপনে এইমত বোল।
প্রথমেতে আনারিণা নাদারেতে রোম।
তাহার পরেতে আনা তানোম॥

গ্রন্থকারের মতে রাগ চার প্রকারের—রাগ-অঙ্গ, ভাষা-অঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ ও অপাঙ্গ। যেখানে শুধু রাগের রূপই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তাকে রাগ-অঙ্গ' বলা হয়। ভাষা-অঙ্গ হচ্ছে সেই গান যার কথা স্পষ্টরূপে গীত হয় এবং শোনামাত্রেই শ্রোতারা বুঝতে পারেন। এ গানের কথার উচ্চারণে কোন জড়তা নাই। যখন কথা বা বোল সুরের সঙ্গে থেকেও তাল লয় ও সুরের কোন হানি করে না তখন গানকে ক্রিয়াঙ্গ বলা হয় এবং এই তিন ধারার সামান্য বিচ্যুতি হয়েও যদি গান অশুদ্ধ না হয় তখন সে গানকে অপাঙ্গ বলা হয়।

রাগরঙ্গ খোলে তাতে শ্রোতা মগ্ন হন।
এ লক্ষণ প্রমাণেতে রাগ-অঙ্গ কন।
গান বোল অতি স্পষ্টরূপেতে গাইবে।
শ্রুতমাত্র শ্রোতাগণ বুঝিতে পারিবে।
জড়তা না জন্মে যেন বোলের প্রকারে।
এইরূপ হইলে ভাষা-অঙ্গ বলি তারে।
সুরে থাকিলে বোল সঙ্গে তাল লয়।
তাতে যেন কোন মতে বিসুরা না হয়।
এসব ক্রিয়ার দ্বারে করিবেন সাঙ্গ।
তবে তাহাকে তখন বলিব ক্রিয়াঙ্গ।
একত্রে করিয়া এই ত্রিবিধ প্রকার।
ন্যূনাধিক্য করিবেন উপরে তাহার।
তাতে যদি কোন মতে অশুদ্ধ না হয়।
অপাঙ্গ বলিয়া তবে তার নাম রয়॥

সঙ্গীত-তরঙ্গে প্রবন্ধাধ্যায় নামক একটী অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ে প্রবন্ধ ও বন্ধের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধের আর এক নাম বিবন্ধ। প্রবন্ধ ও আলাপনে কোন প্রভেদ নাই। আলাপনে রাগ ব্যবহৃত হয় কিন্তু তালের প্রয়োজন হয় না।

রাগ হয় তাল তাতে না হয় ঘটন।
রাগাদির আলাপন প্রকার যেমন॥

বন্ধ দুই প্রকারের—মার্গ এবং দেশী। মার্গ-সঙ্গীতের তিন ধারা, যথা—ধ্রুবপদ, খ্যাল ও টপ্পা। ধ্রুবপদকে সাধারণতঃ 'ধোরপদ' এবং সঙ্কেতে ধ্রুপদও বলা হয়। গ্রন্থকারের মতে ধ্রুও ধুয়া একই কথা এবং তার অর্থ হচ্ছে 'সঙ্কেত বর্ণ'।

ধ্রুশব্দে সঙ্কেত বর্ণ ধুয়া পক্ষে লেখি।
বহুবিধ গ্রন্থেতে লিখিত আছে দেখি।
সংস্কৃত প্রমাণে ধ্রুপদ বলা যায়।
ধোরপদ কন সবে প্রাকৃত ভাষায়।
ধ্রুবশব্দে ধুয়া তার পদশব্দে কলি।
এই দুই শব্দ যোগে ধ্রুবপদ বলি।

ধ্রুপদের নানা ধারা আছে। প্রথম ধারায় ছ'রকমের রচনা—রাজা-বাদশার যশবর্ণনা, সারিগম প্রকরণ, নৃত্যতত্ত্বকথন, মৃদঙ্গের বোল, আশিস্ এবং প্রেম-বিষয়। ধ্রুপদের পাঁচটি অঙ্গ—উর্দ্ধগ্রহ বা আস্থাই, মিলাকুক্, অন্তরা, ভোগ ও আভোগ। ধ্রুপদ চার প্রকারের—ফুলবন্ধ, যুগলবন্ধ, রাগসাগর এবং বিষ্ণুপদ। প্রথম দুই প্রকারের গানের কবিতা চিত্রকাব্য, রাগসাগরের কবিতা রাগের নামে রচিত, এবং বিষ্ণুপদ বা বিষণপদ গদ্যময়। খ্যালগান দুই চরণে শেষ ও তার সৃষ্টিকর্ত্তা হচ্ছেন শোলতান হোসেন। টপ্পার জন্ম পাঞ্জাবে। টপ্পাও দুই চরণে নিবদ্ধ।

দুই চরণেতে জন্মে খ্যালের আকার।
সৃষ্টিকর্ত্তা শোলতান হোসেন তাহার।
পাঞ্জাব হইতে হৈল টপ্পার জনন।
দুই চরণের মধ্যে তাহার মিলন।

এ ছাড়া তেজংলা বা চোতকলা, বারোয়া, তারাণা, কওল, জকরি, কড়খা, শাওড়া প্রভৃতি গানও গ্রন্থকারের মতে মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এলালি এলালোম জাতীয় অর্থহীন শব্দের দ্বারা তারাণা গঠিত হয়। তারাণার সৃষ্টিকর্ত্তা আমির খোশরো। গুজরাতি বা দক্ষিণী শব্দের দ্বারা জকরি গীত হয়। আর যুদ্ধকালে রাজপুতেরা যে গান করেন তাকে কড়খা বলে। এ গান ঢোল বাজিয়ে

আলাপ করা হয় বলে একে অনেকে 'ঢাড়ি'ও বলেন। শাওড়া মথুরার গোয়ালিয়াদের গান আর সে গানে আমির ওমরাদের গুণগানও করা হয়।

দেশীরাগ সঙ্গীত-তরঙ্গের মতে অসংখ্য। এ সব রাগের দেশী আখ্যা দেবার কারণ এই যে এগুলি সোমেশ্বরের সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত রাগগুলির বহির্ভূত। এসব দেশী রাগও শাস্ত্রীয় রাগ হতে উদ্ভূত কিন্তু "দেশে দেশে সৃষ্টি তাই দেশী নাম দিলা"। এই অসংখ্য দেশী রাগের মধ্যে কালয়তেরা ১৩২টী রাগ বেছে নিয়ে গেয়ে থাকেন।

"তাতে কালবৎ লোক সংক্ষেপ করিলা।
মধ্যে মধ্যে কতগুলি বাছিয়া লইলা।
শতাধিক দ্বিত্রিংশৎ রাগাদি প্রমাণ।
সেইসব বর্ত্তমানে গায়কেরা গান"।

সঙ্গীত-তরঙ্গে কত রকমের গায়ক আছে এবং তাদের কি কি লক্ষণ সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হয়েছে। গায়ক সাত প্রকারের—নায়ক, গন্ধর্ব্ব, গুণকার, কালবৎ, কয়্বাল, আতাই ও ঢাড়ি। এঁদের মধ্যে নায়ক শ্রেষ্ঠ, যিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পিঙ্গল এবং বীণ প্রভৃতিতে পারদর্শী। যাঁর কবিতা শক্তি আছে এবং মার্গ ও দেশী সঙ্গীতবিদ্যায় পরম পণ্ডিত সেই গায়কই নায়ক। প্রাচীনকালে নয়জন নায়ক ছিলেন—গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরা, আমির খোশরো দহলবি, লোহঙ্গ, চরজু, ভগবান, ছুঁদি খাঁ, দানো ও নায়ক বখ্সু। প্রথম আট জন ছিলেন দিল্লীর বাদশাদের সভায় এবং বখ্সু ছিলেন গুজরাতে। যিনি দেশী সঙ্গীত জানেন না, শুধু মার্গ-সঙ্গীতেই শ্রেষ্ঠ তাঁকে গন্ধর্ব্ব বলা হয়। এইরূপ একজন গন্ধর্ব্ব দিল্লীতে ছিলেন—তাঁর নাম সুরজ খাঁ এবং তাঁর যশ হেরাত পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। যে গায়ক মার্গ-সঙ্গীত বেশী জানেন না অথচ দেশীতে নিপুণ এবং নূতন সৃষ্টি করতে পারেন তাঁকে গুণকার বলা হয়েছে। মিয়া তানসেন গোবর্হারা এই পদবাচ্য এবং তিনিও ছিলেন দিল্লীতে। কালবৎ, সাধারণতঃ যাঁকে কালয়ৎ বলা হয়, শুধু দেশী সঙ্গীতেই নিপুণ কিন্তু তাঁর নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা নাই। সঙ্গীত-তরঙ্গে কালবৎ শব্দের অদ্ভুত অর্থনির্দ্ধারণ করা হয়েছে—

কাল হইতে এই নাম হইল ঘটন।
গানবস্তু প্রধান বস্তু তাল।
তাল হেন বস্তু তার মূলাধার কাল॥
কালবৎ প্রত্যয় হইল কালবৎ—

দিল্লীতে চৌদ্দ জন কালবৎ ছিলেন—লাল খাঁ, খাগুারা বীণকার, মোল্লা আশহাক, নেজাম খাঁ নওহার, হোসেন খাঁ, সেক পাঁচু, তাজবাহাদুর, ফতেপুরের সুরজ্ঞান খাঁ, মেরজা আকেল, সেক খেজর, চাঁদখাঁ হেরাত, চন্দেযার মিয়া দাউদ, তানসেনের দুই পুত্র—তারতরঙ্গ (?) ও সুরতসেন, ও তিনজন মৃদঙ্গী—রামদাস, দেবীদাস ও শ্রীমদন রায়। যে সব গায়ক কওল বা কয়্বাল গান করেন তাঁদের কয়্বাল আখ্যা দেওয়া হয়। কয়্বাল গান চার রকমের যথা কওল, কালবানা, নক্শগুল ও তারাণা। তারাণা ও তেলেনা অন্য লোকে অভিন্ন মনে করেন কিন্তু সঙ্গীত-তরঙ্গকার এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কওল শব্দ তাঁর মতে আরবি। আতাই ও ঢাড়ি সম্বন্ধে সঙ্গীত-তরঙ্গে বলা হয়েছে—

বেতন নাহিক লন ব্যবসাই নন।
তাঁহাকে আতাই বলি তাঁর নিদর্শন॥
আমির খোশরো ম্রজা আকেল যেমন।
ঢাড়ি ভাঁড় চর্ম্মকাদি কে করে গণনা—

(২)

সঙ্গীত-তরঙ্গের রচয়িতা শুধু যে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের মতামতই গ্রহণ করেছেন তা নয়, তিনি তোফতুল-হেন্দ নামক ফার্সী গ্রন্থ হতেও অনেক বিষয় উদ্ধৃত করেছেন। তোফতুল-হেন্দের রচয়িতার নাম মির্জা খান্ (সঙ্গীত-তরঙ্গে এ নাম 'ম্রজা জান' রূপে উল্লিখিত হয়েছে)। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। এ গ্রন্থ বিরাট এবং এর বিষয়বস্তুর পরিচয় সঙ্গীত-তরঙ্গে আছে—

প্রথমে পিঙ্গল ছন্দ দ্বিতীয় তাহার।
তৃতীয়তে অলঙ্কার চতুর্থে শৃঙ্গার।
পঞ্চমে সঙ্গীত ষষ্ঠে কোক বিস্তারিত।
সপ্তমেতে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বিহিত॥

পঞ্চম ভাগে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তার পরিচয়ও সঙ্গীত-তরঙ্গে আছে। সঙ্গীতশাস্ত্র সাত অধ্যায়ে বিভক্ত আর এই সাত অধ্যায় হচ্ছে—সুর, রাগ, তাল, নৃত্য, অরুণ, কোক ও হস্ত। অরুণাধ্যায়ে অঙ্গভঙ্গির প্রভেদ, কোকাধ্যায়ে নর-নারীর জাতির ভেদাভেদ এবং হস্তাধ্যায়ে নানা যন্ত্রের বর্ণনা আছে। সুর ও রাগের বর্ণনায় তোফতুল-হেন্দের রচয়িতা প্রাচীন ভারতীয় মত পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সোমেশ্বর, ভরত, হনূমন্ত ও কলনাথ (কল্লিনাথ) এ চারিমতই গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া তিনি পারসীক রাগিণীর এবং হিন্দুস্তানী ও পারসিক রাগিণীর সংমিশ্রণে যে সব নূতন রাগিণীর উদ্ভব হয়েছে তারও বিচার করেছেন।

তোফতুল-হেন্দের মতে পারসীক ও হিন্দুস্তানী রাগরাগিনীর সংমিশ্রণ হয়েছিল প্রথম আমির খোশরোর হাতে। আমির খোশরোর পাণ্ডিত্য ও তাঁর সঙ্গে গোপাল নায়কের প্রসিদ্ধ দ্বন্দের কথাও তোফতুল-হেন্দে বর্ণিত হয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় খোশরো দহলবি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মহা মহাকবি॥
তস্‌রি মস্তক তেব হেন্দেশা হায়েত।
জবর মোকাবেলা ফেকা এলাহিয়েত॥
মনাজেরা মনাজের রেয়াজিতৎপর।
তবই নজুমেত্যাদি শাস্ত্রেতে তৎপর॥

এই ফার্সী কথাগুলির অর্থও সঙ্গীত-তরঙ্গে দেওয়া হয়েছে: তস্‌রি=নিদান, মস্তক=তর্কশাস্ত্র, তেব=বাভট (বাগ্‌ভট?) বা চরক, হেন্দেশা=রেখাগণিত, হায়েত=খগোল, জবর মোকাবেলা=লীলাবতী, ফেকা=ধর্ম্মশাস্ত্র, এলাহিয়েৎ=বেদ, মনাজেরা=পরীক্ষা—"পড়িলে বিচারক্ষম হয়"; মনজের="চক্ষুর যে তেজ তার গতিক বিষয়," ম্লেচ্ছমতে 'আপটিক' (optic)—সঙ্গীত-তরঙ্গের মতে হিন্দুদের এ বিদ্যা 'লুপ্ত সমাচার'; রেয়াজি=ইংরাজ মতে 'ফেলাশফি' (philosophy); তবই="তাবৎ বিদ্যার সারসংগ্রহ", রেয়াজি এর অন্তর্গত, নজুম=জোতিষ বিদ্যা।

সুতরাং আমির খোশরো এই সমস্ত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন, উপরন্তু তিনি ছিলেন "অদ্বিতীয় গানে।" গোপাল নায়ক যখন বাদশা তোগলককে তাঁর সমকক্ষ গায়ক উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন তখন বাদশা আমির খোশরোর

শরণাপন্ন হলেন। আমির খোশরো বাদশার 'তক্তের নীচে' থেকে প্রথম দিন গোপাল নায়কের গান শুনে চুরি করে নিলেন।

গোপাল স্বকৃত দেশি রাগ গায়্যাছিলা।
খোশরো তাহাতে অন্য মিশ্রিত করিলা॥
আরবের রাগ আর পারসীক রাগ।
সেই হিন্দি রাগে মিলাইলা দুই ভাগ॥

পরদিন যখন খোশরো এই নূতন মিশ্রিত রাগ গাইলেন তখন গোপাল নায়ক বুঝতে পারলেন যে তাঁর বিদ্যা চুরি করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তবুও খোশরোর গুণমুগ্ধ।

এমন চোরের গুণ সর্ব্বকালে করি।
ধন্য ধন্য ধন্যরে চোরের বাহাদুরি।
সে যাহা হউক এ আমারি তুল্য বটে।
হয় তুম্বি সম ভাগে লব অকপটে॥
এত বলি তিন তুম্বি শিরে হৈতে লয়্যা।
আমির খোশরোকে দিলেন তুষ্ট হয়্যা॥

হিন্দুস্তানী রাগের সঙ্গে আরবী ও পারসীক রাগ মিশিয়ে খোশরো বারটি রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন। এগুলির নাম হচ্ছে—মোহিয়র বা মোহির, সাজগিরি, ইয়ামন বা ইমন, ওসাক, ময়্‌বাফেক বা দেওয়ালী, গানম, জিলফ, ফরগণা, শরপরদা, বাজরির, ফিরোদস্ত, সনম। এ সব রাগিণীতে যে সব রাগ-রাগিণীর রূপ মিশ্রিত হয়েছে সে সম্বন্ধে তোফতুল-হেন্দের মতও সঙ্গীত-তরঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মোহিয়র—গারা ও পারসীক এরাক।

সাজগিরি—পূরবী, গৌরী, গুণকলী এবং পারসীক রাগ, অথবা পূরবী, বিভাষ ও পারসীক।

ইয়ামন—হিন্দোল ও পারসীক।

ওসাক—শারঙ্গ, বসন্ত এবং পারসীক।

ময়্‌বাফেক—টোড়ী, মালশ্রী এবং পারসীক দোগা ও আরবি হোসেনি।

জিলফ—ষট ও পারসীক।

ফরগণা—গুণকলী, গৌরী ও পারসীক।

শরপরদা—গৌরশারঙ্গ ও পারসীক অথবা গৌণ্ড বেলায়ল, পূরবী ও পারসীক অথবা মল্লার, টোড়ী ও পারসীক।

বাজরি—দেশকার ও পারসীক রাগ।

ফিরোদস্ত—কানড়া, গৌরী, পূরবী, শ্যাম ও পারসীক অস্ত।

সনম—কল্যাণ ও পারসীক রাগ।

তোফতুল-হেন্দ হতে সঙ্গীত-তরঙ্গের রচয়িতা হোসেন শা'র ইতিহাসও উদ্ধার করেছেন।

শোলতান হোসেন সরকি তাঁর নাম।
পূর্ব্বদিকে অধিকার ছিল বাদশার।
নামেতে জয়নপুর রাজধানী তাঁর॥

এই হোসেন শা সতেরটি মিশ্র রাগের সৃষ্টি করেন। এই সতেরটি রাগ হচ্ছে বার রকমের শ্যাম, চার রকমের টোড়ী এবং আসায়রী। এই সব রাগের নাম হচ্ছে—গৌর-শ্যাম, সুহ-শ্যাম, গম্ভীর-, মেঘ-, বসন্ত-, বরারী-, মল্লার-, ভূপাল-, সুখরাই-, আসায়রী-, রাম-, কানর-, জয়নপুরি টোড়ী, রামটোড়ী, রসুলী টোড়ী, ভালিমী টোড়ী, আসায়রী।

আর একজন মুসলমান গায়ক কতকগুলি নূতন রাগের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর নাম—বাহা উদ্দিন মখছুম জাকেরিয়া। এঁর সঠিক নাম হচ্ছে মখছুম বাহা-উ-দ্দিন। তিনি ছিলেন মূলতানের লোক ও মূলতানী ধনাশ্রীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তা ছাড়া গুজরাটের শোলতান বাহাদুর শা'র গায়ক নায়ক বক্‌সু বাহাদুরি টোড়ী, নায়িকী কানড়া, নায়িকী কল্যাণ এবং মিয়া তানসেন দরবারী কানড়া ও আসায়রী যোগিয়া নামক দেশী রাগের সৃষ্টি করেন।

তোফতুল-হেন্দ এখনও সম্পূর্ণ অনূদিত হয় নি। এ গ্রন্থের সঙ্গে যে প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞেরা পরিচিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত-তরঙ্গের রচয়িতা এ বই থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়ম জোন্স এই গ্রন্থ অবলম্বনে "On the musical modes of the Hindus" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৩৪ সালে উইলার্ড যখন 'A treatise on the Music of Hindustan' লেখেন তখন তিনিও এ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন তোফতুল-হেন্দ হতে ব্রজভাষার ব্যাকরণ উদ্ধার করেছেন এবং সেই সঙ্গে তোফতুল-হেন্দের বিষয়বস্তুরও বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণী হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সঙ্গীত-তরঙ্গের রচয়িতা তোফতুল-হেন্দ নিজে পড়েছিলেন, কারণ তাঁর বর্ণনার মধ্যে কোনটাই কাল্পনিক নয়। ঐতিহাসিকের নিকট তোফতুল-হেন্দের নবম অধ্যায়ের মূল্য আছে। কারণ ঐ অধ্যায়ে পারসিক সঙ্গীতের বর্ণনা রয়েছে এবং পারসিক ও ভারতীয় রাগের সংমিশ্রণে গঠিত রাগিণীগুলিরও উল্লেখ রয়েছে। পারসিক সঙ্গীতে বারটি রাগ (মকামাৎ) রাগিণী (শু'বা), ছয়টি স্বর (শশ্‌ অওয়াজ) ৪৮ গুশ এবং পারসিক সঙ্গীতে ব্যবহৃত সতেরটি তাল প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ অনূদিত হলে এর মূল্য বোঝা যাবে।

(৩)

'হিন্দুস্তানী' গান ও মার্গ-সঙ্গীত একার্থবোধক। হিন্দুস্তান যদি ভৌগোলিক অর্থে গ্রহণ করা যায় তা হলে তার অর্থ হচ্ছে 'উত্তর ভারত' এবং বাংলা দেশ সে দেশের অন্তর্গত। সঙ্গীত-তরঙ্গকার স্পষ্ট করেই বলেছেন যে সে সঙ্গীত বাংলা দেশের বহির্ভূত নয়—

হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ।
কলিকাতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালায় শেষ।
সকলের অতিগ্রাহ্য হনূমান মত।

হিন্দুস্তানী যদি ভাষা অর্থে গ্রহণ করা যায় তা হলে তার অর্থ হচ্ছে হিন্দী বা উর্দু। মধ্যদেশ বা দোয়াব অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার নাম ছিল শৌরসেনী এবং এই ভাষা হতে যে সব ভাষা উদ্ভূত হয়েছে তার সাধারণ নাম বলা হয় পশ্চিমী হিন্দী বা Western Hindi। পাঁচটি ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—বুন্দেলী, কনৌজী, ব্রজভাষা, বঙ্গারু ও হিন্দুস্তানী বা উর্দু। প্রাচ্য হিন্দীকে পূরবিয়া বলা হয় এবং আওধী সেই ভাষার অন্তর্গত।

শৌরসেনী
প্রাকৃত
|
শৌরসেনী
অপভ্রংশ
|
হিন্দুস্তানী (উর্দু) — বঙ্গারু — ব্রজভাষা — কনৌজী — বুন্দেলী

কিন্তু এই হিন্দুস্তানী বা উর্দু ভাষা গানের একমাত্র ভাষা ছিল না এবং মার্গ-সঙ্গীতের ভাষা ছিল তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রজভাষাই ছিল গানের সর্ব্বপ্রধান ভাষা। সুতরাং যখন হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের কথা ওঠে তখন হিন্দুস্তানী শব্দ বুঝতে হবে ভৌগোলিক অর্থে অর্থাৎ উত্তর ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীত ও হিন্দুস্তানী সঙ্গীত সমার্থক।

সঙ্গীত-তরঙ্গ ও তোফতুল-হেন্দে গানের প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন টপ্পার ভাষা পাঞ্জাবী, বারোয়ার ভাষা পূরবিয়া, জকরির ভাষা গুজরাতী, কড়খার রাজস্থানী এবং শাওড়ার ভাষা মথুরার কথ্য-ভাষা, খ্যালের ভাষা খৈরাবাদ অঞ্চলের কথ্যভাষা। কিন্তু তোফতুল-হেন্দের মতে ব্রজভাষাই হচ্ছে এ সমস্ত প্রদেশের প্রধান ভাষা এবং সমস্ত কথ্যভাষাই এই ভাষার প্রভাবে গড়ে উঠেছে। এ ভাষা সংস্কৃতি ও কাব্যের প্রধান বাহন।

কিন্তু ব্রজভাষা এ শ্রেষ্ঠ আসন কেন পেয়েছে তা, বিচার করা উচিৎ। এ ভাষা প্রাচীন শৌরসেনী হতে উদ্ভূত এবং শৌরসেনীর ধারা এই ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রক্ষা করেছে। আর যাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে প্রাকৃতের যুগে শৌরসেনী-প্রাকৃতই ছিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাহন। তথাকথিত মাগধী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতে লিখিত সাহিত্য সেই শৌরসেনীর প্রভাবেই গড়ে ওঠে। পরবর্ত্তী যুগে যখন অপভ্রংশে কথ্য ভাষা ছিল, তখনও শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব অব্যাহত। বাংলা দেশের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য, বৌদ্ধদোহা ও চর্য্যাপদ এই শৌরসেনীর প্রভাবে ও আদর্শে রচিত। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই যে এই ব্যাপার ঘটছিল তাতে

সন্দেহ নাই। এর পরবর্ত্তী যুগে ব্রজভাখা ও শৌরসেনীর মর্য্যাদা হারায় নি। ব্রজভাখা সাহিত্য এবং গানের বাহন হয়ে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। ব্রজভাখা কেন এ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তার কারণ তোফতুল-হেন্দের রচয়িতাই বলেছেন—

"Ornate poetry and the praise of the lover and the beloved is mostly composed in this language. Its application is generally inclusive of all other languages excepting Sahaskrit (Sanskrit) and Parakrit (Prakrit). The language of the Birj people is the most eloquent of all languages...this language contains poetry full of colour and sweet expressions and of the lover and the beloved, and is much in vogue among poets and people of culture." (জিয়াউদ্দিনের অনুবাদ)

বাংলা ও মিথিলা অঞ্চলে এই ব্রজভাখা ও স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে কাব্য ও গানের যে নূতন বাহন সৃষ্টি হল তাকে ব্রজবুলী বলা হয়। এ ব্রজবুলী কোন দিনই কথ্যভাষা ছিল না, অথচ সাহিত্যে তা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও পদকর্ত্তারা সকলেই যে মোটামুটি এই ভাষায় রচনা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। ষোড়শ শতক হতে আরম্ভ করে প্রায় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত নেপালেও এ ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই যুগে নেপালে যে সব নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে সঙ্গীতাংশ সম্পূর্ণ এই ভাষায় রচিত, অথচ নেপালের কথ্যভাষা হতে সে ভাষা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রজবুলী এবং বিদ্যাপতির ভাষার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। নেপালে প্রচলিত ভাষার খোঁজ অনেকে রাখেন না বলে তার একটি নমুনা দিচ্ছি। এ নমুনা সংগ্রহ করেছি সপ্তদশ শতকের প্রথমে রচিত একখানি অপ্রকাশিত নাটক হতে। নাটকের রচয়িতা হচ্ছেন ভাতগাঁওয়ের রাজা জগজ্জোতি-মল্ল। গানটি যে রাগে গেয় তার নাম হচ্ছে ধনাশ্রী।

সখি আজই বন (?) তেহি বিরাজ। জেঞো পাব তোহর সমাজ॥
সাজল ধনু ধরি কাম। অহনিস ভমএহি ধাম॥
এত বোলি বিহসি নিহারি। পুলকিত দেহ মুরারি॥
নৃপ জগজোতি মলা গাব। হরক চরণ মন লাব॥

ব্রজবুলি কিম্বা এ ভাষার কোন দিন রূপ বদলায় নি, কারণ সে ভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার কোন যোগ না থাকার জন্য তার কোন ক্রমবিবর্ত্তন ছিল না। সেই জন্য পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের পদ ও সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের পদের ভাষার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সাহিত্য ও সঙ্গীতে যে ব্রজভাখা প্রচলিত ছিল তার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। অর্থাৎ সে ভাষাকে যখন সাহিত্য ও গানের আসরে আনা হল তখন কবি ও গায়কের হাতে সে ভাষা যে রূপ নিল তা কথ্যভাষা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ রূপ কৃত্রিম হলেও এত সুন্দর যে বহুকাল তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকল। সেই কারণে কীর্ত্তনিয়া আজও ব্রজবুলি পরিত্যাগ করেন নি, গায়ক ব্রজভাখায় রচিত প্রাচীন 'বোল'ও পরিত্যাগ করবার আবশ্যকতা বোধ করেন নি। কারণ সে ভাষা বুঝতে শ্রোতার কোন কষ্ট হ'ত না এবং এখনো যে হয় না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে সব ভাষার ব্যাকরণ আমরা না জানতে পারি কিন্তু সে ভাষায় রচিত গানের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আমরা সকলেই সুপরিচিত। সুতরাং গান শোনবার সময় যে কথাগুলিই আমাদের কানে পৌছায় তা আমাদের মনে যে পটভূমিকার সৃষ্টি করে তাকে সুর অতি সহজেই রঞ্জিত করতে পারে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

সোমলতা

(৯)

বিনোদিনীর অন্তর্দ্ধানের পর প্রথম কিছুকাল হারাণ যেমন বিমূঢ়ের মতো হয়ে গিয়েছিল, সে ভাবটা এখন আর নেই। নিঃসঙ্গ জীবনে এখন সে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলা-মেশা, হাসি-গল্প সবই এখন করে। বিনোদিনী, কিম্বা হাবল-মেনীর কথা এখন আর বড় একটা মনেও পড়ে না। কিন্তু যখন মনে পড়ে···

হ্যাঁ, সেই সময়টা ওর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করে যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় কে যেন তার শ্বাস রোধ ক'রে বুকের উপর হাতুড়ি পিটোচ্ছে। তেমন মুহূর্ত্ত এখনও মাঝে মাঝে আসে। সেই জন্যে পারৎপক্ষে সে একা থাকতে চায় না কোনো রকমে একটা সোর-গোল তুলে বাড়ীর আবহাওয়া সজীব এবং চঞ্চল রাখবার চেষ্টা করে। এই জন্যে বোলানের দলটিকে সে নিজেই সাধ্যসাধনা ক'রে নিজের বাড়ীতে ডেকে এনেছে। তার জন্যে কিছু ব্যয়ও তাকে স্বীকার করতে হয়েছে।

এখন থেকে থেকে মনে হয়, সে যেন বুড়ো হয়ে আসছে। তার অফুরন্ত কর্ম্ম-শক্তিতে ভাঁটা পড়ছে। লোহার মতো শক্ত মাংস-পেশী আসছে শ্লথ হয়ে। সব কিছুতে আগের মতো সে উৎসাহও আর বোধ করে না। এখন যেন থাকতে হয়, তাই কোনো রকমে আছে।

বড় দিনের ছুটিতে তারাপদ এসেছিল। হারাণকে দেখে গভীর বিস্ময়ে বলেছিল, তুমি যে একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ হারাণদা? দেখলে আর চেনাই যায় না।

হারাণ শুষ্কভাবে হেসেছিল। বলেছিল, বুড়ো হব না? বয়েসও হচ্ছে যে!

কথাটা ব'লে ফেলেই তারাপদ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে আর দ্বিতীয় কথা বলেনি। কিন্তু হারাণের মনের মধ্যে কথাটা যেন গভীর রেখাপাত করলে। সে নিজেও বুঝলে যে, এইবারে সে সত্যিই বুড়ো হচ্ছে।

বিবাহ সম্বন্ধে একটা উৎসাহ মাঝে মাঝে তার মনের মধ্যে উঁকি দেয়। মাঝে মাঝে চেষ্টা চরিত্রও হচ্ছে। কিন্তু ঠিক মনের মতো পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। গণ মেলে তো রাশি মেলে না, রাশি মেলে তো বর্ণ মেলে না। অবশেষে একটি পাত্রী সম্প্রতি পাওয়া গেছে। মেয়েটি দেখতে-শুনতে মন্দ তো নয়ই, বরং ভালোই। যোটকও রাজ-যোটক হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত ছোট। বয়স বড় জোর বারো। কিন্তু তাতেও আটকাচ্ছে না। মেয়ের বাপ নিজেই ব'লে গেছে, বেটাছেলের আবার বয়স কি?

ক'দিন আগে মেয়ের বাপ নিজেই এসেছিল। শীর্ণকায়, দীর্ঘদেহ লোকটি। মুখ অত্যন্ত মোলায়েম, মেজাজও দিল-দরিয়া। বয়সে হারাণের চেয়ে ছোটই হবে। লোকটির অবস্থা এককালে ভালোই ছিল। কিন্তু মামলা মোকর্দ্দমায় এখন একেবারে সর্ব্বস্বান্ত। এই বিবাহে তার একেবারেই আপত্তি নেই। হারাণের বয়স হয়েছে, কিন্তু পুরুষ মানুষের আবার বয়স কি? মেয়েটিও নিতান্ত ছোট, কিন্তু তাতেই বা কি? মেয়েমানুষের বাড় কলাগাছের বাড়। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে। এখন কথা হচ্ছে···

সেই কথাটি কইবার জন্যেই মেয়ের বাপের আগমন।

কথা বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু মনে করুন, মানুষের জীবন যেন পদ্মপাতায় জল,—কখন আছে, কখন নেই কেউ বলতে পারে?

হারাণ ঘাড় নেড়ে বললে, তা কি পারে?

আরও মনে করুন, প্রথম পক্ষের ছেলেরা আছে।

হারাণ সংশোধন ক'রে বললে, ছেলেরা নয়। একটি মাত্র ছেলে, নাম হাবল।

কন্যার পিতা মাথা নেড়ে বললে, সেই হ'ল। মনে করুন, বাপের অবর্ত্তমানে সে যদি তার সৎ-মাকে তাড়িয়েই দেয়।

হারাণ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, না, না। সে তেমন ছেলে নয়!

জিভ কেটে কন্যার পিতা বললে, দেবেই যে, এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু যদিই দেয়, বলা তো যায় না। কি বলেন মহাশয়গণ?

উপস্থিত মহাশয়গণকে এ আশঙ্কার সমীচীনতা মেনে নিতে হ'ল। হারাণও ভাবতে বসল, কি ক'রে সেই আশঙ্কাজনক সম্ভাবনার মুলোৎপাটন করা যায়।

এবং এই প্রবীণজনের মজলিসকে সে সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সুযোগ দেবার জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কন্যার পিতা ধূমপানে মনোনিবেশ করলে।

অবশেষে মজলিসের প্রধানতম সদস্য পালজি বললে, তাহ'লে আপনি কি করতে বলেন?

অত্যধিক বিনয়ে হাত জোড় ক'রে মেয়ের বাপ বললে, আমি মেয়ের বাপ, দায়গ্রস্থ। আপনারা প্রবীণ, আপনারাই একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে আমার মেয়ে না ভেসে যায়।

অনেক ভেবে পালজি বললে, তাহ'লে মেয়ের নামে কিছু জমি লিখে দিতে হয়।

কন্যার পিতা উদাসীন ভাবে বললে, সে আপনারা যা ভালো বিবেচনা হয় করুন।

পালজি হারাণকে নিরিবিলি বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। প্রস্তাবটা শোনা মাত্র হারাণের মুখ শুকিয়ে গেল। ভয় তার পাত্রীর নামে কিছু জমি লিখে দেওয়ায় নয়। সত্যই তো, হারাণের অবর্ত্তমানে তার একটা সংস্থান ক'রে রেখে যাওয়াও তো দরকার। কিন্তু ভয় তার পাত্রীর স্বনামধন্য পিতার জন্যে। জালিয়াতি, জুয়াচুরি, মামলা-মোকর্দ্দমায় এ অঞ্চলে লোকটার জুড়ি নেই। তারই পিছনে সর্ব্বস্ব খুইয়ে এখন তাই তার জীবিকায় দাঁড়িয়েছে। শুষ্কমুখে হারাণ পালজির পিছু পিছু গেল।

পালজি জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে?

—তুমি কি বল?

—আমি আবার বলব কি? বিয়েও আমি করছি না, জমিও আমার নয়।

হারাণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

পালজি খোঁচা দিলে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না, যা হোক একটা বলতে তো হবে।

হারাণ পাংশু মুখে বললে, জমি লিখে দিতে তো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ভয় এই লোকটাকে। যে রকম মামলা-বাজ, শুনেছ তো সবই!

পালজিও সে কথা শুনেছে। তবু বললে, মামলা-বাজ ব'লে তো আর

আমাদের গাঁ থেকে জমি তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। তা সে যতই করুক।

হারাণ কথাটা ভাবলে।

অবশেষে পালজি কি ভেবে বললে, যাই হোক, কথাটা একটু ভেবে দেখা দরকার। কি বল? ওকে বলা যাক, ক'দিন পরে ওকে খবর দোব।

হারাণ সাগ্রহে বললে, সেই ভালো।

সেদিন এই পর্য্যন্তই হয়েছিল। এবং এখনও পর্য্যন্ত হারাণ মনঃস্থির করতে পারেনি। বিয়ের ইচ্ছা তার ষোলো আনাই আছে, ঘর-সংসার রাখবার জন্যে তার প্রয়োজনও আছে। তবু মনঃস্থির করতে তার দেরী হচ্ছে, এবং আপত্তি যে ঠিক কোথায় তাও বুঝে উঠতে পারছে না।

এই খবরটা শুনে তারাপদ বাড়ী এল বড়দিনের ছুটির সময়। বিনোদিনীর গৃহত্যাগের ব্যাপারে তার দায়িত্ব অনেকখানি। বলতে গেলে তাকে নিয়েই কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত। বিনোদিনী যে মরেনি, বেঁচেই আছে, সে সংবাদও সারা গ্রামের মধ্যে একমাত্র সেই জানে। সে কথা জানার দায়িত্বও কম নয়।

কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, বিনোদিনীকে সে সত্য সত্যই শ্রদ্ধা করে। হারাণ যদি আবার বিয়ে করে, তাহ'লে বিনোদিনীর সেই দুঃসহ ক্ষতি তার নিজের পক্ষেও মর্ম্মান্তিক হবে। সেই জন্যেই সে আরও এল। নইলে বিনোদিনী চ'লে যাওয়ার পর এ গ্রামে আসতে তার আর ইচ্ছা করে না, আসেও না।

বিকেলের দিকে নিরিবিলি পেয়ে সে হারাণকে ধরলে। কিন্তু তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। হারাণ একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছে।

বললে, তুমি যে একেবারে বুড়ো হয়ে গেলে হারাণদা?

হারাণ হেসে বললে, বয়েস হ'চ্ছে যে!

বয়স অবশ্য হচ্ছে, কিন্তু ন'মাস আগেও তাকে বুড়ো বলা চলত না। তারাপদ মনে মনে কারণটা উপলব্ধি ক'রে লজ্জিত হ'ল। কিন্তু সে প্রসঙ্গের আর উল্লেখ করলে না।

বললে, তুমি নাকি আবার বিয়ে করছ হারাণদা?

বিয়ের কথায় হারাণ ভিতরে ভিতরে খুব খুসী হয়। ছেলে মানুষের মতো সলজ্জ স্ফূর্ত্তিতে হাসে।

বললে, তোকে কে বললে?

—যেই বলুক। বল না, সত্যি কি না?

হারাণ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, মেয়ে তো অনেক আসছে। কিন্তু ভাবছি কি করি। আসল কথা, খেটে খুটে এসে আবার যে সেই নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধা, ও আর আমি পারছি না। নইলে ছেলে আছে, মেয়ে আছে, এ বয়সে আমার কি আর বিয়ে করবার কথা? তুইই বল?

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

তারাপদ কলেজের ছেলে। হারাণের বিয়ে করার যুক্তিতে মনে মনে হাসলে।

বললে, মেয়েটির বয়েস কত?

হারাণ ফিক ক'রে হেসে বললে, তা একটু ডাগরই বটে। বলছে তো বারো। হয়তো একটু বেশীই হবে।

আবার বললে, দেখতে শুনতেও ভালো। তোর সেই বৌদির মতোই হবে।

তারাপদর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ ক'রে উঠল। সামলে নিয়ে বললে, অত ছোট মেয়ে।

হারাণ হো হো ক'রে হেসে বললে, শোন পাগলের কথা! তার চেয়ে বড় মেয়ে পাব কোথায়? আমার জন্যে কেউ তো আর বুড়ো মেয়ে থুবড়ো ক'রে রাখেনি?

—তবু, এ যে একেবারে হাবলের বয়িসী।

হারাণ প্রথমটা চুপ ক'রে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, ওরে, মেয়ে মানুষের বাড়! এখন তাই মনে হচ্ছে বটে, আসছে বার এসে দেখবি, হাবলের মা হয়ে গেছে।

তারাপদ সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে কি বিয়ে পাকা-পাকি হয়ে গিয়েছে না কি?

—না, পাকা-পাকি এখনও কিছু হয়নি। তবে ওইখানেই হবে বোধ হয়।

যতগুলো সম্বন্ধ এসেছে তার মধ্যে এই মেয়েটিই দেখতে শুনতে ভালো। কেবল,

—কেবল ?

হারাণ চিন্তিত ভাবে বললে, একটুখানি আপত্তি হচ্ছে ?

—কি আপত্তি ?

হারাণ কথাটা বলতে গিয়ে চুপ ক'রে রইল। গ্রামে বিবাহটা ভাত-মুড়ির চেয়েও সুলভ। তবু বিয়ে ভাঙানোর একটা প্রথাও বিশেষ প্রচলিত। বোধ হয় সেই সন্দেহেই সে চুপ ক'রে গেল।

কিন্তু তারাপদ ছাড়লে না।

বললে, বল।

অবশেষে হারাণ বললে, তোকে বলতে আর দোষ কি ? তুই তো নিজের ভায়ের মতো। কিন্তু গাঁ যা খারাপ ! জানিস তো সবই !

তারাপদ হেসে বললে, না আমাকে তোমার ভয় নেই। আমি বিয়ে ভাঙাব না।

—না, তাই বলছি।

তারপরে চুপি চুপি বললে, মেয়ের বাপ বলছে, কিছু জমি লিখে দিতে হবে।

তারাপদ বললে, হুঁ।

—তা জমি লিখে দিতেও আমার আপত্তি নেই। সত্যিই তো, সে বেচারা যে আসবে, তারও তো একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দু'দিন পরে আমার অবর্ত্তমানে যদি তাকে হাবল তাড়িয়েই দেয়।

—তবে ?

—তবে অন্য কিছু তো নয়, মেয়ের যে বাপ, তারই জন্যে ভয় হচ্ছে।

—কেন ?

—শুনছি নাকি ভীষণ মামলাবাজ। সাপের ওঝা সাপে কেটেই মরে। মামলাবাজও মরে মামলা ক'রে। তারও তাই হয়েছে। মামলা ক'রেই ফেরার।

তারাপদ সাগ্রহে বললে, তবে সেখানে কাজ নেই হারাণদা।

—বটে। কিন্তু মেয়েটি ভালো।

তারাপদ মাথা নেড়ে বললে, তা হোক। কিন্তু মামলাবাজের খপ্পরে প'ড়ে তুমিও যাবে, তোমার হাবলও পথে বসবে।

—কথা মিছে নয়। কিন্তু আর যতগুলি মেয়ে দেখলাম, কোনোটাই অমন সুন্দর নয়।

তারাপদ রেগে বললে, আর জ্বালিও না হারাণদা। বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে যাচ্ছ, তার কালো, আর সুন্দর।

হারাণ হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, ওইটি বলিস না ভাই, ওইটি পারব না। আমি নিজে কালো বটে, কিন্তু কালো মেয়ে দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

মুখ বিকৃত ক'রে তারাপদ বললে, ও বাবা !

হারাণ হেসে বললে, তা বাপু পষ্ট কথা ব'লে দিলাম, তুমি ঠাট্টা কর আর যাই কর।

একটু থেমে তারাপদ বললে, আর মনে কর যদি বড়বৌ ফিরেই আসে ? তাহ'লে ?

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হারাণ বললে, ফিরে আসবে কি !

একটা ঢোক গিলে তারাপদ বললে, যদিই আসে ! বলা তো যায় না। বড়বৌ যে মারাই গেছে তার তো কোনো প্রমাণ নেই।

হারাণ থতমত খেয়ে গেল। শুধু বললে, পাগল !

তারাপদ আবার জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে তাকে তুমি ঘরে নেবে না ?

বিরক্ত ভাবে হারাণ বললে, থাক থাক। ও সব বাজে কথায় দরকার নেই।

হারাণ নিজের কাজে চ'লে গেল। তারাপদ ভাবতে লাগল, হারাণ হঠাৎ এমন রেগে গেল কেন ?

তারাপদ চিন্তিতভাবে সেখান থেকে চ'লে এল। হারাণ যে মনে-মনে বিবাহের জন্যে ব্যাকুল হয়েছে তাতে আর ভুল নেই। কেবল জমি লিখে দেওয়া নিয়েই এখনও কিছু দ্বিধা তার মনের মধ্যে আছে। কিন্তু ক'দিন পরে তাও হয়তো আর থাকবে না। এই দিক দিয়ে আত্মহত্যার সঙ্গে বিবাহের

৬

আশ্চর্য্য মিল আছে। আত্মহত্যার কল্পনা একবার যদি মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, তাহ'লে ঠিক কিছুদিন পরে লোকটি আত্মহত্যা ক'রে বসে। বিবাহও তাই।

তারাপদ মুস্কিলে পড়ল। এই গ্রামে বিনোদিনীর বন্ধু কেউ নেই যাকে সকল কথা ব'লে সে সুপরামর্শ চাইতে পারে। স্বামীগৃহে বিনোদিনীর সংসার বড় ছিল না, কিন্তু খাটুনী বড় ছিল। বিনোদিনী চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না, বেশী কথা কইতেও পারে না। সকল কাজ শেষ হয়ে গেলেও সে নতুন কাজ সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে ডুব দিত। শুধুই তাই নয়, স্বামীগৃহে সুখের মধ্যে কোথায় যেন তার মনের মধ্যে একটা জ্বালাও ছিল। সমস্ত সময় তার মন যেন কারও সঙ্গে কলহের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। সেই কলহের সকল বিষ সমস্ত রাত্রি স্বামীর উপর বর্ষিত হ'ত।

এই কারণে দীর্ঘ দিন স্বামীগৃহবাসের পরেও পল্লীর কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুযোগ ঘটেনি। সেই কারণে তারাপদ আরও মুস্কিলে পড়ল। অথচ এত বড় একটা আশঙ্কার ক্ষেত্রে তার পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকাও অপরাধ। কিন্তু এ ব্যাপারে কীই বা করতে পারে সে?

গতবারে নিজে গিয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে তার মনের যে খবর নিয়ে এসেছে, তাতে সে যে কোনো কারণেই স্বামীগৃহে ফিরবে এমন আশা অন্তত তার নেই। বিনোদিনীর উপর তার রাগও হয়। মেয়েমানুষের এতখানি জেদ সে সমর্থন করতে পারে না। রাগের মাথায় যদি একটা গুরুতর কথা অশিক্ষিত হারাণ ব'লেই থাকে, তার কি মীমাংসা নেই? না মার্জ্জনাও নেই?

কিন্তু অশিক্ষিত হারাণের মনোভাবও তো সে বুঝতে পারলে না। কে জানে, বিনোদিনী সম্বন্ধে সত্যকার সংবাদ তাকে জানানো সঙ্গত হবে কি না। পল্লীসমাজকে সে ভালো ক'রেই চেনে। এত বড় একটা রসালো সংবাদ প্রকাশ পাওয়া মাত্র পল্লীসমাজ যদি সহস্রাগ্নিশিখায় দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে নাও ওঠে, সুপ্রচুর ধূমে অন্তত কিছুকালের জন্যে কৃষকসমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সেজন্যেও ভয় ছিল না। ধূম কিছুদিন পরে উড়ে যায়, আবহাওয়া

পুনরায় স্বচ্ছ হয়ে আসে, সমাজও আবার শান্তভাবে চিরকালের সুনির্দিষ্ট বাঁধা পথে চলতে আরম্ভ করে, যদি নারী স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় পায়।

এইখানেই তারাপদর সন্দেহ। বিনোদিনী সম্বন্ধে হারাণের মনোভাব সে বুঝতে পারলে না। সে প্রসঙ্গ ওঠামাত্র হারাণ বিরক্ত ভাবে চ'লে গেল। কেন চ'লে গেল কে বলবে?

এক ললিতা। বিনোদিনীর কোথাও যদি কেউ বন্ধু থাকে, সে ওই ললিতা। তার কথা মনে হ'তেই তারাপদর মন আনন্দে নেচে উঠল। ললিতাও যে বিনোদিনীর বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করতে পারবে তা নয়। সেও তারাপদর মতোই অসহায়। তবু তাকে একবার বলা দরকার। আর কিছু না হোক দু'জনে মিলে খানিকটা পরামর্শও করা যেতে পারবে, এবং···

এবং-এর কথা থাক। কিন্তু কে জানে ললিতাই বা এখন কোথায়? বাউল-বৈষ্ণবী মানুষ। ঘর একটা রাখতে হয় তাই আছে, নইলে কখন যে কোথায় থাকে তার স্থিরতা নেই। রসময়কে আগে একখানা চিঠি না লিখে যাওয়া ঠিক হবে না। দূর তো কম নয়! অতদূর গিয়ে যদি দেখা না পাওয়া যায়, সে বড় মুস্কিলের কথা হবে।

তারাপদ সেখানে একখানা চিঠি দেওয়াই স্থির করলে।

এমন সময় হারাণ এল।

বললে, ভাই আজ আমার 'দাওন' আসবে। বাড়ী-ঘরের অবস্থা তো দেখছ। মোহান্তর আখড়া বললেই হয়। গেল বারে তোমার বৌদি পাড়াশুদ্ধ খাইয়েছিল। এবারে কেই বা রাঁধে, আর কেই বা খাওয়ায়! তাই ভাবলাম শুধু তোমাকে নেমন্তন্ন করব। মাছের ঝোল আর ভাত। কি বল?

তারাপদ বললে, বেশ তো। আজ তোমার 'দাওন' এল নাকি?

—এল। কিন্তু বোঝবার তো উপায় নেই। কেই বা শাঁখ বাজায়, কেই বা উলু দেয়। আমার ও সব আসেও না। তবে নিত্যকর্ম্ম আর যা আছে তা তো না করলে নয়। নিজেই করলাম।

তাই বটে। ওদিক দিয়ে আসবার সময় শেষ আঁটি ধান পরম সমাদরে হারাণের পালার মাথায় দেখে এসেছে বটে। কিন্তু সমারোহের অভাবে সেইটিই যে 'দাওন' এবং আজই এসেছে তা বুঝতে পারেনি।

বললে, খাব তো, কিন্তু রাঁধবে কে ?

হারাণ হেসে বললে, কেন আমি। ওরে আমি ভালোই রাঁধি রে। আজ খেয়েই দেখিস। কিন্তু বেশী কিছু হবে না ভাই, কেবল মাছের ঝোল, আর ভাত। তা আগে থাকতেই ব'লে দিচ্ছি।

খেতে ব'সে তারাপদকে স্বীকার ক'রতে হ'ল, সে ভালই রাঁধে। কিন্তু শুধু সেইটে পরীক্ষা করবার জন্যেই সে নিমন্ত্রণ নেয় নি। অথচ আসল কথাটাও ব'লতে পারছিল না।

অবশেষে কোনো রকমে বললে, তুমি আর বিয়ে কোরো না হারাণদা।

হারাণ বিস্মিতভাবে মুখ তুলে বললে, কেন ?

—এ বয়সে বিয়ে ক'রে কি হবে ?

হারাণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুধু বললে, বেশ।

কি ভেবে হঠাৎ তারাপদ বলে ফেললে, তার চেয়ে বরং একটা বোষ্টমী নিয়ে এসে বাড়ীতে রাখ।

হারাণ হো হো ক'রে হেসে বললে, গোপাল ঠাকুর্দ্দার মতন ?

—হ্যাঁ। মন্দ কি ?

হারাণ কথাটাকে এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে বললে, পাগল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সাম্যবাদের সঙ্কট

১

গত নভেম্বর মাসে সোভিয়েট্ রাশিয়ার বিশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কিছুকাল ধরে' অনেকেই নূতন রাষ্ট্রের আশু পতনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, বিশেষতঃ রিগা নগর থেকে উদীয়মাণ শক্তির প্রতিপক্ষেরা প্রায়শঃই তখন খবর পাঠাত যে সোভিয়েট্-তন্ত্রের উচ্ছেদ আসন্ন। তারপর ক্রমে ক্রমে নব্য রাশিয়ার অস্তিত্ব সহজসত্যে পরিণত হয়ে এসেছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরে নানা ঘটনার প্রতিঘাতে তার প্রকৃতি এবং প্রগতি সম্বন্ধে একটা সন্দেহও বহুলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সংক্ষেপে এ সন্দেহের মূল কথা এই যে রাশিয়া সাম্যবাদের পথ বর্জ্জন করে' ষ্টালিনের নেতৃত্বে এখন ধনতন্ত্রের পুনর্গঠনে ব্যস্ত এবং বল্‌শেভিক্‌দের হাতে ঘসামাজার ফলে নাকি সাম্যবাদের সংস্কৃত ভদ্রস্বরূপ দিন দিন মার্ক্সের আদর্শ থেকে চ্যুত হচ্ছে। এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য একমাত্র ভবিষ্যৎই প্রমাণ করতে পারে। তাছাড়া এ সম্বন্ধে যে-তর্ক-সাহিত্য গড়ে' উঠেছে তার অনেকাংশ রুষ ভাষায় লিখিত বলে' আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং মার্ক্সের মূল গ্রন্থও এদেশে সুপরিচিত নয়। কিন্তু তবুও এ আলোচনা থেকে নিবৃত্তি সব সময় সম্ভব না কারণ এক্ষেত্রে অন্ততঃ সাময়িক একটা মত গঠন ভিন্ন সাম্প্রতিক ইতিহাস একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

প্রথমেই অবশ্য সন্দেহের উপাদানগুলির দ্রুত পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। ১৯৩৩ সালে হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের পর থেকে রুষ মন্ত্রী লিট্‌ভিনভ্ পশ্চিম ইউরোপস্থিত ডেমক্রাটিক্ শক্তিদের সঙ্গে সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ বহুকাল সাম্যবাদীদের বিদ্রূপের বস্তু ছিল অথচ ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বরে রাশিয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তার সভ্যপদ গ্রহণ করল। পর বৎসর মে মাসে এল রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সখ্যবন্ধন—অনেকের কাছেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই মৈত্রী মহাসমর ও বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী এ রাজ্যদুটির নিবিড় সংযোগের পুনরুক্তি মাত্র। ১৯৩৫-এর আগষ্টে কমিন্‌টার্নের সপ্তম মহাসম্মেলনে ডিমিট্রভ্ সাম্যবাদীদলের নূতন কর্ম্মপদ্ধতি হিসাবে United Front-এর প্রবর্ত্তনা করলেন—তদনুসারে স্থির হয় যে ফাশিষ্ট-প্রসারে বাধাসৃষ্টির জন্য কমিউনিষ্টরা

অন্যান্য শ্রমিক, কৃষক ও ফাশিষ্ট-পরিপন্থীদলের সঙ্গে সহযোগে প্রস্তুত থাকবে। এর পরই ফ্রান্সে সম্মিলিত গণশক্তির সঙ্ঘনির্ম্মাণ ১৯৩৬ সালে সম্পন্ন হ'ল—ফরাসী সাম্যবাদীরা হঠাৎ তাদের অভ্যস্ত বিরুদ্ধাচরণে পরাঙ্মুখ হয়ে অন্য উদার দলসমূহের সাহচর্য্য প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল। ইতিপূর্ব্বেই ট্রট্‌স্কির পক্ষে স্বদেশে বসবাস অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং সেই থেকে ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের গোপন ও প্রকাশ্য অসহযোগ রাশিয়াকে সন্ত্রস্ত করে' আস্‌ছে। ১৯৩৬-এর আগষ্টে জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ প্রমুখ পুরাতন বল্‌শেভিক নেতাদের দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচার ও প্রাণদণ্ড সকলকে স্তম্ভিত করল। ১৯৩৭-এর জানুয়ারি মাসে রাডেক্, সকল্‌নিকভ, পিয়াটোকভ্ প্রভৃতি সুপরিচিত লোকদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শাস্তির সংবাদে একটা অনিশ্চয়তার উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। তারপর গত জুন মাসে মার্শাল্ তুকাচেভ্‌স্কি ও অন্যান্য রুষ সেনাপতির আকস্মিক পতন প্রমাণিত করল যে রাশিয়ার অন্তর্লীন সঙ্কট এখনও হ্রাস হয় নি। এদিকে উৎপাদন কার্য্যে ষ্টাকানভ্ পদ্ধতি প্রভৃতি নূতন ব্যবস্থার জন্য ষ্টালিনকে নিন্দাভাগী হ'তে হয়েছে। ১৯৩৬ সালে আঁদ্রে জীদ্ রাশিয়া ভ্রমণের পর ষ্টালিন্‌পন্থীদের আদর্শনিষ্ঠায় সন্দিহান হয়ে পড়লেন। সে বছর ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার নবশাসনপদ্ধতিতে ডিমক্রাসির আংশিক প্রবর্ত্তন অনেকের চোখে সাম্যবাদের অবসানচিহ্ন রূপে গণ্য হ'ল। তাছাড়া স্পেনে ১৯৩৬ থেকে এবং পর বৎসর থেকে চীনদেশে কমিউনিষ্ট্‌রা অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করছে এবং বলা বাহুল্য যে তাদের এই নূতন উদ্যম রুষদেশের আভ্যন্তরিক বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তিত বৈদেশিক নীতির সঙ্গে তাল ফেলে চলেছে।

উপরের তালিকা থেকে সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহের ভিত্তি সহজেই প্রকাশ পাবে। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসবার আগে এই ঘটনাধারার কিছু বিশ্লেষণ আবশ্যক। আর সেই সঙ্গে মার্ক্সের থিওরিতে এই সমস্যার কোন ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা সে প্রশ্নেরও বিচার করা উচিত।

২

রাশিয়ার পক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা এবং দেশে দেশে সম্মিলিত গণশক্তির উদ্বোধন কার্য্যে কমিন্‌টার্নের নূতন উদ্যমের মূল কারণ

এক এবং সে কারণ সহজেই অনুমেয়। ১৯৩৩এ এবং তার পূর্ব্বে হিট্‌লারের অভিযানকে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বলে' অনেকে মনে করেছিল—রাডেক্ প্রভৃতি নেতারা তখন পর্য্যন্ত জার্মান্ সাম্যবাদী ও শ্রমিকদের শক্তি সম্বন্ধে অযথা অতিরঞ্জিত আস্থা পোষণ করে' এসেছিলেন। পরিণামে দেখা গেল যে নাৎসি আন্দোলনের প্রকোপ ও প্রভাবকে অবজ্ঞা করলে বিষময় ফলের সম্ভাবনাই বেশী। হিট্‌লারি প্রতিবিপ্লব শ্রমিক শক্তিকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে বিধ্বস্ত ও পদানত করে' ফেলবার মন্ত্র জানে এই সত্যকে জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে সাম্যবাদীদের শিখতে হ'ল। সে শিক্ষা অবহেলা করলে ফাশিষ্ট্ অত্যাচারে দেশে দেশে শ্রমিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত ও শ্রমিক আন্দোলন অবসন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা সবিশেষ রয়েছে। জনগণের সম্মিলিত শক্তিগঠন এই আসন্ন বিপদকে পরাস্ত করবার অস্ত্র মাত্র। তাছাড়া হিট্‌লারের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য সোভিয়েট্ শক্তিকে নিঃসঙ্গ ও দুর্ব্বল করে' তার পতনের পথ সহজ করে' তোলা। জার্মান্ নাৎসি ও ইটালীয় ফাশিষ্ট্‌দের নিবিড় সখ্যের পিছনে রয়েছে এই ইচ্ছা—সে সংকল্প রূপ নিচ্ছে সাম্যবাদের বিরোধী চুক্তিপত্রে। সম্প্রতি জাপানও এ দলে যোগ দিয়েছে এবং জাপান রাশিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলে ঘোর শত্রু। জার্মানি ও জাপানের যুগ্ম আক্রমণের সম্ভাবনা রোধের জন্য রাশিয়াকে বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সখ্যবন্ধনে মিলিত হ'তে হয়েছে। আর এ বিপদ শুধু রাশিয়ার নয়। সোভিয়েটের পতন হ'লে সাম্যতন্ত্রের অগ্রগতি অনেক বেশী দুরূহ হয়ে উঠবে। সোভিয়েট্ রাশিয়া শ্রমিকদের প্রথম বিজয় চিহ্ন—সে দুর্গের রক্ষাই এখন শ্রমিকদের প্রথম কর্ত্তব্য। মূল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সময়োচিত বিভিন্ন অস্ত্রের আশ্রয় শক্তিরই পরিচায়ক—দৌর্বল্যের নয়।

৩

কমিন্‌টার্নের নির্দ্দেশে যে-নূতন কর্ম্মপদ্ধতি এখন সাম্যবাদী দলগুলিকে পরিচালিত করছে, তার সঙ্গে ডিমিট্রভের নাম অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত। এই বুল্‌গেরীয় কমিউনিষ্ট্ নেতা হিট্‌লারি বিপ্লবের সময় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সম্মিলিত সহযোগিতার নানা দিক তাঁর লেখার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাসে ফাশিষ্টদের বিজয় অভিযানই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। জার্মানি, ইটালি ও জাপান ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যগুলি এর আয়ত্তে এসে পড়ছে। সাম্যবাদীদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ফাশিজ্‌ম্‌এর প্রাণই হ'ল শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনারোধের চেষ্টা। এর কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনকে নানা উপায়ে ক্ষীণ করে' ফেলে ধনতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা। পৃথিবীব্যাপী ফাশিষ্ট্‌ প্রগতির কেন্দ্র অবশ্য হিট্‌লারের নাৎসি দল। তাদের রুষবিদ্বেষ সকল শ্রমিকদের ভাবনার কথা। ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের মতন এ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করা মূঢ় অদূরদর্শিতার নামান্তর।

বাওয়ার, ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড, কাউট্‌স্কি প্রভৃতি সোশ্যাল্‌ ডিমক্রাট্‌দের ধারণা আছে যে ফাশিজ্‌ম্‌ নিম্নস্তরভুক্ত মধ্যশ্রেণীর আধিপত্যের প্রতীক। সাম্যবাদীদের মতে এ বিশ্বাস মারাত্মক ভ্রান্তি। ফাশিষ্ট্‌ আন্দোলনের অনেক ছদ্মবেশ আছে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার জাতিগত পার্থক্যের অভাব নেই, বুর্জোয়া ডিমক্রাট্‌দের হাত থেকে তারা সবলে ক্ষমতা কেড়ে নিতে দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু আসলে ফাশিষ্ট্‌ রাষ্ট্র যে ধনিকদের আধিপত্য সংরক্ষণের সময়োচিত ব্যবস্থা মাত্র, ধনিক কর্ত্তৃত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের আটকে রাখার প্রচেষ্টা যে তার অভ্যুত্থানের কারণ, সাম্যবাদীদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অথচ ফাশিজ্‌ম্‌ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার শক্তি অর্জ্জন করেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সাধারণ লোকের সাময়িক অভাব অভিযোগ মোচনের আশা ফাশিষ্ট্‌ আন্দোলনে স্থান পায়। জনগণের মনে অন্যায়ের প্রতিকার এবং অবস্থা উন্নতির যে-আকাঙ্খা থাকে, ফাশিষ্ট্‌ নেতারা তার সাহায্য নিতে পশ্চাদ্‌পদ হ'ন না—সেই জন্য ইটালিতে কর্পোরেট্‌ রাষ্ট্রের কল্পনা উদ্ভব হয়, জার্মানিতে নাৎসি আমল নূতন সমাজগঠনের দাবী করে। ফাশিজ্‌ম্‌ সাম্রাজ্যবাদের পরাকাষ্ঠা অথচ স্বজাতিকে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত গণ্য করে' জাতীয় অভিমানকে উত্তেজিত করাই তার রীতি। শ্রমিকদের দলে টানবার জন্য ধনিকতন্ত্রকে কড়া কথা শোনাতে তাদের আপত্তি নেই এবং এইভাবেই ফাশিষ্টেরা প্রথমে প্রবল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করবার পর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রচারের অবশ্য ধূম পড়ে যায়, তখন আর সংস্কারের অবকাশ থাকে না, তার উপর বিদেশীদের সঙ্গে বিবাদের উত্তেজনাও আছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর অযথা

জোর দেওয়া এবং ইহুদিবিদ্বেষ প্রভৃতি কুসংস্কারের প্রশ্রয়ও জনসাধারণকে হাতে রাখবার অন্য উপায়।

কিন্তু ফাশিষ্ট্‌ প্রভুত্বে জনসাধারণের বস্তুত কোন লাভ নেই, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এর সাক্ষ্য দিতে পারে। যেখানে ন্যায্য মাহিনা প্রতিশ্রুত হয়েছিল শ্রমিকেরা সেখানে স্বার্থত্যাগের মহিমা শুনছে, কাজের সুযোগের অর্থ দাঁড়াচ্ছে প্রায় অর্দ্ধদাসত্বের অবস্থা। উপার্জ্জনের স্থিরতা ফাশিষ্ট্‌ আমলে আগের চাইতেও অনিশ্চিত, উপরন্তু ফাশিষ্ট্‌-ভাবাপন্ন কর্ত্তাদের তাড়নার অভাব নেই। কৃষকেরাও ধনিককবল থেকে বিন্দুমাত্র উদ্ধার পায় নি। আর শ্রমিকসমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিই ফাশিজ্‌মের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়েছে—জার্মানি, ইটালি, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বুল্‌গেরিয়া প্রভৃতি দেশে এদের সংখ্যা সাম্যবাদীদের হিসাবে বহুশত এমন কি অনেক সহস্রের কোঠায় পড়ে। ধনিকতন্ত্রেরও স্তরভেদ আছে এবং ডেমক্রাটিক্‌ শাসন থেকে ফাশিষ্ট্‌ আমলে শ্রমিকদের অনেক বেশী দুরবস্থা হয় স্বীকার করতেই হবে। এই পার্থক্য অগ্রাহ্য করে' ট্রট্‌স্কির দল শুধু রোমান্টিক্‌ ভাবের পরিচয় দিচ্ছে।

অনেকের মতে ফাশিজ্‌ম্‌ অনিবার্য্য—সমাজের বিবর্ত্তনে এ একটা নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়। আন্দোলন হিসাবে ফাশিষ্ট্‌ উদ্যম একটা বিশেষ সময়ে অবশ্যম্ভাবী হ'তে পারে কিন্তু ডিমিট্রভ্‌-এর দৃঢ় বিশ্বাস যে ফাশিষ্টদের জয়লাভের কারণ বিরোধীশক্তির ভুল ভ্রান্তি মাত্র। United Front সেই ভ্রমের পুনরাবৃত্তির পথে বাধাসৃষ্টির প্রয়াস। ফাশিষ্ট্‌-অভ্যুদয় অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে সোশ্যাল্‌ ডিমক্রাট্‌দের মূর্খতার জন্য। জার্মানি এবং অষ্ট্রিয়াতে তারা শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল বলা যায়। ফাশিষ্ট্‌ বিপদ অঙ্কুরে বিনাশ করতে তারা কখনও যত্নবান হয় নি। পক্ষান্তরে শ্রমিক-ঐক্যভঙ্গ আর কৃষকদের অবহেলা এবং বুর্জোয়া দলগুলি ও তাদের ধনিক বন্ধুদের সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে তারা ফাশিষ্ট্‌ বিজয়েরই আনুকূল্য করেছে। অপরদিকে কমিউনিষ্ট্‌রা এখন বুঝতে পারছে যে তাদেরও অনেক ভুল হয়েছিল। অতীতের ভ্রান্তিস্বীকার অবশ্য সাম্যবাদের ইতিহাসে নূতন না। জার্মান্‌ সাম্যবাদীদের বিশ্বাস ছিল যে জার্মানি ইটালি নয়। সেইজন্য নাৎসিদের শক্তিবৃদ্ধি তাদের কাছে অবজ্ঞার বস্তু ছিল। পোল্যাণ্ড্‌, বুল্‌গেরিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড্‌ প্রভৃতি দেশেও

সাম্যবাদীরা ঠিক প্রকৃত অবস্থা ধরতে পারে নি। কিন্তু এই ধরণের ভ্রম নিরাকরণ হ'লে ফাশিষ্টদের পরাজয় কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। অন্ততঃ সেই বিশ্বাস থেকেই ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের উৎপত্তি।

ফাশিজ্‌মের প্রতাপ যতই হোক না কেন, তার পতন অনিবার্য্য এই ধারণা সাম্যবাদের মজ্জাগত। সাম্যতন্ত্রের আগমন যে শেষ পর্য্যন্ত সুনিশ্চিত শুধু এই আস্থার উপর এ ধারণা নির্ভর করছে না। ফাশিস্ট্-রাষ্ট্রের একটা প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার কথাও সেই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। সেখানে শ্রেণীবিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া দূরে থাকুক, স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত প্রবলতর হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা বেশী। ফাশিষ্ট্ গণআন্দোলনেরও কোন আন্তরিক ঐক্য নেই—তার বিভিন্ন অঙ্গের পার্থক্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। অবশ্য ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র আপনা থেকেই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে শ্রমিক অভিযানের আশার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রামই যদি সাম্যবাদের গোড়ার কথা হয় তাহলে এই অভিযানের সহায়তা সকল শ্রমিকের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের প্রথম কথাই হ'ল সকল শ্রমিককে একত্রীকরণ। এই সম্মিলিত শক্তির গঠনে সাম্যবাদীদের শুধু একটি সর্ত্ত আছে—একত্রিত জনগণকে ফাশিষ্টদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। সকল শ্রমিককে সাম্যতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সময়সাপেক্ষ অথচ ফাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার প্রয়োজন এখনই। সাম্যবাদীদল নিজের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে অবশ্য প্রস্তুত নয়, তাদের আদর্শ প্রচারের স্বাধীনতাও তারা ছাড়ছে না। কিন্তু সোশ্যাল্ ডিমক্রাট্‌দের আক্রমণের পরিবর্ত্তে তাদের সহযোগিতাই এখন সাম্যবাদীদের কাম্য। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ শ্রমিকই আসলে সকল সোশ্যালিষ্ট্ দলের গণ্ডির বাইরে। ফাশিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের আবাহন করতে হ'লে সর্ব্বত্র শ্রমিক-সমিতি গড়ে' তুলতে হবে আর সে সমিতিগুলি কোন দলবিশেষের সম্পত্তি থাকবে না। এভাবে শ্রমিকসমাজের মিলিত শক্তিকে সংগ্রামে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য এখন সাম্যবাদীদের উৎসাহিত করছে। আর শুধু শ্রমিক কেন, ফাশিষ্ট্ বিপদকে আটকাবার জন্য কৃষক, নিম্নস্তরের মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবি প্রভৃতিরও সহযোগ বাঞ্ছনীয়। তাই স্থানবিশেষে ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্ শুধু শ্রমিক নয়, সমগ্র জনসাধারণের মিলনে পর্য্যবসিত হ'তে পারে। ফাশিষ্ট্‌বিরোধী অন্য মণ্ডলীর প্রতি অবজ্ঞা কিম্বা বৈরীভাব সাম্যবাদীদের আপাততঃ সযত্নে পরিহার করা উচিত।

এইভাবে পপুলার ফ্রণ্ট্ গড়ে তুললেও তার কার্য্যক্রম সর্ব্বত্র ঠিক এক হ'তে পারে না। আমেরিকায় প্রথম কর্ত্তব্য এখন একটি স্বাধীন শ্রমিক-কৃষকদলের সংগঠন। ইংল্যাণ্ডে সাম্যবাদীরা এখন লেবার পার্টিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত যদি সে দল ফাশিষ্ট্-গতিরোধের ব্রত গ্রহণ করে। ফ্রান্সে সম্মিলিত জনশক্তির সাফল্য ফরাসী ফাশিষ্টদের অনেকখানি দাবিয়ে রেখে নূতন আদর্শকে জয়যুক্ত করেছে যদিও সম্প্রতি সেখানে আবার অবস্থাবিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যে দেশে ফাশিষ্ট্-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে পপুলার ফ্রণ্টের উদ্দেশ্য হবে ফাশিষ্ট্ সমিতি সঙ্ঘগুলিকে ধীরে ধীরে আয়ত্তে এনে অসন্তোষের বহ্নি জ্বালানো; সে ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের সামান্য প্রাথমিক দাবীগুলিকে আশ্রয় করে' আন্দোলন আরম্ভ করাই উচিত। যে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনগণের যোগ রয়েছে প্রকৃত সাম্যবাদীর কর্ম্মস্থল সেইখানেই; ফাশিষ্ট্ দেশে এই নিয়ম স্মরণ রাখা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। আর যে-দেশে সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্‌দের প্রতিপত্তি অথবা শাসনকর্ত্তৃত্ব রয়েছে সেখানে পপুলার ফ্রণ্টের লক্ষ্য হবে আন্দোলনের সাহায্যে সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্‌দের পদস্খলন ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অসম্ভব করে তোলা। সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্ নেতারা সহযোগে রাজি না হ'লে সেখানে আলোড়নের ফলে জনমতের জাগরণই লক্ষ্য হবে।

এ ছাড়া সর্ব্বত্রই কতকগুলি প্রচেষ্টা নূতন কর্ম্মপদ্ধতির সাধারণ অঙ্গ হয়ে থাকতে বাধ্য। প্রতি দেশে সকল ট্রেড্ ইউনিয়ান্‌কে এক সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে এবং এক জগদ্ব্যাপী মহাপ্রতিষ্ঠানে সকল শ্রমিকসমিতির একতাও বাঞ্ছনীয়। যুবক-আন্দোলন, নারীজাগরণ এবং অনুন্নত জাতিসমূহের মুক্তিকামনাও এক সূত্রে যুক্ত করা ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের অন্যতম আদর্শ। প্রয়োজন হ'লে পপুলার ফ্রণ্টের রাজ্যশাসন কার্য্যেও সাম্যবাদীরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এই অভিযানের প্রথম কাজ ফাশিষ্ট্-থিওরির প্রতিরোধ। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ ফাশিজ্‌মের একটি প্রধান সহায় কিন্তু সে ভাবকে সাম্যবাদের কাজে লাগানো একেবারে অসম্ভব নয়। বুর্জোয়া জাতীয় ভাব সর্ব্বথা

বর্জ্জনীয় কিন্তু ডিমিট্রভের মতে সাম্যবাদের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় ভাবধারার স্থান থাকতে পারে। মার্ক্স বাস্তবপন্থী ছিলেন তাই তাঁর নির্দ্দিষ্ট শ্রমিকদের মিলনমন্ত্রে জাতীয়তাবোধের কোন স্থান নেই ভাবা অনুচিত। সোভিয়েট্ রাষ্ট্রে লেনিন্ বিভিন্ন জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন আর বহুকাল পূর্ব্বেই ষ্টালিন্ বলেছিলেন যে সোশ্যালিষ্ট্ আমলে সংস্কৃতির বাহ্যরূপ হবে জাতীয় যদিও তার অন্তর্লীন প্রাণশক্তি নির্ভর করবে শ্রমিকশ্রেণীর আশা ভরসা ও অভিজ্ঞতার উপর।

৪

সোভিয়েট্ রাশিয়ার নূতন বৈদেশিক নীতি এবং কমিন্টার্ণের নূতন কর্ম্মপ্রণালীর কারণনির্ণয় বিশেষ শক্ত নয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পদ্ধতির যৌক্তিকতাও প্রতিপন্ন হয়েছে বলা চলে। কিন্তু রাশিয়ার আভ্যন্তরিক বিপদ সম্বন্ধে সম্প্রতি বহু জল্পনা সাধারণে প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবতঃ অনেকেরই এখন এই বিশ্বাস যে পুরাতন কোন কোন নেতার শাস্তি এবং আর্থিক বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন রাশিয়ার আদর্শচ্যুতির পরিচায়ক। সাম্যতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অকস্মাৎ এতখানি দরদ অপ্রত্যাশিত ও হাস্যাস্পদ।

জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্ এবং তুকাচেভ্স্কির পতন বহুলোকের কাছে এত অপ্রত্যাশিত বোধ হয়েছিল যে ষ্টালিনের মস্তিস্কবিকৃতির একটা গুজব পর্য্যন্ত উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ষ্টালিনের সমর্থকেরা যে অজস্র এবং রাশিয়ায় তাদের প্রতিপত্তি যে এখনও দৃঢ় সে কথা ভোলা অন্যায়। ড্যান ও এব্রামোভিচ্ প্রভৃতি মেন্শেভিক নেতারা এবং ট্রট্স্কির অনুচরগণ বিশ্বাস করেন যে ষ্টালিনের দল খাঁটি বিপ্লবীদের সরিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছে আর তাদের আচরণ ফরাসী বিপ্লবের থার্মিডরিয়ান্দের অনুরূপ। কিন্তু দণ্ডিত সেনাপতিদেরও শোনা যায় এ ধরণের একটা সংকল্প ছিল—সুতরাং তাঁদের শাস্তির কারণ কি? মিলিকভ্ ও কেরেন্স্কির মতে ষ্টালিন্ই ঘোর বিপ্লবী, তিনি দলের মধ্যে উগ্রপন্থার বিরোধীদের উৎপাটিত করতে চান। তবে রাশিয়ায় ট্রট্স্কির শিষ্যদের আজ এ দশা কেন? নানা থিওরির এভাবে উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু তাদের বোধ হয় একটি সাধারণ বিশ্বাস আছে। সম্প্রতি রুষদেশে যাদের গুরুদণ্ড হয়েছে এই

মত অনুসারে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সাজানো এবং মিথ্যা, তাদের শাস্তির আসল কারণ নাকি ষ্টালিনের সঙ্গে মতভেদ মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের কথা যে এক্ষেত্রে মিথ্যা নয় এই মত মেনে নেবার পক্ষেই বা বাধা কি? রাশিয়ার শাসকেরা বর্ব্বর এই ধারণাই কি আসলে সে বাধা নয়?

মস্কোতে বিচারের সময় বেশীর ভাগ বন্দী অপরাধ স্বীকার করেছিলেন, সে স্বীকারোক্তিকে অবিশ্বাস করবার একমাত্র কারণ হ'তে পারে এই সন্দেহ যে তাঁদের কারাগারে উৎপীড়ন হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ অবশ্য এখনও অনুপস্থিত। অসীমসাহসী বন্দীদের মধ্যে একজনও কেন তাহলে সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ্য বিচারসভায় ফাঁস করে দেন নি? আইনব্যবসায়ী প্রিট্ তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার সময় বলেছেন যে আসামীদের দেখে এ সন্দেহ তাঁর কাছে অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। বরং এ কথা মনে হওয়াই বেশী স্বাভাবিক যে ষড়যন্ত্রের এত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে দোষস্বীকার অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের সময় অবশ্য বন্দীরা এই প্রমাণের পরিমাণ বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর একজনের দোষস্বীকারকে সমর্থন করেছে অন্যদের সাক্ষ্য; অভিযোগগুলির এত বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বন্দীদের বিবৃতিগুলিও এত দীর্ঘ, প্রকাশ্য বিচারের সময় বাদানুবাদও এত দ্রুতগতি চলেছিল যে অপরাধীদের দোষ কল্পনা মাত্র এ সন্দেহের অবকাশ নিতান্তই কম। তুকাচেভ্স্কির অপরাধ সম্ভবতঃ অতি গুরুতর ছিল—তিনি শুধু ষ্টালিন্কে সরাবার সংকল্প করেন নি, তাঁর সঙ্গে জার্মান্ সেনাধ্যক্ষদের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল এবং গুপ্ত যোগস্থাপনের চেষ্টা চলছিল। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ফরাসী ও চেকোশ্লোভাক্ যুদ্ধবিভাগের হাতে এঁর ষড়যন্ত্রের কিছু প্রমাণ সঞ্চিত আছে। Foreign Affairs পত্রিকায় কৌতূহলী পাঠক তার বিবরণ পাবেন।

জিনোভিয়েভ্ প্রভৃতির শাস্তিতে সোভিয়েটের অপযশ বাড়বে এটুকু বুদ্ধি রাশিয়ার শাসকদের আছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিচারে প্রবৃত্ত হবার সুতরাং বৈধ কারণ থাকাই সম্ভব। তুকাচেভ্স্কি এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ আস্থা ভোগ করেছিলেন; তাঁর আকস্মিক দণ্ডবিধান শুধু খামখেয়ালির ফল মনে করা কঠিন। তাই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের হঠাৎ

আবিষ্কার মেনে নিলে, মস্কোর বিচার কয়েকটির অনেক রহস্য মিলিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে শুধু আর দুটি কথা উল্লেখযোগ্য। জিনোভিয়েভ্-এর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে অনেকে ভুলে যান যে ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্রের ফলে কিরভ্ নিহত হয়েছিলেন। তাছাড়া ষ্টালিন, মোলোটভ্ ও ভোরোশিলভের প্রাণসংশয় হয়েছিল এবং সাম্যবাদের ইতিহাসে এঁদের কারও স্থান তুচ্ছ নয়। দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত প্রাচীন নেতাদের প্রতি এত উচ্ছ্বাস একটু আকস্মিক। এঁরা যখন লেনিনের সহচর ছিলেন, তখন এঁদের নিন্দার বিরাম ছিল না। ষ্টালিনের বিরোধী বলেই কি এঁদের এখন এত সম্মান?

৫

সাম্যবাদের পরাজয়ের নিদর্শন হিসাবে রাশিয়ার বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থাকে অনেকখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর্থিক বিধানের বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের স্বল্পায়তনের মধ্যে অসম্ভব। মোটের উপর জীদ্ প্রমুখ সমালোচকের বক্তব্য বোধহয় এই যে ধনতন্ত্র আবার সে দেশে গড়ে' উঠ্‌ছে; আর সামাজিক পরিবর্ত্তনের এই গতির প্রতিফলন হিসাবে রুষদের মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি, ধর্ম্মদ্বেষিতার হ্রাস, বৈষম্যবৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। প্রকাশিত না হ'লেও সমালোচকদের মনে একটা সিদ্ধান্ত সহজেই অনুমান করা চলে—রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা উচিত সোশ্যালিজ্‌ম্ অসম্ভব।

মার্ক্সের মত অনুসারে সাম্যতন্ত্র গঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, (ধনতন্ত্র গড়ে' উঠতে যেমন একাধিক শতাব্দী লেগেছিল) যদিও এ যুগের দৈর্ঘ্য একমাত্র ভবিষ্যতেই বোঝা যাবে। পূর্ণ সাম্যতন্ত্র বা কমিউনিজ্‌মে পৌঁছবার আগে একটা প্রস্তুতির অবস্থা পার হ'তে হবে, তাকে এখন সমাজতন্ত্র অথবা সোশ্যালিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। রাশিয়া এখন মাত্র এই প্রাথমিক অবস্থায় পৌঁছবার প্রয়াস পাচ্ছে এবং সেই উদ্যমের মধ্যে স্বভাবতই অগ্রগতি ও তার বিপরীত দুই থাকবে। বিবর্ত্তনগতির লক্ষ্য ও দিকটাই আসল, তার বেগ ও সাময়িক অবস্থান তুচ্ছতর ব্যাপার।

সাম্যতন্ত্র গঠনের প্রথম সোপান শ্রমিকবিপ্লব। ১৯১৭ সালে রুষদেশে সোভিয়েট্ শক্তির অভ্যুত্থানের পর কমিন্‌টার্নের আশা ছিল দেশে দেশে তার

অনুকরণ হবে। আসলে নানাকারণে ধনিকতন্ত্র রাশিয়ার বাইরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল না। তখন বল্‌শেভিক্‌দের যে-সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, ট্রট্‌স্কি ও ষ্টালিনের দ্বন্দ্ব তার থেকে উৎপত্তি এবং গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস সেই সমস্যারই নূতনরূপ মাত্র।

ট্রট্‌স্কির মত ছিল যে পৃথিবীর নানা দেশে বিপ্লব উপস্থিত না হ'লে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব সুতরাং সমস্ত শক্তি সেদিকে নিয়োগ করাই উচিত। ষ্টালিনের বিশ্বাস এই যে শ্রমিকবিপ্লব ছেলেখেলা নয়, তার একটা সুযোগ আসে; সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। লক্ষ্য অবিচলিত থাকবে অথচ কর্ম্মপদ্ধতি স্থানকাল অনুসারে পরিবর্ত্তিত হতে পারবে; ডায়ালেক্‌টিক্এর গতিছন্দ শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজগঠন-কার্য্যের মধ্যেও রূপ পাওয়াই স্বাভাবিক।

প্রথম দৃষ্টিতে ট্রট্‌স্কিপন্থাকে ঘোর বিপ্লবী মনে হয়। কিন্তু ১৯২৪এর পরে রাশিয়ার সঙ্কটে তার প্রকৃতরূপ ধরা পড়ল। বল্‌শেভিক্‌দের দেশের মধ্যে নিশ্চেষ্টতা এবং বিদেশে গণ্ডগোলসৃষ্টির ব্যর্থপ্রয়াসে শক্তিক্ষয়—ট্রট্‌স্কির থিওরির ন্যায্য পরিণাম ত এই দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ষ্টালিনের মত ছিল যে রাশিয়ার মধ্যে নূতন সমাজের গঠনচেষ্টায় শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি হবে এবং তার ফলে আবার কোন সুযোগের মুহূর্ত্তে শ্রমিকশক্তির বিদেশে প্রসারও তখন সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। এই বিশ্বাসের থেকে নিশ্চেষ্টতার বদলে এল পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। কৃষিকার্য্যে সঙ্ঘবিস্তারের ফলে রাশিয়ার চেহারা বদলে গেল এবং ধনতন্ত্রের অন্যতম মূলাধার কুলাক্ বা বড় কৃষক শ্রেণীর উৎপাটন ও উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে চালিত করল।

ট্রট্‌স্কিপন্থা বস্তুতঃ অনেকখানি কথার আস্ফালন—তার অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীও মার্ক্সের ডায়ালেক্‌টিকের থেকে স্বতন্ত্র। ষ্ট্রেচি, জ্যাক্‌সন্, হেকার প্রভৃতির সুপরিচিত ইংরাজি গ্রন্থেও এ পার্থক্য পরিস্ফুট আছে। প্রথম জীবনের মেন্‌শেভিক্ চিন্তাধারা ট্রট্‌স্কিকে এখনও অভিভূত করে রেখেছে। লেনিনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্য্যন্ত নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলেছিলেন, এখন আবার তাঁর পূর্ব্বমতের ছায়া তাঁকে আচ্ছন্ন করছে। অথচ সম্প্রতি তাঁকেই মার্ক্সের প্রকৃত শিষ্য বলে' বহুস্থানে অভিনন্দিত করা হয়। মার্ক্সের

নিজের ভুল হওয়া বিচিত্র না কিন্তু ট্রট্স্কির ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই মার্ক্সবাদের বিকৃতি মাত্র। ষ্টালিনের কর্ম্মপ্রণালী মার্ক্স্বাদের বিরোধী এ কথা ট্রট্স্কির দল বার বার ঘোষণা করলেও আজ পর্য্যন্ত তার সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত হয় নি।

ট্রট্স্কি প্লেকানভের শেষযুগের মতের মতন মেন্‌শেভিক্ আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে ১৯৩০ সালেই ডেবরিন্ ও মিটিন্‌এর দার্শনিক তর্কযুদ্ধে একথা পরিষ্কার হয়। সাম্যবাদী দল ষ্টালিনের অনুসরণ করল কিন্তু দুঃখের বিষয় ট্রট্স্কি বিরুদ্ধাচরণ ছাড়লেন না। তাঁর নির্ব্বাসনের পরও সে দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। ট্রট্স্কির অনুচরেরা শেষ পর্য্যন্ত গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সাম্যবাদের প্রকৃত সঙ্কট বোধ হয় এইখানেই; ট্রট্স্কিপন্থীরা দলের সিদ্ধান্ত না মেনে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে' শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্ব্বল করে' ফেল্‌ছে।

মার্ক্স্বাদের চর্চ্চা করলে দেখা যায় যে ট্রট্স্কির বাহ্যিক উগ্রমত ও ব্যবহারিক পশ্চাদ্‌গমন নিতান্ত নূতন ব্যাপার নয়। মার্ক্সের থিওরিকে বরাবরই দুই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে—দক্ষিণ ও বামে না টলে' মধ্যপন্থায় অগ্রসর হওয়া তার অভ্যাস আছে। প্রথম জীবনে মার্ক্স্‌কে ব্লাঙ্কির (Blanqui) প্রভাব খণ্ডন করতে হয়েছিল—এই ফরাসী বিপ্লবীর ব্রতই ছিল স্থানকাল অগ্রাহ্য করে' নির্ব্বিচার বিদ্রোহের অভিযান। তারপর ম্যাক্স্ ষ্টার্নার্‌এর উগ্রপন্থাকেও মার্ক্স্ অগ্রাহ্য করলেন। বহুদিন ধরে' মার্ক্সের সঙ্গে বাকুনিন্‌এর মতভেদ চলে—বাকুনিন্ এবং তাঁর নৈরাজ্যবাদী অনুচরেরা বিপ্লব প্রচেষ্টাকে বিলাসে পরিণত করেছিলেন। এঁদের মনোভাব অনেকখানি পেটিবুর্জোয়া—সামাজিক জীবনে এর অনুরূপ চিন্তা বোহেমিয়ান্ যথেচ্ছাচারের রূপ গ্রহণ করে। লেনিন্‌কেও এইভাবে চল্‌তে হয়েছিল—চরমপন্থী সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিদ্রূপাত্মক পুস্তিকাটি সম্ভবতঃ এতদিনে সুবিদিত হয়েছে। তাঁর মতেও অধীর উচ্ছ্বাস অনেক সময় নিশ্চেষ্টতার নামান্তর। শুধু বিপদ এই যে উগ্র-পন্থাকে আট্‌কাতে গিয়ে সাম্যবাদ সোশ্যাল্ ডিমক্রাসিতে পরিণত না হয়ে পড়ে। তবে ষ্টালিন্-এ বিপদ সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত সতর্ক হয়ে চলেছেন বলে'ই বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। বুকারিন্ রাকোভ্স্কি প্রভৃতি যাঁদের বিচার এখন মস্কোতে

চলেছে তাঁদের অনেকেই দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও সোশ্যাল ডিমোক্রাট ভাবাপন্ন হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সাম্যবাদের ইতিহাস থেকে মনে হওয়া অন্যায় নয় যে ষ্টালিনের তথাকথিত আদর্শচ্যুতি প্রকৃত পক্ষে মার্ক্স্ ও লেনিনের অনুসরণ এবং ডায়ালেক্‌টিকের ন্যায্য প্রয়োগ মাত্র। লেনিন্ যখন নেপ্-এর প্রবর্ত্তন করেছিলেন তখন তাঁকেও এই অভিযোগ শুনতে হয়েছিল—সে সময় বলশেভিজ্‌ম্-এর অবসান সম্বন্ধে বই লেখাও হয়েছিল। অবস্থা অনুসারে সাম্যবাদীদের কর্ম্মপদ্ধতি হয়ত আবার বদলাবে। সেইজন্য শুধু সাময়িক দু'চারটি নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করে' সাম্যবাদের সঙ্কট সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত।

শ্রীসুশোভন সরকার

প্রান্তর

হেমন্তের দিনশেষ ;
দিগন্ত আজ কুহেলিবিলীন,
বিস্মৃতির বিধুরতার মতো।
বনানীর নীলিমায়
তোমার
আলুল কুন্তলের সুরভিত অন্ধকার,
প্রথম-ফোটা ধুসর তারকায়
শিহরায়
তোমার
কালো চোখের সর্ব্বনাশা আলো।

তরঙ্গায়িত প্রান্তরে,
রজত জলধারায়
বিসর্পিল তোমার দেহতটরেখার ছন্দ,
নন্দিত তোমার কামনার গুঞ্জরণ
আকাশের কম্প্র স্তব্ধতায়।

ভেবেছিলাম ভুলেচি তোমাকে,
তোমাকে ভুলেচি, পলাতকা,—
নিরন্ত কালের জন্য ভুলেচি।
আজ এসেচে হেমন্তের দিনান্ত,
ভেঙেচে বাঁধ,—
এল বিস্মৃতির বালুবেলায়
স্মরণের উন্মত্ত প্লাবন।

আসে অন্ধকার।

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

নিরুদ্দেশ কামনা

সন্ধ্যার অন্ধকারে
পুষ্পিত শালবনের সঙ্কীর্ণ পথে একা একা যাই।
মনে মনে বলি :
কোথা সে প্রেয়সী
এ জীবনে যার আবির্ভাব অবধারিত ছিল।
সন্ধ্যা-তারা উঠেছে বহুক্ষণ হল,—
প্রাণ আমার তৃষিত রয়েছে চিরজীবন
অশ্রুলবণাক্ত চুম্বন তার কামনা ক'রে।
হায়রে কল্পিতা প্রেয়সী!

একা জেগে উঠি
ঘনঘোরা যামিনীর অশ্রান্ত ঝর্ঝরে।
সূচিভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে খুঁজি :
কোথা সে ভগবান
শীতল যার দুটি চরণের স্পর্শ চাই চিরজীবন
তপ্ত বুকের ভিতর,—
একটু স্পর্শ চাই।
হায়গো কল্পিত ভগবান!

কানাই সামন্ত

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও স্বদেশসেবা

অপর্ণা দেবী সঙ্গীতশাস্ত্র চর্চ্চা করে কীর্ত্তনের মাধুর্য্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এজন্য বৈষ্ণবেরা ও বৈষ্ণবেতর অন্যান্য বাঙালীরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। কীর্ত্তনের সার্থকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে অপর্ণা দেবীর সাধনা ও প্রচেষ্টা যে প্রশংসার্হ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাটনায় ও কৃষ্ণনগরে সাহিত্যসম্মেলনে তিনি যে অভিভাষণদ্বয় পাঠ করেছিলেন, সে দুটি নিয়ে অনেকে হয়তো অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সকলেই অর্পণা দেবীর স্বদেশপ্রীতি দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন।

ফরাসী লেখক পিয়ের লোতি ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষের খোঁজ করতে এ দেশে এসেছিলেন এবং ভারতীয় স্থপতিকলার প্রাচীন নিদর্শনগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অপর্ণা দেবী বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরাজ্যে এক অপূর্ব্ব প্রতীচ্যবর্জ্জিত জগতের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বাসনা এই যে তিনি জীবনসন্ধ্যায় প্রগতির কোলাহলহীন এই নিরিবিলি জগতে তীর্থবাস করেন। একথা কেউ যেন মনে না করেন যে অপর্ণা দেবী বৃদ্ধা হয়েছেন। যাঁরা পদাবলীর ভাবরাজ্যে চলাফেরা করেন, তাঁদের মনের ওপর কালের কালিমা ও জরার জীর্ণরেখা পড়তে পারে না। এই অর্থে অপর্ণা দেবী চিরতারুণ্যের উপাসিকা। তবে তাঁর দুটি অভিভাষণেই প্রগতিবিরোধী ভাব বেশ ফুটে উঠেছে। প্রগতিবিরোধিতাতেই অপর্ণাদেবীর স্বদেশপ্রীতি ব্যক্ত। বিমূঢ় ভারতে এই জাতীয় স্বদেশপ্রীতির স্থান থাকতে পারে; কিন্তু প্রবুদ্ধ ভারত এ ধরণের স্বাদেশিকতাদ্বারা প্রণোদিত হবে কি না সে বিষয়ে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর নয়।

প্রতীচ্য যে শুধু বন্দুক ও কামান নিয়ে প্রাচ্যের দ্বারে হানা দিয়েছে তা নয়। কামান ও বন্দুকের পেছনে আছে বিরাট ও বিশাল সভ্যতা ও কৃষ্টি। যখন সুদূর ভবিষ্যতে এই বিংশ শতাব্দী অতীতের অস্তাচলে ডুবে যাবে আর

রেখে যাবে তার ব্যর্থতা ও সাফল্যের স্মৃতি, তখন হয়তো ঐতিহাসিককে স্বীকার করতে হবে যে বিংশ শতাব্দীর অবদান পাশ্চাত্যের এই কৃষ্টি। বাংলা দেশ কি এই কৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করবে? এই কৃষ্টির কৃত্রিম আবহাওয়াতেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী মানুষ হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী এই কৃষ্টিকে গিলতেও পারে নি, ফেলতেও পারে নি। তাই বোধহয় বাংলার তথা-কথিত শিক্ষিত-সমাজের পনের-আনা লোকই মানসিক বদহজমে ভুগছে আর এই ব্যাধির লক্ষণগুলি নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা শেক্স্‌পীয়র ও মিল্টন মুখস্থ করেছি কিন্তু পাশ্চাত্য কৃষ্টির সত্যিকার দান এখনও গ্রহণ করতে পারি নি। সমগ্র এশিয়ায় একমাত্র জাপানই অকৃত্রিম ভাবে পাশ্চাত্যের দান অঙ্গীকার করতে সমর্থ হয়েছে। জাপানে শেক্স্‌পীয়র ও মিল্টন মুখস্থ বলতে পারে এমন লোকের সংখ্যা অল্প। কিন্তু সেই উদীয়মান সূর্য্যের দেশে পাশ্চাত্য কৃষ্টির ও জাপানের নিজস্ব প্রাচ্য কৃষ্টির অপূর্ব্ব ও অভিনব সমাবেশদ্বারা উদ্বুদ্ধ মনস্বীদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাই আজ জাপান syncretic culture সৃষ্টি করতে পেরেছে। ভারতবর্ষেও এই ধরণের একটা syncretic culture-এর দরকার—দরকার কৃষ্টিগত সৌখীনতার জন্য নয়, দরকার আত্মরক্ষার জন্য।

সমন্বয়ে বিভিন্ন অংশের যোগ স্বাভাবিক ভাবেই হবে। যে অংশগুলির যোগ কৃত্রিম উপায়ে সিদ্ধ হয়, সে অংশগুলি বর্জ্জন করতে হবে। সঙ্গীতশাখায় প্রদত্ত অপর্ণা দেবীর অভিভাষণ পড়ে আমার মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল—প্রাচ্য সঙ্গীতের ধারা ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধারা কি একেবারে বিভিন্ন? কোনও জায়গায় কি এই দুটি ধারা মিলিত হ'তে পারে না?

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে মনীষা না থাকলে সমন্বয় হ'তে পারে না। একজন নিরক্ষর চাকর বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক ও বেদান্তদর্শনের বই টেবিলের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এই বিভিন্ন মতগুলির সমন্বয় করতে পারেন কেবল তত্ত্বদর্শী মনস্বী। বাংলাদেশের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে মনীষার কি এতই অভাব যে সঙ্গীতে এ রকম সমন্বয় অসম্ভব হবে? এর উত্তরে হয়তো অনেকে বলবেন "সমন্বয়ের সম্ভবপরতা নিয়ে প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হচ্ছে বাঞ্ছনীয়তা নিয়ে।" সঙ্গীতে যদি ফিরিঙ্গিয়ানার আমদানি হয়,

তা'হলে একটা উৎকট ধরণের জিনিষ সৃষ্টি হবে—সে জিনিষ লাগবে ন দেবায় ন ধর্ম্মায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার ব্যুৎপত্তি নিতান্তই অল্প। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, তু'তিন বছর ধরে ভাল ভাল পাশ্চাত্য গান শুনলে মনে হয় যেন বাংলাদেশের গান একঘেয়ে। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে পাশ্চাত্য দেশে প্রবাসকালে যখন প্রথম ইউরোপীয় গান শুনেছিলুম, তখন মনে হয়েছিল যে মেয়ে পুরুষ পাগল হয়ে একটা বিকট চীৎকার সুরু করে দিয়েছে। তারপর কান যখন দোরস্ত হয়ে এল, তখন বুঝতে পারলুম যে এই চীৎকারের মধ্যে একটা সংযম ও নিয়ম লুকানো আছে। আমাদের দেশের সঙ্গীতকে কি কেউ এই একঘেয়েমির দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন না?

আজও আমার সেদিনকার কথা মনে পড়ে যে দিন আমি প্রথম ফরাসী দেশ দেখলুম। জাহাজ বন্দরের ভেতর গিয়ে উপকূলের কাছে থামলো। এমন সময়ে দেখলুম একটি ফরাসী মেয়ে হার্প বাজিয়ে গান আরম্ভ করে দিলে। গানের সুরটি লোকমাতানো মাদকতায় ভরপুর। বুঝতে পারলুম যে মেয়েটি ফরাসী দেশের জাতীয় সঙ্গীত লা মার্সেইয়েস্ গান করছে। তখন আমার মনে হ'ল যে আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীতগুলি এই রকম মাতানো সুরে গীত হ'লে দেশের লোককে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করা শক্ত হবে না। এ ব্যাপারে কীর্ত্তনের সার্থকতা কি পরিমাণ তা' সঠিক নির্দ্ধারণ করবার মত সঙ্গীতজ্ঞান আমার নেই। তবে মনে হয় যেন কীর্ত্তন করুণ ও উদাস এই তুই বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হ'তে পারে। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই সুর কার্য্যকর ও সান্ত্বনাদায়ক; কিন্তু দেশকে সমরাভিযানে প্রেরণা দেবার শক্তি এ সুরের নেই। বর্ত্তমান ভারতে বিদেশী শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, তাও এক রকম যুদ্ধ, তার জন্য কালোপযোগী বিশেষ সুরের দরকার। দেশী সুর পাওয়া যায় তো ভালই। তা' না হ'লে অগত্যা বিদেশ থেকে সুর ধার করতে হবে। তাতে লজ্জার কোনই কারণ নেই। পৃথিবীর প্রত্যেক বড় বড় জাতের কৃষ্টিতে খানিকটা ধার করা অংশ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের কৃষ্টিতেও কতকগুলি বিদেশী উপাদান নিহিত আছে। বাংলা সাহিত্যে European elements অনেক দেখতে পাওয়া যায়। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র

ও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাশ্চাত্যের ছায়া বেশ স্পষ্ট ভাবে পড়েছে। এতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরং লাভবানই হয়েছে। তবে সঙ্গীতের বেলায় কেন আমরা মিথ্যা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয়ে পাশ্চাত্যের দান গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করবো? গোবর গণেশ মহাশয় তাঁর বইয়ে ভাটপাড়ার পণ্ডিতের নামাবলী গায় দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিলেন। সেরকম কীর্ত্তনের সুরকে ভারতের উদ্বোধন ব্যাপারে কাজে লাগানো প্রহসন মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম আপত্তি থাকতে পারে। এখানে আমি শুধু তু একটি আপত্তির উল্লেখ করবো। পদাবলীর অনেক কবিতাই আত্ম-নিগ্রহের ভাবে ভরা। পারিভাষিক অর্থে আত্ম-নিগ্রহ শব্দটি ব্যবহার করছি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাকে masochism বলা হয়, সেই অর্থে আত্ম-নিগ্রহ শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। হতাশ প্রেমিক কিংবা বিরহীর পক্ষে আত্ম-নিগ্রহ স্বাভাবিক কারণ এ তুরকম অবস্থাতেই মানুষের মন আত্মনিগ্রহে এক রকম শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। মানসিক অবসাদে আত্ম-নিগ্রহ ক্ষণিক সুখও দিতে পারে। কিন্তু তুঃখের ওপরেই এরকম সুখের প্রতিষ্ঠা। আত্ম-নিগ্রহের ফলাফল সম্বন্ধে এই বলা যেতে পারে যে আত্ম-নিগ্রহ কর্ম্মতৎপরতা নষ্ট করে দেয় ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়। তাতে একটা অবাস্তব মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে এই ভাব নিতান্তই বর্জ্জনীয়। ভারতকে এখন কর্ম্মঠ হ'তে হবে এবং বাস্তব রাজনীতির অর্থাৎ real-politik-এর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। এ সময় যদি ভারত আত্ম-নিগ্রহের মোহে বিমূঢ় হয়ে থাকে, তা' হলে ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে।

একথা স্বীকার করতে আমি আদৌ কুণ্ঠিত নই যে পৃথিবীর সব ধর্ম্মই অল্প বিস্তর আত্ম-নিগ্রহের ভাবে পূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্মেও এই ভাব লক্ষিত হয়। ফরাসী সমালোচক Sainte-Beuve ইংরাজদের ঠাট্টা করে বলেছেন যে পণ্ডিতেরা Imitation of Christ নামক বইটির আনুমানিক রচয়িতার নাম নির্দ্দেশ করতে গিয়ে অনেক দেশের লেখকদের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কোনও ইংরাজ লেখকের নাম উল্লেখ করেন নি। এর উত্তরে Mathew Arnold বলেছেন যে

এতে ইংরেজদের দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই যেহেতু আত্ম-নিগ্রহের ভাবে ভরতি বইএর লেখক হওয়াতে কোনই গৌরব নেই। খৃষ্ট-ধর্ম্মে কিছু পরিমাণে আত্ম-নিগ্রহের স্থান থাকলেও মোটের ওপর খৃষ্টধর্ম্মের বাণী আশা ও কর্ম্ম-তৎপরতার ওপর জোর দিয়েছে। তার জন্যই এই ধর্ম্মের আদর শুধু প্রতীচ্যে নয়, সুদূর প্রাচ্যেও। অর্থাৎ চীন ও জাপানে এই ধর্ম্মের কদর বেড়েছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসেও বার কয়েক সুবর্ণ যুগের উদয় হয়েছিল। সুদূর অতীতে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তির প্রায় দু'শ বছর আগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একজন গ্রীক রাজদূত আত্মার কল্যাণের জন্য দেবদেব বাসুদেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার স্মৃতিস্বরূপ এখনও বেস্‌নগর অনুশাসন-লিপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু সে যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্ম অন্য রকম ছিল। তাতে রাধাতত্ত্বের মোটেই উল্লেখ নেই। ইতিহাসের দিক্ থেকে দেখতে গেলে ব'লতে হবে রাধাতত্ত্ব আধুনিক। প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মে এর কোন স্থান নেই। একদিকে যেমন রাধাতত্ত্ব বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে, অপর দিকে এই তত্ত্ব অনেক অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাধাতত্ত্বের উৎপত্তি মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাতেই খুঁজতে হবে। নরনারীর মিলনকে আশ্রয় করে সাহিত্য ও ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে। এই যুগল মিলন, ধর্ম্মে ভক্ত ও ভগবানের যে সম্বন্ধ, তার প্রতীক স্বরূপ ব্যবহৃত ও উল্লিখিত হয়।

সাহিত্যে ও ধর্ম্মে এই তফাৎ যে সাহিত্যে এই যুগল মিলনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশগুলিই বেশী ফুটে ওঠে আর ধর্ম্মে এই যুগল মিলন প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এক অতীন্দ্রিয় বস্তুর সূচনা করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের বোধ যদি ইন্দ্রিয়ের মায়াজালে নেহাৎ আটকে না পড়ে, তা'হলে এরই ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি একেবারে অসম্ভব হয় না। এরকম অবস্থাতেই সাহিত্য মানুষের মনকে ধর্ম্মের সীমান্ত প্রদেশে পৌছিয়ে দেয়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের স্তরে রয়েছে, ধর্ম্মের স্তরে উঠতে পারে নি। পদাবলীর বিস্তৃতি ধর্ম্মের সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত, তার বেশী নয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষাতেই এর উৎপত্তি ব'লে পদাবলীর মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে। এজন্যই পদাবলীর অনুরূপ কবিতা অন্যান্য জাতির সাহিত্যেও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইহুদীদের ভেতরও এরকম সাহিত্যের অভাব ছিল না। বাইবেলে Song of Solomon

অথবা Song of Songs নামক যে বইটি আছে তার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেম। এই বইটি যখন বাইবেলের মধ্যে স্থান পেল, তখন জন কয়েক বুড়ো "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলে একটা গোলমালের সৃষ্টি করলেন। তার পর বিজ্ঞেরা এই প্রেমগীতিকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে গোলমাল মিটিয়ে দেন। এই ঘটনা খৃষ্টের জন্মের কয়েক শ' বছর আগে ঘটেছিল। যখন শাস্ত্রের কোনও অংশ আমাদের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাপ খায় না, তখন আমরা একটা কাল্পনিক গূঢ় অর্থ বের করতে চাই। রূপক অর্থ উদ্ভাবন করে আমরা পুরানো জিনিষটা একেবারে ফেলে না দিয়ে ধর্ম্মের কাজে লাগাতে চেষ্টা করি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে এর বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি আগেই বলেছি যে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাতত্ত্বের কোন উল্লেখ নেই। পাণ্ডব গীতার কিংবা ভগবৎ গীতার লেখক এ তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। অথচ এই গীতা-গ্রন্থদ্বয়ের মোহিনীশক্তি রাধাতত্ত্বের চেয়ে কম নয় বরং বেশী। কৃষ্ণলীলার প্রথম উল্লেখ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা বোধ হয় আমরা মহাভারতোক্ত শিশুপালের বক্তৃতায় পাই। সেখানে কৃষ্ণের কীর্ত্তিকলাপের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু তারপর দেখতে পাই যে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে এই সব কাজেরই সমর্থন করা হয়েছে এবং এই রূপক ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে। ইংরাজিতে একে বলে allegorisation। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মেও আমরা allegorisation দেখতে পাই। প্রাচীন গ্রীক্‌দের ধর্ম্মে allegorisation ছিল। আমি আমার বৈষ্ণব বন্ধুদের জানাতে চাই যে Omar Khayyam-এর আধ্যাত্মিক ও রূপক ব্যাখ্যা হয়েছে। অন্যান্য জাতির সাহিত্যে বা ধর্ম্মে যে কারণে allegorisation হয়েছে, ঠিক সেই কারণে বৈষ্ণব ধর্ম্মেও allegorisation-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে। কারণ আমি আগেই নির্দ্দেশ করেছি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর ভাবের অনুরূপ সাধনা আমরা খৃষ্টধর্ম্মে দেখতে পাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিষ্টিক্‌দের মধ্যে অনেকেই এই ভাবের সাধনায় রত ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে মধুর ভাবের যে সাধনা দেখতে পাই, তাতে সংযম যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আমার মনে হয় বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংযমের একটু অভাব ঘটেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের জায়গায় জায়গায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের সীমানির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

আমি একথা বলতে চাইনে যে বৈষ্ণব-পদাবলী কিংবা বৈষ্ণব ধর্ম্ম নীতি-বিগর্হিত ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও বাঙালী এ রকম মত পোষণ করতে পারে না। একজন ইংরাজ লেখক তাঁর চীনদেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে প্রত্যেক চীনবাসী সমাজ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে Confucius-এর ভক্ত—অর্থাৎ চীনদেশের খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ সকলেই অন্তরে অন্তরে Confuciusকে শ্রদ্ধা করে। বাংলা দেশ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক বাঙালীই বৈষ্ণব—বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। বাংলাদেশের অনেক মুসলমান কবিও বৈষ্ণবভাবে ভাবান্বিত হয়েছেন। আমার মনে আছে যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও আলাপ হয়, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "যদি বাংলা দেশ কখনও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তা'হলে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মই গ্রহণ করবে।" একথাও বলা যেতে পারে যে বাংলা দেশ যদি কখনও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তা'হলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহায়তায় সে কাজ সিদ্ধ হবে। বৈষ্ণব ধর্ম্মই বাংলা দেশে খৃষ্টধর্ম্মের জন্য রাস্তা তৈরি করে দেবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েরই দার্শনিক ভিত্তি এক। উভয়েরই সাধনা মূলতঃ এক। এ বিষয়ের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে আমি আমার বৈষ্ণব বন্ধুদের বলতে চাই যে কোন বাঙালী খৃষ্টান বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করতে পারেন না। তবে যুক্তির খাতিরে বৈষ্ণবেতর বাঙালীরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা পদাবলী সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন।

ভারতের ইতিহাসে এক সময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে রেষারেষিও যথেষ্ট ছিল। নিদ্দেশ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে কৃষ্ণের অবমাননাসূচক উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সৌগত ধর্ম্ম এখন একটি বিশ্বজনীন ধর্ম্মে পরিণত হয়েছে, এর প্রভাব সুদূর প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্য দেশের সুধীমহলে অনুভূত হচ্ছে। আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম এখনও প্রাদেশিক ধর্ম্মের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি। এর কারণ কি? খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধেও এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম চার শ'

বছরের মধ্যে জগতে যে একটা ওলটপালট এনে দিয়েছিল—যে ওলটপালটের ধাক্কা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের দক্ষিণাংশেও অনুভূত হয়েছিল—সে রকম ওলটপালট গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আনতে পারে নি। এরই বা কারণ কি? এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অত্যধিক ভাবপ্রবণতা। Emotion যদি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে, তা'হলে জীবনের স্থিতি বিচলিত হয়, কর্ম্মতৎপরতা নষ্ট হয়ে যায়—বাস্তবের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মনীষীদের মধ্যে খৃষ্টের জীবনের radical criticism অনেক বছর ধরেই হচ্ছে। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভুর জীবন critical spirit-এ আলোচিত হয় নি। যদি তা' হত, তা'হ'লে আমরা বুঝতে পারতুম যে মহাপ্রভুর জীবন অত্যধিক ভাবপ্রবণতা দোষে দুষ্ট। এটা হয়তো বাঙ্গালীর জাতীয় দোষ। কিন্তু এই দোষই বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় উৎকট আকারে দেখা দিয়েছে। সাধারণ বৈষ্ণব কীর্ত্তনে সংযমের বড়ই অভাব। অপর্ণা দেবী কীর্ত্তনে সংযম আনতে পেরেছেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে অপর্ণা দেবীর বৈষ্ণব ভাবের পেছনে রয়েছে তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। এই শিক্ষা অলক্ষিত ভাবে অপর্ণা দেবীর ওপর নিজ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সাধারণ বৈষ্ণব কীর্ত্তনে আমরা অসংযম দেখতে পাই, কিন্তু অপর্ণা দেবীর কীর্ত্তনে দেখি সংযম যার ভিত্তি সৌন্দর্য্য-বোধের ওপর। বাংলার শিক্ষিত সমাজ অপর্ণা দেবীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে সন্দেহ নেই। অত্যধিক ভাবপ্রবণতা বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। কীর্ত্তনের পথে বেহুঁস হয়ে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে ও সংযত হ'য়ে চলতে হবে।

ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি ভক্তিদ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে সে হয় স্তব্ধ কিংবা পাগল হয়ে যায়—"স্তব্ধো ভবতি মত্তো ভবতি"। বাংলা দেশের সাধারণ বৈষ্ণবদের ঝোঁক কিন্তু পাগলামির দিকেই বেশী। যে যত পাগলামি ও উত্তেজনা দেখাতে পারে, সে ততই প্রশংসা পায়। লোকে এই অবস্থাকে দশা বলে। এই নিয়ে জায়গায় জায়গায় বৈষ্ণবদের মধ্যে mutual admiration society গড়ে উঠেছে। অপর্ণা দেবী হয়তো সে খোঁজ রাখেন। আধুনিক বাংলায় কীর্ত্তনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, কীর্ত্তনকে সুসংযত করতে হবে।

তা না করতে পারলে, কীর্ত্তন চর্চ্চা অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন "হা রে নিরানন্দ দেশ পরি জীর্ণজরা" বলে মায়াবাদী বেদান্তীদের ঠুকেছেন, অপর দিকে তেমনি বোষ্টমদের পাগলামিকে শ্লেষ করে তিনি বলেছেন "যে ভক্তি তোমারে নিয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে, মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে, সেই ভক্তি নাহি চাহি নাথ।"

সম্প্রতি বাংলা দেশ প্রগতির পথে সোঁ সোঁ করে এগিয়ে চলেছে। এর দরুণ দেশে একটা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ চাঞ্চল্যের প্রতিধ্বনি আমরা অন্যান্য শাখার অভিভাষণে শুনতে পাই। কিন্তু অপর্ণা দেবী এ বিষয়ে একেবারে নীরব। তিনি এই গোলমালের ঊর্দ্ধে এক কাল্পনিক জগতে বাস করছেন। বর্ত্তমানে অদৃশ্য কোনও এক অতীতের মায়িক রাজ্যের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়ে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করছেন। নূতন বাংলার আকুল আর্ত্তনাদ অপর্ণা দেবীকে বিচলিত করতে পারে নি। অত্যধিক ভাবপ্রবণতা ও অতীতানুরক্তি অপর্ণা দেবীকে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মহামতি St Paul বলেছেন যে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য এক রকম ও সূর্য্যের সৌন্দর্য্য আর একরকম কিন্তু চাঁদ ও সূর্য্য দু'ই সুন্দর। পদাবলীতে সৌন্দর্য্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু নব্য ভারতে জাতিগঠনের যে প্রচেষ্টা চলেছে সেই প্রচেষ্টার নৈরাশ্যে ও আশায় এবং প্রগতিপথের বন্ধুরতাজনিত পতনে ও উত্থানে এক মনোরম সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত হচ্ছে। এই সহজ ও সরল সত্যটি আমি অপর্ণা দেবীকে জানাতে চাই।*

শ্রীআশানন্দ নাগ

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশনে পদাবলীশাখার এবং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সঙ্গীতশাখার অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।

কসাইখানা

এসো মোরা এইখানে বসি—
এই ভেজা-অন্ধকার ঘাসের ওপর।
সহর ছাড়ায়ে দূরে—এই বড়ো গাছটার নিচে।
এখানে কলের বাঁশি বাজেনা কর্কশ।
স্খলিত-কৌমার্য্য কোনো পথচারী কুমারীর বিষাক্ত চাউনি নাই।
এখানে নিস্তব্ধ সব—
স্বপ্ন-পুরাতন!
অন্ধকার আলিঙ্গনে সময়েরে বন্দী ক'রে রাখে—
নিরাভ সময়
নিঃস্পন্দ সময়
ঐকান্তিক
অচঞ্চল
মৌন।
সৃষ্টিক্লান্ত শ্রান্ত-পাখা সময় ঘুমায়ে পড়ে
এই ভেজা-অন্ধকার ঘাসের ওপর!
সহর ছাড়ায়ে দূরে—এই বড়ো গাছটার নিচে।
এতো রাত্রে—এই মধ্যরজনীতে বন্ধ যবে সময়ের পাখার ঝাপট
ঐ দেখো, অন্ধকার-বুকে জ্বলে জঙ্গল—কপিশচোখ—বলো তো কিসের?
চোখ…
চোখ…
চোখ…
রজনীর তমে আর রহস্যের মাঝে ঐ শঙ্কিত কপিশ চোখে চোখেরা চলেছে দূর
কশাইখানায়!

জঙ্গল-কপিশ-চোখে জলন্ত ভয়ের ছায়া
অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিতেছে সুদূর তারার মতো ।

* * * * *

ভয় করে ?
পৃথিবী কশাই-খানা
দিকে দিকে সমুদ্যত শাণিত বল্লম !

হীরালাল দাসগুপ্ত

ভারতপথে*

চন্দ্রপুরের কলেজের দালান সরকারি পূর্ত্তবিভাগের কীর্ত্তি। কিন্তু কলেজের জমীর মধ্যে ছিল একটি প্রাচীন বাগান ও বাগান-বাড়ি। বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় অধ্যক্ষ ফিলডিং সাহেব এই বাগান-বাড়িতে থাকতেন।

স্নান শেষ ক'রে তিনি পোষাক পরছেন এমন সময় খবর এল ডাক্তার আজিজ এসেছেন। শোবার ঘর থেকে চেঁচিয়ে তিনি বললেন, "ধ'রে নিন এ আপনার নিজের বাড়ি—আমি আসছি।" অবশ্য ভেবে চিন্তে এ কথা তিনি বলেননি, ভেবে চিন্তে কথা বড় একটা তিনি বলতেন না, যা মনে আসত ব'লে ফেলতেন।

আজিজ কিন্তু কথাটি নিল খুব স্পষ্ট অর্থে। বেশ চেঁচিয়ে সে জবাব দিল, "নিজের বাড়ি মনে করব, সত্যি, আপনি এত ভালো। যাই বলুন, আদব কায়দা ফায়দা কিছু না, ঘরোয়া ব্যবহারের কাছে কিছু লাগে না।" মন তার উৎসুক হ'য়ে উঠল। বসবার ঘরের চারদিক সে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বিলাসের সরঞ্জাম কিছু ছিল বটে, কিন্তু না ছিল, শৃঙ্খলা না এমন কিছু যাতে এই গরীব ভারতবাসীরা ভয় পেতে পারে। ঘরটি খুব সুন্দর, তিনটি উঁচু কাঠের খিলানের মধ্য দিয়ে এখান থেকে একবারে বাগানে যাওয়া যায়। "সত্যি বলতে আপনার সঙ্গে অনেক দিন থেকেই আলাপ করব ইচ্ছে। নবাব বাহাদুরের কাছে এত শুনেছি—কি রকম বড় মন আপনার। কিন্তু এই পোড়া চন্দ্রপুরে লোকের সঙ্গে দেখাই বা করি কোথায় ?" দরজার কাছে এগিয়ে এসে আজিজ ব'লে চল্‌ল, "জানেন, প্রথম প্রথম এখানে এসে কি মনে হোতো ? আপনার অসুখ হ'লে বেশ হয়—কেননা, তা'হ'লে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।" দুজনেই

---

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পঃ সঃ

হেসে উঠলেন। আজিজের উৎসাহ গেল বেড়ে। বানিয়ে বানিয়ে সে বলতে লাগল, "মনে মনে বলতাম, আচ্ছা, আজ সকালে ফিলডিং সাহেবকে কেমন দেখাচ্ছে—কি রকম একটু ফ্যাকাশে। আর ডাক্তার সাহেব—তাঁরও তো ঐ অবস্থা, সুতরাং ফিলডিং সাহেবের কাঁপুনি ধরলে কি ক'রে তিনি ওঁকে দেখবেন? এক্ষেত্রে আমাকেই ডাকা উচিত ছিল। তাহলে আমাদের দুজনের আলাপ জমতো ভালো, কেননা পারসি কবিতার সমঝদার ব'লে আপনার তো দেশ জোড়া খ্যাতি।"

"তাহলে দেখছি আপনি আমাকে চেনেন।"

"নিশ্চয়। আপনি আমাকে চেনেন?"

"নামে আপনাকে খুব ভালোই চিনি।"

"এখানে এসেছি এত অল্প দিন, আর তাও বাজার ছেড়ে নড়ি না। আমাকে যে দেখেননি তাতে আর আশ্চর্য্য কি, নাম যে শুনেছেন তাই আশ্চর্য্য। আচ্ছা, মিষ্টার ফিলডিং?"

"বলুন।"

"ঘর থেকে বেরোনোর আগে বলুন তো আমি কি রকম দেখতে—ধরুন যেন একটা খেলা হচ্ছে।"

ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে যে-টুকু চোখে পড়ছিল তাতে আন্দাজ ক'রে ফিলডিং বললেন, "আপনি পাঁচ ফিট ন' ইঞ্চি লম্বা হবেন।"

"আচ্ছা বেশ। তারপর? আমার মস্ত শাদা দাড়ি আছে, কেমন?"

"সর্ব্বনাশ!"

"কিছু হোলো নাকি?"

"আমার একটি মাত্র অবশিষ্ট কলারের বোতাম পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেছি।"

"আমারটা নিন, আমারটা নিন।"

"আপনার কি ফালতু একটা আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—এক্ষুনি দিচ্ছি।"

"যদি নিজে পরে থাকেন তো কাজ নেই।"

"না, না, আমার পকেটে আছে।" একটু স'রে গিয়ে—যাতে ঘসা কাচের জানলায় ওর ছায়া না দেখা যায়—এক টানে কলারটা খুলে কলারের বোতামটা

ও টেনে বের করল। ওর ভগ্নীপতি ইংল্যাণ্ড থেকে এক সেট সোনার বোতাম এনে ওকে দিয়েছিলেন—তারই একটি এই বোতাম।

"এই যে—নিন।"

"ভিতরে আসুন না—যদি কিছু মনে না করেন।"

"একটু অপেক্ষা করুন।" কলারটা ঠিক ক'রে নিয়ে আজিজ মনে মনে প্রার্থনা করল যেন খাওয়ার সময়ে হঠাৎ সেটা কাঁধের পিছনে উঠে না পড়ে।" ফিলডিং-এর বেয়ারা সাহেবকে পোষাক পরিয়ে দিচ্ছিল, সে-ই দরজা খুলে দিল।

"ধন্যবাদ।" হাসিমুখে দুজনে হ্যাণ্ডশেক করলেন। আজিজ নিঃসঙ্কোচে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল, যেন এ ওর এক পুরোনো বন্ধুর বাড়ি। এত তাড়াতাড়ি এতটা ঘনিষ্ঠতায় ফিলডিং আশ্চর্য্য হননি। ঐরকম ভাবপ্রবণ লোকদের এমনি চট্‌ ক'রে বন্ধুত্ব হয়, নয় একেবারেই হয় না। ওঁরা দুজনেই ইতিপূর্ব্বে পরস্পরের সুখ্যাতি শুনেছিলেন—তাই আর ওঁদের ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না।

"আমার ধারণা ছিল যে ইংরেজদের ঘরদোর একবারে ছিম্‌ছাম্‌ থাকে। দেখছি তা নয়। তা'হলে আমার আর অত লজ্জার কি আছে?" মনের আনন্দে সে বিছানার উপর উঠে একেবারে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পা দু'টো আসন পিঁড়ি ক'রে বস্‌ল। "আমি ভাবতাম সব কিছু শেল্‌ফ-এর উপর পরিষ্কার সাজানো থাকে—কি হোলো, মিষ্টার ফিলডিং, বোতামটা ঢুকবে তো?"

"আই হে মা ডুট্‌স্ (সন্দেহ হচ্ছে)।

"কি বললেন ঠিক বুঝলাম না—আচ্ছা, আমাকে কতকগুলো নতুন কথা শিখিয়ে দেবেন, যাতে আমার ইংরেজির জ্ঞান একটু বাড়ে।"

ফিলডিং জবাব দিলেন:

"সব কিছু সেল্‌ফের উপর পরিষ্কার সাজানো"—এই কথাটি আজিজ যে-রকম ইংরেজিতে বলেছিল—তার চইতে ভালো ক'রে আর বলা যায় কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক এক সময়ে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন বিদেশী ভাষায় ছোকরাদের দখল দেখে। কি রকম সজীব তাদের কথাবার্ত্তা। ইংরেজির ধাঁচ হয়তো তারা বদলে দেয়, কিন্তু যখন যা বলতে যায় চট্‌ ক'রে ব'লে ফেলে। ক্লাবে তাদের ইংরেজি সম্বন্ধে 'বাবুইজ্‌ম্‌' ব'লে যে-সব ঠাট্টা প্রচলিত আছে, তা

মোটেই খাটে না। তবে, ক্লাব সব বিষয়েই একটু পিছিয়ে চলে, এখনো সেখানে বলা হয় যে সাহেবদের সঙ্গে খানা খেতে সামান্য দু'চারজন মুসলমান রাজী হতে পারে, হিন্দুরা কেউই হবে না, আর ভারতবর্ষের মেয়েরা সবাই নাকি দুর্ভেদ্য পরদার আড়ালে জীবন কাটান। ব্যক্তিগতভাবে সকলের অবিশ্যি এরকম ভুল ধারণা ছিল না—কিন্তু সমগ্র ক্লাব হিসাবে সেই সনাতন ভুল বিশ্বাস এরা কিছুতেই ছাড়তে চাইত না।

"আসুন, আপনার বোতামটা লাগিয়ে দি—তাইতো পিছনের বোতামের গর্তটা দেখছি একটু ছোট, শেষ কালে টেনে ছিঁড়তে হবে নাকি।"

ফিলডিং ঘাড় নীচু ক'রে বললেন, "কি সুখে যে লোকে কলার পরে বুঝি না।"

"আমরা পরি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।"

"কি রকম?"

"সাইকেলে চড়ে চলেছি—গলায় শক্ত কলার, মাথায় সাহেবি টুপি—পুলিশের মুখে কথাটি নেই। আর মাথায় যদি ফেজ পরেছি অমনি শুনব, 'তোমরা বাত্তি বুৎ গিয়া'। লর্ড কার্জন যখন আমাদের প্রাচীন কালের জমকালো পোষাক বাহাল রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন একথা ভেবে দেখেন নি।—আরে বাস্। বোতাম লাগ্ গিয়া। এক এক সময়ে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখি যে পরণে ঝলমলে পোষাক, আলম্গীরের পিছন পিছন চলেছি যুদ্ধ করতে। আচ্ছা, ফিলডিং সাহেব, যখন মোগল সাম্রাজ্য ছিল গৌরবের চূড়ায় আর দিল্লির ময়ূর-সিংহাসনে ব'সে আলম্গীর বাদশা দেশ শাসন করতেন তখন ভারতবর্ষ কি সত্যি সুন্দর ছিল না?"

"দুজন মহিলা আসছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের চেনেন না বোধ হয়?"

"আমার সঙ্গে আলাপ করতে? আমি কোনো মহিলাকে চিনিনা।"

"মিসেস্ মূর আর মিস্ কেষ্টেড্কেও না?"

"ও—হ্যাঁ। এখন মনে পড়ছে।" মসজিদের সেই রোমান্স্ তার স্মৃতি থেকে প্রায় লোপ পেয়েছিল। "মহিলাটি একেবারে বুড়ী—কিন্তু তাঁর সঙ্গীটির নাম কি বললেন?"

"মিস কেষ্টেড্।"

"যা বলেন।" অন্য অতিথি আসছে শুনে ও একটু ক্ষুণ্ণ হোলো, ওর ইচ্ছা ছিল নতুন বন্ধুর সঙ্গে একলা থাকা।

"মিস্ কেষ্টেড্রের সঙ্গে ইচ্ছা হ'লে ময়ূর সিংহাসনের কথা বলতে পারেন। সবাই ব'লে শিল্পকলায় তিনি অনুরাগী।"

"তিনি কি 'পোষ্ট-ইম্প্রেশনিষ্ট' নাকি?"

"পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজম্। বলেন কি? আসুন চা খাওয়া যাক—আমার পক্ষে এসব একটু বেশি বেশি হ'য়ে পড়ছে।"

আজিজ চটে গেল। ফিলডিং তা'হলে বলতে চান যে ও হোলো সামান্য এক ভারতবাসী, ওর আবার 'পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজম্-এর কথা শোনার কি অধিকার আছে—এই অধিকার শুধু ভারতের শাসকসম্প্রদায়ের একচেটে। একটু কড়াস্বরে ও জবাব দিল, "মিসেস মূরকে ঠিক বন্ধু বলতে পারি না। মসজিদে একবার মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা।" ও আরো বলতে যাচ্ছিল, "মাত্র একবার দেখায় কি আর বন্ধুত্ব হয়?" কিন্তু কথা শেষ হ'তে না হ'তে তার কড়া স্বর গেল চলে, কেননা মনে মনে ও অনুভব করল ফিলডিং সাহেবের অন্তর্নিহিত প্রীতির ভাব। অমনি ওর নিজের মনের প্রীতি উঠল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে, পরস্পরের প্রীতির বিনিময় হোলো হৃদয়াবেগের চঞ্চল স্রোতের তলায় তলায়—যে-স্রোতের টানে মানুষকে নিয়ে যায় হয় স্থির আশ্রয়ে নয় চূরমার ক'রে আছড়ে মারে কঠিন ডাঙার উপর। তবে আজিজ সত্যি একবারে নিরাপদ ছিল, যেমন নিরাপদ সব ডাঙার বাসিন্দারা, যারা শুধু জানে স্থৈর্য্য আর মনে ক'রে জলযাত্রা মানেই নৌকাডুবি। কিন্তু ওর মনে এমন সব অনুভূতি সচেতন হ'য়ে উঠেছিল ডাঙার বাসিন্দারা যা কখনো অনুভব করে না। সত্যি বলতে আজিজের মন সাড়া যতখানি দিত তার চেয়ে অনেক বেশি করত অনুভব। সব কথাতেই ও একটা না একটা মানে পেত, অনেক সময়েই তা হোতো ভুল, তাই ওর জীবন খুব জলজ্বলে হলেও প্রধানত স্বপ্নলোকেই ওর ছিল বাস।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ফিলডিং একথা বলতে চাননি যে ভারতবাসীরা সব এলোমেলো কথা বলে, উনি বলতে চেয়েছিলেন পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজম্-এর অস্পষ্টতার কথা। ফিলডিং-এর এই মন্তব্যের সঙ্গে টার্টন-গিন্নির 'ওমা, ওরা দেখি

ইংরেজি বলে।' এই কথার আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল, কিন্তু আজিজের কানে দুজনের কথাই ঠিক একরকম ঠেকেছিল। ফিলডিং বুঝলেন যে একটা কি গোলমাল হয়েছে, আবার তেমনি বুঝে নিলেন যে গোলমাল মিটে গেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আদান-প্রদানের ব্যাপারে তিনি কখনো দমবার পাত্র ছিলেন না, তাই ওসব নিয়ে তিনিও মাথা ঘামালেন না। দুজনের কথাবার্ত্তাও আবার পূর্ব্ববৎ চলতে লাগল।

"ঐ দুটি মহিলা ছাড়া আমার এক সহকারী, নারায়ণ গডবোলে, বোধ হয় আসছেন।"

"ও! সেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ?"

"তিনিও চান অতীতকে ফিরে পেতে, তবে ঠিক্ আলমগীরকে নয়।"

"তা না চাইবারই কথা। জানেন, দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা কি বলে? ইংল্যাণ্ড নাকি তাদের কাছে থেকে এই দেশ জয় করেছিল—বুঝে দেখুন, তাদের কাছ থেকে, মোগলদের কাছ থেকে নয়। লোকগুলোর কি স্পর্দ্ধা দেখুন তো! ওরা ঘুষ দিয়ে সব পড়ার বই-এর মধ্যেও এই কথা ঢুকিয়েছে কেননা যেমনি ওরা ঘুঘু তেমনি ওদের পয়সা। যা শুনেছি, মনে হয় প্রফেসর গডবোলে অন্য দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মতন একেবারে নয়। লোকটি নাকি সত্যি ভারি সরলহৃদয়।"

"আচ্ছা, আজিজ, তোমরা চন্দ্রপুরে ক্লাব কর না কেন?"

"হয়তো একদিন···ঐ যে মিসেস্ মূর আর—ওঁর নাম কি—আসছেন্।"

ভাগ্যি ভালো পার্টিটা ছিল নেহাৎ ঘরোয়া, আদব কায়দার বালাই ছিল না। তাই আজিজ বেশ সহজ ভাবে মহিলাদুটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারল, ঠিক যেন দুজন পুরুষ মানুষের সঙ্গেই কথা বলছে। ওঁরা সুন্দর দেখতে হলে বেচারি মুস্কিলে পড়ত, কেননা সুন্দর লোকদের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম কানুন খাটে না। কিন্তু মিসেস্ মূর ছিলেন বুড়ী, আর মিস্ কেষ্টেড্ দেখতে নেহাৎই চলনসই, তাই ও দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেয়েছিল। এডেলার খেংরা কাঠির মতন শরীর আর মুখের দাগ আজিজের চোখে একটা গুরুতর রকমের ত্রুটি ব'লে মনে হয়েছিল, ওর মনে হচ্ছিল কি ক'রে ভগবান কোনো মেয়ের দেহ সম্বন্ধে এতটা নির্দ্দয় হতে পারেন। ফলে এডেলা সম্বন্ধে ওর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটতে পারেনি।

"ডক্টর আজিজ, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই"—এই ব'লে

এডেলা কথা সুরু করল। "মিসেস্ মূরের কাছে শুনলাম আপনি সেই মসজিদে তাঁকে কি রকম সাহায্য করেছেন আর কত সব নাকি কথা বলেছেন। আমরা এদেশে পা দেবার পর তিন হপ্তায় যা না শিখেছি আপনার সঙ্গে ঐ কয় মিনিটের কথায় মিসেস্ মূর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তা শিখেছেন।"

"বিলক্ষণ। ঐ সামান্য জিনিষের কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমাদের দেশের বিষয়ে আর কি জানতে চান বলুন?"

"এই দেখুন আজ সকালের একটা ব্যাপারে ভারি দমে গেছি—তার কারণটা যদি বুঝিয়ে বলতে পারেন, বোধ হয় আপনাদের আদবকায়দা সংক্রান্ত একটা কিছু হবে।"

"আদব-কায়দা সত্যি বলতে কিছু নেই, আমাদের প্রকৃতিই হোলো একেবারে ঘরোয়া।"

মিসেস মূর বললেন, "ভয় হচ্ছে একটা কি ভুল টুল ক'রে বসেছি যাতে সত্যি লোকের চটবার কথা।"

"তা তো আর হতে পারে না। কিন্তু কি ব্যাপারটা খুলেই বলুন না।"

"এদেশী এক ভদ্রলোক আর মহিলা আজ সকালে ন'টার সময়ে আমাদের জন্যে গাড়ি পাঠাবেন কথা ছিল, আমরা ব'সে আছি তো ব'সেই আছি, গাড়ি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এল না।"

এই ধরণের ঘটনার পরিষ্কার মীমাংসা না হওয়াই ভালো এই ভেবে ফিলডিং সাহেব বললেন, "বোঝবার ভুল হ'য়ে থাকতে পারে।"

মিস্ কেষ্টেড্ নাছোড়-বান্দা। তিনি বলে উঠলেন, "না, না, তা হয়নি। তাঁরা আমাদের জন্যে এমন কি কলকাতায় যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করলেন। আমাদের দুজনেরই দৃঢ় ধারণা একটা ভীষণ কিছু বোকামি ক'রে থাকব।"

"ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না।"

একটু লাল হয়ে তিনি বললেন, মিষ্টার হিসলপও "ঠিক ঐ কথা বলেন। কিন্তু মাথা যদি নাই ঘামাই তো সব বুঝব কেমন ক'রে?"

ফিলডিং চেষ্টা করছিলেন কথাটা চাপা দিতে, কিন্তু আজিজ মহোৎসাহে লেগে গেল এই নিয়ে আলোচনা করতে, আর যাঁরা এই কাণ্ড করেছিলেন তাঁদের নামের টুকরো টাকরা শুনেই ব'লে উঠল যে ওঁরা হিন্দু।

"একেবারে বে-আক্কেল ওরা—সমাজ বলতে কি বোঝায় তা ওরা আদৌ বোঝে না। হাঁসপাতালের এক ডাক্তারের কল্যাণে আমি ওদের ভালো করেই চিনি। কি রকম যে কাছা-ঢিলে লোক, সময়জ্ঞান একেবারে নাই। ওঁদের বাড়ি গেলে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি চমৎকার ধারণাই হোতো! ভালোই করেছেন না গিয়ে। এমন নোংরা! আমার মনে হয় ওঁদের নিজের বাড়ির কথা ভেবে এমন লজ্জা হয়েছিল যে আর গাড়ি পাঠাতে পারেন নি।"

ফিলডিং সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা অবিশ্যি হ'তে পারে।"

"রহস্য জিনিষটা আমি আদবে পছন্দ করি না"—এডেলা জোর গলায় এই কথা জানিয়ে দিল।

"ইংরেজরা সবাই তাই।"

এডেলা বল্‌ল, প্রতিবাদ ক'রে "আমি রহস্য পছন্দ করি না, ইংরেজ ব'লে তা নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে।"

মিসেস্ মূর বললেন, "রহস্য ভালোই লাগে, তবে গণ্ডগোল ব্যাপারটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না।"

"রহস্য মানেই গণ্ডগোল।"

"বলেন কি, মিষ্টার ফিলডিং, আপনার কি তাই ধারণা?"

"যাকে বলে গণ্ডগোল শুদ্ধ ভাষায় তাকেই বলে রহস্য? যাই হোক না কেন, ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। আজিজ আর আমি ভালো করেই জানি সারা দেশটাই একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার।"

"সারা ভারতবর্ষ হচ্ছে···কি ভীষণ কথা!"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আজিজ ব'লে উঠল—"আমার বাড়িতে যখন আসবেন, গণ্ডগোল কিছুই হবে না। আসবেন কিন্তু, মিসেস্ মূর, আর আপনারা সক্কলে—নিশ্চয়।"

বৃদ্ধা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন; এই তরুণ ডাক্তারটিকে ওঁর এখন পর্য্যন্ত বিশেষ ভালো লাগছিল। তা'ছাড়া উত্তেজনা ও আবেশ মিলে ওঁর মনে এমন একটা ভাব এসেছিল যে নতুন একটা কিছু পেলেই উনি একেবারে গা ঢেলে না দিয়ে পারতেন না। মিস্ কেষ্টেড্‌ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন—অপরিচিতের আকর্ষণে। তাঁরও আজিজকে ভালো লেগেছিল আর মনে এই ধারণা হ'য়েছিল যে ভালো ক'রে আলাপ জমলে আজিজ তার স্বদেশের দ্বার ওঁর জন্যে একেবারে মুক্ত ক'রে দেবে। নিমন্ত্রণে খুসি হ'য়ে উনি আজিজকে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন।

নিজের বাংলোর কথা ভেবে বেচারির ভয় হোলো। বাজারের কাছে বিশ্রী একটা বাড়ি, বলতে গেলে একটিমাত্র তাতে ঘর, তাও আবার মাছিতে ভরা। ও বল্‌ল "কিন্তু এখন একটু অন্য কথা বলা যাক। দেখুন, এই বাড়িটাতে থাকতে পেলে বেশ হোতো। আসুন না, দুজনে মিলে এর একটু তারিফ করা যাক। ঐ খিলানগুলোর তলার দিক দেখেছেন—কি রকম সূক্ষ্ম কাজ না? এ হোলো প্রশ্ন ও উত্তরের স্থাপত্য। মিসেস্ মূর, আমি ঠাট্টা করছি না, আপনি এখন ভারতবর্ষে।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনো উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আম-দরবারের জন্য তৈরি এই ঘরটি আজিজকে একেবারে মুগ্ধ করেছিল। কাঠ দিয়ে তৈরি ব'লে ফিলডিং-এর এই ঘরটি দেখে মনে পড়ত ফ্লরেন্স্-এর লজিয়া ডি লান্‌জির কথা। এর দুদিকে ছিল ছোট ছোট কামরা, বর্ত্তমানে সেগুলি বিলিতি ঢঙে পরিণত করা হয়েছিল, কিন্তু মাঝের হল-ঘরটি ছিল একেবারে সাবেকি, না ছিল তার কাঁচের দরজা, না তার দেওয়ালে কাগজমারা, আর বাগানের খোলা হাওয়া অবাধে তাতে ঢুকত। বাগানে মালীরা চেঁচিয়ে পাখী তাড়াত আর একটি লোক পুকুরটা ভাড়া নিয়ে পানি ফলের চাষ করত—হল-ঘরটিতে বসতে হ'লে এদের সকলের চোখের সামনে একেবারে বেআব্রু হয়ে বসা ছাড়া উপায় ছিল না। ফিলডিং আমগাছগুলিও জমা দিয়ে দিয়েছিলেন—তাই কখন যে কে আসবে তার ঠিক ছিল না—তার ওপর চোর তাড়াবার জন্য চাকররা দিনরাত দোর-গোড়ায় বসে থাকত। সত্যি সুন্দর ঘরটি, ইংরেজের হাতে পড়েও এই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল, তবে আজিজ হ'লে হঠাৎ সাহেবী মেজাজের ঝোঁকে বোধ হয় দেওয়ালে বিলিতি ছবি টাঙিয়ে ফেলত। কিন্তু, তবু, সত্যি এই ঘরটিতে কার অধিকার সে সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

"এখানে ব'সে আমি করি ন্যায়বিচার। এক গরীব বিধবা এসে বলল তার টাকা লুট হয়েছে, তাকে অমনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলাম, আর একজনকে হয়তো পুরো একশ'—এই রকম বেশ লাগে।" মিসেস্ মূর-এর মনে পড়ল

বর্ত্তমান কালের ব্যবস্থার কথা, যার দৃষ্টান্তস্থল স্বয়ং তাঁর পুত্র। একটু হেসে তিনি বললেন, "কিন্তু টাকা কি আর চিরকাল টেঁকে ?"

"আমার বেলা টিঁকবে। আমি দিচ্ছি দেখলে খোদাই আমাকে দেবেন। সব সময়ে দান ক'রে যাও, নবাব বাহাদুরের মতন। আমার বাবাও ছিলেন ঐ রকম, তাই কিছু রেখে যেতে পারেননি।" তারপর ঘরটির চারদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে সে কেরাণীতে গোমস্তায় তা একেবারে ভ'রে ফেলল, সবাই তারা সাবেক কালের, সুতরাং খুব দানশীল। "এই ভাবে ব'সে ব'সে— চেয়ারের উপর নয়, গালিচার উপর, শুধু এখনকার সঙ্গে ঐটুকু তফাৎ হবে— কেবল দান ক'রে যাব। আর কাউকে বোধ হয় শাস্তি দেব না।"

দুজন মহিলাই এই কথায় সায় দিলেন।

"কোনো বেচারি যদি হঠাৎ কিছু অপরাধ ক'রে ফেলে তাকে আর একবার রেহাই দেওয়া উচিত। জেলে ঢুকলে বিগড়ে গিয়ে মানুষ আরো খারাপ হ'য়ে যায়।"

বলতে বলতে তার মুখের ভাব করুণ, অত্যন্ত করুণ, হ'য়ে উঠল। শাসন করবার ক্ষমতা যার নাই আর যে একথা বুঝতে পারে না যে চোর বেচারিকে বিনা সাজায় ছেড়ে দিলে সে আবার গরীব বিধবার টাকা চুরি করবে, এ জাতীয় করুণা তাকেই সাজে। কয়েকটি লোক ছাড়া আর সকলের সম্বন্ধেই তার এরকম করুণা হোতো—ঐ লোক কটি ছিল তাদের পরিবারের চক্ষুশূল, তাদের উপর আজিজ চাইত প্রতিশোধ নিতে। এমন কি ইংরেজদের প্রতিও করুণা হোতো, কেননা মনে মনে সে যথেষ্ট জানত যে ওরা যে ওরকম অদ্ভুত, নিঃসাড় আর সাবধান, যেন দেশের মধ্য দিয়ে এক হিমের ধারা ব'য়ে গেছে, তা ওরা না হ'য়ে পারে না, ওদের ঐরকম হওয়াই মজ্জাগত। ও ব'লে চলল, "কাউকে সাজা দেব না, কাউকে না। সন্ধ্যায় রোজ হবে মস্ত ভোজ, সঙ্গে নাচ, পুকুরের চারধারে ফুটফুটে সব মেয়েরা হাতে জ্বলন্ত ফুলঝুরি নিয়ে একেবারে জ্বলজ্বল করবে, এমনি সারারাত সবাই শুধু খাওয়া দাওয়া আর ফুর্ত্তি করবে, তারপর পরদিন হবে ন্যায়বিচার—পঞ্চাশটাকা, একশটাকা, হাজার টাকা এমনি চলবে যতদিন না শান্তি আসে। দুঃখ হয় সত্যি কেন ওরকম দিনে আমরা থাকিনি। কিন্তু, আপনারা ফিলডিং সাহেবের বাড়ির তারিফ করছেন তো? দেখুন,

থামগুলো কেমন নীল রং-করা আর বারান্দার ঐ 'প্যাভিলিয়ন'—কি যেন বলে ওকে ?—ঐ ঠিক আমাদের মাথার উপর, ওর ভিতরটাও নীল রং-করা। আর ওর উপরের কি রকম কাজ দেখুন, আর ভেবে দেখুন ওগুলো করতে কত যে সময় লেগেছে। ওর উপরের ছাদ ওরকম বাঁকানো কেন জানেন? বাঁশের নকলে। কি চমৎকার! বাইরে পুকুরের ধারে বাঁশ গাছগুলো আবার দুলছে। মিসেস্ মূর! মিসেস্ মূর!"

হাসতে হাসতে মিসেস্ মূর বললেন, "কি বলছেন ?"

"আমাদের মসজিদের কাছে সেই জল দেখেছিলেন মনে আছে? সেই জল এসে এই পুকুরটা ভর্ত্তি করেছে—বাদশাদের এমনি বিচিত্র কৌশল। বাংলা মুলুকে যাবার পথে এইটা ছিল তাঁদের এক থামবার জায়গা। জল তাঁরা কি ভালোই বাসতেন। যেখানে যেতেন ফোয়ারা, বাগিচা, হামাম সব তৈরি হোতো। ফিলডিং সাহেবকে বলছিলাম, বাদশাদের কাজ করবার জন্যে এমন কিছু নেই যা আমি দিতে পারি না।"

কিন্তু জলের কথা আজিজ যা বলল তা ঠিক নয়। বাদশাদের কৌশল যতই বিচিত্র হোক না কেন, পাহাড়ের উপর জলকে ঠেলে তুলবার শক্তি তাঁদের ছিল না; ফিলডিং সাহেবের বাড়ি আর মসজিদের মাঝখানের জায়গাটা ছিল বেশ খানিকটা নীচু, গোটা চন্দ্রপুর সহরটাই ছিল এই নীচু জায়গার মধ্যে। রনি হ'লে আজিজের ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত, টার্টন সাহেব মনে মনে তা করতে চাইলেও কাজে করতেন না। কিন্তু ফিলডিং-এর আদৌই সেরকম প্রবৃত্তি হোলো না। মুখের কথার সত্যি মিথ্যা সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ গিয়েছিল চ'লে, তিনি শুধু বুঝতেন মনের—মেজাজের— আন্তরিকতা। আর মিস্ কেস্টেড, আজিজ যা বলছিল তাই একেবারে বেদবাক্য ব'লে গিলছিলেন। নিজের অজ্ঞতার জন্যে তাঁর ধারণা হ'য়েছিল, আজিজ হোলো "ভারতবর্ষ", একথা তাঁর মাথায় আসেনি যে ওর দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, ওর দেখবার ও ভাববার প্রণালী যথাযথ নয়, আর কোনো একজন লোক সমগ্র "ভারতবর্ষ" হতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পুস্তক-পরিচয়

The Evolution of the Rigvedic Pantheon—by Srimati Akshaya Kumari Devi ; pp. 212 ; (Vijaya Krishna Brothers). Price one Rupee.

লেখক আমার সুপরিচিত। তিনি কেন যে "অক্ষয়কুমারী দেবী" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানি না। তাঁহার অনেকগুলি বই তিনি আমাকে পূর্ব্বে উপহার দিয়াছিলেন ; তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় বহু বিষয়ে তাঁহার প্রবেশ ও অধিকার আছে। কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অনুরাগী (amateur) হওয়া যদি ভাল হয় তবে বলিতে হইবে অক্ষয়কুমারী দেবী উচ্চতর পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। আর একটি কথা :—আজকাল চাকরীর বাজার মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় অনেকে লেখাপড়া করিয়াও দেখেন সেদিক দিয়া কিছু সুবিধা হয় কি না। অক্ষয়কুমারী দেবীর কথা কিন্তু স্বতন্ত্র ; তিনি এইরূপ কোন পরমার্থের আশাতেই ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন একথা কেহই বলিতে পারিবে না। সুতরাং তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

লেখক এই গ্রন্থে ঋগ্বেদের বিভিন্ন দেবতার উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে Oldenberg, Bergaigne, Hillebrandt, Macdonell প্রমুখ বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই বিষয়েই নূতন পুস্তক রচনা তখনই সার্থক যখন তাহাতে নূতন গবেষণালব্ধ জ্ঞান সন্নিবিষ্ট থাকে। এই দিক হইতে গ্রন্থকার কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অনুবর্ত্তী আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে :—

লেখক মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন :—"Mitra means friendly"। একথা পড়িয়া সকলেই সন্দেহে মাথা নাড়িবেন, কারণ উৎপত্তি হইতে পরিণতি-বিচার অবাঞ্ছনীয় না হইলেও তদ্বিপরীত পন্থা যে যুক্তিসঙ্গত নহে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিত্র-শব্দের অর্থ কি প্রথমেই সে বিচার না করিয়া এই শব্দের প্রয়োগ সর্ব্বাগ্রে কোথায় কিরূপে হইয়াছে

তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। Hittiteদের 'সহিত Mitanniদের সন্ধিপত্রে সর্ব্বপ্রথম মিত্র-শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, একথা গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, কিন্তু এই প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া এবং আরও নানা বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ফলে Guentert তাঁহার Der arische Weltkoenig নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। Guentert (এবং আরও অনেকে) বলেন মী-ধাতু হইতে মিত্র-শব্দের উৎপত্তি, এবং এই মী-ধাতু এক "মেখলা" ভিন্ন অপর কোন শব্দেই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে Guentertএর মত গ্রহণযোগ্য নহে। "মা" ধাতুর উত্তর "ত্র" প্রত্যয় করিয়া "মিত্র-"শব্দের উৎপত্তি (যেমন "পা-"ধাতু হইতে "পিতা" = রক্ষক)। "তৃ"-প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচক, কিন্তু "ত্র"-প্রত্যয় করণ-বাচক, যেমন পাত্র = বর্ম্ম, যাহার দ্বারা রক্ষা করা যায় ; দাত্র = যাহার দ্বারা কাটা যায়, ইত্যাদি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে "মিত্র"-শব্দটির অর্থ "যাহার দ্বারা মাপ করা যায়।" এক্ষণে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে ঋগ্বেদে মিত্র সর্ব্বদাই বরুণের সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন। বরুণ যে ঋগ্বেদে আকাশের দেবতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এইবার জিজ্ঞাস্য, আকাশে এমন কি আছে যাহার দ্বারা মাপ করা যাইতে পারে? উত্তর নিশ্চয়ই হইবে হয় চন্দ্র না হয় সূর্য্য, কারণ মানুষ অনাদি কাল হইতে এই গ্রহদ্বয়ের সাহায্যেই কাল পরিমাপ করিয়া আসিতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করা এস্থলে মোটেই কঠিন নহে, কারণ দিবাভাগই যে মিত্রের কাল একথা ঋগ্বেদে পুনঃপুনঃ বলা আছে। ইহাই মিত্র দেবতার প্রকৃত ইতিহাস, গ্রন্থকার Encyclopaedia Britannica-র উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সমস্তই প্রায় ভুল। এই মিত্র-শব্দই পারস্য ঘুরিয়া আসিয়া "মিহির"রূপে সংস্কৃত ভাষায় সূর্য্যের প্রতিশব্দ হইয়াছে।

গ্রন্থকার আবার বলিয়াছেন "the Vedic Mitra is the Avestan Mithra"। ইহা আদৌ ঠিক নহে। সংস্কৃত "মিত্র"-শব্দটি যে অবেস্তার "মিথ্র" শব্দের প্রতিরূপ,—তাহা অবশ্য অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু মিত্র-দেবতার সহিত অবেস্তার মিথ্রদেবতার কোনই সাদৃশ্য নাই। আসল কথা এই যে

জরথুস্ত্রের সংস্কারের ফলে রাজসিকপ্রকৃতি ইন্দ্র দানবে মাত্র পরিণত হইলে জনসাধারণ প্রকারান্তরে মিত্রকেই সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মিথ্রধর্ম্ম আজ একটি শব্দে মাত্র পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন রোম সাম্রাজ্যে অনেকেই মনে করিত ইহাই রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম্মে পরিণত হইবে, খৃষ্ট-ধর্ম্ম নহে। প্রতীচ্যে এই প্রাচ্য ধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক Georg Wissowa তাঁহার Religion und Kultus der Roemer নামক গ্রন্থে (pp. 307 ff.) বিস্তীর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম যে মিথ্রধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে প্রতীচ্যে মিথ্রধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার দুই শতাব্দী পরে আবার একটি প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম্ম ইউরোপ আক্রমণ করিয়া তথাকার খৃষ্ট প্রচারকদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল,—সেটি Manichaeism। Mani তৃতীয় শতকের লোক, এবং Babylon তাঁহার জন্মস্থান। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় Manichaeism-এ যেরূপ হইয়াছিল সেরূপ বোধ হয় আর কোন ধর্ম্মে কখনও হয় নাই। বুদ্ধদেব, জরথুস্ত্র এবং যিশু খৃষ্ট Mani-র মতে ভগবানের তিন অবতার! Manichaeism-এর দ্রুত প্রসারে সন্ত্রস্ত হইয়া Europe ও বিশেষ করিয়া Africa-র খৃষ্টীয় প্রচারকগণ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে Mani ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে যে ভীষণ অভিশাপ দিয়া গিয়াছেন তাহাই ছিল এতদিন Manichaeism সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র না হইলেও মুখ্য উপায়। ইহা হইতে Manichaeism-এর কিরূপ চিত্র পাওয়া যাইত তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি কিন্তু মধ্য এশিয়ার মরুভূমি হইতে Sassanian যুগের কতকগুলি Manichaean পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার কিছু কিছু F. W. K, Mueller প্রকাশও করিয়াছেন। আমি Europe-এ থাকিতে মধ্য ইরানীয় ভাষার নিদর্শন স্বরূপ এই Manichaean পুঁথির কিছু কিছু অধ্যাপক Emile Benveniste-এর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। এই সকল মূল গ্রন্থ হইতে Manichaeism-এর যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা অতি বিচিত্র। আমার মনে হয় জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মের dualismকে আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বরূপে প্রচার করাই ছিল Mania প্রধান আবিষ্কার।—কথায় কথায় Manichaeism সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলাম মাত্র, অক্ষয়কুমারী দেবী এসম্বন্ধে যদিও কোন কথাই বলেন নাই।

বরুণদেবের আলোচনায় গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন যে বরুণই অবেস্তার Ahura Mazda। তবে Mazda কথাটির তিনি যে নিরুক্তি দিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। এই কথা লইয়া ভাষতাত্ত্বিকদের মধ্যে বহুদিন হইতেই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক Andreas Mazda কথাটি যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। Andreas বলিয়াছেন সংস্কৃত "মেধস্" ও ইরানীয় "Mazda" ইন্দো-ইরানীয় "মনস্-ধা" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে এইরূপ :—manas-dhā > manaz-dhā > manz-dhā > maz-dhā > medhā (মেধা)। ইরানে কিন্তু শব্দটির ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে অন্যরূপ :—manas-dhā > manaz-dā > manz-dā > maz-dā। সংস্কৃত ও ইরানীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাই স্বীকার করিবেন Mazda শব্দের ইহাই প্রকৃত নিরুক্তি।

গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন যে বেদের "অসুর", অবেস্তার "অহুর" এবং Assyriaর Assur মূলে একই ব্যক্তি, যদিও এ সম্বন্ধেও যে সব প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কিছুই তিনি দেন নাই। ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষদের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় খৃঃপূঃ চতুর্দ্দশ শতকে উত্তর Mesopotamiaর Mitanni রাজ্যে (আমার Linguistic Introduction to Sanskrit, pp. 48-51 দ্রষ্টব্য)। এই Mitanni-গণ যে বাস্তবিকই Assyria (অর্থাৎ "অসুর দেবতার রাজ্য") অধিকার করিয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে। সুতরাং Assyriaর প্রধান দেবতার নামানুসারে যে প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহাদের প্রধান দেবতার নামকরণ করিবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে Assyriaর "অসুর" একজন মাত্র বিশেষ প্রধান দেবতার নাম, কিন্তু ঋগ্বেদে সকল প্রধান প্রধান দেবতাকেই অসুর বলা হইয়াছে, যথা দৌঃ, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি। অর্থাৎ Assyriaয় যাহা ব্যক্তির নাম ছিল, ভারতবর্ষে তাহাই জাতির নামে পরিণত হইয়াছে। উচ্চতর সভ্যতার ব্যক্তিবাচক শব্দ প্রায়ই নিম্নতর সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া জাতিবাচক হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ জার্ম্মান Kaiser (=সম্রাট) শব্দটির আলোচনা করা যাইতে পারে। এই শব্দটি আসলে রোমক Caesar

ভিন্ন আর কিছুই নহে। Julius Caesar-এর নামানুসারে Caesar প্রথমে Rome-এই সম্রাটবাচক শব্দ হইয়া পড়ে এবং পরে অসভ্য জার্ম্মানগণও তাহা নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করে। (Caesar ও Kaiser-এর মধ্যে আসলে উচ্চারণগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই কারণ c-এর উচ্চারণ ল্যাটিন ভাষায় ছিল ক, Cicero = কিকেরো)। আমার আরও বিশ্বাস ইন্দো-ইরানীয়গণ Assyrianদের নিকট হইতে কেবল তাঁহাদের প্রধান দেবতার নাম গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। হিন্দুধর্ম্ম, এবং বিশেষ ভাবে বৈদিক ধর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে হয়তো দেখা যাইবে যে হিন্দুধর্ম্মের অনেক বৈশিষ্ট্যের কারণ Assyria-র প্রভাব। একথা ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই ইহা স্বীকার করেন নাই। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে একটি অন্ততঃ দৃষ্টান্ত দিতেছি। বৈদিক ঋষিদের পুত্রকামনা সর্ব্বজনবিদিত, এবং তাহার প্রধান কারণ এই যে পুত্র না থাকিলে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জলতর্পণ অবচ্ছিন্ন হইবে। পুত্রকামনা করার শতবিধ সম্ভব কারণের মধ্যে এইটিকেই মুখ্য কারণ মনে করা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কিন্তু এই বিস্ময়কর বস্তু আবার বৈদিক যুগের বহুপূর্ব্বে Babylonএও দেখা যায় (Meissner, Babylonien und Assyrien, Vol. I, p. 392)। জাতিভেদ স্বীকার করার জন্য তো ভারতীয় সভ্যতা সভ্যসমাজে অপাংক্তেয়। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ইউরোপে যে পুরাপুরি জাতিভেদ প্রতিষ্ঠা করার প্রবল চেষ্টা করা হইয়াছিল একথা Risley বহুদিন পূর্ব্বেই দেখাইয়া দিয়া গেলেও আমরা তাহা স্মরণ রাখি না। আর বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বেই যে ভারতের বাহিরে চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। মিশরের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে "an official who took the census in the XVIIIth dynasty divided the people into 'soldiers, priests, royal serfs and all the craftsmen' and this classification is corroborated by all that we know" (Cambridge Ancient History, Vol. II, p. 49)। কুশন রাজাদের সময়ে যে মিশরীয় ধর্ম্মের দ্বারাও ভারতীয় ধর্ম্ম পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে (Erman, Die Religion der Aegypter, 2nd. Ed., p. 419, foot-note 1)।

এইবার ইন্দ্র-দেবতার আলোচনা করা যাউক। অক্ষয়কুমারী দেবী বক্তৃতার মধ্যে "Hittite Indar"-এর উল্লেখ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিলাম তাঁহার নিশ্চয়ই জানা নাই যে আমার শিক্ষক অধ্যাপক Ferdinand Sommer নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে Hittite Indar একটি দেবীর নাম, দেবের নহে। যতদিন ধারণা ছিল Hittite Indar একজন পুরুষ দেবতা ততদিন সকলেই না হইলেও অধিকাংশ পণ্ডিত একপ্রকার ধরিয়াই লইতেন যে বেদের ইন্দ্র-দেবতা Hittite Indar-এরই অন্য রূপ মাত্র। এখন কিন্তু আর সে কথা বলা চলিবে না। এ সম্বন্ধে আমার একটি এখনও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

"Vritra therefore originally signified some force which held the waters confined. But this force early came to be conceived in a theriomorphic from—as a dragon, for in the Rigveda the words *ahi-han* and *vritra-han,* both epithets of Indra, are practically synonymous. Indra as the slayer of the dragon cannot fail to remind us of the far-flung group of similar myths,—of Hercules and Hydra, Apollo and Python, Zeus and Typhon. Even the Hittites had known the legend of a dragon-slaying hero. But that is not all. The Hittites also possessed a word *innara* signifying "force", cf. *innarawa* "strong", *innarawatar* "heroism" etc. They also worshipped a divinity called "Indar", but Sommer has shown that it is the name of a goddess. If we now remember that the god Indra is mentioned for the first time by the Mitanni who were the neighbours of the Hittites, does it not suggest of itself that the name of our god Indra might be derived from this word *innara* borrowed from the Hittites ? It is true that it has yet to be proved that the Hittites themselves

used the word as the name of a deity. But even admitting that the word *innara*, out of which would automatically result *indra*, was exclusively an abstract noun originally, there is no reason why we should get diffident about connecting Indra with Hittite *innara*. If what I have tried to prove at the beginning of this article is even partially true, nothing could be easier than to metamorphose an abstract quality into a concrete deity in the state of mind revealed by the ancient Indo-Aryans in their oldest records. The legend of a dragon-slaying hero must have been known to the earliest Indo-Europeans, as is proved by its ramifications in the cultures of all the chief Indo-European tribes. This legend itself might have been borrowed from other peoples, but that has yet to be proved. What is certain however is that the early Indo-Eurepeans lacked the *name* of a hero, under the sign of which they could conveniently integrate and consolidate the loose features of a floating legend. Their eastern tribes, on their march to India, came in contact with the Hittites who possessed a word expressive of vigour and heroism. Similar words in their own language could not be utilised for the purpose of consolidating the legend, for, at least in their eyes, they must have been encumbered with various associations which might not have been consistent with the chief idea underlying the legend. In all such cases a loan-word has a great advantage over indigenous synonyms : every possible semasiological nuance can be forced on a loan-word which the indigenous synonyms would usually refuse to accommodate. The name of the great god Indra should therefore be

regarded as a loan-word from Hittite as Kretschmer and Benveniste have suggested ; thus Hit. *Innara*> *Inra*> *Indra*."—ইন্দ্র-শব্দের এই ব্যুৎপত্তি সকলেই যে স্বীকার করেন না তাহা বলাই বাহুল্য, যথা Albrecht Goetze (Kulturgeschichte des alten Orients (Kleinasien), p. 59, foot-note 2) এবং Johannes Friedrich (Hirt-Festschrift, Vol. II, p. 223, foot-note 1)। কিন্তু Goetze বা Friedrich কেহই তাঁহাদের মত সমর্থনের জন্য যথাযোগ্য কারণ দেখান প্রয়োজন বোধ করেন নাই,—হয়তো তাহা দেখান যায় না বলিয়া। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে ইন্দ্র সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারী দেবী যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা।

আলোচ্য পুস্তকের তুলনায় সমালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে ; সুতরাং অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে সারিব। গ্রন্থকার পূষণের আলোচনায় (p. 109 f.) কোথাও বলেন নাই যে বৈদিক পূষন্ ও গ্রীক Pan একই দেবতা। বহুদিন পূর্ব্বেই Wilhelm Schulze ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। লেখক মনে করেন পণি-শব্দের সহিত বণিক-শব্দের সম্বন্ধ। ইহা আদৌ ঠিক নহে। পণি-শব্দের সহিত সম্বন্ধ Lithuanian *pelnis*-শব্দের, এবং বণিক-শব্দের সহিত সম্বন্ধ ইংরাজি *ware*-শব্দের। এই শব্দগুলি আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসদৃশ হইলেও ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সহজেই তাহাদের মূলগত অনন্যত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত "সূর্য্য" ও Greek "Helios"-এর মধ্যে যে শব্দগত অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাহার কারণ ইহা নহে যে এই দুই শব্দের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। অসামঞ্জস্যের কারণ বাস্তব এই যে ইন্দো-ইউরোপীয়গণ খুব সম্ভব অপর কোন জাতির ভাষা হইতে এই শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়গণ যে অন্যান্য জাতির বিবিধ ভাষা হইতে কত শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা Alfons Nehring-এর "Studien zur indogermanischen Kultur und Urheimat" (Vienna 1936) পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। বইটিতে ছাপার ভুল অসংখ্য ; প্রচ্ছদের উপরে ছাপা হইয়াছে "Rigvedic Pentheon"।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

Lucretius, De Rerum Natura; Translated into English by R. C. Trevelyan (Cambridge) 8/6.

অনুবাদ-গ্রন্থ বিচার করিতে বসিলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, বিচার করিতে হইবে কাহার তরফ হইতে, যে-পাঠক মূলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, না যে-পাঠকের নিকট মূল একেবারে অপরিচিত। এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমার জানা নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিচারের অধিকারও আমার নাই। আমি শুধু পাঠকবর্গকে এইটুকু জানাইতে পারি যে অনুবাদক প্রস্তুত ছিলেন তাঁহার অনুবাদের পাশাপাশি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লুক্রিশিয়াস-এর মূল ল্যাটিন মুদ্রিত করিতে, প্রকাশকের অসুবিধাতেই তাহা হইয়া ওঠে নাই। তাঁহার বিশ্বাস মূল গ্রন্থের প্রত্যেকটি কথা তিনি যথাযথভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, ও এবিষয়ে তিনি পণ্ডিতবর্গের তীক্ষ্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে ভীত নন।

কিন্তু এমন কোনো কথাই নাই যে প্রতিটি শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ যোগাইতে পারিলেই অনুবাদ সিদ্ধ হইবে। বিশেষ করিয়া মহৎ কবিতায়, যাহার প্রাণশক্তি বাক্যের অর্থ অপেক্ষা ছন্দের স্পন্দনেই গূঢ়ভাবে নিহিত। এই ছন্দস্পন্দনেই হয় একই কালে অনুবাদকের লোভ ও হতাশা। কোনোরূপে ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে সমস্ত অনুবাদই হয় প্রাণহীন পণ্ডশ্রম, অথচ সকল শিক্ষিত অনুবাদকই জানে যে ছন্দস্পন্দের ভাষান্তর মানববুদ্ধির সীমারেখার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লুক্রিশিয়াস-এর ধ্যানগম্ভীর ষট্‌পর্ব্বিকা যাহার কানে একবার বাজিয়াছে, কোনো অনুবাদই তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আর সে উদাত্তধ্বনি যে শোনে নাই, কোনো অনুবাদেই যে তাহার রস পরিবেশন করা অসম্ভব, এ কঠিন সত্য ট্রেভেলিয়ানের অবিদিত নয়। ভার্জ্জিলের ল্যাটিন ষট্‌-পর্ব্বিকাকে ইংরাজ কবি টেনিসন যে অর্ঘ্য দিয়াছেন, তাহার দাবী লুক্রিশীয় ষট্‌-পর্ব্বিকার অধিকার-বহির্ভূত নহে, পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন। তবু ইংরাজ কবি হইয়া ট্রেভেলিয়ান একটি সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহার মাতৃভাষায় এমন একটি সুপ্রচলিত ছন্দ আছে, বহু যুগের বহু মহাকবির অনুশীলনের ফলে তাহার প্রকাশশক্তি এমনই অকুণ্ঠিত ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, যে এমন ভাবাবেগ কল্পনা করা কঠিন যাহা তাহাতে পূর্ণ কাব্যরূপ পরিগ্রহ করিতে না পারে। আয়াম্বিক পঞ্চপর্ব্বিকার মাহাত্ম্যেই ট্রেভেলিয়ান-এর অনুবাদ এমন স্বচ্ছন্দ

সাবলীল ও রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ একটি পাঠক সানন্দ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করিতেছে যে প্রথম হইতে শেষ লাইন পর্য্যন্ত আদ্যন্ত পড়িয়া যাইতে তাহার কোথায়ও কোনো বাধা লাগে নাই, অতৃপ্তি বা বিরক্তি জন্মে নাই। যদিও কিছুকাল পূর্ব্বে ভিন্ন অনুবাদে প্রথম লুক্রিশিয়াস পড়িতে গিয়া তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল অন্যরূপ।

তবুও মনে হয় ল্যাটিন শিখিবার বিপুল শ্রম সার্থক হয় এক লুক্রিশিয়াসকে আয়ত্ত করিয়া আনন্দ পাইতে শিখিলেই। শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবিগণের তিনি অন্যতম, ইহা বলিলে লুক্রিশিয়াস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় না। গ্রীক কবিতার মহিমার প্রাখর্য্যে ল্যাটিন কবিতার গৌরব আজ অনেকাংশ ম্লান। লুক্রিশিয়াস নিজেও গ্রীক প্রভাবে আপাদমস্তক সিক্ত ছিলেন। বিদেশী ভাষার প্রাত্যহিক চর্চ্চা শুধু যে আমাদের প্রকাশভঙ্গীকে প্রভাবিত করে তাহা নহে, আমাদের চিন্তার গঠন ও ভাবের উদ্‌গমকেও ছাড়ে না। ব্যক্তিগত অনুভূতি অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রকাশও তাহার আলোকে বর্ণাঢ্য হইয়া উঠে। এদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যেক বাঙালী কবিরই লুক্রিশিয়াস অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। এ-হেন গ্রীক প্রভাব সত্ত্বেও—এমন কি তাঁহার একমাত্র গ্রন্থের নামটি পর্য্যন্ত গ্রীক হইতে গৃহীত—তাঁহার কবিপ্রতিভার স্বকীয়তা অবিসংবাদিত, বিস্ময়কর, স্তম্ভনপ্রদ।

অথচ লুক্রিশিয়াস-এর অভিপ্রায় ছিল না কবি হওয়া; তিনি কবি, নিজের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। কাব্য বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সাজাইয়া গোছাইয়া ইনাইয়া বিনাইয়া কথার মালা গাঁথা, তাহাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদী, গুরুবাদী, অথচ নিরীশ্বরবাদী। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানপ্রচারের সহায়তায় মানুষের দৈববিশ্বাস ও ভয় দূর করিয়া এই পার্থিব জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর করিয়া তোলা। বিশ্বের সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য দুর্নীতির মূলে মানুষের অজ্ঞান কুসংস্কার। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা মানিলে কোনো সমস্যাই অমীমাংসিত থাকে না, দেবতার খেয়াল বা ঈশ্বরের লীলা মানিবার প্রয়োজন হয় না, মানুষ নিজের পায়ে ভর করিয়া নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার দ্বারাই দেবত্বে উপনীত হইতে পারে। জাগতিক হেতুবাদে এই প্রগাঢ় প্রত্যয় তিনি অর্জ্জন করেন এপিকিউরীয় দর্শন হইতে। তাই তাঁহার একমাত্র উপাস্য

দেবতা এপিকিউরাস। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের যেখানে সেখানে তাঁহার সাধারণতঃ কঠিন সংযতভাষা গুরুভক্তির উচ্ছ্বাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্লেটো জেনোফোনও এ বিষয়ে তাঁহার পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন, ভয় হয়। দার্শনিক আত্মবিলোপের এরূপ উদাহরণ আর আছে কি না জানি না। ছয় সর্গে বিভক্ত লুক্রিশিয়াস-এর বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ ছন্দে বাঁধা একটি বিরাট তর্কজাল। একমাত্র উদ্দেশ্য এপিকিউরীয় দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা যাহাতে শিষ্য গুরুকে এক কেশাগ্রও অতিক্রম করেন নাই, অন্ততঃ তাহাই তাঁহার ধারণা। ছন্দের প্রয়োজনও একই উদ্দেশ্যে, যাহাতে দর্শনের তিক্তস্বাদ মিষ্টতায় আবৃত হয়। একান্ত ব্যাবহারিক প্রয়োজনই তাঁহার কাব্যের মূল প্রেরণা ; গুরুর মতবাদ প্রচারার্থে অন্য দার্শনিক মতামতকে তিনি নির্দ্দয় ব্যঙ্গ করিতেও পশ্চাৎপদ নন। তাঁর কাব্যে গল্প নাই ঘটনা নাই চরিত্র নাই, আছে শুধু দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিপ্রয়োগ স্বমতের সমর্থনে ও বিপক্ষের বিনাশনে। কাব্যের বিষয়বস্তু—ইংরাজী সমালোচনার ভাষায় যাহাকে বলা চলে অ্যাক্‌শন্—হইতেছে যুক্তির সংঘাত, সুপ্রাচীন ভ্রান্তির সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বের ক্রমিক পরাজয় ও তিরোভাব, প্রাকৃতিক রহস্যের ও জাগতিক সত্যের অভিনব উপলব্ধির অমোঘ দীপ্তির আবির্ভাবে। কাব্যের চিরাচরিত পথ পরিহার করিয়া দর্শন ও বিজ্ঞান-বোধের ভিত্তিতে কবিতা রচনার প্রচেষ্টা আজ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আপনাদিগকে ভবিষ্যতের অগ্রদূত ভাবিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন একবার লুক্রিশিয়াস-এর কথা ভাবিয়া দেখেন।

এই বহুল-বিজ্ঞাপিত দার্শনিকতা সত্ত্বেও লুক্রিশিয়াস-এর কাব্যগ্রন্থ নিছক কাব্য, দর্শন নহে, এবং দান্তে বা মিল্‌টন-এর কীর্ত্তিকলাপের সহিত তুলনীয়। বুদ্ধিপ্রণোদিত ঘনবিন্যস্ত যুক্তিজালের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির বিশ্ববীক্ষা ও জীবনবেদ; সৃষ্টির শৃঙ্খলা বৃহত্ত্ব ও বৈচিত্র্য, এবং প্রকৃতির নিত্য-চঞ্চলতার প্রতি চিরসজাগ দৃষ্টি; মানবজীবনের সফলতায় উল্লাস ও বিফলতায় করুণা। মানবের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা, ইতর প্রাণীজগতের সহিত মানুষের নিবিড় সহানুভূতির সম্পর্ক, কর্ম্মের উন্মত্ততা ও নির্জ্জন চিন্তাশীলতার প্রশান্তি—এ সবকিছুই তাঁহার কাব্যে আপনা হইতে স্থান পাইয়াছে, কাহাকেও কষ্ট করিয়া টানিয়া আনিয়া বসানো হয় নাই। দার্শনিক মরুভূমিতে তাহারা নহে মরুদ্যান, বিশ্বের বহুলাঙ্গত্বের তাহারা অনুপ্রেরিত প্রতিরূপ।

প্রশ্ন উঠিবে, লুক্রিশিয়াস-এর কাব্যাংশের উৎকর্ষকে কি তবে গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহার অসার দার্শনিক তত্ত্বকে বর্জ্জন করিয়া—মেকলে যেমন করিয়াছিলেন? কারণ ইহা ত সকলেরই জানা কথা যে দর্শন বা বিজ্ঞানের বিচারে এপিকিউরীয় মতবাদ বর্ত্তমানকালে একেবারে অচল। সমস্ত সৃষ্টি যে অসংখ্য অবিভাজ্য কণিকার আকস্মিক যোগাযোগের ফল, কে তাহা আজ সুস্থ অবস্থায় বিশ্বাস করিবে? তাহা ছাড়া, কণিকার যে অনির্দ্দেশ্য স্বেচ্ছাচালিত তির্য্যক্‌গতি—ক্লিনামেন—এপিকিউরাস ও তৎশিষ্য লুক্রিশিয়াস কল্পনা করিয়াছেন, ন্যায়তঃ তাহা তাঁহাদের মূল প্রত্যয়ের বিরোধী। নিয়তির শাসনাতিরিক্ত মানুষের স্বাধীন পুরুষকারের সমর্থনেই তাঁহারা এ পরিকল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ যুক্তি ত ন্যায়ের বিচারে টিঁকিতে পারে না। গুরু ও শিষ্য উভয়েই হেতুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু হেতুবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের প্রয়োজন, তাঁহাদের যুগে তাহা পণ্ডিত সমাজেও অজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের যুক্তির ধারা বহিত নিরীক্ষণ ও উপমানের খাত বাহিয়া ; তাঁহাদের ভুল ধারণায় আজ আমাদের হাসি আসে ; প্রত্যেক দিন হয়ত নূতন সূর্য্য আমাদের দেখা দেয়, সূর্য্যকে যত বড় চোখে দেখা যায়, তাহার প্রকৃত আয়তনও তাহাই, এসব কি আমাদের নিকট পাগলের প্রলাপ নহে? তবে কি করিয়া আমরা লুক্রিশিয়াস-এর "প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণন"-কে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারি?

কিন্তু এতর্ক বুদ্ধিজীবী নৈয়ায়িকের, কাব্যরসিকের নহে। অভিজ্ঞ কাব্য-পাঠকমাত্রই জানেন মহৎকাব্য উপভোগের সময় বুদ্ধিপ্রসূত মতামতকে জীর্ণবস্ত্রের মতো দূরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। কোনো অখ্রীষ্টিয়ানই তাহা হইলে মিলটন বা দান্তে পড়িবার অধিকারী নহে ; কোনো আধুনিক ব্যক্তিই হোমার বা হিব্রু কবিতার রসাস্বাদ করিতে পারে না। এরূপ মন লইয়া অধিকাংশ কবিতাপাঠের চেষ্টা বৃথা হইবে। কবিতায় মজিতে হইলে চাই সেই শক্তি যাহাকে কোল্‌রিজ বলিয়াছেন, স্বেচ্ছায় সন্দিহার অবদমন। এ শক্তি যাহার নাই তাহার পক্ষে লুক্রিশিয়াস পড়িবার আয়োজন না করাই ভালো। এপি-কিউরীয় মতবাদ আজ যতই তুচ্ছ মনে হউক, যুগক্রমবোধ থাকিলে দেখা যাইবে সভ্যতার ইতিবৃত্তে তাহার স্থান তুচ্ছ নয়। জগৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহাতে খাম-খেয়ালীর খেলা চলিতে পারে না, এপিকিউরাস যদি এ তত্ত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা

না করিতেন, আধুনিক বিজ্ঞানের কি গতি হইত ভাবা দুষ্কর। আর হউক সে-মতবাদ পঙ্কস্বরূপ, তাহাতে ফুটিয়াছে পঙ্কজ, লুক্রিশিয়াশ-এর কাব্যগ্রন্থ। কামনা করি অধ্যাত্মবাদ বা সাম্যবাদের মূলনীতি (সত্য মিথ্যা যাহাই হউক) অবলম্বন করিয়া রচিত হউক এমন কাব্য যাহাকে লুক্রিশিয়াস-এর সমপর্য্যায়ে স্থাপন করিতে সাহিত্যরসিক সমালোচক বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রান্তিক—শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর, বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার বই "প্রান্তিক" পড়ার পর বাংলা কাব্যের পাঠককে কবির কাব্যদৃষ্টির সম্বন্ধে নূতন করে ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ ক্ষোভ বরাবরই ছিল এই যে, তা প্রধানত সূর্যালোকিত মুহূর্ত্তের কবিতা। তাতে প্রাণবন্ত আনন্দের পূর্ণতা আছে, কিন্তু আনন্দহীন বিক্ষুব্ধ অন্ধকার তাঁর কাব্যে ভাষা পায়নি—জীবনের সেই গভীরতম স্তরটি তাঁর কাব্যে প্রায় উপেক্ষিত, তাঁর কাব্য তাই অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক। বর্ত্তমান বইয়ে কবি আমাদের সেই ক্ষোভ মিটিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁর বহুবিচিত্র কাব্যসাহিত্যে একটি নবতম সুর সংযোজন করেছেন।

কিছুদিন আগে গুরুতর পীড়ায় কবির সংজ্ঞা কয়েক ঘণ্টার জন্যে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছিল—সেই চেতন ও অচেতনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটা জীবনে অনুভব হয়তো অনেকে করেছেন—এই অচেতন মনই যদিও যত কিছু স্বপ্ন ও স্মৃতির ভাণ্ডার স্বরূপ, তবু এর গতি-প্রকৃতির হদিশ আমরা পাই না—কিন্তু তার স্বরূপকে কাব্যে ভাষান্তরিত করার দৃষ্টান্ত বিরল। মনোরাজ্যের ধরণধারণ স্বভাবতই নিরুপাধিক, তার অনুগমনে কল্পনার ফলকে কোনো 'রূপ' উদ্রিক্ত হয় না ব'লেই তা অনির্বচনীয়, তাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু এমন অবস্থা অবশ্যই আসা সম্ভব যখন সজীব ও জীবনহীন এই দুই চরম অবস্থার মধ্যস্থলে থেকে বিচিত্র অর্ধস্ফুট স্বপ্নাচ্ছন্ন একটি মানসজগৎকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধক হয়তো ধ্যানে এই তুরীয় লোককে প্রত্যক্ষ করে থাকেন, কবি হয়তো এমনি একটা দুর্লভ অবসরেই তাকে উপলব্ধি করেন—

অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি,

বিন্ধ্যগিরি ব্যবধানসম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তবিচ্যুত—বন্ধমুক্ত আপনাকে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে, সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

এডোনাইসের শেষাংশে শেলি যে রূপাতীত অনন্তের জগৎকে অনুভব করেছেন, এ সেই কবিকল্পনার রূপজগৎ নয়—যে জগৎ আমাদের কবির যৌবনোত্তর কাব্যের অবলম্বন, সেই অপরূপ রসজগৎও এ নয়। এ একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়—এ দুর্জ্ঞেয় অন্তর জগৎ, যা আমাদের মনোরাজ্যের পশ্চাৎপট, যার আশ্রয়ে আমাদের মনোধর্মের স্ফুরণ, অথচ যা আমাদের বস্তুমুখী চেতনার নাগালের বাইরে।

বস্তুকে আশ্রয় করেই বোধ—বস্তুসম্পর্কহীন নিরবলম্ব বোধের কোনো অস্তিত্ব আছে কি? কি তার স্বরূপ? সে সম্বন্ধে আমরা অচেতন, কারণ, আমাদের মানসক্রিয়াই বস্তু-আশ্রয়ী,—কবি বলছেন—

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ
দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়।

এ অনুভূতি জীবলোক থেকে জীবনাতীত লোকে যাবার পথে সকলেই হয়তো লাভ করে থাকেন। কিন্তু এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার সৌভাগ্যবশে ফিরে আসার সুযোগ যাঁর ঘটে, মনের স্বভাবধর্ম্মেই সেই লোকের ভাবস্মৃতি তাঁর অন্তর থেকে লুপ্ত হয়। কাজেই মরণোন্মুখ ব্যক্তির তাৎকালিক অনুভূতির সম্বন্ধে কল্পনা চলতে পারে, তার সুস্পষ্ট নজির দাখিলের উপায় দুর্লভ। সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এ বিষয়ে প্রাকৃতজনের থেকে স্বতন্ত্র—তাই সর্ব্বাঙ্গীণ না হোলেও আবছা আবছা ভাবে সেই রাজ্যের আভাস

তাঁর সেই রোগমুক্তির অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। একে কবিকল্পনার অতীন্দ্রিয় লোক ব'লে মনে করলে ভুল করা হবে—হেমলক্ পান ক'রে মৃত্যুসমুদ্রে তলিয়ে যাবার মতো যে অপার্থিব অনুভূতি নাইটিংগেলের গান শুনে কীটসের মনে জেগেছিল—তার ঐতিহ্য রবীন্দ্রকাব্যেই প্রচুর আছে—শেলির 'অনন্ত জগৎ' তারই একটু সূক্ষ্মতর সংস্করণ—বন্ধুর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর আত্মার পরিবেশ খুঁজতে খুঁজতে দুর্জ্ঞেয়ের পথে এসে অজ্ঞাতে শেলি গ্রীক ঐতিহ্যের অনুসরণ করে বসেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দ অনুভবকে রূপ দিয়েছেন—এমন কি ছন্দে মিল দেবার প্রয়াসটুকুও তিনি স্বীকার করেননি, পাছে এই সহজ আবেশটুকু ব্যাহত হয়। সমগ্র কাব্যটিই তাই লম্বিতপর্ব্বের অমিত্রাক্ষরে রচিত—শুধু শেষের দু'একটি ছাড়া।

এই অবচেতন লোকের রূপ কবির ভাষায় বিচিত্রতা লাভ করেছে। আলো নেই, শব্দ নেই, বায়ুপ্রবাহশূন্য অনড় অন্ধকারের ভেতর একটি প্রচ্ছন্ন দ্যুতির শিহরণ, একটি সম্মিলিত গুঞ্জনধ্বনির অস্ফুট প্রতিধ্বনি—সম্মুখ-পিছন, উপর-নিচু পরিব্যাপ্ত ক'রে সীমাশূন্য একটি নিরবয়ব পরিমণ্ডলের বিস্তার…

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিলসূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্যঘাতে সে মুহূর্ত্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতি দূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্ম্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা একা
ডাক দিল একাকীরে……।
মনে হোলো মুহূর্ত্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হোলো আশাপ্রত্যাশার কোলাহল।…
……বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে।

সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অল্পক্ষণ পরেই কবি একখানি ছবি এঁকেছিলেন—সেই ছবিতে যে অস্ফুট একটি অজ্ঞাত লোকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কয়েকটি কবিতায়ও তার আভাস সুস্পষ্ট। মনের এই গ্রন্থিমুক্ত ক্ষণিক বিরতির অবকাশে ভাষা যখন নিরস্ত, স্মৃতি যখন বিছিন্ন, তখনকার অনুভূতি কেবল বর্ণময়, আলো অন্ধকারের সূক্ষ্ম তারতম্যে তার পরিমাপ। উক্ত ছবির মতো প্রান্তিকের বহু

কবিতায়ও তার ছায়া সুলভ—ক্রমে সংজ্ঞা যত স্ফুট হয়ে এসেছে, বস্তুজগতের অস্তিত্ব ও তার বৈচিত্র্য ততই প্রকট হোতে হোতে পূর্ণাঙ্গ চেতনার বিকাশ কি ভাবে সমগ্রতা পেয়েছে, তারও ক্রমিক আভাস প্রান্তিকে দেখা যায়।

…চরম ঐশ্বর্য্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি' এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলীতে, গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ঈশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত……
রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

পূর্ণ চৈতন্যের স্ফুরণ হবার পর কবি দেখলেন, পুরাতন পরিচিত পৃথিবীর সত্যকার রূপ—

……দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ……

তখন তিনি কাতরকণ্ঠে বলছেন

…শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।

মানবীয় চৈতন্যের সঙ্গে অহংজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—সেই চৈতন্য যখন দেহের তটসীমায় নিরুদ্ধ, তখন সর্ব্বপ্রথম যে অনুভূতি তা আত্ম-বিস্মৃতির, অহঙ্কারমুক্তির। সেই সর্ব্বস্মৃতিহীন নির্ম্মুক্ত একাকিত্বের ওপর সংজ্ঞাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি করে আবার নবচেতনার সঞ্চার হ'ল, কি ক'রে সহসা বিচ্ছিন্ন অতীতের সঙ্গে আপনা আপনিই আবার সংযোগ সাধিত হ'ল, নিজত্ববোধ ফিরে এলো, কবি তা নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর ভাষাই এই ক্রম-পরিণতিটুকু ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানেই প্রান্তিকের শেষ। সংজ্ঞালুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ দিয়ে শুরু হয়ে সংজ্ঞাশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই বহু বিচিত্র দুর্লভ দুর্জ্ঞেয় ব্যাপারটি সমগ্রভাবে প্রান্তিকে আশ্চর্য্যরূপে পরিস্ফুট হয়েছে—একটির সঙ্গে আর একটি কবিতার ঐক্য তাই এই বইয়ে এতই

সহজলভ্য যে এদের সবগুলিকে নিয়ে অখণ্ড একটি কাব্যই জন্মলাভ করেছে বলতে পারি। এদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ, ঋজু অথচ অনলঙ্কৃত এবং অকৃত্রিম—লিরিকধর্ম্মী রবীন্দ্রকাব্যে এরা নবজাত। এই কাব্যের সত্যিকার বিচার ঠিক এখনি হওয়া সম্ভব কি না বলতে পারি না, কারণ এই কাব্যকে ঠিক ঠিক বুঝতে হোলে প্রচলিত রসশাস্ত্রের প্রত্যাশিত পথে হাঁটার উপায় নেই—কারণ এই কাব্যের মর্ম্মদেশে যে অনুভূতির বাসা তা মনোসমীক্ষণের অন্তর্গত—কাব্যসৃষ্টির একেবারে গোড়ার সূত্র ধরে এই কাব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। মনে হয় সে হিসাবে প্রান্তিক কবির ইদানীন্তন কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বশেষ কবিতাটি এই বইয়ের অন্তর্গত না হ'লেই ভালো হত। কাব্যটির সমাপ্তিতে যে একটি গাম্ভীর্য্যের সুর আছে, তা ওতে আহত হয়েছে মনে হয়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

I Will Not Rest—by Romain Rolland. (Selwyn & Blount.) সাহিত্যিককে যে রাজনীতিক হ'তেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; কিন্তু আপন শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তের দশ হাত দূর দিয়ে যাওয়া সুবিধাবাদী ও কাপুরুষের লক্ষণ ব'লে সম্প্রতি বিবেচিত হ'চ্ছে। কোনো বড় সাহিত্যিক রাজনীতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেন কিনা সন্দেহ। এমন কি কালিদাসের 'রঘুবংশ' থেকেও যে একটা রাজধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করা যায়, তা' প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে আমাদের দেখিয়েছেন। বর্ত্তমানকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপরেও আধুনিক রাজনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ফরাসী ঔপন্যাসিক রোম্যা রোলাঁ এঁদেরই মতো সত্যপরায়ণ ও আত্মনিষ্ঠ। তাই বার্দ্ধক্যেও প্রতিক্রিয়ার পিচ্ছিল পথের দিকে বারেকের জন্য ভুলেও তাকান নি; নিরপেক্ষতার ভান ক'রে বিপুলা পৃথ্বীর সুবিপুল সমস্যাকে এড়িয়ে মোক্ষ লাভের জন্যও ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন নি। বরঞ্চ বলেছেন: "My activities have always and in every case been dynamic. I have always written for those who are on the move. I have always been on the move, and I hope never to stop as long as I live. Life will be nothing to me if it is not movement—straight ahead, of course!"

সাহিত্যে প্রগতিমার্গের কথা উত্থাপন করলে বাংলা দেশের সাহিত্যিক নন্দদুলালরা প্রচার বা প্রোপ্যাগাণ্ডার গন্ধ পেয়ে উষ্ণ হ'য়ে ওঠেন। অথচ সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হ'লেই যে অধঃপাতে যায় না, এমন গ্রন্থের তালিকা দিয়ে আলোচনা ভারাক্রান্ত করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক।

গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে রোম্যা রোলাঁ 'Above the Battle'-এর পতাকাবাহী হ'য়ে চিন্তাশীল লোকদের সাবধান করেন। তার প্রায় দুই যুগ পরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি পুনরায় ঘোষনা করলেন 'I Will Not Rest'। তাঁর মনের মন্থর বিকাশের ইতিহাস অর্থাৎ তাঁর মানসিক বিবর্ত্তনের কাহিনী তাঁর এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের ভিতর দিয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এ-কথা মিথ্যা নয় যে, ষাট বৎসর অতিক্রম করার পর ভাবরাজ্যের ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র জীবনকে নূতন ভাবধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে হলে প্রভূত সাহসের প্রয়োজন। তবু যে তিনি সোভিয়েট রাশ্যা-র প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'তে পেরেছেন, এবং আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেন যে, Communism is to-day the only world-wide party of social action which, without reservations and without compromise, is carrying the flag and making its way, with a considered and courageous logic, toward the conquest of the high mountain lands, তাতে তাঁর মনের প্রগতি-প্রবণতারই পরিচয় পাওয়া যাও।

আলোচ্য গ্রন্থে Prologue ও Epilogue-কে বাদ দিলে রোলাঁর বাইশটি প্রবন্ধ আছে। পনের বৎসর ধ'রে তাঁর যে সব রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তারই কতকগুলি এই গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। সমস্ত বইখানিকে 'Diary of A Man of Sixty Years' আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। কারণ, বর্ত্তমান জগতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তাঁর হৃদয়-তন্ত্রীতে যে ভাবে ঝঙ্কার তুলেছে, তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই বইখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। তাই কখনো দেখি, তিনি ফ্যাশিজম্-এর বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেছেন, যে-ফ্যাশিজম্ বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়; হিট্লার ও মুসোলিনির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিষোদগার করছেন; ফ্যাশিজম্-এর নিপাতের জন্য যুবকদের নিকট আবেদন করছেন; টৌরগ্লার, ডিমিট্রভ্,

পোপোভ্ এবং টানেভ্-এর মুক্তির জন্য জার্মেনীর অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করছেন; থেইলমান্-এর প্রকাশ্য বিচারের জন্য হিট্লার্-এর গভর্ণমেণ্টকে সদর্পে আহ্বান করছেন; মুসোলিনির কারাগারে আবদ্ধ মুমূর্ষু রাজনৈতিক বন্দী ও বন্দিনীদের জন্য, বিশেষ ক'রে এণ্টোনিও গ্রাম্স্কির ন্যায় অনন্যসাধারণ শক্তিমান তরুণ কম্যুনিষ্ট নেতার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে বিচলিত হ'চ্ছেন। আবার কখনো বা, বার্লিনে জানুয়ারি মাসের স্পার্টাকিষ্ট্ বিপ্লব দলনে লাইব্নেক্ট ও রোসা লুক্সেম্বুর্গ্-কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় ক্রোধে ও ক্ষোভে অস্থির হ'য়ে পড়ছেন; ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এ সাকো ও ভেঞ্জেটির আইনানুগ হত্যায় দুঃখিতচিত্তে ফ্রান্সের ড্রেফুস্-এর ঘটনা স্মরণ ক'রে আমেরিকান বন্ধুকে পত্র লিখছেন; মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রাজনৈতিক বন্দীদের পুনর্বিচারের দাবী জানিয়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রে বলছেন, 'England has been living for the last century on India, bled white; and her wealth, which is tottering, will crumble the moment her prey escapes her clutches'; ইন্দো-চীনে সায়গন্-এর অমানুষিক বিচার-ফলের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করছেন।

সোভিয়েট রাশ্যা-র সমর্থন রোলাঁ একাধিকবার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাশ্যায় এক বিরাট পরীক্ষা চল্‌ছে, এবং ভবিষ্যতের অনেকখানিই নির্ভর করছে এরই পরিণামের উপর। রুষ বিপ্লবের সঙ্কীর্ণ মতবাদ, একনায়-কোচিত ভাব, বহুচারী বৃত্তি, এবং পীড়ন ও অত্যাচারের নিন্দা করলেও তিনি প্রথমেই এর ঐতিহাসিক আবশ্যকতা স্বীকার করেছিলেন। মানব-সমাজের শক্তিশালী অগ্রদূতরূপে তিনি রাশ্যা-কে মনে করেন। যদি কোনো কারণে রাশ্যার বিরাট সংগঠনের কার্য্য শেষ হ'তে না পায়, তাহ'লে ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর সকল আশা আকাশকুসুমে পরিণত হবে। বিদ্রোহী দেশসমূহের স্বাধীনতার জন্য তিনি ইয়োরোপের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত নন। ফ্রাঙ্কো-জার্মান্ সামরিক ঐক্যের মতো গোপন সন্ধিই হ'ল তাঁর মতে নব প্যান-ইয়োরোপা-র অঙ্গবিশেষ। ইয়োরোপ যদি এই ভাবে শাসন ও শোষণের জন্য সংগ্রাম চালায় তাহ'লে তিনি সভ্যতার নামে ভারতবর্ষ, চীন,

ইন্দো-চীন প্রভৃতি প্রত্যেক অত্যাচারক্লিষ্ট ও নিপীড়িত জাতির পক্ষাবলম্বন করবেন। সারা জীবন ধ'রে তিনি স্বাধীন মতানুযায়ী কাজ ক'রে আসছেন; জাঁ ক্রিস্তফ্ ও কোলা ব্রোঞ্যঁ তাঁর কণ্ঠেরই ভাষায় সজীব ও প্রাণবান হ'য়ে উঠেছে। আজ তিনি স্পষ্ট ক'রেই ইয়োরোপকে জানাতে চান, 'Broaden yourself, or perish.'

স্বাধীন চিন্তার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী। এই নিয়ে অঁারি বারবুস্-এর সঙ্গে তাঁর যে বিতর্ক হয়েছিল, তাও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পীড়ন ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণের জন্য তিনি মনে করেন যে, কম্যুনিষ্ট্ পার্টির কাজের ক্ষতি হয়। জগতে ভাবাতিশয্যই যদি একটি প্রধান শক্তি হয়, তাহ'লে একে উপেক্ষা করা বাস্তববাদীর উচিত নয়। পীড়ননীতি ও এই পন্থাকে নানা প্রকারে সমর্থন করার জন্য রাশ্যা বাট্র্যাণ্ড রাসেল, জর্জ্জ ব্রাণ্ডিস্ ও আনাতোল ফ্রাঁস্-এর মতো চিন্তানায়কদের সহানুভূতি হারিয়েছে। এই একই কারণে ওঅর্ড্স্ওঅর্থ, কোলরিজ এবং শিলার-এর মতো মনীষীবৃন্দ ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিরূপ হন। এই উদাহরণ থেকে রুষ বিপ্লবের শিক্ষালাভ করা উচিত। সকল রকমের পীড়ন-নীতি সম্বন্ধে রোলাঁর এই মত কেউ কেউ হয়ত' নাও মানতে পারেন; কারণ, পীড়নেরও প্রকারভেদ আছে। এ বিষয়ে ফয়েখ্ট্-ভেঙ্গার-এর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বিচার্য্য: 'There is a difference between the bandit who shoots at a passer-by and the policeman who shoots at the bandit!'

চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে রোলাঁ-র মত অনেকাংশে সত্য হ'লেও সকল ক্ষেত্রে তা' সমর্থনযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে জুলিয়ান হাক্স্লি-র মত উদ্ধৃত করছি: 'one wonders sometimes just what would happen if young Communism were suddenly subjected to all the blasts of doctrines current in other countries. Perhaps freedom of ideas is confusing after all!' সোভিয়েট রাশ্যায় যে সবে মার্ক্সপন্থীদের মতে প্রথম অথবা নিম্নস্তরের কম্যুনিজ্ম্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যার মৌলিক নীতি হ'ল "from each according to his abilities, to each according to his labour"),—তা' আমাদের অজানা নেই। উচ্চস্তরের কম্যুনিজ্ম্

এখনও সেখানে প্রবর্ত্তিত হয় নি, যার মৌলিক নীতি হবে "from each according to his abilities, to each according to his needs."

কয়েক ক্ষেত্রে। রোলাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ার প্রধান কারণ, তাঁর কাছে হৃদয় বড়, বুদ্ধি নয়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'Woe to those who scorn the forces of the heart।' সেই জন্যই তিনি "divorce between la haute pensee and the workers" দেখে তার ভয়াবহ পরিণামের কথা ভেবে ভীত হন। যাতে এই মারাত্মক বিরোধের অবসান হয়, তার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত তিনি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। এই কারণেই idealism ও materialism তাঁর কাছে গুরুত্বহীন। কম্যুনিজ্‌ম্ এবং সোভিয়েট রাশ্যা-কে সমর্থন করা সত্ত্বেও তিনি এরই অন্তর্লীন দর্শন সম্বন্ধে অনুৎসুক। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আদর্শবাদের একনিষ্ঠ উপাসক ব'লেই 'Marxist creed and its materialistic fatalism'-এর সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। কিন্তু সোশ্যালিজ্‌ম্ যে equalitarianism নয়, এবং আদর্শবাদী হ'লে যে মার্ক্সপন্থী হওয়া যায় না,—তাঁর এ-কথায় কোনো যুক্তি নেই। তবু, সমগ্র পৃথিবীর নরকীয় রূপ দেখে তাঁর মনে অশান্তির উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও যে রোলাঁ মানবতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উজ্জ্বল এবং অদম্য আশা পোষণ করেন, তজ্জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙলায় ভ্রমণ—প্রকাশক :-ই, বি, রেলওয়ে—মূল্য—আট আনা।

বইখানিতে বাঙলাদেশের অধিকাংশ বিশিষ্ট স্থানসমূহের ঐতিহাসিক এবং শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি গাইড্-বুক। পুস্তকটি যেরূপ বহুল চিত্রিত ও উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা তাহাতে আট আনা মূল্য মোটেই বেশী হয় নাই।

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪৫

পরিচয়

ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড *

ফ্রয়েডী মনস্তত্ত্বের বিচারে পিতা-পুত্রের অনিবার্য্য দ্বন্দ্ব সমাজজীবনের প্রথম সোপান; এবং এ-সিদ্ধান্ত বিনা ভাষ্যে অগ্রাহ্য বটে, কিন্তু মহারাণীর মৃত্যু আর আমার জন্ম—এই দুর্ঘটনাদ্বয় সমসাময়িক ব'লেই আমি সম্ভবত ভিক্টোরীয় যুগের হাল আমলী সাধুবাদে অপারগ। কারণ নিরাসক্ত বুদ্ধিতে ভাবলে উনিশ শতকের সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি আমার কাছেও তর্কাতীত ঠেকে; এবং পূর্ব্বপুরুষের আদর্শ ও আচারের বৈষম্য আমাকে যদিও আশৈশব ভুগিয়েছে, তবু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্রও অনুরূপ সংঘর্ষের সন্ধান পেয়ে আজ আমি মানতে বাধ্য যে অবৈকল্যের অভাবে ভিক্টোরীয়া-র রাজ্যকাল অদ্বিতীয় নয়, সকল কালেরই সমকক্ষ। তাহলেও সহজাত শত্রুতার প্রতিবিধান আমার সাধ্যে কুলায় না; এবং যে-বিবেকের নির্দ্দেশে আমি বুঝি যে কায়মনোবাক্যের বিসংবাদ মানুষী সভ্যতার সনাতন উপসর্গ, সেই নিরপেক্ষতাই আমাকে দেখিয়ে দেয় যে, শুধু দোষে নয়, এমনকি গুণেও সে-যুগ বৈশিষ্ট্যবিহীন এবং তদানীন্তন প্রতিষ্ঠা যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ, তখনকার প্রগতি তেমনি পারগত আমাদেরই নির্ব্বাহে। আসলে সাম্রাজ্যবাদের উদ্‌ভাবন ব্যতীত অন্য কোনো কৃতিত্ব সে-কালের আছে কিনা সন্দেহ; এবং সেজন্যেও ডিজ্রেলি-র প্রাচ্যশোভন কল্পনাশক্তি হয়তো ততটা প্রশংসনীয় নয়, যতটা উল্লেখযোগ্য কার্ট্রাইট-এর আঠারো শতকী সৃজনপ্রতিভা। অবশ্য তার পরেও বেণ্টামী হিতবাদ বাকী

* **Victorian England**: Portrait of an Age—by G. M. Young (Oxford)
Daylight and Champaign—by G. M. Young (Cape)

থাকে ; এবং সে-মতের সূত্রপাত যেহেতু হিউম্-এর ন্যায়নিষ্ঠ সংশয়ে, তাই আমার মতো বৈনাশিক সেই একদেশদর্শীদের মায়া একেবারে কাটাতে পারে না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে উক্ত লোকায়তিকেরা সকলেই সমস্বরে চেঁচিয়েছিলেন যে তাঁদের বিবেচনায় তত্ত্ব তথ্যেরই নামান্তর ; এবং সেইজন্যে যখন মনে পড়ে যে অত বাদ-বিতণ্ডার স্থায়ী ফল শুধু ভারতীয় শিক্ষাপ্রদ্ধতি ও দণ্ডবিধি এবং স্বয়ং বেন্টাম্-এর সেক্রেটারি বোরিং-এর অগ্নিবৃষ্টিতে কান্টন্ নগরীর আকস্মিক উচ্ছেদ, তখন অন্তত এশিয়াবাসীর কানে হিতবাদের নাম-সঙ্কীর্ত্তন কেমন যেন বেসুর শোনায়।

বলাই বাহুল্য, ইতিহাস একটা ধারাবাহিক ব্যাপার ; এবং বিশ্ববিধানের বিবরণে গণিতের নিয়ম খাটুক বা না খাটুক, কালস্রোতের শতাব্দীগত বিভাগ স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা। সুতরাং উনিশ শতকের স্বরূপ অঙ্ক ক'ষে পাওয়া যাবে না ; মনে রাখতে হবে যে তার সূচনা ফরাসী বিপ্লবে এবং সমাপ্তি য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে। উপরন্তু তার আদ্যন্তে মহাপ্রলয় থাকলেও, তার মাঝে মাঝে খণ্ড প্রলয়ের অভাব নেই ; এবং সেই উপনিপাতসমূহ যদিও ইংলণ্ডে সাংঘাতিক আকার ধরেনি, তবু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ডায়ালেক্টিক্ তরঙ্গে সে-দ্বীপপুঞ্জও নিয়ত দোদুল্যমান। রাসেল্ এই পরিবর্ত্তনের উর্ম্মিমালায় স্বাধীনতা ও সংগঠনের পতন-অভ্যুদয় দেখেছেন ; এবং ফিশার-এর মতে প্রচারধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়তাবাদ, ধনবিজ্ঞান ও তুলামূল্য, অবাধ বাণিজ্য ও স্বার্থসংরক্ষণ, যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ ও চার্টিষ্ট্দের সশস্ত্র বিদ্রোহ ইত্যাদি স্বতোবিরোধী সমস্যাগুলো নাকি পরিণামী উদারনীতির অব্যর্থ অভিব্যক্তি। কিন্তু এতাদৃশ সামান্যীকরণ নিরতিশয় ব্যাপক ; এবং এ-রকম সার্ব্বভৌম নামের আশ্রয় নিলে, শুধু ভিক্টোরীয়া-র আমল কেন, মানবসভ্যতার সকল শাখা-প্রশাখাকে একই কাণ্ডে জুড়ে দেওয়া সম্ভব। আসলে সাধারণ্যের প্রতি এতখানি সদ্ভাব হোয়াইট্হেড্-এর মতো আদর্শবাদীদেরই সাজে, যাঁরা প্লেটোনিক্ তিতিক্ষার অমর কণ্ঠস্বর শোনেন গান্ধি-আরুইন্ সন্ধির নশ্বর সর্ত্তে। ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য যখন যুগপরম্পরার পার্থক্যনিরূপণ, তখন তিনি সংজ্ঞাসঙ্কোচে বাধ্য ; এবং ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্যসন্ধানে বেরুলে তিনি কখনো কোনো চিরন্তন প্রত্যয়ে থামবেন না, শেষ পর্য্যন্ত একটি সাময়িক সম্প্রদায়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করবেন। সে-সম্প্রদায়ের

অস্তিত্ব কোন্ ছার, তার স্মৃতি সুদ্ধ আজ ইংরেজী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিলুপ্ত ; এবং তার আরম্ভ, তথা আধিপত্য, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বটে, কিন্তু তার প্রভাব ও প্রকোপ যেহেতু মহারাণীর সময়েই আত্ম-পর সকলের মধ্যে সমভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তাই হুইগারি-কে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের প্রাণবস্তু বলায় বোধহয় অতিশয়োক্তি নেই।

দুঃখের বিষয়, হুইগ্ দলের নামোল্লেখ যত সহজ, তার পরিচয়প্রদান তেমনি দুষ্কর। কারণ ব্যক্তির মতো দলের বৈশিষ্ট্যও তার কার্য্যকলাপের অপেক্ষা রাখে ; এবং হুইগ্দের মধ্যে গর্জ্জন-বর্ষণের সমীকরণ তো কোনোদিন ঘটেইনি, এমনকি অবস্থাগতিকে তাদের নেতারা যখন সদাব্রতে না নেমে পার পায়নি, তখনও অন্নযাত্রের পৃষ্ঠপ্রদর্শনে অথবা অসহযোগে তাদের আরব্ধ কর্ম্ম বারম্বার অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও তখনকার ভাবয়িত্রী প্রতিভা সেই সম্প্রদায়ের প্রশ্রয়েই পরিপুষ্ট ; এবং মহারাণীর সুবিখ্যাত নির্ব্বন্ধাতিশয্য রমণীরঞ্জন স্তোক-বাক্যের বশবর্ত্তী হওয়ায় হুইগ্দের রাজভক্তি সে-যুগে এমনি উথলে উঠেছিলো যে তাদের দলে যোগ দেওয়া আর আভিজাতিক বিবেকেও বাধেনি। কিন্তু ইংলণ্ডের সিংহাসন দৈবাৎ একজন অবলার অধিকারে এসেছিলো ব'লেই হুইগ্-টোরি-র চিরকলহ মুহূর্ত্তমধ্যে মিটে যায়নি ; এবং উভয় পক্ষের প্রভেদ দেখাতে কোল্রিজ্ যদিও ভিক্টোরীয় আমলের প্রাক্কালেই মন্তব্য করেছিলেন যে হুইগ্দের মতে রাজা, কুলীনমণ্ডলী ও জনগণ—এই ত্রিধাবিভক্ত সমাজব্যবস্থার ভারসাম্য রাজশক্তির অতিবৃদ্ধিতে অরক্ষণীয় আর টোরিদের বিশ্বাস অন্ত্যজেরাই ইংরেজী রাষ্ট্রের অপ্রতিষ্ঠ অঙ্গ, তবু ফরাসী বিপ্লবের সন্নিকর্ষে যেমন বর্ক্-এর হিতবুদ্ধি তাঁর সংস্কারচেষ্টাকে দাবিয়েছিলো, তেমনি চার্টিষ্ট্ আন্দোলনের বিভীষিকায় মেকলে-র প্রাগ্রসর মতিগতিও নির্ব্বিকার থাকেনি। তত্রাচ হুইগ্-টোরি-র অদ্বৈত অসাধ্য ; এবং বংশমর্য্যাদায়, তথা উপস্বত্বে, দু দলের নেতারাই তুল্যমূল্য বটে, কিন্তু প্রথমত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত গোষ্ঠীগত সুবিধার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সুযোগের নাম জপা ছাড়া হুইগ্-দের গত্যন্তর ছিলো না। ফলত প্রবর্দ্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনসংগ্রহে তাদের সময় লাগেনি ; এবং দায়ভাগের জন্মভূমি গ্রাম যেহেতু স্বাবলম্বীর প্রতিকূল, তাই হুইগারি-র আসর গোড়া থেকেই জমেছিলো ব্যবসায়ীর শ্রীক্ষেত্র

নগরে। অবশ্য দুর্গেশদের চেয়ে অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা নিশ্চয় গণনায় বেশী; এবং সেইজন্যে মধ্যবিত্ত মানুষকে মহাবিত্ত সঞ্চয়ে মাতিয়ে হুইগ্-এরা হয়তো সংখ্যাধিকেরই স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছিলো। কিন্তু নির্ব্বাচনপ্রথার প্রথম সংস্কারে সাধারণের দুর্দ্দশা একতিলও কমেনি, বরং শ্রমজীবীরা অনেকেই তাদের ভোট হারিয়েছিলো; এবং সমৃদ্ধি ও শক্তির এই হস্তান্তরে কুলপ্রদীপগুলো একে একে তৈলাভাবে নিবলেও, সে-ঘনায়মান অন্ধকারে সর্ব্বহারারা প্রগতির পথে এগোয়নি, মুষ্টিমেয় দুঃসাহসিক আর্ত্ত পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুটে, সর্ব্বত্র রটিয়ে বেড়িয়েছিলো যে জোর যার মুলুক তার—প্রবাদটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সেইজন্যেই ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যভাগে পদচ্যুত বেন্টাম্-এর শূন্য বেদিতে চ'ড়ে ব'সে চার্ল্‌স্ ডারুইন্ দেখিয়েছিলেন যে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল জীবযাত্রার মূল মন্ত্র নয়, প্রাণিবিদ্যার সার মর্ম্ম, যোগ্যের অবশ্যম্ভাবী জয়; এবং উদ্বর্ত্তনের বর্ণছত্রে শ্বেত যেহেতু কৃষ্ণ বা পীতের ঊর্দ্ধবর্ত্তী, তাই ব্রিটিশ শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থানির্দ্ধারণে নেমে ফসেট্ বলেছিলেন যে অনাগত ভবিষ্যতে হীন কর্ম্মের ভার কাফ্রি বা চীনা ভৃত্যের স্কন্ধে চাপিয়ে ইংরেজ শ্রমজীবীরাও স্তরবিভক্ত সমাজব্যবস্থার কাছে যথেষ্ট আহার ও উচিত শিক্ষার দাবি করতে পারবে। অবশ্য ডারুইন্-এর উক্ত সিদ্ধান্ত সর্ব্বৈব মিথ্যা কিম্বা শুধুই পুনর্ব্বাদী, সে-সমস্যার সমাধান হয়তো আজও অসম্ভব। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আর বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই যে মনুষ্যলোকে তাঁর প্রত্যাদেশ খাটালে অভিব্যক্তির উৎস নিশ্চয়ই অকালে শুকাবে। সুতরাং যদি তর্কের খাতিরে মানা যায় যে তদানীন্তন আত্মরতি ডারুইন্-কে ছোঁয়নি, তিনি বস্তুত সত্যানুরক্ত ছিলেন ব'লেই অমানুষিক বিজ্ঞানে তাঁর অতখানি ব্যুৎপত্তি, তবু ডারুইনী সমাজতত্ত্ব ভিক্টোরীয়ানদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার অকাট্য সাক্ষ্য; এবং যে-অহৈতুক ব্যাপ্তির প্রসাদে তখনকার অর্থশাস্ত্র সর্ব্বগ্রাসী ধনকুবেরদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজসেবী ভেবে অব্যাহত প্রতিযোগের গুণ গেয়েছিলো, সেই একদেশদর্শিতার জোরেই সে-কালের পদার্থবিদেরা বুঝেছিলেন যে বিশ্বযন্ত্রের অড়ালে বিশ্ববিধাতা লুকিয়ে নেই। কিন্তু তাঁদের নিষ্প্রমাণ জড়বাদের মূলে নিরাসক্ত প্রজ্ঞার নাম-গন্ধ না থাকায় তাঁরা কেউই জনসাধারণকে সংস্কারমুক্তির উপদেশ দেননি; এবং সমসাময়িক অবৈজ্ঞানিকেরা শুদ্ধ ন্যায়ের অবমাননায় এমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে নিঃস্ব-নির্জ্জিতের একমাত্র

মুখপাত্র ব্রাউনিং-এরও লিখতে আটকায়নি যে জগৎসংসার চূড়ান্তে সৎ ও সুস্থ। টেনিসন্-এর 'ইন্ মেমোরিয়ম্' হয়তো এই অভিব্যাপ্ত শুভবাদের বহির্ভুক্ত। কিন্তু 'মড্'-এর উপসংহার পড়লে আর সংশয় থাকে না যে কিপ্লিং-এর পাশবিক জাত্যভিমান তাঁরই ঔরসজাত; এবং ন্যুম্যানী মনীষার সাংঘাতিক সংঘাতে কিংস্‌লি-র অহমিকা সমূলে ঘুচেছিলো বটে, তথাচ 'এপলোগিয়া-'র শূন্যবাদ যখন রোমক গির্জ্জাতন্ত্রেই লব্ধকাম, তখন সর্ব্বব্যাপী অন্ধতার সংক্রাম শেষ পর্য্যন্ত ন্যুম্যান্-ও কাটিয়ে ওঠেননি। এমনকি মার্ক্‌স্-এর মতো মহাবিদ্রোহীও সে-রোগে আক্রান্ত; এবং ভিক্টোরীয়া-র রাজ্যে দীর্ঘ নির্ব্বাসনের ফলেই তিনি যেমন অবচেতন শ্রেণিস্বার্থের পরিকল্পনায় পৌঁছেছিলেন, তেমনি তাঁর অসহিষ্ণু আত্মনিষ্ঠায়, অমূলক নিরুক্তির নিশ্চিন্ত পরিপোষণে, সত্যাসত্যের সুবিধাসাপেক্ষ আদর্শস্বীকারে ভিক্টোরীয় যুগের দারুণ দুর্লক্ষণগুলোই সুপরিস্ফুট। সমগ্র ইংলণ্ডে একা জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্-কেই সে-অভিশাপ বর্ত্তায়নি; এবং সেজন্যে শুধু পিতা-পুত্রের স্বাভাবিক বৈপরীত্য দায়ী নয়, সে-ক্ষেত্রে এ-কথাও স্মরণীয় যে ব্যতিক্রমই নিয়মমাত্রের প্রাণ।

আমার মতে ট্রেজান্-পরবর্ত্তী রোম সাম্রাজ্যের কথা ছেড়ে দিলে য়ুরোপীয় ইতিহাসের অন্যত্র অনুরূপ অন্ধতার নিদর্শন দুর্লভ। অন্ততপক্ষে অন্ধ তামসের তথাকথিত লীলাভূমি মধ্যযুগও যে এ-দিক থেকে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য নয়, তার প্রমাণ ন্যুম্যান্-এর ধর্ম্মান্তরগ্রহণে; এবং ইংরেজ ভাবুকদের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম বুঝেছিলেন বটে যে প্রচলিত যুক্তিবাদ মূলত হেতুপ্রভব নয়, আসলে পক্ষপাতজাত, কিন্তু কেবল সেইজন্যেই স্বধর্ম্ম তাঁর অসহ্য লাগেনি, পিতৃ-পিতামহের নিত্যপূজাপদ্ধতির মধ্যে নীরস বুদ্ধিজীবী ভিন্ন অপরের চিত্তপ্রসাদ দুর্ঘট ভেবেই তিনি রোমক অমৃতে তাঁর প্রখর সৌন্দর্য্যপিপাসা মিটিয়েছিলেন। এই মনোভাবের সঙ্গে একোয়াইনাস্-এর অন্বীক্ষিকী তুলনীয়; এবং বুদ্ধি ও বোধির সেই নৈয়ায়িক সমন্বয় যদিও ডান্ স্কোটাস্-প্রমুখ দার্শনিকদের প্রতিবাদ জাগিয়েছিলো, তবু টোমিষ্টদের সঙ্গে তাঁদের বাদানুবাদ অবদমিত সুকুমারবৃত্তির উদ্ধারকল্পে নয়; বরং একোয়াইনাস্-এর শিষ্যসম্প্রদায় গণিতবিদ্বেষী ব'লেই রজার বেকন্ তাদের এরিষ্টটেলী অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্লেটোনিক্ প্রজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। অবশ্য গণিতের সুশৃঙ্খলা অপরিক্ষিত কল্পিতসাধ্যের মুখাপেক্ষী;

এবং সেই কারণে অঙ্কের সাহায্যে কৈবল্যপ্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা। কিন্তু এ-কথা রজার বেকন্ জানতেন; এবং তাই আনুমানিক সত্যের প্রতিভূ হিসাবে তিনি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের কোপকটাক্ষে পড়েছিলেন। বেকন্-শিষ্য অক্যাম্-এর ভাগ্য আরো মন্দ; এবং নিদারুণ ক্ষৌরকর্ম্মে সামান্যবিধির নিশ্চয়তা ছেঁটে তিনি যেমন সমসাময়িকদের দুরুক্তি কুড়িয়েছিলেন, তেমনি রিনেসেঁন্স্-এর ভূমাবাদীরা তাঁর প্রতর্কে প্রমাদ গ'ণে অগত্যা আবার অবিদ্যার শরণ নিয়েছিলো। অতএব উজ্জীবিত য়ুরোপই অজ্ঞানান্ধকারের প্রতীক, সে-সম্মান মধ্যযুগের প্রাপ্য নয়; এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য মনীষা বিচার ও বিবেচনার চরমে তো পৌঁছেছিলোই, এমনকি আবেলার-এর জন্ম যেকালে একাদশ শতকের শেষ ভাগে, তখন আর এক শ বছরও নিঃসন্দেহে আলোকপ্রাপ্ত। তবে সে-আলো ঘাটে, বাটে, মাঠে জ্বলেনি, প্রধানত মঠে মঠেই লালিত হয়েছিলো; তার অনভ্যস্ত অভ্যাঘাতে অতর্কিত বুদ্ধির আত্মবেদ ঘোচেনি, সমীক্ষকেরা সবিনয়ে মেনেছিলেন যে মানুষের মন প্রামাণ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ফলত তাঁরা ব্র্যাড্লে-র মতো বুদ্ধির নির্দ্দেশ বুদ্ধিবিসর্জ্জনের প্রয়াস পেতেন না, মূল বিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের অবিরোধসম্পাদনে অনন্ত কাল কাটাতেন।

সে-রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কযুদ্ধ নাগরিক সভ্যতার ঊর্দ্ধশ্বাস প্রতিযোগে সম্ভবপর নয়; এবং তার জন্যে নিরাসক্ত অবকাশ যত না কাম্য, জনতার সংসর্গ ততোধিক পরিত্যাজ্য। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই ইংরেজ ভাবুকেরা ন্যায়দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন; এবং আর এক শ বছরের মধ্যে প্রগতির উন্মাদনা এতই সার্ব্বজনীন হয়ে উঠেছিলো যে ন্যুম্যান্-এর মতো অসাধারণ পুরুষও পশ্চিমের যুক্তিপ্রধান ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে নামতে পারেননি, আবালবৃদ্ধবনিতার অধিকাংশ জীবনে অন্ধ বিশ্বাসের একাধিপত্য দেখেই নিঃসঙ্কোচে ক্যাথলিক কর্ত্তাভজাদের দলে ভিড়েছিলেন। বুঝি বা সেইজন্যেই প্রতিবাদী বিবেকের জ্বালা-যন্ত্রণা তাঁকে আমরণ ভুগিয়েছিলো; এবং তৎসত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে আনুগত্যের পুরস্কার তাঁর কপালে জুটেছিলো বটে, কিন্তু সধর্ম্মীর উন্নিদ্র সন্দেহ থেকে তিনি মুহূর্ত্তমাত্র অব্যাহতি পাননি। ফলত এমন অনুমান বোধহয় সমীচীন যে ন্যুম্যান্-এর স্বাবলম্বন নাতিগভীর এবং

আপাতত প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গেলেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ উৎকেন্দ্রিকদের অন্যতম নন। কারণ নাগরিক সমাজে অনুকল্প অভাবনীয়; এবং গ্রামের গয়ংগচ্ছ যেমন আত্মসমাহিত ধ্যানধারণার পরিপোষক, তেমনি ব্যতিব্যস্ত রাজধানীতে জনরবই সর্ব্বেসর্ব্বা। উপরন্তু শুধু স্থানাভাবেই ইংরেজদের চিরাচরিত খামখেয়াল ভিক্টোরীয়ান্ লোকলজ্জার পোষ মানেনি; সে-কালের মানুষ যেহেতু ব্যবসাগতিকেই শহরে শহরে ভিড় জমিয়েছিলো, তাই ব্রিটিশ ভদ্রাসনের দুর্গপ্রাকারও আর দিগ্বিজয়ী সুনীতির বাদ সাধেনি, প্রকাশ্য অনাচারের সুবিধা মিলবে ভেবে সকলেই নেপথ্য সদাচারের প্রদর্শনী খুলে বসেছিলো। এতাদৃশ অবস্থায় ভাববিলাসের প্রাচুর্ভাব স্বাভাবিক; এবং ভাববিলাস পরের ধনে পোদ্দারির নামান্তর ব'লে, ভাবালু আবহে বিচক্ষণেরা কখনো যুক্তির জালে জড়িয়ে পড়ে না, প্রতিপক্ষের কুৎসা রটিয়ে নিজেদের কাজ গোছায়। এইখানেই কার্লাইলী বীরপূজার সার্থকতা; এবং ইতিহাসের অনুরূপ কুব্যাখ্যা যদিও আদৌ নাতিবিরল নয়, তবু সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির সমগ্র কর্ত্তব্যভার একলার স্কন্ধে চাপিয়ে ঔপনিবেশিক ঘোড়দৌড়ে ইংরেজদের অতুলনীয় ক্ষিপ্রতা নিশ্চয়ই অমানুষিক উৎকর্ষের পরিচায়ক।

অবশ্য উক্ত অহংসর্ব্বস্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতার অনুপম অবদান ভারতের শাসনতন্ত্র; এবং প্রাপ্তবয়স্ক অপোগণ্ডদের জন্যে সিবিলিয়ান্ মা-বাপের পুষ্টিকর উৎকণ্ঠা একা আমরাই খুব কাছ থেকে দেখেছি। কিন্তু পিতৃত্বের প্রকারভেদ থাকলেও তার প্রত্যেকটাই যদৃচ্ছালব্ধ; এবং ভিক্টোরীয়া-র শ্বেতাঙ্গ প্রজারা যদিও রক্ষাকর্ত্তার ভক্ষ্য জোগাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়নি, তবু জন্মদাতার প্রতাপ তাদের ভাগ্যে অতিরিক্ত পরিমাণেই জুটেছিলো। উপরন্তু আমাদের রাজসেবার মতো তাদের পিতৃভক্তিও স্বতঃসিদ্ধ সদ্ভাবের ধার ধারতো না, তখনকার নাবালকেরা অভিভাবকের ইসারায় উঠতো-বসতো অন্নকষ্টের ভয়ে; এবং ইংরেজ ভূস্বামীর ঘরে যেহেতু ত্যাজ্যপুত্র আইনত অসম্ভব, তাই ভিক্টোরীয়ান্ পিতার একাধিপত্য গতানুগতিক নয়, বাণিজ্যজীবী নগরবাসীরাই সে-স্বৈরতন্ত্রের মূলাধার। অর্থাৎ শুধু রাষ্ট্রনীতি নয়, ধর্ম্মনীতিও অতঃপর ধনপতিদের মন জুগিয়ে চলেছিলো; এবং এ-কথা সত্য বটে যে আঠারো শতকের শেষ দশাতেই নেপোলিয়ান্ সমগ্র ইংরেজ জাতিকে পসারী ব'লে বিদ্রূপ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ইংলণ্ডে কেবল টাকা যথেচ্ছাচারের

অধিকার পেতো না, সে-দেশের সমাজপতিরা জন্মাতো বংশমর্য্যাদা আর অর্থবলের উদ্বাহবন্ধনে। ফলত প্রাগ্‌ভিক্টোরীয় যুগের আবহ আভিজাতিক, এতই আভিজাতিক যে যারা টাকা ঢেলেও কৌলিন্য কিনতে পারতো না, তারা বহু ব্যয়ে কুলাচার্য্যদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাখতো যাতে, গোত্রে না হোক, অন্তত পর্য্যায়ে তাদের পৌত্র-প্রপৌত্রেরা যথাসাধ্য এগোয়। তবে ফরাসী সামন্তদের ভেদবুদ্ধি কখনো ইংরেজ সম্ভ্রান্তমণ্ডলীর মতিভ্রম ঘটায়নি; এবং অনুলোম-বিলোমের দ্বারা তারা এক দিকে যেমন জ্ঞাতিগমনের শোচনীয় পরিণাম কাটিয়ে উঠেছিলো, তেমনি অন্য দিকে সেখানকার উত্তরাধিকারে জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্য সন্তানদের স্বত্ব না থাকায় স্বোপার্জ্জনক্ষম উচ্চবংশীয়েরাই তথাকথিত স্বাধীন বৃত্তিসমূহকে নিজেদের বশে এনেছিলো। হয়তো সেইজন্যেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজেরা কুললক্ষণকে কৌলিন্যের চেয়েও আবশ্যিক ভেবেছিলো; এবং তদনুসারে বৈদগ্ধ্য ও সৌজাত্যের বিবাদ তো ঘুচেছিলোই, এমনকি উনিশ শতকী প্রগতির প্রসাদে নির্ব্বাচনক্ষমতা অন্ত্যজদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও, পরিবর্দ্ধিত প্রতিনিধিসভায় অপাত্রের সংখ্যা বাড়েনি, বরং অপজাতদের প্রভাব কমেছিলো।

কারণ ফরাসী প্রবচনের মতে সৌজাত্য স্বার্থবিরোধী; এবং এ-কথা যদিও ঠিক যে প্রবাদমাত্রেই প্রতিপাদ্য, তবু বংশগৌরব যেকালে সাধারণ সম্মতির অপেক্ষা রাখে, তখন কুলতিলকদের পক্ষে প্রিয়চিকীর্ষা আপাতত আত্মচিন্তার অগ্রগণ্য। অর্থাৎ আভিজাতিক শাসনতন্ত্র, অন্তত প্রথম প্রথম, সর্ব্বতোমুখ সমাজব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরশ্রীকাতরতার প্রতিবিধানকল্পে প্রতিভাবানদের প্রশ্রয় দেয়, সম্ভ্রান্ত জীবনযাত্রার সহজাত ঔচ্চাবচ্য প্রতিযোগের অতীত ব'লে মানুষী প্রচেষ্টার মূল্যবিচারে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাবনা ভাবে না; এবং সেইজন্যে সে-রকম পরিমণ্ডলে সুইফ্‌ট্-এর মতো বিদেশী বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রচালকদের কটুকাটব্য শুনিয়েও একাধিক রাজমন্ত্রীর সখা ও সচিব হয়ে ওঠে, পোপ্-এর মতো কৃতঘ্ন কবি আশ্রিতবৎসলার কুৎসা রটিয়েও বিদ্বজ্জনের বাহবা কুড়ায়, জন্সন্-এর মতো নিঃসম্বল স্পষ্টভাষী পালকসম্প্রদায়ের মুখে চূণ-কালি মাখিয়েও সাহিত্যজগতে প্রামাণিকের পদ পায়। আসলে নির্ভীক চিত্তবৃত্তির দৃষ্টান্ত যে-সমাজে এত প্রচুর, তাতে অধিকারভেদ থাকলেও সে-বৈষম্য নিশ্চয়ই মূলীভূত নয়, খুব সম্ভব বাহ্য; এবং লোকত উনবিংশ শতাব্দীর সাম্য আঠারো শতকের চেয়ে বেশী

বটে, কিন্তু শেলি-পরবর্ত্তী অসমঞ্জদের নিয়মিত নির্যাতন দেখে এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য লাগে যে কালক্রমে ব্যক্তিগত অবস্থার তারতম্য যতই ক'মে থাক না কেন, ইংলণ্ডে তবু সৎসাহসের আদর বাড়েনি। ভিক্টোরীয়া-র রাজত্ব আবার হিতবাদের লীলাভূমি; এবং বেন্টামীরা গুণগ্রহণ দুঃসাধ্য জেনে গণনায় তলিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে অপ্রিয় সত্যের আপদ তো একেবারে চুকেছিলোই, এমনকি তত্ত্বত স্বার্থ-যাথার্থ্যের নির্দ্বন্দ্ব ঘটায় সাংবাদিকেরা সুদ্ধ অবিলম্বে বুঝেছিলো যে শক্তিমানের মনোবাঞ্ছাই বাস্তবের অদ্বিতীয় নির্ভর। তৎসত্ত্বেও ডিকেন্স্, রাস্কিন্, মরিস্ প্রভৃতি দু-চারজন আদর্শবিলাসী লেখক অবশ্য সদাশয়দের চিনির পাকে নিম খাওয়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ঐকান্তিক প্রাণধারা খণ্ড খণ্ড পম্বলে আট্‌কে পড়েছিলো; এবং তাই পারিপার্শ্বিক দৈন্যের চাক্ষুষ উপলব্ধি যেমন তাঁদের সাধ্যে কুলায়নি, তেমনি তাঁদের ভাবালু আবেদনও পৌঁছায়নি কর্ত্তৃপক্ষের কানে। উপরন্ত ততদিনে সাহিত্যের বাজারদরও প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিলো, কারোই আর সন্দেহ ছিলো না যে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের হাতে, যারা, মানুষ কোন্ ছার, জড়প্রকৃতিকেও কলে ফেলে কেবলই সোনা নিংড়ায়। অতএব সারস্বতেরাও নিজেদের উপকারিতাপ্রমাণে কোমর বেঁধেছিলেন, লোকরঞ্জনে তাঁদের আর সাধ মেটেনি, বিজ্ঞানীদের অনুকরণে তাঁরাও পরেছিলেন প্রবক্তার ছদ্মবেশ। দুর্ভাগ্যবশত স্বদেশে প্রবক্তার অপমান অনিবারণীয় এবং ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক সর্ব্বত্রই উপহাস্য।

পক্ষান্তরে য়াং-প্রমুখ ভিক্টোরীয়া-ভক্তেরা উক্ত অনধিকারচর্চ্চার ছল ধরেন না। তাঁদের মতে তদানীন্তন মানুষের অমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিযোগবিকল সমাজব্যবস্থার বিষময় ফল নয়; বরঞ্চ তৎকালীন সভ্যতার শুচিবায়ু ছিলো না ব'লেই তখনকার বহুলাঙ্গ চিৎপ্রকর্ষ অন্যোন্যনির্ভর। আসলে বর্ত্তমানের বিশেষজ্ঞেরাই তাঁদের চক্ষুশূল; এবং এই একাগ্র পণ্ডিত মূর্খদের না দাবালে ধ্রুপদী মনুষ্যধর্ম্মের অপমৃত্যু যে অনিবার্য্য, তাতে তাঁরা একেবারেই নিঃসন্দেহ। অবশ্য এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে ভিক্টোরীয়ানদের মনীষা ব্যাপকতর হোক বা না হোক, আমাদের পঠন-পাঠন নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ; এবং এই অভিযোগের উত্তরে যদিচ এইটুকুই বক্তব্য যে সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্যকে এক নিয়মে বাঁধার প্রচেষ্টা শিশুসুলভ হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা, তবু অবচ্ছেদই জ্ঞানার্জ্জনের নান্য পন্থা নয়, অসংযুক্ত

ভাবনা-বেদনা চিত্তবিকারের লক্ষণ। তবে আমার বিবেচনায় আজকালকার সোহংবাদ ভিক্টোরীয় উদ্যোগপর্ব্বেই উৎপন্ন; এবং সে-যুগের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য যেমন সর্ব্বজ্ঞতার দাবি ক'রে শেষ পর্য্যন্ত লোক হাসিয়েছিলো, তেমনি শত্রুদলের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারিভাষিকের দুর্গে ঢুকে, কোনোটাই আর প্রাণে প্রাণে বেরিয়ে আসেনি। এর পরে কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা আমাদের একমাত্র গতি; এবং অনাস্থার ধর্ম্ম এমনি ভয়ানক যে নিজের নাক কেটেও আমরা পরের যাত্রা ভাঙতে প্রস্তুত। তৎসত্ত্বেও আমি আধুনিকদের নিন্দনীয় ভাবি না; কারণ আমার বিচারে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বর্ব্বরতার চিহ্ন নয়, সভ্যতার পরিচয়। অন্ততপক্ষে প্রতর্ক পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের নিকটাত্মীয়; এবং গ্রীকদের সময় থেকেই পশ্চিমের মানুষ কোনো এক প্রকারে কৈবল্যপ্রাপ্তি অসম্ভব বুঝে বৃত্তির সংখ্যা তো বাড়িয়ে গেছেই, এমন কি বৃত্তিবিশেষের মধ্যেও বিকল্পের বাদ সাধেনি। এই বহুরূপী জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক সংজ্ঞা শ্রমবিভাগ; এবং শ্রমবিভাগ ব্যতীত ব্যক্তিগত বুৎপত্তির অপচয় যেহেতু সুনিশ্চিত, তাই বর্দ্ধিষ্ণু সভ্যতায় স্বপ্রাধান্য প্রশ্রয় পায় না, সহজাত ক্ষমতার যথোচিত প্রয়োগ সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনে। অতএব সাম্প্রতিকদের মনে আত্মধিক্কারের ভয়াবহ প্রসার দেখে আত্মজিজ্ঞাসার অবদমন সঙ্গত নয়, তার চালনে প্রাচীনেরা সশ্রদ্ধ দৈবানুগত্যে পৌঁছেছিলেন; এবং স্বকীয়তা আর বিধিলিপির সমীকরণ সাধারণত অধিকারভেদে থামে বটে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান পুরুষকারের নাম জপলেই সে-বিপদ কাটে না, সেজন্যে শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও সংশয়ের এমন সংমিশ্রণ চাই, যাতে ব্যক্তি বনাম সমাজের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনো পক্ষই পুরোপুরি না জেতে। আমি যত দূর জানি, সে-রকম লোকপাল পৃথিবীর কোথাও অদ্যাবধি জন্মায়নি; কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যাপারে সাহিত্যের সাক্ষ্য অবান্তর না ঠেকলে এলিজাবেথী ইংলণ্ডে তাদৃশ প্রতিসাম্যের আভাস মিললেও বা মিলতে পারে। কেননা কড্‌ওয়েল্‌-সদৃশ বামাচারীও এ-প্রসঙ্গে উইণ্ড্যাম্‌ ল্যুইস্‌-এর ন্যায় দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে একমত; এবং আমার মতো মধ্যবর্ত্তীর কাছে রবার্ট্‌ সেসিল্‌-এর উন্নতি আর এসেক্স্‌-এর পতন পূর্ব্বোক্ত স্থিতিস্থাপকতার অকাট্য প্রমাণ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গীণ না হলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই শিকল ছেঁড়ে, ব্যক্তিস্বরূপ ধরা পড়ে না; এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরোহী ব'লে তার

অভ্যুদয়ে যেমন পারিপার্শ্বিকের অধোগতি ঘটে, তেমনি ব্যক্তিস্বরূপের অবরোহ প্রতিবেশীর প্রতিষ্ঠা বাড়ায়। হয়তো বা সেইজন্যেই যন্ত্রযুগের সমাজবিপর্য্যয়ে যাঁরা স্বনামধন্য, তাঁরা অকপট হিতৈষণা সত্ত্বেও অতখানি নিষ্ক্রিয়; এবং শ্রমিকদের দুর্দ্দশাতালিকার পাদটীকায় এঙ্গেল্‌স্‌ যদিও ডিজ্রেলি-র নিরপেক্ষ দৃক্‌শক্তির গুণ গেয়েছেন, তবু 'সিবিল্‌'-প্রণেতার রাষ্ট্রীয় প্রতিভা স্বপরিকল্পিত তুলাসাম্যের নির্ম্মাণকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেনি, প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদকল্পে আজীবন চক্রান্ত চালিয়েছিলো। আসলে অনুরূপ আত্মম্ভরিতা আর তৎসম্পর্কিত আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রায় সকল ভিক্টোরীয়ানের মধ্যেই বর্ত্তমান; এবং এই প্রবৃত্তিদ্বয়ের অভিশাপে সে-কালের মহাপুরুষেরা সুদ্ধ শুধু জ্ঞানপাপী নয়, এমনকি নিতান্ত নেতিবাচক। কারণ পরিবর্জ্জনই ব্যক্তিবাদের মূলমন্ত্র; এবং বিবেকের হিতোপদেশ আর নির্জ্জিতের আর্ত্তনাদ—এই উভয় উৎপাতই যেহেতু সমান বিপজ্জনক, তাই তখনকার ব্যক্তিবাদীরা একসঙ্গে অন্তর-বাহিরের অস্তিত্ব ভুলে এমন এক অমানুষিক লোকে পৌঁছেছিলেন, যেখানে ঐশ্বর্য্যই অগতির গতি। কিন্তু তার পরে ব্যক্তিত্বেরও কোনো মানে থাকে না; যে-চারিত্র্য বা লোকমত তার বৈভাষিক অভিজ্ঞান, সে-দুটোকেই সার্ব্বজনীন বিষয়াসক্তির উদ্বেগে হারিয়ে কৃতার্থমন্যেরা অবশেষে দেখেন যে পরিমেয় ধন-সম্পত্তি ভিন্ন তাঁদের অপর পরিচয় নেই। অর্থাৎ ব্যবসাতন্ত্র একাধারে অহংসর্ব্বস্ব ও রক্ষণশীল; সেখানে লাভের আশায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনুকরণে ব্যস্ত, অথচ কেউ কারো সাহায্য চায় না কিম্বা পায় না; এবং তার ফলে সমাজের অধিকারভেদ ঘুচলেও সমানাধিকার আসে না, বরং স্বাধিকারপ্রমত্তেরা অবৈতনিক বররুচিদের অনাহারে মারে। ভিক্টোরীয়া-র রাজ্যে এ-নিয়ম অন্তত নিপাতনে সিদ্ধ; এবং তদানীন্তন মনোজগতের উচ্ছ্রিতি ও পরিব্যাপ্তির নিদর্শন হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত গ্লাড্‌ষ্টন্‌-আদির কাব্যচর্চ্চা উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু সে-সাক্ষ্যের প্রতিপক্ষে এ-কথাও অবশ্যস্মর্ত্তব্য যে যুবরাজ, তথা সম্রাট, সপ্তম এডোয়ার্ড্‌-এর বন্ধু-বান্ধব শিল্প-সাহিত্যে অথবা দর্শন-বিজ্ঞানে নাম কেনেনি, মহাজনির মুনাফা জুয়ায় ফুঁকেই তাঁর মন জুগিয়েছিলো। সুতরাং এ-রকম অনুমান মোটেই অযৌক্তিক নয় যে ইংলণ্ডের শাসকবর্গ অতঃপর ঠাট বজায় রাখলেও পরিশীলনপরিচালনার ভার ইতিপূর্ব্বেই শ্রেষ্ঠীদের হাতে সঁপেছিলেন

এবং সে-অনভ্যস্ত ভারের চাপে তারা অনুগামীদের নিয়ে উপরে উঠতে পারেনি, উল্টে উর্দ্ধবর্ত্তীদেরই টেনে সমভূমিতে নামিয়েছিল।

কিন্তু অধোগতি আর প্রগতি এক নয়; এবং স্বয়ং হেগেল্-এর নিরুক্তি সত্ত্বেও গুণ ও গণনার প্রভেদ আকাশ-পাতালের চেয়ে বেশী। অতএব য়াং যাই বলুন না কেন, ইংরাজী সভ্যতার পরাকাষ্ঠা ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের অলি-গলিতে অন্বেষ্টব্য নয়, আঠারো শতকের প্রথমার্দ্ধেই দ্রষ্টব্য, যখন ব্যক্তি ছিলো সমাজেরই মুখপাত্র এবং সমাজ করতো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রতিপালন। অবশ্য স্বার্থপরতা সকল মানুষেরই মজ্জাগত; এবং সে-যুগেও এমন লোক বিরল নয় যে দেশ ও দশের সর্ব্বনাশে আত্মোন্নতির প্রয়াস পেতো। তত্রাচ ন্যায়মার্গই বোধহয় তখনো ইংরেজদের টানতো; এবং স্বাধিকারপ্রমত্ত দ্বিতীয় জেম্‌স্-এর সিংহাসনচ্যুতি সপ্তদশ শতাব্দীরই অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু অনাচারী ওয়রেন্ হেষ্টিংস্-এর অপরাধমুক্তি আর এক শ বছর বাদে। আসলে হেষ্টিংস্ হয়তো আগামী যুগের অগ্রদূত ব'লেই বর্ক্, শেরিডেন্, ফক্স্-এর সমবেত চেষ্টাও তাঁকে পাড়তে পারেনি; এবং অনুগামী সাম্রাজ্যশাসকদের অনেকেই যদিও অন্যায়ে তাঁকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তবু সেজন্যে আর কেউই কখনো বিপদে পড়েননি, প্রায় সকলের ভাগ্যেই সম্মান-সমৃদ্ধির আতিশয্য ঘটেছিলো। তবে প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস আজ প্রাচ্য মানুষকেই সাজে; এবং পশ্চিম যেহেতু লোকত কর্ম্মফলে বীতশ্রদ্ধ, তাই ভিক্টোরীয়ানদের স্বায়ত্তশাসিত ভবিতব্য হয়তো পাশ্চাত্ত্য মতে প্রশংসনীয়। তাহলেও এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই যে রাষ্ট্রজীবনে বীরপূজা অদৃষ্টবাদের চেয়ে কম ক্ষতিকর। অন্ততপক্ষে ইটালি ও জার্ম্মানির সাক্ষ্য এ-রকম বিশ্বাসের প্রতিকূল; এবং নৈয়ায়িক শশবৃত্তি ইংরেজদের মজ্জাগত না হলে সে-দেশও এত দিন নীতিনিরপেক্ষ অগ্রনায়কদের পদান্তে লুটাতো। কারণ স্বপ্রাধান্যে ও জাত্যভিমানে উত্তর-ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডই হিট্‌লার-মুসোলীনি-র দীক্ষাগুরু; কেবল যুক্তি-তর্কের অনভ্যাসবশত ইংরেজরা এখনো বোঝেনি যে সেই দুই আদর্শ মূলত অভিন্ন এবং কোনো সয়ম্বৃত জাতিই যেকালে জৈবোৎকর্ষের অনন্য বাহক, তখন জাতীয় মহিমার একমাত্র আধার কোনো স্বয়ম্ভর নেতা। অদৃষ্টবাদের বেলায় এই নির্ব্বাচন নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে সিদ্ধ। অর্থাৎ সেখানে আর কোনো একজনের বা

এক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এমনকি সাময়িক সর্ব্বসম্মতিও সে-ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; ভূতের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে জুড়ে, নিত্যের নিকষে নৈমিত্তিককে যাচিয়ে, তবেই অদৃষ্টবাদী কর্ত্তব্যে হাত দেয়। সুতরাং নিয়তিনিষ্ঠা সভ্যতারই নামান্তর; এবং সভ্যতা যেমন প্রত্যুৎপন্নমতির জনক, তেমনি তার সঙ্গে অবিমৃষ্যকারিতার সম্পর্ক অহী-নকুলের চেয়েও বিসদৃশ। বস্তুত অবস্থানুরূপ কার্য্য বর্ব্বরদেরই মানায়, পরিণামচিন্তা সভ্য মানুষের মজ্জাগত; এবং আরব্ধ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কোথা ভাবলে কর্ত্তার আত্মপ্রত্যয় হয়তো টি'কে না, কিন্তু তখন পরমুখাপেক্ষিতাও আর উপকারে লাগে কিনা সন্দেহ। অতএব সে-সময়ে অধিজৈবিকের ধ্যান অত্যাবশ্যক ঠেকে এবং প্রতর্ক আর প্রমিতির মধ্যে প্রভেদ থাকে না।

আমার বিবেচনায় এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বসমাসই গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এবং সমসাময়িক বিদ্যাভিমানীদের মধ্যে অশ্রদ্ধার বৃদ্ধি দেখে টেনিসন্ যদিও মানবমনে বিনম্র বিস্ময়ের পুনরাবর্ত্তন কামনা করেছিলেন, তবু তাঁর আর্ত্ত প্রার্থনার পিছনে যেহেতু অনিশ্চয়ের উপলব্ধি একেবারেই নেই, তাই য়াং-এর ওকালতি সত্ত্বেও সে-কালের কাব্যসাহিত্যে সফোক্লিস্-এর প্রতিধ্বনি আমি অন্তত শুনতে পাই না। কারণ 'এন্টিগনি'-রচনাকালে সফোক্লিস্-ও মেনেছিলেন বটে যে জ্ঞানগর্ব্বিতেরা অন্ধনীয়মান অন্ধদেরই সগোত্র, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার ফলে অক্ষম লীলাবাদ তাঁর কাছে অপরিহার্য্য ঠেকেনি, তিনি কায়মনোবাক্যে বুঝেছিলেন যে মানুষ ম'রে অদৃষ্টকে ফাঁকি দেয়। মৃত্যু-সম্বন্ধে এই অকুতোভয় ভিক্টোরীয় যুগে নিতান্ত দুর্লভ; এবং সেইজন্যে অষ্টপ্রহর অভিব্যক্তির নাম জপেও সে-যুগ ধ্রুপদী নিরাসক্তির দিকে এগোয়নি, শেষ পর্য্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক বিষয়াসক্তির শরণ নিয়েছিলো। অর্থাৎ তখনকার মরণাতঙ্ক নিরুপম জিজীবিষার উত্তর সাক্ষ্য নয়, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ অথবা সঞ্চয়ের চক্রবৃদ্ধি গতাসুর অসাধ্য ব'লেই ভিক্টোরীয়ানদের মনে মৃত্যুচিন্তা এতখানি জায়গা জুড়েছিলো; এবং মধ্যবিত্ত নীতিশাস্ত্রের উৎস খুঁজতে গিয়ে ফরাসী সমাজ-তাত্ত্বিক ইমানুয়েল্ বের্ল্ সম্প্রতি লিখেছেন যে শ্রেষ্ঠীরা আজও ভোগের জন্যে টাকা জমায় না, নচেৎ গত মহাযুদ্ধে সন্তান-সন্ততি হারিয়ে তাদের অর্থলিপ্সা নিশ্চয়ই সমূলে ঘুচে যেতো, সার্ব্বত্রিক সর্ব্বনাশে ধনৈশ্বর্য্য কারো উপকারে লাগবে না জেনেও তারা আবার প্রাণপণে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত হতো না। অবশ্য এতাদৃশ

অর্থপৈশাচিকতার সঙ্গে মৃত্যু-সম্বন্ধে ডিকেন্স্-আদির ভাববিলাস আপাতত বিযুক্ত। কিন্তু মনোবিকলনের মতে অবচেতনের স্বভাব স্বতোবিরোধী ; এবং এই জাতের মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে জেম্স্-এর পরিচয় না থাকলেও তিনি সুস্পষ্ট বলেছিলেন যে দুর্গন্ধে যতই ন্যাকার আসুক না কেন, তবু সে-দুর্গন্ধ ঘন ঘন না শুঁকেও আমাদের স্বস্তি নেই। সুতরাং এখানেও ভিক্টোরীয়ানদের প্রাগুক্ত স্বেচ্ছান্ধতাই ক্রিয়াশীল ; এবং এজন্যে সে-কালের দোষ ধরতে যাঁদের বিবেকে বাধে, তাঁরা আঠারো শতকের নির্মম ভোগলিপ্সার বিশ্লেষণ করলে হয়তো নিঃসঙ্কোচে আমার দলে আসবেন। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর তথাকথিত ধ্রুপদী ধরণ-ধারণ কখনোই নিষ্কাম ধর্ম্মের ধার ধারতো না ; অশন-ব্যসনের আধিক্যবশতই সে-সময়ে অকাল মৃত্যুর প্রকোপ বেড়েছিলো। কিন্তু সে-দিনকার মানুষ আপনাদের দুর্বুদ্ধি নিজেদের কাছে ঢেকে রাখতো না, তারা জানতো সংযমের বাঁধ মুহুর্মুহু ভাঙলে অবশেষে প্রলয়পয়োধি কূল ছাপাবে ; এবং আত্মবেদের পরিবৃদ্ধিই যেকালে মানবসভ্যতার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন এই অন্তর্দৃষ্টির গুণে আঠারো শতক যেমন সভ্য-পদবাচ্য, তেমনি এরই অভাবে ভিক্টোরীয়া-র আমল অসভ্য।

তবে অসভ্য-বিশেষণটা ভিক্টোরীয়ানদের উপরে চাপালে প্রকৃত বর্ব্বরদের উপযোগী পদবী আর হয়তো অভিধানে মিলবে না ; এবং সেইজন্যে স্পেংলারী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীকে সংস্কৃত আর উনিশ শতককে সভ্য বলাই বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু সংস্কৃতি ও সভ্যতার সেই পারিভাষিক প্রভেদ সর্ব্বান্তঃকরণে মানলে ভিক্টোরীয়ানদের ছিদ্রান্বেষ আর সার্থক ঠেকবে না, ধরা পড়বে যে মনুষ্যসমাজও দেহধর্ম্মী এবং ব্যক্তিবিশেষের আপত্তি সত্ত্বেও যৌবন যেমন জরায় ফুরায়, তেমনি জাতিবিশেষের অনুমোদন ব্যতিরেকেই ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতি ম্রিয়মাণ সভ্যতায় বদলায়। তখন সম্ভবত অধস্তনের অল্প-বিস্তর পদোন্নতি ঘটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অগ্রণীরাও তাদের চিৎপ্রকর্ষ হারায় ; চিরপ্রথার অত্যাচার কমে, অথচ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা পায় না ; বরং গতানুগতিক শাসক-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সেধে দু-একজন প্রবল পুরুষ সকলের হাতে-পায়ে দাসত্বের শিকল পরায়। অতঃপর প্রাণিমাত্রের মতো রাষ্ট্রও ম'রে ভূত হয় ; এবং সে-ভূত এক-আধ শতাব্দী জীবিতদের শাসিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মহাভূতের মধ্যে

বেমালুম মিশিয়ে যায়। তত দিনে তার পিণ্ড দেওয়ারও লোক জোটে না, তার নাম কদাচিৎ কারো মনে পড়লেও, সে-নামের মানে আর জনমানব হৃদয়ঙ্গম করে না ; এবং তার পরেও যারা তার প্রত্নাস্থি নিয়ে নাড়ে-চাড়ে, তারা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, সুস্থ শরীরে প্রলাপ বকে, অকারণে পরকে নাচায় আর নিজের সঙ্গে খেলে। কেননা প্রগতি আসলে উন্মার্গদেরই মারাত্মক মরীচিকা, তার পরিকল্পনা ভিক্টোরীয় আত্মশ্লাঘার অন্যতম উদাহরণ ; এবং এই মণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডে মহাকালের রথ যে-কম্বুরেখায় ঘোরে, তাতে অধোর্দ্ধেরই পার্থক্য আছে, অগ্র-পশ্চাতের বালাই নেই। এই কালাবর্ত্তের এক একটি পাক এক একটি সভ্যতার অলঙ্ঘনীয় অয়ন যার প্রত্যেকটাই যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই কোনো ছুটোর অন্তঃপ্রবেশ যে-পরিমাণ অনাবশ্যক, ততোধিক অঘটনীয় ; এবং চক্রাকারে চললে যখন মধ্যপথে দিগ্‌বৈপরীত্য অবশ্যম্ভাবী, তখন বৃত্তবদ্ধ জাতিসমূহ কেবল প্রারম্ভে স্বগত নয়, অন্তিমে স্ববিরোধীও বটে। অর্থাৎ একবার উন্নতির চূড়ান্তে উঠলে, অবশেষে অবনতির অতলে নামা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না ; এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈষম্যে এই চড়া-পড়াই সুস্পষ্ট, যার অমোঘ পৌর্ব্বাপর্য্য কারো চেষ্টা-নিশ্চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না, সদসদ্‌নির্ব্বিচারে সকল মানবগোষ্ঠীকেই জগদ্দল যাঁতায় পেষে। অবশ্য ইংরেজদের কীর্ত্তিস্তম্ভ বোধহয় আজও অসমাপ্ত ; এবং তাদের ইতিহাস আদ্যন্ত জানা গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীকে নিশ্চয়ই আর এতখানি লোভনীয় লাগবে না। কিন্তু তেমন সুদিন যদি না আসে, যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে পৌঁছানোর আগেই যদি ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী ধূলায় লুটায়, তবে লোকে মহারাণীর রাজত্বকালেই সে-মন্বন্তরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজবে ; এবং দৈবাৎ সে-অভিশপ্ত উত্তরাধিকার কাটাতে পারলেও নিয়তির নাগরদোলা থামবে না, আত্মদর্শীরা শুধু বুঝবে যে চক্রচর জাতিদের গতিবিধি এত জটিল যে বৃহত্তর উত্থান-পতনের মাঝে মাঝেও তারা এক নাগাড়ে লাট খায়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

নিষ্ফলা

মণিকা এবার মা হবে।···

বারান্দার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে' মেয়েটি ডাক্‌ল, "বৌদি', ষ্টোভটা বাপু ধরাতে পার্‌ছিনি কিছুতেই, তুমি এস শীগ্‌গির। বৌদি', অ'···শুন্‌ছ ?"

নীচের কলতলাটা ঠিক দেখা যায় না সেখান থেকে। শানের ওপর দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আস্‌ছে ওধারে, দেখে' অনুমান করা যায় কল চৌবাচ্চায় লাগানো নেই, খোলা।

—কিন্তু কি এত মুখ ধুচ্ছে এতক্ষণ ধরে'। আবার ডাক্‌ল, "বৌদি' অ' বৌদি' শুন্‌ছ ?"

সাড়া এল, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর নয়।

ওঃ। আবার ও···

ঘরের ভেতর তার দাদা বসে' খবরের কাগজ ওল্‌টাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি রে ?"

—"আবার ওয়াক্ পাড়্‌ছে বৌদি মুখ ধুতে গিয়ে।"

আশ্চর্য্য অসুখ ! ক'দিন থেকেই ও' অম্‌নি করে। কিন্তু কাল ত' ওষুধ এনে দেওয়া হয়েছে—ফল হ'ল না ?

"কালকের ওষুধটা আজও একবার খেতে বলিস্।"—বলে' দাদা আবার খবরের কাগজে আঁখিনিবেশ কর্‌ল।

সে জানে, তার বৌদি ওষুধ খায় নি। কিন্তু দাদাকে বল্‌ল না, যে রাগী মানুষ !

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চল্‌ল। আচ্ছা মানুষ যা হোক্ বৌদি ! অসুখ করেছে, অথচ···

দাদা যেমন রাগী, বৌদিও তেম্‌নি জেদী।

মণিকা এবার মা হবে—।

ওর মগ্নমনে অনুমিত হয়, বাইরের মন নিঃসংশয় হয় নি। কি জানি এ

ব্যাধি কি না। এমন মোচড় পেড়ে ওঠে ভেতরটা, যে—ওয়াক্ থু ! মুখ ধুতে ধুতে আর এক ঝলক জল উঠ্‌ল মুখ দিয়ে। কি কষ্টকর !

মুখভাব বিকৃত হ'য়ে ওঠে,—চোখ ফেটে জল বেরোয়।

কিন্তু না'ও হ'তে পারে ব্যাধি।···চকিতেই ওর প্রসন্নতা আবার ফিরে' আসে। শিশির-ভেজা দূর্ব্বাদলের মত চোখের পক্ষ্মগুলো ভেজা, তার ওপর এসে পড়েছে ভোরের আলোর মত খুসী। মগ্নমনের অনুমান এসে ওর চোখের জানালায় উঁকি মার্‌ছে।

কলতলা থেকে উঠে' আস্‌তে আস্‌তে ভাবে : আশ্চর্য্য ! সুখ আস্‌ছে—অথচ কেমন অসুখের ছদ্মবেশে।

ওর বাইরের মন শিউরে' উঠেছে এবার ; শরীরে জাগে শিহরণ।

ওপরে উঠ্‌বার সিঁড়িতে পা দিয়ে মণিকা একবার ঠোঁট উদ্ভিন্ন করে' হাস্‌ল। কিন্তু—তখনি সঙ্কোচে ভারী হ'য়ে আসে ওর হাসি। এ ওর এক্‌লার সুখ—সম্ভাবনার গোপন স্বপন !

বর্ষীয়সীর গম্ভীর মুখে ও' এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল।

বারান্দায় পা দিতেই উপলা বলে, "বৌদি', দাদা বল্‌লেন এখনি সেই ওষুধটা খেতে।" আদেশক সুরে এসে মেশে অনুযোগী সুর : "লক্ষ্মী বৌদি', অসুখ বাড়িয়ো না জিদ্ করে'—!"

মণিকার গাম্ভীর্য্য আর টিঁকে না। লঘুতাকে রাগের ভানে ঝাঁঝিয়ে বলে' ওঠে, "তোর দাদা যেমন গোরু !"

চোখ কপালে তুলে' পিছিয়ে দাঁড়ায় উপলা ; মণিকা গিয়ে ঘরে ঢোকে।

ষ্টোভের শব্দে এতক্ষণ পরে চোখ তুলে' ভূপাল তাকাল। হাই তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌ল, "কাদের গোরু এসে ঢুকেছিল বাড়ীতে ! তাড়িয়ে দিয়েছ ত' ? টবের গাছগুলো—"

হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে হাসিতে ফেটে পড়্‌ল মণিকা। হাসির তোড়ে পথ

পেল না তার কৌতুকের শ্লেষ—যে, গোরু শুধু বাড়ীতে ঢোকে নি, একেবারে ঢুকে' পড়েছে ঘরের ভেতর!

রাগী মানুষ দাদার ভয় ভুলে' উপলাও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চেপে হাসছে।

মণিকা জোর করে' হাসি থামিয়ে উপলার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বল্‌ল, "তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা কর—।"

উপলা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রত্যুৎপন্ন মতি খাটিয়ে বলে, "গোরু কোথায় দাদা, বৌদি' গিয়েছিল কলতলায়—না?"

"ওঃ, তাই নাকি!" বলে' অপ্রস্তুত ভূপাল চায়ের প্রস্তুতির দিকে চেয়ে সঙ্কোচে মাথা চুল্‌কোতে লাগ্‌ল।

ভূপাল নামটার যে অর্থ, তার নামকরণের সময় সে অর্থবাচকতার বিশেষ ব্যত্যয় ঘটে নি। পিতার আমলে তখন তাদের উচ্চবিত্তের পরিচিতি ছিল। এখন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে। পিতার মৃত্যুর পর অনেকের মতই ভূপালও বিস্মিত হ'য়ে দেখেছিল, অবস্থার উঁচু বাঁশটা মাথা উঁচিয়ে থাক্‌লেও ভেতরটা ঋণের ঘুণে ভর্ত্তি। মধ্যজীবনে শেয়ার মার্কেট ও রেস্ এবং জীবনের অপরাহ্ণে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করে' পারিবারিক মান বজায় রাখ্‌বার প্রয়াস—তার ফল এসে বর্ত্তাল পুত্রেরই কপালে।

পার্টিশন-দেওয়া বড় বাড়ীর যে অংশটায় তারা বসবাস করে সেটা এখনও ভূপালের দখলে। ব্যাঙ্ক বল্‌তে যা বোঝায় তা নয়, পোষ্টাফিসের খাতায় চাকরী করে' শ'তিনেক টাকা জমিয়েছে। মা গেল-বছর ছেলেব বৌয়ের ছেলে হ'ল না বলে' দুঃখ করে' পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। সংসারে বৌ, বোন, আর একটি ছোট ভাই—ইস্কুলে পড়ে এবং সুইমিং ক্লাবে পয়সা দিয়ে সাঁতার শেখে।

কিন্তু এসব অবান্তর কথা। শুধু পার্শ্বভূমিকা ফুটিয়ে তুল্‌বার জন্যে।

চা তৈরী করে' ভূপালকে এগিয়ে দেওয়া হ'ল টেবিলে। মেঝেয় উবু হ'য়ে বসে' হাত বাড়িয়ে উপলা একটা কাপ টেনে নিল। মণিকা ওর নিজের চা ঢাল্‌তে গিয়েও না ঢেলে কেট্‌লীটা সরিয়ে রেখে উঠে' দাঁড়াল।

"বাঃ! তুমি নিলে না—?" প্রশ্ন কর্‌ল উপলা।

—"না।"

"কি?" বলে' ভূপাল কাপে আরএক চুমুক দিয়ে মুখ তুলে' চাইল।

স্বামীর চা-পান-তৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে মণিকা হেসে বল্‌ল, "চা খাব না, তাই?"

ভূপাল কোমল সুরে বলে, "অসুখটা বাড়ে বুঝি? খেয়ো না; কিন্তু ওষুধটা খেতে ভুল ক'রো না।"

এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে উপলা বলে' ফেলে, "ওষুধ বৌদি খায় না।"

এসব অন্যায়ে ভূপাল রেগে ওঠে: "খাওনি—মানে?"

মণিকা সশ্লেষ প্রতিবাদে বলে, "খাব তোমার ঐ পচা ওষুধ—পল্‌সিটিলা থার্টি? সবতাতেই তোমার ঐ এক ওষুধ!"

উপলার দাদা রাগী মানুষ, কিন্তু মণিকার জিদ্‌কে সে ভয় করে। সুর নামিয়ে বল্‌ল,—"তুমি যেমন বল' তাতে ঐ—"

মণিকার চোখে স্নিগ্ধ প্রীতির আভা ফুটে' ওঠে। দুর্ব্বোধ্য মৃদুহাসিতে বলে, "পরে তোমাকে বল্‌ব।"

উপলা বৌদি'র কথার হেঁয়ালি বুঝ্‌তে পারে না।

গামছায় মোড়া সুইমিং কষ্টিউম্ হাতে গুপী অর্থাৎ গোপাল এসে দুপ্‌দাপ করে' দরজায় দাঁড়ায়।

ওঃ, দাদার মর্ণিংটি এখনো শেষ হয়নি? গুপীর এক চোখে চায়ের তৃষ্ণা চক্‌চক্ করে' ওঠে, অন্য চোখে অপ্রসন্নতা—বাজারের থোলে নিয়ে এতক্ষণও দাদা বা'র হ'য়ে যান নি যে সেই ফাঁকে আজ সুইমিং ক্লাবের মজার ব্যাপারটা অতিরঞ্জনে অভিনয় করে' দেখাবে।

গুপী দাদার হাতের চা'র কাপে চোখের তিরস্কার হেনে কষ্টিউম্‌টা মেলে' দিতে যাচ্ছে বাইরের রেলিংয়ে, বৌদি' ডেকে বল্‌ল, "চা খাবি নাকি রে, গুপে'?"

কি কেয়ারলেস্ বৌদি'টা!—ছেলেমানুষের চা খাওয়া নিয়ে সেদিন যে সার্‌মনটাই আওড়ালেন দাদা…

সার্‌প্রাইজ্‌। দাদা বল্‌ছেন কি, "হ্যাঁ, গুপীকেই দিয়ে ফেল' চা-টা। দেড়টাকা পাউণ্ডের চা···"

গুপী চা খেতে ঘরে ঢুক্‌ল; দাদা বেরিয়ে এল বাজারের থোলের জন্যে।

উপলা স্মরণ করিয়ে দেয়, "মরা সিঙ্গিমাছ এনো না, দাদা।"

মণিকা হেঁকে বলে, "এক পয়সার কাঁচা তেঁতুল—।"

ভূপাল তার অফিসে। বই-ভর্ত্তি স্যাশেল পিঠে ঝুলিয়ে গুপী গিয়েছে 'বয়েজ ওন্‌ হোমে'। উপলাকে আজ জোর করে'ই মণিকা সেলাইয়ের ক্লাসে যেতে দেয় নি।

দুপুরের রোদ বাইরে তানপূরার তারের মত কাঁপ্‌ছে। উপলাকে টেনে এঘরে এনে মণিকা দোর বন্ধ করে' দিল।

—"ঘুমুবে নাকি বৌদি', দোর বন্ধ কর্‌লে?"

"না, আয় গল্প করি," বলে' মণিকা গিয়ে খাটের বাজুতে হাত দিয়ে বিছানায় বস্‌ল।

উপলা প্রলোভনের সুরে বলে, "শুধ্‌ গপ্প···তার চেয়ে খেলিনা কতক্ষণ কিছু একটা?"

"সে দেখা যাবে তখন; এখন—শোন্‌।"—এক হেঁচ্‌কা টানে উপলাকে এনে বসিয়ে দিল মণিকা খাটের কিনারে।

"উঃ! কি শক্ত হাত তোমার বৌদি'!"···কিন্তু ওর কৌতূহল হয়েছে; বলে, "কিসের কথা বৌদি'?"

মণিকা অন্যমনস্ক ভাবে বলে, "কথা-টথা না, অম্‌নি গল্প।"

কিন্তু গল্প কোথায়—হঠাৎ সে চুপ করে' যায়।

বৌদি'র বুঝি কষ্ট হ'চ্ছে।···অসুখ যে তার আর ভুল নেই। কিন্তু—

"আচ্ছা বৌদি', অসুখে কষ্ট পাচ্ছ, অথচ ওষুধ খাওনা কেন বল' ত'?"

মণিকা লুকিয়ে একটা চাপা-শ্বাস ফেল্‌ল। বন্ধ্যা বলে' যার বদ্‌নাম পড়ে'

গিয়েছে, তার এ অসুখ, না সুখের আতিশয্য।···সে যেন বুকের মধ্যে কি অনুভব করতে চায়।

আচম্‌কা অদ্ভুত প্রশ্ন করে' বসে সে, "আচ্ছা উপী, গুপী ক'বছরের ছোট রে তোর থেকে?"

উপলা কিছু না ভেবেই বলে, "ও, অ—অনেক ছোট।"

"গুপী যখন হ'ল, মনে আছে তোর সব কথা—?"—মণিকার সুরে সন্ধানী ঔৎসুক্য।

—"তা'—তা' সব মনে নেই।···কিন্তু মা তখন মরতে মরতে উঠে-ছিলেন বেঁচে।"

মণিকার মনে আশঙ্কার ছায়াপাত হয়, কিন্তু জোর করে' মুখ অমলিন রাখে।

উপলা বিস্ময়ে সুরে বলে, "একথা এমন করে' জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন বৌদি'?"

মণিকা অসংলগ্ন ভাবে বলে' ওঠে, "কিন্তু মরেন নি ত' মা তাই বলে'।"

উপলা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' বৌদি'র মুখের দিকে চায়। মণিকার মুখে আনন্দের আভা ফুটে' উঠ্‌ছে। সাম্‌লিয়ে সহজ সুরে বলে, "অম্‌নি বল্‌ছি। তোরা পিঠোপিঠি ভাই-বোন, অথচ একটুও ঝগ্‌ড়াঝাটি নেই।"

উপলার কানে শব্দ আস্‌ছে, মণিকার কানেও। টিন বাজ্‌বার শব্দ।—কে বাজায়? মণিকা বলে, "টিন বাজাচ্ছে ওবাড়ীর কোন দুষ্টু ছেলে।"

উপলা মুহূর্ত্ত কান পেতে থেকেই লাফিয়ে ওঠে।—"না বৌদি', পার্টিশনের টিনের বেড়ার শব্দ। ওবাড়ীর মাধুরীদিরা নিশ্চয়···।"

হড়াস্‌ করে' খিল খুলে' বেরিয়ে যেতে যেতে আপন মনে বলে, "কি মজা! স্নেক লুডো, না ত' ওদের পট্‌লীর আছে ক্যারাম বোর্ড···।"

মণিকার রাগ হয়। খেল্‌তে হয় ত' খেলুক্‌ বসে' ওঘরে···আড্ডা! তখনি উঠে' দরজা বন্ধ করে' দেয়।

তারপর এসে শুয়ে পড়ে।

একসঙ্গে অনেকের পায়ের শব্দ। দুয়ারের কপাটে চট্‌পট্‌ করে' বাজে করাঘাত। মণিকা যেন জানেই না আর কেউ এসেছে। উপলাকে ধমকের সুরে বলে, "দুষ্টু মেয়ে ইস্কুল এড়িয়ে দাপাদাপি করে' বেড়াচ্ছে। জ্বালাতন! আমি মরি অসুখে এদিকে···।"

কে যেন বাইরে থেকে ডেকে বলে, "কি অসুখ হ'ল মণিদি'! শোনই না একবার।"

একেবারে দল বেঁধে এসেছে!···বিরক্তির সঙ্গে উঠে' এসে জানালার মুখে দাঁড়ায়। মুখ বিকৃত করে' একহাত পেটে রেখে ককিয়ে ককিয়ে বলে, "এই পেটের অসুখ···।"

হাত জোড় করে' বলে, "তোমরা খেলোগে' ভাই ওঘরে গিয়ে। উপী, দাঁড় করিয়ে রেখেছিস্‌ মানুষগুলোকে? ওঘরে নিয়ে গিয়ে বসা—যা।"

উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করে' ফিরে' আসে ওর বিছানায়।

ওঘরে ওরা কোলাহল করে' খেল্‌ছে। এঘরের নিঃশব্দতায় তাল দিয়ে মণিকার বুকের শব্দ বাজে।

সুখ ও অসুখের মাঝামাঝি একটা সম্মোহনকারী অবস্থা। ও ঘুমোয় নি, এক অপূর্ব্ব মাদকতায় ওর চোখের পাতা দুটি নেমে এসেছে। বোজা ঠোঁটের জোড়কে ওর আচ্ছন্ন মন এসে যেন রহস্যের হাসিতে উদ্ভিন্ন কর্‌তে চায়। দ্রুত শ্বাস থমকে থমকে ভারী হ'য়ে পড়ে।

এম্‌নি কিছুক্ষণ এবং অনেকক্ষণ। ওর মন ও মর্ম্মের মাঝামাঝি একটা সূক্ষ্ম মননের চুলের সেতুতে কে যেন অলক্ষ্যে আনাগোনা করে। তার হাওয়া এসে গায়ে লাগে কিন্তু তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না।···আশ্চর্য্য!

হঠাৎ মণিকা চম্‌কে ওঠে।—কে ওকে ডাক্‌ল না? কি বলে' ডাক্‌ল!

ডাক্‌লই ত'। ঐ যে—

প্রাণকে কানে পেতে ও' সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শুনতে পায়: মা···

হ্যাঁ, তাই ত'!···না ত'—কি?

মণিকা উবু হ'য়ে খাটের কিনারে মুখ নামিয়ে দেখে অবাক্‌ হ'য়ে—মেনী বিড়ালের বাচ্চাটা!

বিড়ালকে ও' দুচোখে দেখ্‌তে পারে না কিন্তু কে যেন ওর চোখে আজ রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। ও' হাত বাড়িয়ে বিড়ালছানাটিকে আল্‌গোছে তুলে' নিল কোলের ওপর।

টেনে' তুল্‌ল বুকের উঁচুতে।...চুমোয় ভারী হ'য়ে ওর মুখ নেমে আসে বিড়ালছানার মুখের ওপর।

'মিউ, মিউ'—মণিকা শোনে 'মা, মা'।

ওঘরের খেলার হৈ-রৈ থেমে গেছে। পার্টিশনের টিনের বেড়া বেজে উঠে' মিলিয়ে যায়। উপলার শিষের সুর ক্রমোচ্চ হ'য়ে এগিয়ে আসে ওদিক থেকে বারান্দার এদিকে।

মণিকার অলস হাতের পাশ কাটিয়ে বিড়ালছানা কখন নেমে লুকিয়েছে খাটের তলার কানাচে, মণিকা জানে না। তার আলস্যের পর্দ্দায় এসে আঘাত কর্‌ল উপলার শিষের খোঁচা।

'হিস্‌ হিস্‌—হিস্‌!'—একেবারে দোর-গোড়াতেই। মেয়েটা শিষ দিতে শিখেছে ঠিক ফিচ্‌কে পাখীর মতই! মণিকা কিন্তু পছন্দ করে না মেয়েছেলের ওসব ফাজলামি! ওস্তাদ মেয়ে!

না,—

শিষ দিতে দিতেই মেয়েটা আবার ফিরে' গেল, ডাক্‌ল না বা কপাটে ঘা দিল না।

মণিকা বিছানায় উঠে' বসে' আড়মোড়া ভাঙে।

ওঃ, বেলা সাড়ে তিনটের কম নয়। নীচ থেকে খালি-চৌবাচ্চায় বিকেলের কলের প্রথম জল-ঝরার শব্দ কানে আসে।

ও এবার উঠে' বাইরে আসে।

—"উপী, উপী—উপ্‌লী রে !"

দালানের আড়ালে উপলার শিষ থেমে যায়, কিন্তু জবাব আসে না।

স্বভাব ওর অভিমানী—ইচ্ছে করে'ই জবাব দিল না। কিন্তু মণিকারও রাগ অভিমান আছে…কত গল্প-সল্প করবে বলে'ই না ওকে আজ সেলাইয়ের ক্লাসে যেতে দিল না, লক্ষ্মীছাড়ী বস্‌ল ওদের সাথে তাস পিটুতে।… একবার ডেকেছে, আর না—সেধে যদি কথা বলে ত' বলুক্, সে যাচ্ছে না সাধ্‌তে।

মণিকা ঘরে ফিরে' এল। টুকিটাকি, এটা-সেটা করে' ঘর গোছাতে সুরু কর্‌ল। ঝি আবার আজ কামাই করেছে—ঘরে বাইরে অনেক কিছুই কাজ আছে জমে'। ভাঁড়ারে যেতে হবে একবার, হেঁসেলেও।··তাই বলে' উপীকে সে ডাক্‌ছে না সাহায্য করতে।

অম্‌নিতর কাজ কর্‌ছে সব মণিকা। উপলা এসে আশে পাশে ঘুরিঘারি কর্‌ছে। মণিকা কিন্তু দেখেও দেখ্‌ছে না।

ভারি মুস্কিল! বৌদি' ডেকে কথা বল্‌বে কি, তার দিকে তাকাচ্ছে না পর্য্যন্ত। উপলার অভিমানে আঘাত লাগে। কিন্তু একটা মজার কথা যে বৌদি'কে এখনি না বল্‌লে চল্‌ছেই না—তার পেট ফেঁপে উঠেছে এতক্ষণ না বল্‌তে পেরে।

আরও দু'চারবার ঘুরিঘারি কর্‌ল। বৌদি'র হাতের কাছে এটা সেটা যুগিয়ে দিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা কর্‌ল। কিন্তু না—একেবারেই না···বৌদি' যেন একেবারে পাথর হ'য়ে গেছে।

একবার ইতস্ততঃ কর্‌ল। খুক্ করে' একবার কাস্‌ল। তারপর—যেন কানে কানে কথা বল্‌ছে, এম্‌নি সুরে বল্‌ল, "বৌদি'—।"

মণিকা মনে মনে হাস্‌ছে। কিন্তু আর না,—সত্যি মনে কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা! হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "কি ?"

যে কথাটা বল্‌তে চায় প্রথম-কথাতেই বলা যায় না তা'। বল্‌ল,—"বৌদি', আমার চুল বেঁধে দাও না লক্ষ্মীটি এসে।"

বৌদি' ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।—"বল্ ত' এখন, কে কথা বল্‌ল সেধে আগে ?"

উপলা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, "যাও,—চুল বেঁধে দিতে হবে না আমার, যাচ্ছি।…তুমি দোর বন্ধ করে' রইলে, এলে না, কত কি সব বল্‌লে ওরা যে !"

—"তা' বলুক্, কি এসে যায় কার! দুপুরেচণ্ডীর দল সারা দুপুর খালি টো-টো কোম্পানী করে' বেড়ায়। আমার অসুখ…"

উপলা এবার ইতস্ততঃ না করে'ই বলে, "তোমার অসুখের কথায় ওরা কি বল্‌লে জানো ?"

মণিকা ওর সমস্ত মন চোখে এনে বলে, "কি বল্‌লে—?"

মাধুরীদি' বল্‌লেন, "অসুখ না হাতী! তোর বৌদি'র ই-ইয়ে হবে…।"

"কি হবে ?"—বল্‌তে বল্‌তে মণিকা ওর হাতের কব্জী সজোরে চেপে ধরেছে।

"ইঃ! ছাড়ো, লাগে।"—হাতের কব্জী আল্‌গা করতে করতে বলে, "আর বিন্নুমাসী কি ফোড়ন দিলেন জানো, বল্‌লেন, 'ছেলে না ঘোড়ার ডিম! ছেলে হওয়ার ভঙ্গী'।"

উপলার হাতের কব্জী থেকে মণিকার মুঠি শিথিল হ'য়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সরে' আসে।

উপলা বৌদি'র কাঁধে হাত রেখে আগ্রহের সুরে বলে, "বৌদি', সত্যি কি ছেলে হবে তোমার—?"

বৌদি' ওকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলে, "বলি নি যে আমার অসুখ···ইয়ার্কি দিতে এসেছে আমার সঙ্গে !"

কার্ত্তিকের বেলা। বিকেলের সঙ্গে সঙ্গেই দিনটা যেন মিইয়ে পড়ে। স্তিমিত রোদ এত দ্রুত ছায়া ফেলে' সরে' যায় যে বেলা থাক্‌তেই মনে হয় আর বেলা নেই।

দেয়াল-ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজে ঠং করে'। মণিকা ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে' গামছা আর মেটে সোরাইটি নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। উপলার সাড়া নেই। ওদিকের জানালায় উঁকি মেরে দেখ্‌ল, উপলা অনভ্যস্ত হাতে নিজের চুল

নিজে বাঁধ্‌তে বসে' বেণীর বিনুনি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। অক্ষমতার অস্থিরতায় হাত কাঁপ্‌ছে ; আহত আত্মাভিমানে চোখ ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছে।

মণিকার মায়া হয়। খামখা মেয়েটাকে তখন···

মণিকারই দোষ।···কিন্তু ওরা কেন কথায় কথায় তাকে অমন করে' আঘাত করে? এতদিন হয় নি বলে' যে কোনদিনই হবে না তার সন্তান, এমন কি বিধান আছে। বয়স তার মা-হওয়ার কাল পেরিয়ে আসে নি,—স্বাস্থ্য তার ওদের চেয়ে ঢের ভালো। ওরা তাকে এমনি করে' গায়ে পড়ে' অপমান করে। আর—উপী যায় ওদেরই সঙ্গে গায়ে পড়ে' ভাব কর্‌তে।···নির্বুদ্ধিতাই ওর দোষ।

দালানের রকে সোরাইটাকে নামিয়ে রেখে গামছাখানা গোল করে' রাখল সেটার মুখের ওপর। মৃদু পায়ে প্রসাধনরতার পেছনে এসে বসে' পড়্‌তে পড়্‌তে বল্‌ল, "মাথাটা আর একটু হেলিয়ে বস্‌ এদিকে, এগিয়ে দে তেলের বাটিটা।··· আহা, কি চুল বাঁধ্‌বার ছিরি রে!"

উপলা যেন অতর্কিতে ইলেক্‌ট্রিকের তার ছুঁয়েছে!···তড়াক্‌ করে' উঠে' দাঁড়িয়ে তর্জ্জনী তুলে' বল্‌ল, "বারণ কর্‌ছি, আমাকে কেউ বিরক্ত করতে না আসে!"

···উপলার দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়্‌ছে।

অন্যদিন হ'লে ওর অভিমান দূর কর্‌বার চেষ্টায় বিব্রত হ'য়ে পড়্‌ত মণিকা। আজ অতি নিস্পৃহভাবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বারান্দায়। সোরাইটাকে রক থেকে উঠিয়ে নিয়ে নীরবে চল্‌ল নীচে নাম্‌বার সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে একবার দাঁড়ায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।—একটু হাসেও!

তাচ্ছিল্যের তীক্ষ্ণতায় হাসিটুকু চক্‌ চক্‌ করে' মিলিয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিতে ক্রূরতার আভাস।···আস্‌বে, আস্‌বে—এমন একদিন আস্‌বেই যেদিন ওদের হিংসুটে মুখের ওপর দিয়ে এম্‌নি করে' নাচিয়ে নিয়ে যাবে সে তার সোনার চাঁদ খোকনকে। এম্‌নি করে···

যেন তার কোলের খোকনকেই বুকের' পরে উঁচিয়ে তুল্‌ছে এম্‌নি ভঙ্গীতে সোরাইটাকে উঁচু করে' তুল্‌ল দেহের ঊর্দ্ধস্তরে।

মণিকার মুখের ভাব কোমল করুণ হ'য়ে এসেছে, চোখের কোণ স্নেহার্দ্র।

সোরাইটাকে কাঁখে নামিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। খোকনকে কোলে করে' নাম্‌ছে খোকনের মা!

অফিস-ফের্‌তা ভূপাল আস্‌ছে জুতো মচ্‌মচ্‌ কর্‌তে কর্‌তে। মণিকার তন্ময়তা ওকে শুন্‌তে দেয়নি সে শব্দ—একেবারে ভূপালের গায়ের ওপর এসে পড়্‌বার মত হ'ল। সিঁড়ির গোড়ায় তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে ধাক্কা লাগ্‌ত যে ভুল নেই।

"একেবারে চোখ বুজে' নাম্‌ছ যে—আঃ!"—ভূপাল সতর্কিত স্বরে বলে।

"ওঃ, তুমি—! যে মুখ-আঁধারে বাপু এই নীচের দালানটা!···"—মণিকা ঝল্‌মলে চোখে ভূপালের মুখের দিকে চায়। ওর চোখে মুখে খুসী ঝরে' পড়্‌ছে।

এই খুসীর উত্তম ভাগ এখনি সে তার স্বামীকে দিতে চায়। "দেখ—" বলে' একবার চকিতে আশপাশে চেয়ে নেয়—কেউ নেই। স্বরটাকে মৃদুতর করে' বলে, "শোন, ভারী একটা সুখবর আছে···কি দেবে আমাকে আগে বল, মিঠাই মণ্ডা সন্দেশ?"

ভূপালের মুখ মুহূর্ত্তেই উত্তেজনার আতিশয্যে টক্‌টকে হ'য়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই সেই রেঞ্জার্সের টিকিট···

মণিকার মণিবন্ধ সজোরে চেপে ধরে' বলে, "কখন্‌ এল সেই চিঠি··· লটারীতে কোন্‌ ঘোড়ার নাম···"

"কিসের চিঠি—তোমার লটারীর ঘোড়ার ডিম!"—রাগের সঙ্গে বলে' মণিকা হেঁচ্‌কা টানে ওর হাত এড়িয়ে নিল।

"আচ্ছা, উপীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই জানা যাবে", বিড়্‌বিড়্‌ করে' বল্‌তে বল্‌তে ভূপাল টক্‌টক্‌ করে' ওপরে উঠে' গেল।

ইঃ! কি কন্‌কন্‌ কর্‌ছে এখানটা জুড়ে'!···কোনপ্রকারে সোরাইটাকে

চৌবাচ্চার শানের ওপর বসিয়ে রেখেই মণিকা তলপেট চেপে ধরে' কুঁচ্‌কে দাঁড়াল।

এঃ! বুকের ভেতর কেমন করে' মোচড় পাকিয়ে উঠ্‌ছে—ওয়াক্ থু, ওয়াক্।

সহসাই মণিকার মাথার' পরে আকাশ ভেঙে পড়ে!···ভগবান! ভগবান! এ কি হ'ল!···ও এবার অতর্কিতে আবিষ্কার করে' ফেলেছে যে এ ওর সত্যই অসুখ—অসুখ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ওর রহস্যময় আবিষ্কার—নারীর চোখের সন্ধানী দৃষ্টির সাম্‌নেই এ রহস্য শুধু উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে পড়ে। পরম গোপনীয় কিন্তু চরম বেদনাকর।

একটা অসহ উন্মাদনা—সঙ্গে সঙ্গে এক অস্বাভাবিক আক্ষেপ। দু'হাত ছড়িয়ে সে আর্তস্বরে চীৎকার করে' ওঠে—"অসুখ—ওগো, আমার এ অসুখ!"

তার হাতের ধাক্কা লেগে সোরাইটা চৌবাচ্চার ওপর থেকে নীচের শানে ছিট্‌কে পড়ে' চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। ভেঙে গেল তার খোকনের স্বপন।

···সূর্য্যাস্তের রক্তপ্রতিবিম্ব পড়ে' সারা কলতলাটাকে আরক্ত করে' তুলেছে।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সাংখ্যের সাংপরায়

৩

গত দুই মাসের 'পরিচয়ে' আমরা জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে সাংখ্যমতের আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুর পর সাধারণ জীবের সংসৃতি হয়, অর্থাৎ জীব স্থূল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া লিঙ্গদেহ অবলম্বনে পুনশ্চ বিবিধ ও বিচিত্র স্থূল শরীর গ্রহণ করতঃ কখনও দেব কখনও মানুষ কখনও পশু কখনও স্থাবররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই তাহার 'সাংপরায়' (eschatology)। কিন্তু যাঁহারা অ-সাধারণ জীব, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী (কুশল), যাঁহারা অতি-মানব—তাঁহাদের সংসৃতির শেষ হয়—ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে। ঐরূপ অ-সাধারণ জীবের যে 'প্রসংখ্যান' উৎপন্ন হয় (যাহাকে সাংখ্য পরিভাষায় 'বিবেকখ্যাতি' বলে)—ঐ জ্ঞান নিঃশেষ জ্ঞান—বিশুদ্ধ জ্ঞান—কেবল জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে যিনি জ্ঞানবান্ তিনি কেবলী, তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁহার সম্বন্ধে—বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য। ঐরূপ সাধনসিদ্ধ পুরুষ—তন্নিবৃত্তৌ শান্তো-পরাগঃ স্বস্থঃ।

জীবন্মুক্ত হইবার পর তিনি প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত যে শরীরে অবস্থান করেন,—সেই তাঁহার অন্তিম দেহ। ঐ শরীরের নাশ হইলে তাঁহার লিঙ্গদেহ প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেরও বিলয় ঘটে। অর্থাৎ তাঁহার 'personality becomes extinguished'। ইহাই সাংখ্যের বিদেহ-কৈবল্য বা মুক্তি।

তস্মিন্ (চিত্তে) নিবৃত্তে, পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে—ব্যাসভাষ্য

এ মুক্তি ব্যতীত সাংখ্যাচার্য্যেরা জীবের আর এক প্রকার মুক্তির কথা বলিয়াছেন—সে মুক্তি 'প্রকৃতিলয়'।

প্রকৃতিলয় কিন্তু প্রকৃত মোক্ষ নহে—উহা মোক্ষাভাস। সেইজন্য ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদম্ ইব অনুভবন্তি—

'ঐ অবস্থায় কৈবল্যপদ (মোক্ষ) যেন অনুভূত হয়।'

তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদম্ ইব অনুভবন্তঃ প্রাপ্নুবন্তঃ—বাচস্পতি

প্রকৃতিলয়ের স্বরূপ কি? প্রকৃতিলয় কিসে সিদ্ধ হয়? কারিকা বলেন বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ।

বিবেকজ্ঞানাভাবে যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রকৃত্যুপাসনয়া ভবতি, তদা প্রকৃতৌ লয়ো ভবতি—বিজ্ঞানভিক্ষু

ঐ কারিকার উপর বাচস্পতিমিশ্রের টীকা এই :—

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞস্য বৈরাগ্যমাত্রাৎ প্রকৃতিলয়ঃ। প্রকৃতি-গ্রহণেন প্রকৃতি-তৎ-কার্য্য-মহদহঙ্কারভূতেন্দ্রিয়াণি গৃহ্যন্তে। তেষ্বাত্মবুদ্ধ্যা উপাস্যমানেষু লয়ঃ।

সাংখ্যমতে রাগ হইতেই সংসার ও বি-রাগ হইতে যোগসমাধি। সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ (৫৪ কারিকা)।

যে সকল জীবের চিত্তে উৎকট বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়—অথচ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, তাঁহাদের কি দশা হয়? তাঁহাদের কৈবল্য মুক্তি হয় না—'প্রকৃতিলয়' ঘটে।* এই কথাই বাচস্পতি মিশ্র উপরে বলিলেন—পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞস্য বৈরাগ্যমাত্রাৎ প্রকৃতিলয়ঃ। ভোজবৃত্তিতে এই কথা আরও বিস্পষ্ট করা হইয়াছে—

---

* এ সম্পর্কে মিসেস্ বেসান্ট কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

There is a lower kind of Moksha that is quite possible to get. A great many people in this country get it by a deliberate killing out of all desire for objects of enjoyment. They remain away for indefinite periods of time.

Desire is dead for the present life, which means that all the higher life of the emotions and the mind is for the time killed; of course not altogether, it is for the time. —Talks with a Class. Ch. IV pp 60-7.

He has extinguished for the time being the particular *trshna* which would bring him back to this world.

There are many cases of this sort in which a man passes into a loka (a world) which is not permanent, but in which he may remain practically for ages. * * Ultimately he has to come back to a world, either this world if it is still going on, or a world similar to this, where he can take up his evolution at the point at which it was dropped. —Bye-ways of Evolution pp. 94-95.

অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি, তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপাগতে 'প্রকৃতিলয়াঃ' ইত্যুচ্যন্তে।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানে প্রকৃতির অর্থ 'অব্যক্ত' মাত্র নয়—এস্থলে প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের (অর্থাৎ অব্যক্ত, মহদ্, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, ও একাদশ ইন্দ্রিয়গণের) অন্যতম। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই যে লয়, ইহা আত্যন্তিক লয় নহে—ইহার অবধি বা কালসংখ্যা আছে। বিবেকখ্যাতি-জনিত যে কৈবল্য মুক্তি—সে মুক্তি যেমন নিরবধি—

পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে

—এ মুক্তি সেরূপ নয়। নির্দিষ্ট কালান্তে প্রকৃতিলীনের আবার প্রাদুর্ভাব হইতে বাধ্য—

অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবতি—বাচস্পতি।

পুনশ্চ—যিনি যে তত্ত্বে লীন হন, তদনুসারে তাঁহার ঐ অবধির তারতম্য হয়। এ প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বায়ু পুরাণ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়-চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাশ্চ শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধাঃ দশসহস্রানি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত-চিন্তকাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রিয়ে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ মন্বন্তর; যাঁহারা স্থূলভূত অথবা তন্মাত্রে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি শত মন্বন্তর; যাঁহারা অহংতত্ত্বে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি সহস্র মন্বন্তর; যাঁহারা মহৎ-তত্ত্বে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ সহস্র মন্বন্তর; আর যাঁহারা অব্যক্তে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি পূর্ণ শত সহস্র মন্বন্তর।

শত সহস্র মন্বন্তর সুদীর্ঘ সময় বটে—কিন্তু অনন্ত কালের তুলনায় তুচ্ছ নয় কি?

আমরা দেখিয়াছি যে যিনি কেবলী, 'প্রত্যুদিত-খ্যাতি'—দেহান্তে চিত্তের সহিত তাঁহার লিঙ্গ-শরীরের নাশ হয়। সুতরাং তাঁহার আর সংসৃতি হয় না—তিনি চিরদিন (eternally) শুদ্ধ স্বচ্ছ কেবল অবস্থায় অবস্থান করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের ত' লিঙ্গ-দেহের নাশ হয় না—তাঁহাদের চিত্ত

সাধিকার, তাঁহাদের চিত্তে বন্ধ-বীজ বিদ্যমান থাকে ‡—অতএব তাঁহাদের সংসৃতি বা জন্মান্তর সুদূরবর্তী হইলেও অবশ্যম্ভাবী। প্রাপ্তাবধয়ঃ পুনরপি সংসারে বিশন্তি (বাচস্পতি)। সেই জন্য পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন, ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্—১।১৯।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পতঞ্জলি প্রকৃতিলীনদিগের মধ্যে সূক্ষ্মভেদের নির্দেশ করিলেন—প্রথম 'বিদেহ', দ্বিতীয় 'প্রকৃতিলয়'। প্রকৃতি-লীনের মধ্যে যাঁহারা অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতির* অন্যতমে লয়প্রাপ্ত, তাঁহারা 'প্রকৃতিলয়' ; এবং যাঁহারা পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকারের অন্যতমে লয়প্রাপ্ত, তাঁহারা 'বিদেহ'।

প্রকৃতিলয়াঃ অব্যক্তমহদহংকারতন্মাত্রেষু অন্যতমস্মিন্ লীনাঃ ** ভূতেন্দ্রিয়ানাম্ অন্যতমম্ আত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ তদুপাসনয়া তদ্বাসনাবাসিতান্তঃকরণাঃ পিণ্ডপাতানন্তরম্ ইন্দ্রিয়েষু ভূতেষু বা লীনাঃ ষট্‌কৌশিক-শরীররহিতা বিদেহাঃ—বাচস্পতি।

অতএব আমরা দেখিলাম কি বিদেহ, কি প্রকৃতিলয়—কাহারই চিত্ত বন্ধ-মুক্ত নহে। সেইজন্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, বিদেহের বৈকৃতিক বন্ধ এবং প্রকৃতিলয়ের প্রাকৃতিক বন্ধ—

তত্র প্রকৃতৌ আত্মজ্ঞানাদ্ যে প্রকৃতিম্ উপাসতে তেষাং প্রাকৃতো বন্ধঃ ** বৈকারিকো বন্ধস্তেষাং যে বিকারান্ এব ভূতেন্দ্রিয়াহংকারবুদ্ধীঃ পুরুষবুদ্ধ্যা উপাসতে।

—৪৪ কারিকায় বাচস্পতি

এই দ্বিবিধ বন্ধ ছাড়া আর এক প্রকার বন্ধ আছে—তাহার নাম দাক্ষিণিক বন্ধ। এই বন্ধ সকামকর্মী কামহত সাধারণ জীবের—

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞোহি ইষ্টাপূর্তকারী কামোপহতমনা বধ্যতে—বাচস্পতি

কিন্তু যিনি কেবলী, প্রত্যুদিত-খ্যাতি—

তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ

—তিনি ঐ ত্রিবিধ বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া সদাকাল কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

তথাপি বিদেহ অপেক্ষা প্রকৃতিলয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতি-লয়ের অবধি বা স্থিতিকাল দীর্ঘতর—

‡ ক্লেশা বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং বীজভাবং প্রাপ্ত স্তু তে শক্তিমাত্রেণ সন্তি, ক্ষীরে ইব দধি—বাচস্পতি

* অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ—তত্ত্বসমাস

পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।

বাচস্পতি বলিলেন, ষট্-কৌশিক শরীররহিতাঃ বিদেহাঃ—অর্থাৎ 'বিদেহ তাঁহারা, যাঁহারা স্থূলশরীর-বিরহিত'—কিন্তু ব্যাসভাষ্যে দেখিতে পাই 'বিদেহাঃ দেবাঃ'। ইহার সমাধান কি? আমরা জানি, দেবতা মাত্রেই স্থূলশরীর-বিবর্জিত—দেবতাদিগের সূক্ষ্ম তৈজস শরীর। ইহা হইতে মনে হয়—'বিদেহে'র অর্থ সাধারণ দেবতা নহে। এ সম্পর্কে ৩।২৬ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, সূক্ষ্মতর মহঃ জনঃ তপঃ প্রভৃতি লোকে এমন সকল দেবনিকায় বসতি করেন, যাঁহারা যথাক্রমে মহাভূতবশী, ভূতেন্দ্রিয়বশী, ভূতেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রবশী, এবং প্রধানবশী। যাঁহারা মহাভূতবশী তাঁহাদের স্থিতিকাল এক সহস্রকল্প, যাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার দ্বিগুণ, যাঁহারা ভূতেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রবশী তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার চতুর্গুণ এবং যাহারা প্রধান-বশী তাঁহাদের স্থিতিকাল এক মহাকল্প। এই শেষোক্ত দেবনিকায় সম্পর্কে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—

তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ—অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎ সর্গায়ুষঃ।

ভাষ্যকার বলিলেন, ঐ সত্যলোকবাসী দেব-নিকায় চতুর্বিধ—অচ্যুত, শুদ্ধ-নিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহারা সকলেই সবীজ সমাধিনিষ্ঠ।

তে এতে সর্ব্বে সংপ্রজ্ঞাত-সমাধিম্ উপাসতে—বাচস্পতি

তন্মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতর্ক-ধ্যানপর, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচার-ধ্যানপর, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র-ধ্যানপর এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্র-ধ্যানপর। এই সবীজ ধ্যানের অপর নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ—যোগসূত্র, ১।১৭

এ-সকল সমাধিই 'সালম্ব', নিরালম্ব নহে।

সর্ব্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।

ঐ বিতর্কের আলম্বন স্থূল, বিচারের সূক্ষ্ম, আনন্দের হ্লাদ এবং অস্মিতার একাত্মিকা সম্বিৎ।

বিতর্কশ্চিত্তস্যালম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ। আনন্দো হ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদ্ অস্মিতা।

ঐ প্রথম সমাধি সবিতর্ক, দ্বিতীয় বিতর্কবিকল সবিচার, তৃতীয় বিচারবিকল সানন্দ এবং চতুর্থ আনন্দবিকল অস্মিতামাত্র।

এই সবীজ সমাধির নামান্তর 'সমাপত্তি'।

সমাপত্তিঃ সংপ্রজ্ঞাতলক্ষণো যোগ উচ্যতে (বাচস্পতি)

সমাপত্তি কি? চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া অভিজাত মণির (clear crystal-এর) ন্যায় যখন চিত্তের বস্তুর-যথাযথ-প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্যতা উপজাত হয়, উহাই সমাপত্তি।

ক্ষীণবৃত্তেঃ অভিজাতস্যেব মণেঃ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ
—যোগসূত্র, ১।৪১

এই সমাপত্তি স্থূল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য-ভেদে চতুর্বিধ। স্থূলের সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক এবং বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অর্থমাত্র-নির্ভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সূক্ষ্মের সমাপত্তিকে সংকীর্ণ ও বিশুদ্ধ ভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলা হয়। (১।৪২-৪ যোগসূত্র দ্রষ্টব্য)। ইহাদিগেরই সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি।

বিষয়ভেদে ঐ সমাপত্তি ত্রিবিধ—গ্রহণবিষয়, গ্রাহ্যবিষয় ও গ্রহীতৃবিষয়। গ্রহণ = একাদশ ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় যে সমাপত্তির বিষয়, সে সমাপত্তি গ্রহণ-বিষয়; গ্রাহ্য = ক্ষিত্যাদি স্থূল ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রাদি সূক্ষ্মভূত—উহারা যে সমাপত্তির বিষয়, সে সমাপত্তি গ্রাহ্যবিষয়। গ্রহীতা = অহংকার, বুদ্ধি, অস্মিতা—উহারা যে সমাপত্তির বিষয় সে সমাপত্তি গ্রহীতৃবিষয়। অর্থাৎ এ সমাপত্তি পূর্ব্বোক্ত সাস্মিত ধ্যান।

বলা বাহুল্য, সমাপত্তি যখন সংপ্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি—তখন পুরুষ বা আত্মতত্ত্ব উহার বিষয় হইতে পারেন না,—কারণ, চিত্ত সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি লাভ হয় না—বিশেষতঃ 'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ'—দ্রষ্টা বা বিষয়ী (Subject) কিরূপে দৃশ্য বা বিষয় (Object) হইবেন?

সবীজের উপর নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ঐ অবস্থার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তি অস্তমিত হইয়া সংস্কারশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ঐ বিরাম 'অর্থশূন্য' ও নিরালম্ব।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ—১।১৮

যাঁহারা কেবলী, তাঁহাদের সমাধিই নির্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত।

আমরা দেখিলাম, সত্যলোকবাসী যে চতুর্বিধ দেবনিকায়—তাঁহারা সকলেই সবীজ-ধ্যানপর; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চভূমিকায় আরূঢ় নহেন। ইহারাই কি আমাদের আলোচ্য 'বিদেহ' ও 'প্রকৃতিলয়'-প্রাপ্ত? বৃত্তিকার ভোজদেব বলেন যে, যাঁহারা সানন্দ-সমাধিতে নিমগ্ন অথচ প্রধান-পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করেন নাই, তাহারাই 'বিদেহ'-পদবাচ্য।

চিতিশক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্ত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি। অস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয়স্তত্ত্বান্তরং প্রধানপুরুষরূপং ন পশ্যন্তি, তে বিগত-দেহাহংকারত্বাৎ 'বিদেহ' শব্দবাচ্যাঃ।

আর যাঁহারা অস্মিতা মাত্র সমাধিতেই তুষ্ট, যাঁহারা পরম পুরুষকে দর্শন করেন নাই—তাঁহাদের চিত্ত স্বকারণে লীন হইলে তাঁহাদের নাম হয় 'প্রকৃতি-লয়'।

অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি, তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপগতে 'প্রকৃতিলয়া' ইত্যুচ্যন্তে।—ভোজবৃত্তি।

এমনকি ভোজদেব বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের সমাধিকে প্রকৃত 'যোগ' বলিতেই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন উহা 'যোগাভাস'—যেহেতু তাঁহাদের সমাধি 'ভব-প্রত্যয়'।

তেষাং সমাধির্ভবপ্রত্যয়ঃ—ভবঃ সংসারঃ স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স ভবপ্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—আবির্ভূত এব সংসারে তে তথাবিধ-সমাধিভাজো ভবন্তি। তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাদ্ যোগাভাসোঽয়ম্।

বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু ৩।২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকায় ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের যে সমাধি, সে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি।

অথ অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধিনিষ্ঠাঃ বিদেহ-প্রকৃতিলয়াঃ

এ মত সমীচীন বোধ হয় না—কেন না, যিনি অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার কি আবার সংসারে অবতরণ সম্ভবপর ? অথচ বাচস্পতি নিজেই বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের পুনঃ সংসারের কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা 'বিদেহ', তাঁহাদের চিত্তে 'সাধিকার-সংস্কারে'র অবশেষ থাকে—সেইজন্য—

প্রাপ্তাবধয়ঃ পুনরপি সংসারে বিশন্তি।

এবং যাঁহারা 'প্রকৃতি-লয়' তাঁহারা—

প্রকৃতিসাম্যম্ উপগতমপি অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবন্তি—১৷১৯ সূত্রের টীকা।

পুনশ্চ—১৷৫১ যোগসূত্রের টীকায় বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা 'বিদেহ' বা 'প্রকৃতিলয়', তাঁহাদের চিত্ত ক্লেশবাসিত থাকে—

বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাং ন নিরোধ-ভাগিতয়া সাধিকারং চিত্তং, অপিতু ক্লেশ-বাসিততয়া।

যাঁহার চিত্ত ক্লেশবাসিত, তাঁহার পক্ষে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সুদূর-পরাহত নহে কি ?

এ কথা ঠিক বটে যে, ব্যাসভাষ্য বিদেহ-প্রকৃতিলয়দিগের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মলোকবর্ত্তী দেবনিকায় ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্ত্তী কিন্তু বিদেহ-প্রকৃতিলয়েরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সপ্তলোকের বহির্ভূত—

তেষ্বপি (দেবনিকায়াঃ) ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি**** বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে ন্যস্তাঃ

(আমরা দেখিয়াছি, বিদেহ-প্রকৃতিলয়ের যে মোক্ষ—তাহা প্রকৃত মোক্ষ নহে—মোক্ষাভাস মাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা।)

প্রশ্ন উঠিবে, ব্যাসভাষ্য বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগকে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্থাপন করিলেন কেন ? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি ? একখানি থিয়সফিক্যাল গ্রন্থ হইতে (সি, ভি, লেড্‌বিটর-কৃত Man—Whence and Whither) এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোক পাইয়াছি—ঐ আলোক প্রয়োগ করিয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

জীবের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, বিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধগতিতে কল্পের মধ্যে এমন কাল উপস্থিত হয়—'when a portion of humanity

has to drop out for the time from our scheme of evolution.' ঐ সকল বিবর্ত্তনরিক্ত জীব যে বিনষ্ট হয় তাহা নয়—

'Those who thus fall out of the current of progress for the time, will take up the work again in the next chain of globes, exactly where they had to leave it in this.'

এ কল্পের মত তাহাদের উন্নতি স্থগিত হয় বটে কিন্তু আগামী কল্পে ঐ উন্নতির সূত্র তাহারা যথাকালে পরিগ্রহ করিয়া আবার ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে তাহারা কোথায় অবস্থান করে ? লেখক বলিতেছেন—

'They are shipped off to the Inter-chain sphere, where they live a strange, slow, inward-turned, subjective life, for perhaps a million years, passing into, what the writer calls, 'Inter-chain Nirvana.'

অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে কোন আন্তর্গণিক লোকে নির্বাণিক অবস্থায় এক অদ্ভুত আজব বিলম্বিত অন্তর্মুখ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া অযুত অযুত বৎসর অতিবাহিত করে। সেই জন্যই কি ব্যাসভাষ্য ঐ সংপ্রজ্ঞাত-সমাধিপর বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের সম্পর্কে বলিলেন—বিদেহ-প্রকৃতিলয়াশ্চ মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে ন্যস্তাঃ ?

এ অবস্থা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপরিচিত 'অবীচিনির্বাণে'র অনুরূপ। খৃষ্টানেরা যাহাকে 'Day of Judgment' বলেন, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। ঐ শেষ বিচারের দিন মেষদিগকে ছাগদিগ হইতে বিবিক্ত করা হয়—the sheep are separated from the goats'.

অর্থাৎ those who are capable are separated from those who are incapable of further progress on that particular chain and *these* pass into æonian life and *those* into æonian death.

ইহা হইতে অনেক আধুনিক খৃষ্টান ধারণা করিয়াছেন যে, শেষের সেই বিচারের দিনে যাঁহারা মেষস্থানীয় তাঁহাদের জন্য অনন্ত স্বর্গ—এবং যাহারা ছাগ-স্থানীয় তাহাদের জন্য অনন্ত নরক (eternal damnation) নির্দ্দিষ্ট হয়। এ ধারণা কিন্তু ভিত্তিহীন, কারণ, মূল বাইবেলে (প্রচলিত ইংরাজি বাইবেল অনুবাদ মাত্র—তাহাও কয়েকবার সংশোধন সত্ত্বেও নির্ভুল নহে) 'eternal

damnation'-এর কোনই প্রসঙ্গ নাই—æonian suspension বা কল্পান্তিক স্তম্ভনের কথা আছে। প্রকৃতিলীনের ন্যায় ঐ ছাগস্থানীয় জীবগণ 'after remaining for a prolonged period in a condition of comparatively suspended animation'—কল্পান্তে আবার 'অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবন্তি'—will again take up the work of evolution in the next chain, exactly where they had left it। প্রকৃতিলীনের ন্যায় ঐ পুনরাবির্ভাব কি 'মগ্নস্য পুনরুৎথানম্' নহে ?

সে যাহা হ'ক আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়—এই 'প্রকৃতিলয়' কখনই জীবের পুরুষার্থ (Summum Bonum) নয়, হইতে পারে না। প্রকৃতিলীন হওয়া যেন জলমগ্ন হওয়া—ইহাতে লাভ কি? মগ্নের পুনরুৎথান যেমন অবশ্যংভাবী, প্রকৃতিলীনের পুনর্জন্ম সেইরূপ অবশ্যংভাবী।

> ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবৎ উৎথানাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩৫

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

> যথা জলে মগ্নঃ পুরুষঃ পুনরুৎতিষ্ঠতি, এবমেব প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ পুনরাবির্ভবন্তি ? কেন ? সংস্কারাদেঃ অক্ষয়েন পুনঃ রাগাভিব্যক্তেঃ বিবেকখ্যাতিং বিনা দোষদাহানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। *

---

* ভিক্ষু ঐ ভাষ্যের একস্থানে বলিয়াছেন—প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বরভাবেন পুনরাবির্ভবন্তি—এবং "সহি সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বকর্ত্তা—এই ৩।৫৬ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন—প্রকৃতিলীনস্য জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধিঃ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ সর্ব্বসম্মতৈব। একথা কিন্তু ঠিক মনে হয় না। প্রথমতঃ ঐ শ্রুতি জন্য-ঈশ্বর সম্পর্কে নয়, নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে। দ্বিতীয়তঃ যখন তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকৃতিলীনের এখনও দোষদাহ নিষ্পন্ন না হওয়ায় পুনরায় রাগাভিব্যক্তি হয়, তখন প্রকৃতিলীন জন্য-ঈশ্বর হইবেন কিরূপে? শ্রীশঙ্করাচার্য্য জন্য-ঈশ্বর সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১।৪।১) নিম্নোক্ত বচন "যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ" উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্ব্বঃ প্রথমঃ সন্ অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসু-সমুদয়াৎ সর্ব্বস্মাৎ আদৌ ঔষং অদহৎ। কিম্? আসঙ্গাজ্ঞানলক্ষণান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্ব-প্রতিবন্ধককারণভূতান্। অর্থাৎ যেহেতু সেই প্রজাপতি প্রজাপতিত্ব-লাভেচ্ছু অন্যান্য সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত আসক্তি অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে।' এ কথাই যে শাস্ত্রসম্মত এবিষয়ে সন্দেহ নাই। জন্য-ঈশ্বর সাধনার পারগত সিদ্ধজীব। তাঁহাতে দোষ স্পর্শ থাকিবে কিরূপে? পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাস্তোরুহাস্পদম্। কশ্চিদ্ এব চিন্ময়াসো ব্রহ্মতাম্ অধিতিষ্ঠতি॥—যোগবাসিষ্ঠ, মুমুক্ষু, ৪।১৪।

পুনশ্চ—

> প্রকৃত্যা পুনরুৎথাপ্যতে স্বলীনঃ। কেন? বিবেকখ্যাতিরূপ-পুরুষার্থবশেন—৩।৫৫ সূত্রে ভিক্ষু। (ইহাই প্রকৃতির Unconscious Teleology)

পতঞ্জলিরও ঐ কথা—

> ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্—যোগসূত্র ১।১৯

> বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের ভবপ্রত্যয় (পুনঃসংসার-বন্ধন) অবশ্যংভাবী—যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সংভাব্যতে ** যাবৎ ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তম্ (ব্যাসভাষ্য)।

সাংখ্যের সাংপরায়ের আলোচনা এখানে সাঙ্গ করিলাম। আশা করি এই আলোচনার ফলে সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোথাও কোথাও নূতন আলোকসম্পাত পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সোমলতা

(১০)

দিন পনেরো পরে ছোট বাবাজির আখড়া থেকে গৌরহরি ফিরে এসেই হৈ হৈ লাগালে, পনেরো দিনের মধ্যে তার ঘর তৈরী শেষ ক'রে ফেলতেই হবে।

শিবদাস হেসে বললে, বিলক্ষণ! তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

গৌরহরি ছোট বাবাজির আখড়ার কথাটা আর ভাঙলে না। বললে, কত জায়গা ঘুরে এলাম।

—তা তো এলে। দেখছি ঘোড়ায় চ'ড়েই ফিরে এলে। এতদিন তো ঘরের খোঁজ-খবরই ছিল না। আর এখন এলে তো এলে একেবারে পনেরো দিনের মধ্যেই ঘর চাই।

তা ছাড়া উপায় কি? ছোট বাবাজির শরীর ভালো নয়। তিনি কখন আছেন, কখন নেই। এই বেলা তিনি তমাললতাকে গৌরহরির হাতে সমর্পণ ক'রে যেতে চান। একটুখানি মুস্কিল হয়েছিল, ভগ্নস্বাস্থ্য ছোট বাবাজিকে একলা ফেলে তমাললতা কোথাও যেতে রাজি নয়। কিন্তু সে মুস্কিলও গৌরহরি কাটিয়ে এসেছে। তার ঘর হয়ে গেলেই সে ছোট বাবাজিকে শুদ্ধ এখানে নিয়ে আসবে। গৌরহরির সাধ্য-সাধনায় তিনি জীবনের শেষ ক'টা দিন তার আখড়াতে কাটাতে রাজি হয়েছেন। এ দেশে গঙ্গা নেই কাছে। তা হোক। 'মন চাঙ্গা তো কটোরামে গঙ্গা'।

এত কাণ্ড এই ক'দিনের মধ্যে সেরে গৌরহরি ফিরেছে। কিন্তু বার বার ঘা খেয়ে সে চালাক হয়ে গেছে। এ সবের একটা কথাও সে শিবদাসের কাছে ভাঙলে না।

শুধু বললে, আর কাঁহাতক দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব ভাই, ভালো লাগে না। ঘরটা হয়ে গেলে একটু সুস্থির হয়ে বসতে পাই।

—আর তোমার সুস্থির হওয়া!

শিবদাস অবিশ্বাসের সঙ্গে হাসলে।

গৌরহরিও হাসলে। বললে, এইবার দেখো।

শিবদাস বললে, তাই দেখব। ঘর তো তোমার হয়েই আছে। তুমি থাকলে এতদিন ছাওয়ানো হয়ে যেত। তা বেশ। কালকেই লোক লাগিয়ে দোব। দু'তিন দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

গৌরহরি সবিস্ময়ে বললে, বল কি?

—আবার কি! বৃহৎ ব্যাপার তো আর নয়, ছোট একখানা ঘর। ও ছাওয়াতে আর ক'দিন লাগে!

গৌরহরি বললে, আখড়াটা হয়ে গেলে, আবার একটা মচ্ছব দিতে হবে।

দেশে এবার ফসলটা ভালোই হয়েছে। শিবদাস খুব গম্ভীর ভাবে বললে, তাতেও আটকাবে না।

গৌরহরি বললে, তার জন্যে আবার একবার ভিক্ষেয় বেরুতে তো হবে!

—কি জন্যে? আমাদের এই সোনার গাঁয়ে অভাবটা কিসের শুনি। ইচ্ছে করলে কালই হাজার লোককে খাইয়ে দিতে পারি।

—বল কি হে!

—তা নয় তো কি। তবে হ্যাঁ, গেল বছর হ'লে ভাবনা হ'ত বটে। তা এবারে সবারই ঘরে মা-লক্ষ্মী যা এসেছেন, তাতে এ গাঁয়ের লোক ভয় কিছুতে পায় না।

গৌরহরি খুশী হয়ে গেল। তাহ'লে মহোৎসবের দুর্ভাবনাও নেই। কেবল একবার গ্রামে গ্রামে গিয়ে গোঁসাই-বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসা। গৌরহরি সঙ্গে সঙ্গে স্থির ক'রে ফেললে, ললিতা আর রসময়কে কয়েকদিন আগেই আনতে হবে। নইলে মহোৎসবের যোগাড় করবে কে? কিন্তু ললিতাকে দিয়ে কি বিশেষ কিছু হবে? হেসে, গান গেয়ে আর পাড়া বেড়িয়েই তো তার সময় কাটবে। আসল কথা তমাললতাকে না আনলে কিছুই হবে না। অমন কাজের ব্যবস্থা তো আর আর কারও নেই।

ছোট বাবাজি এলে তমাললতা আসবে ঠিক। তবে বেশীদিন আগে তো আর আসতে পারবে না। বড় জোর দু'দিন কি একদিন আগে আসবে।

সে যাক গে, তার জন্যে তো আসছে যাচ্ছে না। আসলে তমাললতার নাগালই পাওয়া যাচ্ছে না যে। ছোট বাবাজি একরকম তার সামনেই তো

মালা-বদলের কথাটা পাড়লেন। ঘরের মধ্যে না থাকলেও বাইরেই সে ছিল। কথাটা কি আর শোনেনি? কিন্তু তবু যেন কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলল।

গৌরহরি আপন মনেই হাসলে। মাঝের আর এই ক'টা তো দিন। তারপরে কত এড়িয়ে চলে দেখা যাবে। বিয়ের আগে মেয়েরা ও রকম লজ্জা করেই। এখন এড়িয়ে চলছে, এর পরে একেবারে মাথায় চড়বে।

এই ব'লে সে নিজকে সান্ত্বনা দিলে বটে, তবু যেন মনের মধ্যে একটুখানি 'কিন্তু' রয়ে গেল। সেইটুকু ভোলবার জন্যে সে শিবদাসকে নিয়ে তখনই ঘর দেখতে বেরিয়ে গেল।

তাদের সেই পুরোনো ভিতের উপর অবিকল সেই ধরণের আখড়া। এখন যেন অনেকটা সেই পুরোনো স্মৃতির আমেজ আসছে। সামনে সেই পরিমার্জ্জিত উঠানে আগাছার জঙ্গল হয়েছে বটে, তবু এখন যেন সেই পুরোনো আখড়ার কথা ভাবতে পারা যাচ্ছে। বহু কাল পরে তার পরলোকগতা জননীর কথা স্মরণ ক'রে তার চোখ জলে ভ'রে উঠল।

শিবদাস সত্যসত্যই করিৎকর্ম্মা লোক। দু'দিনের মধ্যে গৌরহরির আখড়া ছাওয়ান, তার দরজা জানালা লাগান হয়ে গেল। এমন কি ছাঁচি বেড়ার একটা রান্নাঘরও তৈরী হয়ে গেল। উঠানের জঙ্গল সাফ ক'রে, ঘর দোর নিকিয়ে দেখতে দেখতে তারা এমন ফিটফাট ক'রে দিলে যে, পরের দিন থেকেই গৌরহরি সেখানে বাস করতে লাগল।

কিন্তু এখনও অনেক কিছু করার আছে। উঠানের কেলীকদম্ব গাছটির নীচে বেদীটি আবার বাঁধাতে হবে। ওপাশের নিমগাছটিতে আবার জড়িয়ে দিতে হবে মাধবীলতা। কিন্তু তার এখনও দেরী আছে। আপাতত বাঁধুলী গাছগুলির নীচে যে জঙ্গল হয়েছে, সেগুলো সাফ করতেই হবে। ওইখানটাতেই যত সাপের বাসা। তার পুরোনো আখড়ার মাটি সরাবার সময় নাকি অনেকগুলো সাপের ডিম পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ীতে লোক বাস না করলে তাই হয়। সাপদেরও তো এক জায়গায় থাকতে হবে।

শিমুলগাছের ঝড়ে-পড়া গুঁড়িটার কাছে এসে গৌরহরি একটু থামল। আপন মনেই বললে, বেঁচে থাকলে এটা এতদিন লাল লাল ফুলে বাড়ী মাৎ

ক'রে রাখত। ঝড়ে প'ড়ে গেছে, তা আর কি করা যায়। শেষ পর্য্যন্ত একটা মহোৎসবে জ্বালানিতেই লাগবে। তা কাঠও বড় কম হবে না।

গৌরহরি পা দিয়ে ঠেলে কাঠটার ওজন অনুমান করবার চেষ্টা করলে।

এমন সময় মনে হ'ল দূরে সুমুখের রাস্তা দিয়ে কে যেন তার দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্তপদে চলেছে। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি হেসে ফেললে। গৌরহরি অপ্রস্তুত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলে। অপরিচিত মেয়ে,—নিশ্চয়ই তাকে দেখে হাসেনি। তার চোখের ভুল। কিন্তু কৌতূহল তাকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে দিলে না। আবার চাইলে। দেখলে মেয়েটি এবার আর চলছে না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। আর মেনী তার হাত ধ'রে বাড়ীর দিকে টানছে।

মেনীকে গৌরহরি তক্ষুনি চিনতে পারলে। তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে সে তাদের দিকে এগিয়ে এল।

বললে, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে বিনোদিনী! আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি, অমন রঙ কে যেন ঝলসে দিয়ে গেছে!

বিনোদিনী শুধু বললে, হ্যাঁ, খুব ভুগলাম। তোমার ঘর সারা হয়ে গেল।

—প্রায়।

বিনোদিনী ঘরের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক সেই আগের আখড়ার মতোই হয়েছে, না?

কিন্তু গৌরহরির সে কথা কানেই গেল না। সে বিনোদিনীর পোড়াকাঠের মতো দেহের দিকে আতঙ্কিত বিস্ময়ে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখছিল। বললে, তোমার অসুখ কি খুব বেশী হয়েছিল বিনোদিনী?

বিনোদিনী অকস্মাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, সে খবরে তোমার দরকার কি বলত? একদিন তো এসে খবরও নিয়ে যেতে পারনি।

ওকি! বিনোদিনী কি কেঁদে ফেললে নাকি!

গৌরহরি তাড়াতাড়ি বললে, না, না। খবর আমি প্রায়ই পেতাম। কি জান,...

—জানি। যাক।

বিনোদিনী তাকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ না দিয়েই মেনীর হাত

ধ'রে টলতে টলতে চ'লে গেল। লজ্জায়, দুঃখে এবং অনুশোচনায় গৌরহরির বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল। তার ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে বিনোদিনীকে ডাকে। কিন্তু সাহস ক'রে ডাকতে পারল না।

হতশ্রী বিনোদিনীকে দেখে সে কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ল। এই বিনোদিনী ? পোড়াকাঠের মতো শীর্ণ দেহ, কোটরলগ্ন বুভুক্ষিত দৃষ্টি, স্খলিত-পত্র মাধবীলতার মতো রিক্ততার প্রতিমূর্ত্তি। কোথায় গেল সেই অপরূপ দেহশ্রী, যা ছিল তার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের সাধনা, তার ছন্নছাড়া জীবনের একমাত্র আকর্ষণ ? এরই মধ্যে কোথায় গেল সে সব ? এ যেন স্বপ্নের চেয়েও আশ্চর্য্য।

গৌরহরির মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিনোদিনীর জন্যে তার দুঃখ হ'ল। মনে হ'ল পাষাণীই বটে, বিনোদিনী অহল্যা পাষাণী হয়ে গেছে। সে বিনোদিনী আর নেই। গৌরহরি শিমুলগাছের গুঁড়ির উপর ব'সে কিশোরী বিনোদিনীকে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই সে ছবি আর মনের মধ্যে আনতে পারলে না, সব যেন কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে, গুলিয়ে যাচ্ছে। তমাললতার মতো ? না, না, সে অন্য রকমের। কিন্তু কি রকমের ? গৌরহরি কিছুতেই স্থির করতে পারলে না। তার কলহাস্য মনে পড়ে, কথা বলিবার সময় ঠোঁটের সেই বিশেষ ভঙ্গিটিও মনে পড়ে। কিন্তু আর কিছুই মনে পড়ে না।

ক'দিনের মধ্যেই গৌরহরি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার বাড়ীর সুমুখের পথটাতেই যেন আজকাল বিনোদিনীর আবশ্যকেরও অতিরিক্ত প্রয়োজন পড়েছে। যখন তখন এই পথ দিয়ে মেনীর হাত ধ'রে অত্যন্ত মন্থর পদে হয় সে যাচ্ছে, নয় আসছে। কিন্তু মুখ তুলে চায় না। গৌরহরি ঘরের ভিতরে থাকলে মেনীকে নিয়ে পথের মাঝখানে একটা কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি ক'রে অকারণে কিছুক্ষণ দেরী করে, কিম্বা হয়তো একটা কল্পিত উপলক্ষে কলকণ্ঠে হেসে ওঠে। গৌরহরি বাইরে দৃষ্টিপথের ভিতরে থাকলে নিঃশব্দে পথ চলে।

গৌরহরি অস্বস্তি বোধ করে। না পারে ওকে ডেকে দুটো কথা কইতে,

না পারে লুকোতে। অস্বস্তি বোধ করে ওর কলহাস্যে। বিনোদিনীর সব গেছে, কিন্তু কলহাস্যের মাদকতা এতটুকুও কমেনি। ঘরের ভিতরে নানা কাজের মধ্যে থেকেও সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

চঞ্চলই হয়ে ওঠে। একদিন আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। বিনোদিনী পথের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে ব'সে মেনীকে পরা কাপড় আবার খুলে নতুন ক'রে পরাচ্ছিল। গৌরহরিকে দেখে সে তার দিকে পিছন ফিরে ব'সে কাপড় পরাতে লাগল।

গৌরহরি হেসে বললে, ওকে আবার কাপড় পরান কেন বিনোদিনী ? ও কি কাপড় রাখতে পারে ?

বিনোদিনী সাড়া দিলে না।

গৌরহরি লক্ষ্য করলে, বিনোদিনী একখানা চওড়া কালো পাড় ফর্সা শাড়ী প'রেছে। মাথার চুলগুলিও সেদিনের মতো রুক্ষ, এলোমেলো নয়, পরিপাটি বাঁধা। এখানে এসে পর্য্যন্ত শুধু সে নয়, কেউ তাকে কোনো দিন প্রসাধন করতে দেখেনি। দেখলেই বোঝা যায়, অনেক দিনের পরে তার এই নতুন উদ্যম এখনও যেন তেমন রপ্ত হয়নি। গৌরহরি চেয়ে চেয়ে দেখলে।

তারপর যেন আকাশকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল :

—আখড়া তো হয়ে গেল। এইবার মচ্ছবের হাঙ্গামা। সাত গাঁ কাঞ্চনপুর থেকে ললিতাকে না আনলে সে হাঙ্গাম পোয়াবার শক্তি আমার নেই।

বিনোদিনী তথাপি সাড়া দিলে না।

গৌরহরি আবার বললে, ভাবছি কালকেই যাব। সময় তো আর নেই। মাঝে মাত্র পনেরোটা দিন।

মেনীকে কাপড় পরান হয়ে গিয়েছিল। বিনোদিনী অনাবশ্যক তার কাপড়টা ঝেড়ে ফিটফাট করতে লাগল।

গৌরহরি বললে, তোমার কিছু বলবার থাকে তো বলতে পার।

বিনোদিনী মেনীকে বললে, জিগ্যেস কর কবে তারা আসবে।

মেনীকে আর জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না, গৌরহরি এমনিতেই শুনতে পেলে। বললে, তার কি ঠিক আছে ? যেদিন আসতে চাইবে, সেই দিনই নিয়ে আসব,— পরশু, তরশু যেদিন হয়।

বিনোদিনী মনে মনে হিসাব করতে লাগল, ললিতা কবে আসতে পারে। তার সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই, গৃহস্থালী গুছানও নেই। চল, বললেই বেরিয়ে পড়বে। ললিতা আসবে শুনে বিনোদিনী খুব খুশী হয়ে উঠল।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে ?

বিনোদিনী মেনীকে বললে, বল্, বলব আবার কি ?

গৌরহরি আর কিছু বললে না।

বিনোদিনী অনেকক্ষণ তার উত্তরের প্রতীক্ষা ক'রে অবশেষে আবার মেনীকে বললে, মেনী জিগেস্য কর, তোমার মালাবদল কবে হবে ?

—মালবেদল ?—গৌরহরি শুষ্ককণ্ঠে হাসলে বটে, কিন্তু তার মুখ পাংশু হয়ে উঠল। বললে, তার জন্যে চিন্তা কি ? সে একদিন হ'লেই হবে।

এই প্রথম মালাবদল সম্বন্ধে তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। একটু যেন সে চিন্তিতও হয়ে পড়ল। বিনোদিনীর ম্লান মুখ কল্পনা ক'রে এবার আর স্পষ্ট ক'রে সত্য কথা বলতে পারল না।

দূরে কাকে আসতে দেখে বিনোদিনীও উঠল। মেনীর হাত ধ'রে শ্রান্তভাবে শিবদাসের বাড়ীর দিকে চলল।

(১১)

গৌরহরির কাছে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পাওয়ামাত্র ললিতার খুশীতে যেন হীরার কুচির মতো ছিটিয়ে পড়ল। তার আর তর সইছিল না। রাতটুকু এক রকম বিনিদ্র কাটিয়ে ভোর হ'তে না হ'তে হ'তেই রসময় আর গৌরহরিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রসময়ের অন্য যায়গায় একটু কাজ আছে। মাৎলার ঘাট পর্য্যন্ত সে ওদের সঙ্গে যাবে। তারপরে তার কাজ সেরে সে অন্য পথে মহোৎসবের আগের দিন পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে কথা দিলে।

আখড়া পৌঁছুতেই বিকেল হয়ে গেল। ললিতা হাতে মুখে জল দিয়েই ছুটল বিনোদিনীর বাড়ী। সেখান থেকে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল নিজেদের আখড়ায়। গেল ঘাটে। সেখানে সাঁতার কেটে, জল ছিটিয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে শুধু বিনোদিনীকে নয়, পাড়ার সমস্ত মেয়েকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলল। বিনোদিনী হাঁফিয়ে উঠল কয়েক ঘণ্টাতেই। কিন্তু ললিতার উৎসাহ তাতেই মিটল না।

বললে, কাপড় ছেড়ে আসবি আমাদের আখড়ায় ?

—এই সন্ধ্যেবেলায় ?

—তাতে কি ?

বিনোদিনী বললে, মরণ আর কি !

ললিতা চোখ নাচিয়ে বললে, কেন ? দাদাকে ভয় করে ?

—তোর মাথা !

ললিতা ওর কানে কানে বললে, ভয় কি ! তোকে দাদার কাছে নিরিবিলি বসিয়ে রেখে আমি যাব হাওয়া খেতে।

ভুরু বেঁকিয়ে বিনোদিনী বললে, তুই মর, তুই মর।

ললিতা হেসে বললে, আমি মরলে তোমার দূতীগিরি করবে কে ?

—যম।

দুজনেই হেসে উঠল।

ললিতা বললে, তবে কাল সকালে আসিস। বেশ ?

—বেশ। আমার তো আর কাজ কর্ম্ম কিছু নেই ? দাদা এমনি এমনি ভাত দিচ্ছে।

ললিতা সবিস্ময়ে বললে, এই রোগা শরীরে তোর আবার কাজ কর্ম্ম কি ?

—কাজের কি আর শেষ আছে ? ঢেঁকিটাই না হয় বন্ধ রেখেছি। অন্য কাজ তো আছে।

রেগে ললিতা বললে, তবে আর ঢেঁকিটাকেই বা বিশ্রাম দেওয়া কেন ? আমি ঠিক করেছি, তুই মরলে ঢেঁকিটা তোর গলায় বেঁধে দোব। নইলে তুই স্বর্গে গিয়েও সোয়াস্তি পাবি না।

বিনোদিনী হেসে বললে, তাই দিস।

দুজনে নিজের নিজের বাড়ী চ'লে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সকাল হ'তে না হ'তেই বিনোদিনী হাসতে হাসতে এসে ললিতাদের আখড়ার উঠানে দাঁড়াল। ললিতা ছুটতে ছুটতে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে ওদিকের কাঞ্চন গাছগুলির ঝোঁপের দিকে নিয়ে গেল। জায়গাটা নিরিবিলি।

বললে, কি লো, রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো ?

বিনোদিনী বললে, আঃ ছাড়্।

কিন্তু ললিতা ছাড়বে ? তবেই হয়েছে। ওকে আরও ভাল ক'রে জড়িয়ে ধ'রে সে গুন গুন ক'রে গান আরম্ভ ক'রে দিলে :

কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি-কুল প্রাণ নিলে বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সংসারের সবার বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে !

বিনোদিনী শশব্যস্তে বললে, আঃ কি করিস ! এ কি তোদের সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর পেয়েছিস ? কেউ শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

—আমার আর কি করবে ?

—তোর কেন, আমার।

—ওঃ ! তাদের বলবি।

বোলো ডুবেছে রাই কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

বিনোদিনী এবার ওর মুখ চেপে ধরলে। শাসনের ভঙ্গিতে বললে, আবার গান গাইছিস !

—আর গাইব না, ছেড়ে দে।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিন্তু এ অবস্থা যেন গান গাওয়ার চেয়েও আরও অসহ্য।

ললিতা বললে, এমন ক'রে চুপ ক'রে আমি ব'সে থাকতে পারব না। বরং দুটো গল্প কর।

—কি গল্প করব ?

—যে গল্প শোনাবার জন্যে এনেছিস। দাদা কি বলে ?

—কি আবার বলবে ?

চোখ ঘুরিয়ে ললিতা বললে, কিছু বলে না ?

বিনোদিনী একটুখানি হাসলে শুধু।

ললিতা বললে, আমি আসায় তোর ভারি অসুবিধা হচ্ছে, নয় ?

বিনোদিনী হেসে বললে, ভয়ানক।

—কিছু অসুবিধা হবে না দেখিস। বরং আগে যখন তখন আসতে পেতিস না, এখন আমি এসেছি, যখন খুসী আসতে পারবি।

বিনোদিনী হেসে বললে, বাঁচলাম।

বিনোদিনী বুঝলে, ললিতা ভুল বুঝেছে। কিন্তু কিছু বলতে পারলে না। চুপ ক'রে রইল। ললিতাকেও তার যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল।

কি যে করবে বিনোদিনী ভেবে পায় না। সে বুঝতে পারে তার মধ্যে কেমন যেন একটা কাঙ্গালপনা এসেছে, কিন্তু রুখতে পারে না। তার অসামান্য সংযম এবং দৃপ্ত মর্য্যাদাবোধের বাঁধে কোথায় যেন ছিদ্র হয়েছে। আর সেই ছিদ্রপথে যে প্রচণ্ড প্রবাহের আবির্ভাব হয়েছে, তাতে যেন সে কুটোর মতো অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে। ইচ্ছা থাকলেও বাধা দিতে পারছে না।

এই অবস্থা-সঙ্কট সহনশীলতার বাইরে চলে গেছে। এদিকে কিম্বা ওদিকে, যেদিকেই হোক, এর থেকে মুক্তি না পেলে সে বাঁচবে না। সেই মুক্তির জন্যে সে মরীয়া হয়ে উঠল।

গৌরহরিকে সে বুঝতে পারছে না। গৌরহরি যে ভিতরে ভিতরে আর একটিকে কিশোরীকে বিবাহের জন্যে লোভার্ত্ত হয়ে উঠেছে, তা সে জানে না। তমাললতার সে নামও শোনেনি। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যা দু'একটা কথা গৌরহরির মুখে শুনেছে, তাও সে নিছক রসিকতা ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছে।

সে-সব নয় ! সে ভাবে ভয়। ভয়ে গৌরহরি পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ভয়ে বিনোদিনীকে এড়িয়ে চলছে। একটা অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, এমনি ক'রে যেন তার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছে।

গৌরহরির ভয় দেখে মাঝে মাঝে তার হাসি আসে, মাঝে মাঝে সে রাগে। পুরুষ মানুষের আবার ভয় কিসের ? সে তো কই ভয় করে না !

এক কথায় রমণীসুলভ লজ্জা নিয়ে বিনোদিনীর আর দূরে থাকা চলবে না। যদি বাঁচতে চায়, সকল সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেই তাকে হাল ধরতে হবে। গৌরহরিকে একবার নিরিবিলি পাওয়া দরকার।

রান্নার চালায় ললিতা ঘটর ঘটর ক'রে খুব সমারোহের সঙ্গে কি যেন রাঁধছিল। বিনোদিনী সেদিকে গেল না। আখড়ার বড় ঘরের ভিতর থেকে গুনগুনানি গান শোনা যাচ্ছিল। বিনোদিনী কোনদিকে জ্রক্ষেপ না ক'রে সোজা সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

গৌরহরি চমকে গান বন্ধ করলে।

থতমত খেয়ে জড়িত কণ্ঠে বললে, ললিতা ও ঘরে আছে।

বিনোদিনীর চোখ ছুটো যেন অসহ্য জ্বালায় জ্বলছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধ'রে বললে, দেখেছি।

—দেখেছ? তা'হলে···

ওর জ্বলন্ত চোখের দিকে চেয়ে গৌরহরির গলায় যেন পাথর আটকে গেল। একটা কথাও সে বলতে পারলে না।

কিন্তু সে জানত না, এরও চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিস তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বিনোদিনীর চোখ অসহ্য ক্ষুধায় জ্বলছিল। চকমক ক'রে সে এদিক ওদিক চেয়ে কি যেন দেখছিল। অকস্মাৎ সে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসল, আকস্মিকতার দিক দিয়ে যার তুলনা মেলে না। হঠাৎ সে ঘরের মধ্যে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

গৌরহরি চাপা কণ্ঠে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল: ওকি! দরজা বন্ধ করলে কেন? ললিতা রয়েছে যে!

বিনোদিনীর মাথায় যেন শয়তান চেপেছে। তার সমস্ত দেহ, বিশেষ ঠোঁট থর থর ক'রে কাঁপছিল। একবার যেন সে হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললে, থাকুক।···

যখন বেরিয়ে এল, ললিতা তখনও হাঁড়ি নিয়ে ঘটর ঘটর করছে। ওর পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে বিনোদিনী পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

ললিতা অবাক হয়ে বললে, ওকি, চলে যাচ্ছিস যে! এলিই বা কখন, যাচ্ছিসই বা কেন?

বিনোদিনী গোঁ গোঁ ক'রে কি যেন বললে, বোঝা গেল না।

ললিতা হাতা হাতেই বাইরে এসে ডাকলে, ও বিনোদিনী, শোন্। কথা আছে।

কিন্তু বিনোদিনী থামলেও না, সাড়াও দিলে না।

ললিতা অবাক হয়ে গেল। আখড়া-ঘরের দিকে চেয়ে দেখলে দরজা খোলা, কিন্তু দাদার গুন-গুনানি গানের সাড়া নেই।

ডাকলে, দাদা আছ নাকি?

জবাব পাওয়া গেল না, কিন্তু দাদার কাশির শব্দ পাওয়া গেল।

এতক্ষণে ললিতার বিস্ময়ের ঘোর কাটল। আপন মনে হাসতে হাসতে সে আবার রান্নায় মন দিলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ট্র্যাজেডি ও তাহার বিবর্ত্তন

পরিভাষার যুগেও 'ট্র্যাজেডি' কথাটাই ব্যবহার করিতে হইল। প্রত্যেক ভাষাতেই কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা কালের স্রোতের ঘূর্ণিপাকে তাহাদের চতুঃপার্শ্বে এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যময় সূক্ষ্ম অর্থের জাল বুনিয়া আসিতেছে যে হঠাৎ তাহাদিগকে ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া যায় না,—ভাষান্তরিত করিলেই তাহারা অনেকখানি যায় রূপান্তরিত হইয়া, এবং তপোবনের বাহিরে সখী-বিরহিতা খণ্ডিতা শকুন্তলার ন্যায় তাহাদিগকেও চেনা কঠিন হইতে পারে। আমরা বাঙলায় সাধারণত 'ট্র্যাজেডি' কথাটিকে 'বিয়োগান্ত কাব্য'-রূপে ভাষান্তরিত করি; কিন্তু ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণতা এবং গভীরতা সেখানে প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয় না। বিয়োগই ট্র্যাজেডির ভিতরে সব চেয়ে বড় কথা নহে,—মিলনের ভিতরেও সে হয়ত গভীরভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে। মহাভারতের ট্র্যাজেডি কুরুকুলের ধ্বংসের ভিতরে ততখানি নহে, যতখানি সেই কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের বুকে পাণ্ডবদের রাজ্য-প্রাপ্তিতে। তাই বিয়োগটা ট্র্যাজেডির অনেকখানি একটা বহিরঙ্গ লক্ষণ মাত্র,—উহা ট্র্যাজেডির স্বরূপ-লক্ষণ নহে।

সুতরাং সর্বপ্রথমে ট্র্যাজেডির স্বরূপ-লক্ষণটি চিনিয়া লওয়া দরকার। ট্র্যাজেডি জীবনের একটা গভীর তত্ত্ব,—একটা গভীর বেদনা—জীবনের একটা চিরন্তন বিষাদময় সমস্যা। এ বেদনা ঘটনাপরম্পরাগত যে কোনও একটা বিশেষ বিরহ, বিচ্ছেদ বা শোকমাত্র তাহা নহে,—এ বেদনা যেন রহিয়াছে আমাদের জীবনের মূলে। সেই জীবনের মূলে যেন কোথায় রহিয়াছে একটা আকাশজোড়া ফাঁক, কিছুতেই যেন আর তাহাকে ভরিয়া তোলা যাইতেছে না,—সেই বিরাট ফাঁকের ভিতরে ক্রমান্বয়ে যেন জমাট বাঁধিয়া ওঠে জীবনের ঘনীভূত বেদনা। এ সমস্যা—এ বেদনা মানুষের বুকে আঁচড় দিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতে যেদিন হইতে সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, জীবন সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছে। নিখিল বিশ্বসৃষ্টির এই যে অনাদি-অনন্ত

প্রবাহ—ইহার ভিতরে আমাদের জীবনের মূল্য কোথায় এবং কতটুকু? শৌর্যে বীর্যে, চরিত্রের নিশ্চল দৃঢ়তায়, ধনে জনে মানে যে ব্যক্তিপুরুষটি বিরাট বনস্পতির ন্যায় আপন ঐশ্বর্য ও মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাহিরের অকস্মাৎ একটি মাত্র আলোড়ন আসিয়া তাহাকে ধরণীর তৃণগুল্মের সহিত এক করিয়া পিষিয়া দিয়া গেল! কোথায় রহিল পৌরুষের মহিমা,—কি মূল্য জীবনের সেই সকল উপাদানের যাহার সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল ব্যক্তি-পুরুষের এই বিরাট মহিমা? জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মানুষ চাহিয়া দেখিল, বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে যে অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য শক্তি তাহার হাতে সে খেলার পুতুল মাত্র! বিশ্ব-সাগরের মধ্যে ক্ষুদ্র এক বালু-কণা হইতে একটি জীবনের মূল্য কোথায় কতটুকু বেশী ইহাই দাঁড়াইল মানুষের মস্তবড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ যদি সত্য সত্যই কখনও বুঝিতে পারিত, একটি জীবনের মূল্য একটি বালুকণা হইতে কোথাও কিছু বেশী নয়,—মানুষের ব্যক্তিপুরুষ অন্ধ-প্রকৃতির হাতের একটি অসহায় ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়,—তবে হইতে পারিত জীবনের সকল ট্র্যাজেডির অবসান। কিন্তু অন্তরে মানুষ জীবনকে দিয়াছে গভীর মূল্য, তাহার ব্যক্তিপুরুষটি আত্ম-প্রত্যয়ে আত্ম-মহিমায় আকাশ ফুঁড়িয়া মাথা জাগাইতে চাহিতেছে, অসীম শূন্যে—সকলের ঊর্দ্ধে;—কিন্তু বাস্তবজীবনে সে পদে পদে অনুভব করিতেছে, জীবনের যেন কোথাও কোন মূল্য নাই—এ যেন প্রকৃতির তাসের খেলাঘর।—এইখানেই জমাট বাঁধিয়া ওঠে জীবনের ট্র্যাজেডি।

এই যে জীবনের অপমান—মনুষ্যত্বের অপমান—ব্যক্তিপুরুষের অপমান,—ইহার বেদনাই ট্র্যাজেডির বেদনা। ট্র্যাজেডির মূলে তাই রহিয়াছে জীবনের একটা প্রকাণ্ড অর্থহীনতা, মনুষ্যত্বের তীব্র লাঞ্ছনা, পৌরুষের অহৈতুক অপমান। জীবনের সকল দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা অপমানকে আমরা ন্যায়ের দিক দিয়া, যুক্তির দিক দিয়া অন্তত বরদাস্ত করিয়া লইতে পারিতাম যদি তাহার ভিতরে সন্ধান পাইতাম অন্তত একটা ব্যাবহারিক হেতুপ্রত্যয়ের। কিন্তু জীবনের অনেক দুঃখ-নৈরাশ্য, অনেক লাঞ্ছনা-অপমানই এমন যে তাহাকে আমরা কোনও কার্যকারণের আওতার ভিতরে টানিয়া আনিতে পারি না, সেইখানেই অন্তরের গভীরে শুধু এই রুদ্ধ দীর্ঘ-শ্বাস গুমরিয়া উঠিতে থাকে,

যে বেদনা—যে অপমান-লাঞ্ছনার উপরে আমার বিশেষ কোনও হাত নাই, যাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ীও নহি অথচ যাহার প্রত্যেকটি আঘাত আমাকে ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক গ্রহণ করিতেই হইবে, সে বেদনায়—সে অপমানে জীবন যে একান্তই দুর্বহ! জীবনের এই নৈরাশ্যবাদ যে শুধু বাহির হইতে আঘাত খাইয়াই আসে তাহা নহে, আমাদের নিজেদের ভিতরেই অনেক সময় রহিয়াছে এই নৈরাশ্যবাদের মূল। আমাদের নিজেদের ভিতরেই রহিয়াছে এমন পরস্পরবিরোধী উপাদান যে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে বাধা দিতেছে জীবনকে নিবিড় করিয়া পাইতে। তাইত সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর ম্যাগবেথ একদিন জীবনের সত্য আবিষ্কার করিয়া বসিল,—

Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

জীবনটা একটা চলন্ত ছায়া—দু'দিনের রঙ্গমঞ্চ—একটা অবোধের উপাখ্যান,—বাগাড়ম্বর আছে—উত্তেজনা আছে,—কিন্তু কোনও অর্থ নাই! ম্যাগবেথের জীবনে এইটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ম্যাগবেথ না হয় জীবনের ব্যর্থতার ভিতরেই লাভ করিয়াছিল এই নৈরাশ্যবাদ, কিন্তু এই সত্যকার ব্যর্থতার ভিতরেই যে আসে জীবনের এই নৈরাশ্যবাদ—এই মূল্যহীনতা—একথাও সত্য নহে, পরিপূর্ণ সফলতার ভিতর দিয়াও আসে সেই জীবনের মূল্যহীনতা—সেই নৈরাশ্য,—জীবনের সে ট্র্যাজেডি আরও দুঃসহ গভীর। মহাভারতের দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের অন্য দিক হইতে যাহাই অর্থ হৌক না কেন, কাব্যের দিক হইতে উহা জীবনের এমন একটা ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত যাহার উপমা সাহিত্যে বিরল। কত আয়োজন—কত বিরোধ-মৈত্রী—যুদ্ধ—হত্যা—ধ্বংসের ভিতর দিয়া পাণ্ডবগণ যেদিন বিজয় লাভ করিল সেদিন যেন হঠাৎ মনে হইল, এ বিজয় সম্ভোগ্য নহে, জীবনে যেন তাহাদের অন্তরাত্মা তাহাকে সত্যই চাহে নাই,—তখন সেই পরিপূর্ণ সফলতাকে মৃৎপাত্রের ন্যায় মাটির পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিয়া তাহারা যেন জীবনের আরেকটি রাজ্যের সন্ধানে চলিয়া গেল। একদিন যাহাকে জীবনের

প্রার্থিততম বস্তু বলিয়া মনে করি, কত স্বপ্ন—কত কল্পনার রঙীন আলোকে যাহাকে অফুরন্ত মধুর রহস্যময় করিয়া তুলি, জীবনের কোন্ এক সন্ধিক্ষণে হয়ত আবিষ্কার করিয়া বসি—সে যেন একেবারেই মূল্যহীন,—তাহাকে পাইয়া যেন কিছুই সুখ নাই—সত্য সত্য হয়ত তাহাকে অন্তর হইতে কোনও দিন চাহিও নাই! এইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি!

মানুষের মনের গহনে এই যে একটি মূল বেদনার সুর ইহাই জাগাইয়াছে তাহার মনে অসংখ্য সমস্যা—মানুষ তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে, এবং সেখানে হয়ত কোথাও কোথাও সে পাইয়াছে একটা বুদ্ধির সান্ত্বনা; কিন্তু সেই বুদ্ধির সান্ত্বনার পাশ কাটাইয়া অন্তরের বেদনা ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে আবার সাহিত্যের ভিতরে,—সেইখানেই সৃষ্টি হইল ট্র্যাজেডির।

ট্র্যাজেডির ভিতরে প্রথম পাইলাম তাই জীবনের মূলে একটা গভীর বেদনা,—প্রাচীন যুগে এই বেদনার সহিত মিশ্রিত ছিল একটা নিঃসহায়তার ভীতি! এই যে ভয়-মিশ্রিত ট্র্যাজেডির বেদনাবোধ তাহার আর একটি প্রধান লক্ষণ এই, সে কখনও মানুষকে আদালতের বিচারক করে না,—সে মানুষের মনের মধ্যে জাগায় অসীম করুণা—গভীর সহানুভূতি। ইহার কারণও খুব স্পষ্ট,—উহা মানুষের নিঃসহায়তা। দৈবরোষে অলঙ্ঘ্য নিয়তির বশে সে যেখানে বিপর্যস্ত সেখানেও সেই নিঃসহায়তা, যেখানে নিজের অন্তরের পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির প্রকোপে সে বিপর্যস্ত সেখানেও যেন মনে হয়, অসহায় জীব—মানুষের যেন হাত নাই,—অদৃশ্য কোন্ ভাগ্যনিয়ন্তা যেন তাহাকে টানিয়া লইতেছে,—সেখানেও সেই সূক্ষ্ম অসহায়ত্বের বোধ! আমার মনে হয়, গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ভিতরে যে নিয়তির কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় উহাও যেন ট্র্যাজেডির একটি মূল সুর। বাহিরের দ্বন্দ্ব বা ভিতরের দ্বন্দ্ব যে কারণেই ট্র্যাজেডি হৌক না কেন, সেখানে যেন একটা নিরুপায়ত্ব বোধ—একটা ভাগ্য—একটা দৈব—একটা নিয়তির অতি সূক্ষ্মরূপ সর্বত্রই অনুস্যূত থাকে। এই সূক্ষ্ম নিয়তিবোধ হইতেই ট্র্যাজেডির বেদনার ভিতরে সর্বত্র মিশিয়া থাকে একটি গভীর সহানুভূতি; কারণ নিয়তি দেবীই মনুষ্যত্বের ঘনীভূত লাঞ্ছনা,—সে যেন পৌরুষের মূর্তিমতী অস্বীকার,—জীবনের মূলে সে যেন রহিয়াছে একটি গভীর ফাঁকি।

একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে উদিত হয়, এই যে মানব জীবনের এক নিষ্ঠুর বেদনা ইহা আমাদের সাহিত্যের মধ্যে রস হইয়া উঠিতে পারিল কেমন করিয়া? সে আমাদিগকে কোন্ আনন্দে মুগ্ধ করিয়াছে? পাশ্চাত্য অনেক দার্শনিক ইহার নানাপ্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক সোপেনহাওয়ের বলিয়াছেন যে,—ট্র্যাজেডি আমাদিগকে যে আনন্দ দান করে তাহা কোনও সৌন্দর্যের আনন্দ নহে, তাহা আমাদের চিন্তার আনন্দ—জ্ঞানের আনন্দ। ট্র্যাজেডির ভিতর দিয়া আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে জীবনে শান্তি নাই, সুখ নাই, থাকিতে পারেও না,—জীবন শুধু দুঃখের, শুধু চিরন্তন ক্রন্দনের। জীবন সম্বন্ধে এই যে নিষ্ঠুর সত্যলাভ ইহার ভিতরেও আমাদের মনে আনন্দ আছে,—এবং শুধু তাহা নহে,—এই সত্যদর্শনের ফলে আমরা জীবনকে নিয়তির হাতে সঁপিয়া দিয়া অনেকখানি সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারি,—এইখানেই ট্র্যাজেডির আনন্দ। হেগেল এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—ট্র্যাজেডির ভিতরে আমরা যে দুইটি শক্তির ভিতরে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, তাহারা উভয়ই ন্যায্য—অর্থাৎ এখানে যে সঙ্ঘাত তাহা ঠিক ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, পুণ্যের সহিত পাপের বিরোধ নহে,—অনেকখানিই যেন ন্যায়ের সহিত ন্যায়ের বিরোধ। কিন্তু এই বিরোধের কারণ এই, এখানে একটি ন্যায়-শক্তি অপরের ন্যায় অধিকারকে অস্বীকার করিতেছে। পরিবার যাহা চায়, দেশ তাহা অস্বীকার করিতেছে, প্রেম যাহা চাহে, মর্যাদাবোধ তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে। ট্র্যাজেডির বিষাদময় পরিণতিটি এই উভয়েরই অন্যায় আব্দারকে অস্বীকার করে এবং একটা বেদনাময় পরিণতির ভিতর দিয়া আমাদের পরস্পরবিরোধী ন্যায়বোধের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য, একটা ঐক্য সৃষ্টি করে। এই পরিণতির ভিতর দিয়া আমরা যতই ব্যথিত হই না কেন, সকল ব্যথার ভিতর দিয়া একটা আনন্দ আমাদের মনকে ভরিয়া দেয়, যে সমস্ত বিরোধের ভিতর দিয়া সনাতন ন্যায়ের অখণ্ডত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকপ্রবর এরিষ্টট্‌লের মতবাদটিও আলোচনা করা যাইতে পারে। তিনি মনে করেন, ট্র্যাজেডি জিনিসটা অনেকখানি হোমিওপ্যাথি ঔষধের ন্যায়। এরিষ্টট্‌লের মতে আমাদের মনের ভিতরে দুইটি সব চেয়ে বেশী বিক্ষোভকারী বস্তু হইল আমাদের 'করুণা' এবং 'ভয়'। এরিষ্টট্‌লের ভাষায় 'করুণা' এবং 'ভয়' এই শব্দ দুইটির দুইটি বিশেষ অর্থ

আছে। 'করুণা' অর্থে তিনি মনে করিয়াছেন চিত্তের সেই অবস্থা যাহা কোনও একটা অহৈতুক দুর্দশা—একটা অবাঞ্ছিত দুরদৃষ্টের দ্বারা সৃষ্ট হয়। আর 'ভয়' অর্থে চিত্তের সেই ভাব যাহা আমাদের ন্যায় অসহায় জীবের ক্লেশের দ্বারা উৎপন্ন হয়। মনের মধ্যে এই দুইটি ভাব আমাদিকে নিরন্তর বেদনা দিতেছে। ট্র্যাজেডির মধ্যেও আমরা পাই সেই 'করুণা' এবং 'ভয়'; আর্টের সেই 'করুণা' এবং 'ভয়ে'র দ্বারা আমাদের জীবনের 'করুণা এবং 'ভয়ে'র বেদনা অনেকখানি উপশমিত হয়—এইখানেই ট্র্যাজেডির আনন্দ।

কিন্তু আমার মনে হয়, ট্র্যাজেডির আনন্দ ইহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম এবং গভীর,—ইহা সাহিত্যের রমণীয়তার ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির আনন্দ। আমার মনে হয়, সাহিত্যের রসবোধের ভিতরে এই আত্মানুভূতি বা আত্মোপলব্ধির ব্যাপারটি অনুস্যূত হইয়া আছে। পুত্রের জন্য যে পুত্র প্রিয় হয় না, বিত্তের জন্য যে বিত্ত প্রিয় হয় না,—আত্মার কামনায়ই সকল প্রিয় হয়, উপনিষদের এ সত্য সাহিত্যের উপরেও অনেকখানি প্রযোজ্য। শুধু লোকোত্তর রমণীয়তা দ্বারাই সাহিত্য আমাদের প্রিয় হয় না—তাহার রস জমিয়া ওঠে না; তাহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে সেই আত্মোপলব্ধির প্রশ্ন। সাহিত্যের ঘটনা বিশেষের ভিতর দিয়া আমরা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া পাইতেছি,—কত বৈচিত্র্যে মাধুর্যে সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় যে আমাদের অন্তরপুরুষের সকল সত্তা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে,—সেই আত্মচেতনার ভিতরে রহিয়াছে সাহিত্যের অনেকখানি রসবোধ। ট্র্যাজেডির ভিতরেও আমরা অতি নিবিড় করিয়া পাই আমাদের সত্তাটিকে—আমাদের বাস্তব জীবনটিকে। ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকার বহির্দ্বন্দ্ব এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের চিত্ত-ধাতুকে শতভঙ্গে দিতেছে দোলা,—সেই আঘাতের স্পন্দনে চিত্তরাজ্যে আসে একটা আলোড়ন,—তাহাতে বাস্তবের প্রচণ্ডতা নাই, আছে মনোময় রূপের রমণীয়তা, ট্র্যাজেডিও তাই করে রসসৃষ্টি।

ট্র্যাজেডির বেদনাকে বিশ্লেষ করিলে আমরা দেখিতে পাইব,—এই বেদনার মধ্যে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। দ্বন্দ্ব-বিহীন যে বেদনা তাহা করুণ রসের সৃষ্টি করে, ট্র্যাজেডি নহে। এই দ্বন্দ্বটি কিসের তাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এ দ্বন্দ্বের একদিকে রহিয়াছে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিপুরুষ, অপর দিকে রহিয়াছে প্রাণহীন জগৎব্যাপারের অনিবার্য প্রবাহ। মানুষের এই ব্যক্তি-

পুরুষটি বড় স্বেচ্ছাভিমানী, সে নিজের ছন্দে নিজের জীবনযাত্রাকে বহাইয়া দিতে চায় ; কিন্তু জগৎ-ব্যাপারটি প্রতিনিয়তই তাহার পশ্চাতে লাগিয়া আছে—পদে পদে তাহাকে বাধা দিতেছে, এইখানেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। যে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে এই বিরাট স্রোতের প্রবাহের ভিতরে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মিলিয়া মিশিয়া জীবনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে রাজি হয়, তাহার জীবনে যতই দুঃখ থাক, শোক থাক, বিরহ-বিচ্ছেদ থাক, তাহার ভিতরে ট্র্যাজেডি নাই ; কিন্তু যে আত্মাভিমানী ব্যক্তিপুরুষ তাহা দিতে চায় না, যে নিজের আস্তিত্বকেই সার্থক করিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, জগৎব্যাপারের সহিত তাহার রহিয়াছে পদে পদে বিরোধ, এই বিরোধই আনে জীবনে ট্র্যাজেডি। এখানে আমি জগৎব্যাপার শব্দটি শুধু বহির্জগতের ঘটনা অর্থেই ব্যবহার করিতেছি না, কথাটিকে আমি একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বাহিরে যাহা কিছু তাহাকেই আমি এই জগৎব্যাপারের ভিতরে স্থান দিয়াছি। এই যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বাহিরের জগৎব্যাপারটি, ইহা কখনও রূপ লইয়াছে দৈবের বা নিয়তির, তাই গ্রীক্-ট্র্যাজেডির ভিতরে দেখিতে পাই সেখানে যে দ্বন্দ্ব তাহা অনেকখানি এই ব্যক্তিপুরুষ এবং অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়তির দ্বন্দ্ব। গ্রীক্-ট্র্যাজেডির বীরগণ সর্বত্রই বিপর্যস্ত লাঞ্ছিত—বিষাদময় পরাজয় এবং মৃত্যুই তাহাদের জীবনের পরিণতি। অথচ দেখা যাইতেছে, এই যে জীবনের পরাজয়, এই যে সহস্রভাবে জীবনের সহস্র অপমান, ইহার জন্য মানুষকে আমরা দায়ী করিতে পারিতেছি না, পশ্চাতে রহিয়াছে দৈবরোষ—অলঙ্ঘ্য অভিশাপ। গ্রীক্‌জাতি ক্রমে পৌরুষের উপরে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস হারাইল, ক্রমে তাহারা বুঝিতে শিখিল, মানুষের পৌরুষবলের উর্দ্ধে আরও প্রকাণ্ড একটা অদৃশ্য শক্তি রহিয়াছে, সে দুর্নিবার্য, অলঙ্ঘ্য, অন্ধ। মানুষের কার্য্য-কারণ বোধকে নিরন্তর নির্দয় উপেক্ষা করিয়া সে আপন খেয়ালে কাজ করিয়া যাইতেছে। এই যে দুর্বার দৈবরোষ ইহাই দেখা দিল নিষ্ঠুর নিয়তিরূপে। গ্রীক্-ট্র্যাজেডির এই যে দৈবরোষ উহা অন্ধ নিয়তিরই প্রতীক মাত্র! জীবনের যে দুঃখ-বেদনা, যে লাঞ্ছনা-অপমানকে আমরা যুক্তি দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, সেখানেই করিয়াছি দৈবরোষের কল্পনা—জীবনের পশ্চাতে যেন রহিয়াছে কাহার দুর্নিবার্য প্রচণ্ড অভিশাপ।

কিন্তু গ্রীক্-ট্র্যাজেডির ভিতরে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব জীবনের যে দ্বন্দ্ব ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সর্বত্রই বাহিরের দৈবরোষের সহিত মানুষের ব্যক্তিপুরুষের সংঘর্ষ নহে, স্থানে স্থানে রহিয়াছে সে দ্বন্দ্ব অন্তর্জগতে, পরস্পরবিরোধী কর্ত্তব্যবোধের ভিতরে। ঈস্কিলাসের 'ইউমেনিডিস্' নাটকের ওরেষ্টিসের ভিতরে দেখিতে পাই আমরা দৈবরোষের পশ্চাতে সেই কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব। একদিকে মাতৃহত্যার পাপের ফলে দৈবরোষ তাহার পশ্চাতে লাগিয়াই আছে, অন্যদিকে তাহার প্রাণের অদম্য শক্তি—সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্যই মাতৃহত্যা করিয়াছে। এখানে দৈবরোষের কথাটা বাদ দিলে দেখিতে পাই, দ্বন্দ্ব ওরেষ্টিসের মনের ভিতরে, একদিকে পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা, অন্য-দিকে মাতৃহত্যার অনুশোচনা। সোফোক্লিসের 'এ্যান্টিগনি'র ভিতরেও সেই কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব ; একদিকে ভ্রাতৃস্নেহ, অন্যদিকে স্বদেশ-দ্রোহীর বিরুদ্ধে রাজআজ্ঞা! কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে গ্রীক্-ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বটা অনেকখানি বহিরঙ্গ ছিল। মানুষের মনের যে দ্বন্দ্ব তাহাও অনেকখানি পারি-পার্শ্বিক অবস্থার ফলে কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব এবং তাহাও আবার অনেকস্থলে রূপ লইয়াছে দৈবরোষের। কি শেক্‌সপিয়ার আবিষ্কার করিলেন, যে কারণে মানুষ তাহার সকল শৌর্য-বীর্য, সকল পুরুষের মহিমা সত্ত্বেও ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলে তাহা যে শুধু বাহিরের দৈবরোষরূপে বা কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব রূপেই রহিয়াছে তাহা নহে, অনেকখানিই রহিয়াছে মানুষের অন্তরে—তাহার প্রকৃতির মূলে—তাহার চরিত্রের উপাদান রূপে। বাহিরেও সঙ্ঘাত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বাহিরের সেই সঙ্ঘাতই খুব বড় জিনিস নহে—বড় জিনিস তাহার নিজের অন্তরের মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রবৃত্তির সঙ্ঘাত! এই যে অন্তর্বিপ্লব—এই যে একটা মনের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন দোটানার দ্বন্দ্ব—ইহাই জীবনকে পরিণত করে ট্র্যাজেডিতে। তাই শেক্‌সপিয়ারের নাটকে তিনি বাহিরের সঙ্ঘাতকে অনেখানিই রাখিয়াছেন চরম বিষাদময় পরিণতির অবলম্বন বা উপলক্ষ্য মাত্র,—কিন্তু সত্যকার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে মানুষের মনের ভিতরে, পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তিগুলির ভিতরে। এই যে অন্তরের ভিতরে নিরন্তর বিভিন্ন ভাবের বিরোধ ইহা পদে পদে ব্যহত করে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীন সহজ সরল গতিকে, চালিত করে তাহাকে শুধু বিরামহীন অশান্তির ভিতরে। পিতৃব্যের সহিত বিরোধই অর্ধ-উন্মাদ হ্যামলেটের দ্বন্দ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরিণতির

কারণ নহে,—সে কারণ রহিয়াছে তাহার প্রকৃতিতে,—তাহার একাধারে বীরত্ব এবং অতিমাত্রায় চিন্তাশীলতায়। হ্যামলেট শুধু বীর হইলেও আসিত না তাহার জীবনে এমন শোচনীয় পরিণতি, শুধু চিন্তাশীল হইলেও আসিত না সেই পরিণতি। মানুষের জীবনে যত জ্বালা রহিয়াছে তাহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা বড় জ্বালা এই অন্তর্দ্বন্দ্বে,—যেখানে মন মুহূর্তের জন্য পাইতেছে না একটু বিশ্রামের ঠাঁই—দেখিতেছে না সম্মুখের পথ,—শুধু সংশয় দ্বিধা, শুধু পলে পলে এদিকে ওদিকে ধাক্কা খাইয়া মরা। এই যে একটা মানসিক দ্বন্দ্বের অস্থিরতা, ইহা হইতে মৃত্যু অনেক শান্তির,—তাই মানুষ মৃত্যুর ভিতরে চাহে এই দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি। ম্যাগবেথ, ব্রুটাস, কিংলিয়ার, ওথেলো প্রভৃতি সকল ট্র্যাজেডির বীরের ভিতরেই রহিয়াছে সেই প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব,—মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যাহা মানুষকে মুহূর্তের জন্য একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে দেয় না।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, শেক্‌সপিয়ারের ট্র্যাজেডির ভিতরে ত দেখিতে পাইতেছি মানুষ নিজের অন্তর্বিপ্লবের জন্যই জীবনকে করিয়া তোলে ট্র্যাজেডি,—এখানে ত তবে আমাদের বিচারক মন কার্য-কারণের যোগ-সূত্র পাইতেছে। একটু গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, এই যে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব যাহার উপরে মানুষের যেন কিছুই হাত নাই—যাহা শুধু মানুষকে তিলে তিলে নিষ্করুণ ধ্বংসের পথেই আগাইয়া দেয়,—ইহাও সেই নিয়তির অতি সূক্ষ্ম রূপ। মানুষের হাত নাই—নিজের অন্ধ-প্রকৃতির হাতেই সে ক্রীড়নক। বিরাট হ্যামলেট্, বিরাট ব্রুটাস্, বিরাট ম্যাগবেথ,—কিন্তু তবু যেন নিরুপায় নিঃসহায়। দুর্বার প্রকৃতি যেদিকে টানিয়া লইতেছে, সমস্ত পৌরুষের গর্ব, ব্যক্তিত্বের মহিমা লইয়া মানুষ সেই দিকে ছুটিয়া চলিতেছে—কতবড় সে অসহায়, কতখানি সে নিরুপায়—কৃপার পাত্র! হ্যামলেট বা ব্রুটাসের মৃত্যুশিয়রে দাঁড়াইয়া আমরা কোনও বিচার করিতে পারি না,—তর্ক করিতে পারি না, আমাদের কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত কোন ভাল-মন্দের যুক্তিই সেখানে ঠাঁই পায় না, শুধু অসীম করুণা ও সহানুভূতি এবং গভীর-বিস্ময়-বিমথিত চিত্তে চাহিয়া দেখি আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ধরণীতে খসিয়া পড়িয়াছে, পর্বতের উত্তুঙ্গ শিখর ধরণীর সমতল ভূমিতে ধসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা ভাল হইয়াছে

কি মন্দ হইয়াছে, ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে এ প্রশ্নের কোন জবাবই আর যেন সেখানে যোগায় না।

শেক্‌সপিয়ার ট্র্যাজেডিকে বাহির হইতে মানুষের জীবনের ভিতরে আনিয়া মানুষের মূল প্রকৃতির মাঝে তাহার সন্ধান খুঁজিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেক্‌সপীয়ারও মৃত্যু ব্যতীত কখনও ট্র্যাজেডি করেন নাই, মৃত্যুই যেন ট্র্যাজেডির চরম পরিণতি। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, জীবনের সমস্যাগুলি আমাদের নিকটে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ইব্‌সেনের যুগে আমরা আসিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, মৃত্যু ট্র্যাজেডির কোনও অপরিহার্য অঙ্গ নহে, মানুষের জীবনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে অনেক সময় এমন ট্র্যাজেডি রহিয়াছে, মৃত্যু যেখানে অতি তুচ্ছ। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার ভিতরেও থাকিতে পারে যে অতলস্পর্শ বেদনা, মনুষ্যত্বের যে লাঞ্ছনা, সে হয়ত আমাদের মনোরাজ্যে একটা রাজ্যধ্বংস বা ঐ জাতীয় একটা বৃহদ্ বিপদ হইতে গভীরতায় কিছু কম নহে। ইব্‌সেন তাই দেখাইয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিবার ভিতরকার ট্র্যাজেডি। তাঁহার 'লোক-শত্রু' (An Enemy of the People) নাটকের নিরীহ বেচারা ডাক্তার 'ষ্টক্‌মান্'-এর কথাই ধরা যাক্। এই সরল সোজা সত্যকার পরোপকারী লোকটি সারা জীবন ধরিয়া যে শহরে বাস করিতেন সেই শহরের অধিবাসিগণের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সংস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরস্কার মিলিয়াছিল 'লোক-শত্রু' উপাধি; এবং যবনিকা পতনের পূর্বে দেখিতে পাইলাম স্ত্রী ও কন্যাকে অতি নিকটে ডাকিয়া তিনি তাহাদিগকে জীবনের আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় সত্য কথাটা বলিলেন,—"It is this, let me tell you—that the strongest man in the world is he who stands most alone"—জগতে যে সবচেয়ে বেশী একেলা সেই সব চেয়ে বলবান্। ইব্‌সেনের "প্রেতাত্মা" (Ghosts) নাটকে দেখিলাম, মানুষ তাহার সেই সকল দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্যই সমস্ত জীবনকে বিষাদময় করিয়া তুলিতেছে, যাহার উপরে তাহার কোনও হাত নাই—যে সকল দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা তাহার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। তাঁহার 'পুতুলের ঘর' (A Doll's House) নাটকে দেখিলাম, অভিমানিনী নোরা অকস্মাৎ একদিন

একমুহূর্তে আবিষ্কার করিয়া বসিল, যাহাকে সমগ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, যাহার মঙ্গলের জন্য জাল জুয়াচুরিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে, সে বাহিরে যাহাই হৌক, অন্তরে তাহার দরদ নোরা অপেক্ষা সমাজের মতামতের প্রতিই বেশী। এক নিমেষের ভিতরে নোরা আবিষ্কার করিতে পারিল, যে সংসারকে সুখের নীড় বলিয়া বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল সেও পুতুলের খেলাঘর মাত্র; সে পুতুলের ঘর ছাড়িয়া নোরা উধাও হইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম, ইবসেনের যে ট্র্যাজেডির বেদনা তাহা কত সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়াছে। শুধু যে বেদনাই সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা নহে,—ভিতরে-বাহিরে দ্বন্দ্বেরও পাই একটি সূক্ষ্ম রূপ। ডাক্তার ষ্টক্‌মানের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব সে তাহার পরোপকার বৃত্তি এবং পারিবারিক প্রীতিজনিত দুর্বলতার দ্বন্দ্ব। অস্‌ওয়াল্ড অ্যালভিঙ্গ-এর (Oswald Alving) জীবনে যে দ্বন্দ্ব সে তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার ভিতরে। নোরার মনের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব তাহাও গভীর প্রেম এবং প্রবল ব্যক্তিভিমানের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব,—মনের এ দুইটি বৃত্তি অন্য ক্ষেত্রে হয়ত একে অপরের সহিত সন্ধি করিয়া, বনাইয়া চলিতে পারিত, কিন্তু নোরার ভিতরে তাহা পারে নাই,—এইখানেই ট্র্যাজেডি।

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ এবং মহাভারত ব্যতীত আর কোনও ট্র্যাজেডি গড়িয়া ওঠে নাই। অবশ্য প্রসঙ্গ ক্রমে একথাটিও মনে হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যের রামায়ণ এবং মহাভারত ও কালিদাসের কিছু কিছু কাব্যাংশ বাদ দিলে জীবনের গভীরতার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যও খুব বিরল। সংস্কৃত অন্যান্য কাব্যের ভিতরে সাহিত্যের আর যে সকল কলা-কৌশল ও সৌকুমার্যই পাওয়া যাক না কেন, জীবনের স্পন্দন যেন সেখানে অতি গৌণ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে, দেখিতে পাই, ট্র্যাজেডি সাহিত্যে একেবারে অচল; কাব্যের ভিতরে যতই দুঃখ-বেদনা থাকুক না কেন, ফলশ্রুতিটি যেন হৃদয়ে কোনও বেদনার রেখাপাত না করে। কিন্তু ভারতীয় কবিকল্পনায় ট্র্যাজেডির আদর্শ যে দাঁড়াইতে পারে নাই শুধু আলঙ্কারিকগণের নিষেধেই, একথা মানিতে ইচ্ছা হয় না। সাহিত্যের ভিতরে জীবনের এই ট্র্যাজেডির দিকটি চাপা পড়িবার আরও কতকগুলি কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সাহিত্যে জীবনের স্পর্শ যেন কোথাও তেমন গভীর হইয়া উঠিতে

পারে নাই। জীবনের জটিল সমস্যাগুলিও তাই সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। তারপরে আমরা দেখিয়াছি,—জীবনকে আদিতেই অস্বীকার করিয়া কোনও ট্র্যাজেডি দাঁড়ায় না; জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকিলে ট্র্যাজেডির রূপটি কখনও চোখে ধরা পড়ে না। ভারতীয় চিন্তাধারায় এই জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তাহার অন্তর্নিহিত সত্যে—তাহার নিজস্ব মহিমার প্রতি আস্থা যেন কোন দিনই তেমন জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। মায়াবাদ যেন আমাদের মজ্জাগত, আর সেই মায়াবাদে ছাইয়া-ফেলা জল-বাতাসে জীবনের কোনও নিজস্ব গভীর মাহাত্ম্য আর দাঁড়াইতে পারিল না। আমরা আরও দেখিয়াছি,—ট্র্যাজেডির সব চেয়ে বড় রহস্য এই, জীবনে আমরা পাইতেছি যে বেদনা—জীবনের যে অপমান,—আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না তাহার কোনও কার্য-কারণ সম্পর্ক, তাই সে আমাদের নিকট একটা চিরন্তন বেদনা-ঘন অজ্ঞাত রহস্য! কিন্তু কর্মবাদের দেশে সে রহস্যও অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছে, জীবনের যে বেদনা—যে লাঞ্ছনা-অপমানকে এ জীবনের কিছু দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না, তাহার পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম কর্মবাদের সীমাহীন সূত্রকে। এই সকল কারণে মনে হয়, জীবনের যে ট্র্যাজেডির দিকটা তাহা আর ভারতীয় কবি-কল্পনাকে তেমন বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাই ভারতীয় সাহিত্য হইতে ট্র্যাজেডি লাভ করিয়াছে চির-নির্বাসন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালাদেশের আকাশে বাতাসে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা যখন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তখন বাঙলার চির-বিদ্রোহী কবি মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডির আমদানি করেন। কিন্তু 'মেঘনাদ বধ' কাব্য বা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক-এর ভিতরে মধুসূদনের নিজস্ব কোনও ট্র্যাজেডির আদর্শ দেখিতে পাই না, সেখানে তিনি গ্রীক্ আদর্শকেই বাঙলা ছাঁচে ঢালিয়াছেন মাত্র। পরবর্তী যুগে নাট্যকার হিসাবে গিরীশচন্দ্র অনেক ট্র্যাজেডি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার ভিতরে কোথাও ট্র্যাজেডির আদর্শের কোনও মৌলিকতা পাওয়া যায় না। তিনি কোথাও গ্রীক্ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও শেক্‌সপিয়ারের, কোথাও করিয়াছেন উভয়ের সংমিশ্রণ, কোথাও আবার এই সকলের উপরে ফলাইয়াছেন একটু প্রাচ্য রঙ।

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরেই আমরা বাঙলায়

প্রথম পাইয়াছি ট্র্যাজেডির একটা নিজস্ব স্বরূপ,—যাহা একটা কাব্যের কৌশল বা ধরণ মাত্র নহে,—যাহা প্রতিষ্ঠিত বাস্তব জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের উপরে। 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি উপন্যাসের ভিতরে একটা গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ছায়া রহিয়াছে সত্য। কিন্তু তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসগুলি মূলত জীবনের ট্র্যাজেডির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের এই ট্র্যাজেডি কোথায়? ঐ সেই যেখানে ব্যক্তিপ্রাণ তাহার আপন সত্তাকে বিসর্জনও দিতে পারিতেছে না, জগৎ ব্যাপারের সহিত নিজেকে বনাইয়াও লইতে পারিতেছে না,—শুধু সংসারের একটানা দুর্নিবার্য লৌহচক্রের তলে নিষ্পেষিত হইয়া মরিতেছে। এখানেও এই যে লাঞ্ছিত, ব্যথিত, নিষ্পেষিত জীবন তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমের কবিচিত্ত,—অন্তরে তাঁহার তীব্র বেদনা, অসীম সহানুভূতি! কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল, এ তাহার স্বাধীন ব্যক্তিপুরুষের স্পন্দন; কিন্তু ইহার সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্ব বাধিল সেই জগৎব্যাপারের,—ভালবাসিয়াই জীবন হইল ট্র্যাজেডি, সংসার-যন্ত্রের নিষ্পেষণে বুকভরা পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ড লইয়া কুন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কে বলিতে পারে কুন্দের বুকভরা যাহা ছিল তাহা সুধা কি বিষ! আর সুধাই হৌক, কি বিষই হৌক, তাহার জন্য কুন্দ কতখানি দায়ী ছিল? কুন্দের উপর সংসার অবিচার করিয়াছে, একথা সংসারের চোখে চোখে চাহিয়া বলা শক্ত; কিন্তু কুন্দ যে এত অপমান নিষ্পেষণের উপযুক্ত ছিল, একথাই বা বলা যায় কেমন করিয়া? সেই দুর্নিবার স্রোত—সেই অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য শক্তি—সেই নিয়তির অতি সূক্ষ্ম রূপ, সেই মানুষের অসহায়ত্ব! নগেন্দ্রও সেই শক্তির কাছেই বিপর্যস্ত; সেই অন্ধ-প্রকৃতি—গহন অন্ধকারের মুখে ঠেলিয়া চলিয়াছে,—সেও দেখিতে দেখিতে 'না-না' বলিতে বলিতেই আগাইয়া চলিতেছে, উপায় নাই! গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনের ট্র্যাজেডি, প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনের ট্র্যাজেডি—ঐ একই সূত্রে গ্রথিত। তাই ইহাদের কাহারও উপরেই যেন আমাদের নৈতিক বিচার প্রয়োগ করিতে পারি না,—করুণাময় ব্যথিত চিত্তে শুধু তাকাইয়া থাকিতে হয়, আর শুধু মনে হয়, এই ত জীবন—মানুষ কত নিঃসহায়।

সূক্ষ্মদর্শী রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডির আদর্শও চলিয়াছে সূক্ষ্মের দিকে,—'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' প্রভৃতির ভিতরে রহিয়াছে সেই সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বে জীবনের

ট্র্যাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ধারা এত বহুমুখী এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদর্শনও এমন বিভিন্নমুখী যে ট্র্যাজেডির আদর্শটি তাঁহার সাহিত্যে একটা বিশেষ কিছু হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ট্র্যাজেডির একটি গভীর এবং বিশেষ রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র দেখিলেন জীবনটি যেন মুক্তাফল, তাহাকে যত টুকরা করিয়া ভাঙা যায় প্রত্যেক টুকরার ভিতরেই প্রতিফলিত দেখিতে পাই অপূর্ব বর্ণ বৈচিত্র্যের অগাধ রহস্য, মানুষ তাহাকেই বা কতটুকু জানিতে পারিয়াছে? বেদনা শরৎ-সাহিত্যে গ্রহণ করিয়াছে অতি সূক্ষ্ম রূপ। 'মেজদিদি'র মাতৃহারা কেষ্ট যেদিন বৈমাত্র বোন কাদাম্বিনীর বাড়িতে ভাত খাইতে বসিয়া মন্তব্য শুনিয়াছিল, 'এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে'। তখন কাদম্বিনীর সেই মন্তব্যে মর্মান্তিক লজ্জায় চৌদ্দবছরের মাতৃহীন কেষ্ট যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। সে দুঃখিনী মায়ের একমাত্র ছেলে, স্বাচ্ছল্য কোনও দিন চক্ষে দেখে নাই; কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইবার অপরাধে মাতা তাহাকে কোনও দিন অপরাধী করে নাই। এখানে রাজ্যনাশ ঘটে নাই, প্রাণনাশ ঘটে নাই, শুধু আমাদের হৃদয় তন্ত্রীর সূক্ষ্ম একটি তারে পড়িয়াছে করুণ-কোমল আঘাত—তাহাতেই হৃদয়ের অন্তস্তল ভরিয়া গিয়াছে একটি করুণ বেদনার সুরে। 'অরক্ষণীয়া' জ্ঞানদা যদি জীবনের দুর্বিষহ ভারে, সমাজের নিষ্করুণ গ্লানির ভারে একদিন আত্মহত্যা করিয়া বসিত, আমরাও একদিন 'আহা' বলিয়া নিষ্কৃতি পাইতাম; কিন্তু তাহার তিনগুণ বয়সের পাত্রদের কাছেও বারবার রূপের পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সর্বজন-ঘৃণ্য, ও পাড়ার বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যের নিকটে যখন নিজে নিজে সাজ গোজ করিয়া অপরূপ বেশে একবার শেষ পরীক্ষা দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে ট্র্যাজেডিরই জীবন্ত মূর্তি। এখানেও জীবনের সেই পুঞ্জীভূত অপমান,—মানবাত্মার নিদারুণ লাঞ্ছনা। অথচ জ্ঞানদা নামক জীবটি ইহার কোন কিছুর জন্যই দায়ী নহে। সে যে গরীবের মেয়ে,—সে যে শৈশবে পিতৃহারা,—তাহার যে রূপ নাই,—ইহার কোনটার জন্য সমাজ তাহাকে দায়ী করিতে পারে? কিন্তু তথাপি তাহাকে মুখ বুজিয়া নীরবে সহ্য করিতে হয় সমাজের সকল গ্লানি,—তাহার সকল অকৃত কর্মের ফল! বেদনা-জর্জরিত জীবনের শিয়রে জাগিয়া উঠিতেছে সেই অন্ধ-নিয়তির ক্রূর হাসি!

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি,—ট্র্যাজেডির যে বেদনা সে দ্বন্দ্বের বেদনা—বাহিরের দ্বন্দ্ব অনেকেখানিই উপলক্ষ্য মাত্র,—নিরন্তর নিরবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব মানুষের অন্তরে। জ্ঞানদার জীবনেও রহিয়াছে অন্তরের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব,—তাহার ভিতরে যে বাস করিত একটি অন্তরাত্মা সে তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সহিত কিছুতেই নিজেকে মিলাইয়া দিতে পারিতেছিল না। সমাজ জীবনের সহিত তাহার ব্যক্তি-জীবনের অনেকখানিই ছিল অমিল,—আর সে তাহার ব্যক্তি-জীবনকেও সমাজ-জীবনের উর্দ্ধে টানিয়া লইতে পারে নাই, সমাজ-জীবনকেও ব্যক্তিত্বের উপরে আন্তরিক প্রাধান্য দিতে পারে নাই,—এখানেই তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির ভিতরে যেখানেই রহিয়াছে ট্র্যাজেডি সেইখানেই রহিয়াছে এই মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্ব। মানুষের জীবনের মধ্যেই এই যে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ ইহাই বর্তমান যুগ-সাহিত্যের অধিকাংশ ট্র্যাজেডির মূল। সমাজ কথাটিকেও এখানে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের আধুনিক জীবনের যে দ্বন্দ্ব তাহা ব্যক্তির সহিত পারিপার্শ্বিকের—ব্যক্তিমনের সহিত চিরাচরিত সংস্কার, চিন্তা, রীতি-নীতি, পদ্ধতির। সমাজের সংস্কারের বাহিরে আমাদেরও যে রহিয়াছে একটি স্বাধীন সত্তা, সমাজ করিতেছে সে অধিকারকে অস্বীকার ; আবার ব্যক্তি-জীবনও করিতেছে সমাজের অধিকার অস্বীকার ; এইখানেই দ্বন্দ্ব। ব্যক্তি যেখানে নিজেকে সমাজের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছে, সেখানে জীবনের কোন বিপর্যয়েই নাই ট্র্যাজেডি। ধরা যাক্ 'শেষ-প্রশ্নে'র কমলের কথা। জীবনে তাহার কত দুঃখ, কত ব্যথা,—মৃত্যু, বিরহ, বিচ্ছেদ, কিন্তু কমলের জীবনের ট্র্যাজেডি নাই। দুই দিনের জন্য ভালবাসিতেও সে প্রস্তুত,—দুইদিন পরে সে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনইতর প্রস্তুত,—মন তাহার সকল রীতিনীতির বাঁধনের বাহিরে,—জীবনে তাই নাই কোনও দ্বন্দ্ব। কিন্তু ট্র্যাজেডি রহিয়াছে 'পল্লী-সমাজে'র রমার ভিতরে, ট্র্যাজেডি রহিয়াছে 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর ভিতরে। রমার ভিতরে পাশাপাশি বাস করিতেছে দুইটি জীব, একটি তাহার ব্যক্তিসত্তা, অপরটি তাহার সমাজ-সত্তা। তাহার ব্যক্তিপুরুষ যেমন বিধবা হইয়াও সমাজ-সংস্কারকে পদদলিত করিয়া রমেশকে ভালবাসিয়াছে,—তাহার সমাজ-সত্তাও তাহাকে দিয়া ভৈরব আচার্যের পক্ষ হইয়া রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া রমেশকে জেলে পুরিয়া

লইয়াছে তাহার প্রতিশোধ। ব্যক্তি ও সমাজের যে এই বিরোধ ইহাকে রমা কোন দিনই কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই,—তাই সমগ্র জীবন তাহার ট্র্যাজেডি। কিরণময়ীর ভিতরেও ছিল একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব ; তাই সে বিধবা কুলবধূ হইয়া আবার শাড়ী পরিয়া দিবাকরকে লইয়া উধাও হইয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত দিবাকরকে নিজের হাত হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ছিল বলিয়াই যে কিরণময়ী একদিন উপনিষদের নচিকেতা-উপাখ্যানকে নিছক মিথ্যা গল্প বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই কিরণময়ীই গঙ্গার পথে অপরিচিত পথিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত,—ভগবান্‌কে কি করিয়া পাওয়া যায়! এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতেই কিরণময়ী বিকৃত-মস্তিষ্ক, তাই উপেন্দ্র যখন উপরের ঘরে বসিয়া জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করিতেছে, কিরণময়ী তখন নিচের ঘরে শুইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে! অদৃষ্টের সেই ক্রূর হাসি!

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের একটি মূল সুরই এই,—মানুষের ভিতরে রহিয়াছে একটা প্রকাণ্ড দ্বিত্ব ;—একটি তাহার অন্তর-পুরুষ—তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, অপরটি তাহার সমাজপুরুষ। এই দ্বিত্বের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া মানুষের অন্তর-পুরুষটিই লাভ করিতেছে অপমান লাঞ্ছনা,—মানুষের অন্তর-পুরুষটিকে চিরদিনই আমরা বুঝিয়াছি ভুল। এইখানেই শরৎচন্দ্রের কবিচিত্তের গভীর সহানুভূতি লাঞ্ছিত মানবাত্মার করুণ বেদনায়। এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা তীব্র বেদনা-বোধ এবং অসীম সহানুভূতি ইহাই দান করিয়াছিল শরৎচন্দ্রকে একটি সত্যকার ট্র্যাজেডির দৃষ্টি।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতপথে*

(১১)

আজিজ মনের আনন্দে অনর্গল ব'কে যাচ্ছিল আর বকতে বকতে এত উত্তেজিত হয়েছিল যে মাঝে মাঝে কথা গুলিয়ে গেলে এমনকি 'ড্যাম' পর্য্যন্ত ব'লে ফেলছিল। নিজের কাজের খবর, যে সব 'অপারেশন' সে করা দেখেছে আর যা নিজের হাতে করেছে—কত কথাই সে না বলছিল, এমনকি এমন সব খুঁটি-নাটির কথা যা শুনে মিসেস্ মূরের আতঙ্ক হচ্ছিল। তবে মিস্ কেষ্টেড মনে করছিলেন, এসব কথা বলা আজিজের উদার মনের পরিচয়; এই রকম একেবারে খোলোখুলি কথাবার্ত্তা তিনি শুনেছিলেন স্বদেশে, সব জ্ঞানীগুণীদের বৈঠকে। মিস্ কেষ্টেড ভাবছিলেন, আজিজ হোলো মুক্তপুরুষ, সম্পূর্ণ আস্থার যোগ্য, তাই মনে মনে ওকে প্রতিষ্ঠা করছিলেন অভ্রভেদী শিখরের উপর। কিন্তু বেচারির সেখানে টি঳কে যাবার মত শক্তি ছিল না—যদিও অল্পক্ষণের জন্য একেবারে অভ্রভেদী সিংহাসনের উপর না হলেও বেশ খানিকটা উঁচুতে সে উঠতে পারত। যেন পাখার ঝাপটে তাকে শূন্যে ঠেলে তোলা হচ্ছিল, তারপর আবার যেই ঝাপট থেমে যাবে অমনি সে মাটিতে নেমে আসবে।

অধ্যাপক গডবোলের অভ্যুদয়ে আজিজের কথার স্রোতে একটু ভাঁটা পড়লেও, এই চা-পার্টির শেষ পর্য্যন্ত আজিজই থাকল নায়ক। অধ্যাপক মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং একটু যেন হেঁয়ালির মতন, আজিজের বক্তৃতায় বাধা দেওয়া দূরের কথা, মাঝে মাঝে তিনি বরং বাহবাই দিচ্ছিলেন। এই সব জাতিচ্যুত লোকদের থেকে একটু দূরে একটি নিচু টেবিলে তিনি চা খাচ্ছিলেন। টেবিলটা আবার ছিল তাঁর একটু পিছনে, একটু হেলে, যেন হঠাৎ হাতে খাবার

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পঃ সঃ

ঠেকছে—এইভাবে তাঁর সেবা চলছিল। সবাই ভান করছিল যেন অধ্যাপক মহাশয়ের চা খাওয়া কেউ দেখছে না। ভদ্রলোকের বয়স খুব কম হয়নি, চেহারা রোগা, গোঁফে পাক ধরেছিল, চোখ কটা-নীল রঙের, আর বর্ণ সাহেবদের মতন উজ্জ্বল। মাথায় ছিল ফিকে বেগুনি ম্যাকারনির মতন পাগড়ি, পরণে কোট, ওয়েষ্টকোট, ধুতি, পায়ে পাগড়ির সঙ্গে রং মেলানো নকসা-কাটা মোজা। অধ্যাপক মহাশয়ের গোটা চেহারার মধ্যেই ছিল এই রকম মিল, দেখলে মনে হোতো যেন দেহে ও মনে প্রতীচীর সঙ্গে প্রাচীর সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তিনি চলছেন, কোথাও এতটুকু বৈসাদৃশ্য নাই। এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে মহিলা দুটির ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না, তাদের বিশেষ আশা হচ্ছিল আজিজের পর উনিও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলবেন। কিন্তু ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিমুখে সেরেফ খেয়ে যাচ্ছিলেন, কি যে খাচ্ছেন একবারও তাকিয়ে তা দেখছিলেন না।

মোগল বাদশাদের প্রসঙ্গ ছেড়ে আজিজ এমন সব বিষয়ে কথা শুরু করল যাতে কারও মনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল না। সে বলছিল আম পাকার কথা আর ছেলেবেলায় বর্ষার সময়ে তার খুড়োর প্রকাণ্ড আমবাগানে গিয়ে সে কিরকম পেটুকের মতন আম খেত।

"তারপর ভিজতে ভিজতে আর হয়তো পেটে ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফেরা। কিন্তু কিছু তাতে এসে যেত না, বন্ধুদেরও সব একই দশা। উর্দ্দুতে একটা প্রবাদ আছে: সবাই মিলে দুঃখ পেলে দুঃখে কি এসে যায়? আম খাবার পর এই প্রবাদটা খুব লাগসই মনে হয়। মিস কেষ্টেড, আম পাকা পর্য্যন্ত থাকবেন, কিম্বা একেবারেই এদেশে থেকে যান না কেন?"

কিছু না ভেবে চিন্তেই এডেলা জবাব দিল, "না, তা বোধ হয় সম্ভব হবে না।" যে-ভাবে কথাবার্ত্তা চলছিল তাতে ওর বা যে-তিনটি পুরুষ ওখানে ছিলেন, তাঁদের কারও কাছে এডেলার এই সব জবাব মোটেই খাপছাড়া মনে হয়নি। অনেকক্ষণ, প্রায় আধঘণ্টা, পরে নিজের কথার গুরুত্ব বুঝতে পারাতে এডেলার মনে হোলো সব প্রথম রণিকেই তার এই কথা বলা উচিত ছিল।

"আপনার মত লোক খুব কমই এদেশে আসে।"

অধ্যাপক গডবোলে বললেন, "সত্যি কথা। এ রকম অমায়িকতা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এঁদের ধ'রে রাখবার মতন আমাদের কি আছে?"

"কেন, আম ?"

সবাই হেসে উঠল। ফিলডিং বল্‌লেন, "এমন কি আমও এখন ইংল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। বরফের মতন ঠাণ্ডা কামরায় ভ'রে বিলেতে আম চালান যায়। এদেশে যেমন বিলেত তৈরি করা যায়, মনে হয় বিলেতেও তেমনি ভারতবর্ষ তৈরি করা যায়।"

তরুণীটি বললেন, "কিন্তু খরচ দুই ক্ষেত্রেই হয় একেবারে অসম্ভব।"

"তা হবে।"

"আর অতি বিশ্রী।"

কথাবার্ত্তা এরকম গুরুভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ে ফিলডিং সাহেবের তা আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এদিকে বৃদ্ধাটি কেমন যেন অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন, এর কারণ কি ফিলডিং সাহেব কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারলেন না। যাহোক্, কথার মোড় ফিরাবার জন্যে তাঁকে ফিলডিং জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি করা যায় বলুন তো ?" তিনি বললেন কলেজটা ঘুরে দেখলে মন্দ হয় না। অধ্যাপক গডবোলে একটি কদলীর সৎকারে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বাদে আর সবাই চটপট উঠে পড়ল।

"এডেলা, তোমার এসে কাজ নেই, তুমি তো কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই পছন্দ কর না ?"

"তা বটে" ব'লে মিস কেষ্টেড আবার ব'সে পড়লেন।

আজিজ ইতস্ততঃ করছিল। তার শ্রোতারা দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পরিচিতেরা যাচ্ছিল কলেজ দেখতে, কিন্তু মন-দিয়ে শোনার দল ছিল ব'সে। এই চা-পার্টিটা নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার ভেবে আজিজও থেকে গেল।

কথা চলতে লাগল ঠিক পূর্ব্ববৎ। "এই বিদেশী অতিথিদের কি কাঁচা আমের সরবৎ দেওয়া যেতে পারে ?" "ডাক্তার হিসেবে আমি বলব—না।" প্রবীণ ভদ্রলোকটি বললেন, "কিন্তু আমি আপনাদের কিছু ভালো মিষ্টি পাঠিয়ে দেব—যা' খেলে অসুখের কোনো সম্ভাবনা নাই। এটুকু আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হব কেন ?"

আজিজেরও খুব ইচ্ছা ছিল মিষ্টি পাঠায়, কিন্তু বেচারির তো স্ত্রী নাই, কে মিষ্টি পাক করবে ? তাই খুব বিষণ্ণভাবে ও বলল, "মিস কেষ্টেড, অধ্যাপক

গডবোলের বাড়ির মিষ্টি অতি উপাদেয়। তা খেলে বুঝবেন সত্যিকারের দেশী খাবার কি রকম। আমার এরকম অবস্থা নয় আপনাদের কিছু দিতে পারি।"

"কেন যে এরকম কথা বলছেন, আপনার বাড়িতে তো আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।"

নিজের বাংলোর কথা ভেবে আজিজের আবার আতঙ্ক হোলো। সর্ব্বনাশ—ঐ মেয়েটি ওর মুখের কথা একেকারে হুবহু বিশ্বাস করেছে। কি করা যায় ? ও বলল, "হ্যাঁ, তা তো ঠিকই আছে—মারাবার গুহাতে আপনাদের সকলকে আমি নিমন্ত্রণ করছি।"

"সে খুব চমৎকার হবে।"

"আমার সামান্য কতকগুলো মিষ্টির চাইতে এ ঢের বেশি বড় জিনিষ হবে। কিন্তু মিস কেষ্টেড কি এই সব গুহা এতদিন দেখেন নি ?"

"দেখা তো দূরের কথা—শুনিও নি।"

দুজনেই ব'লে উঠলেন, "সে কি কথা, শোনেন নি ! মারাবার পাহাড়ের মারাবার গুহার কথা ?"

"ক্লাবে শোনার মত কথা কিছু শোনা যায় না—এক টেনিস আর বাজে গুজব ছাড়া।"

প্রবীণ ভদ্রলোকটি ছিলেন নীরব। বোধ হয় এরকম ভাবে স্বজাতির সমালোচনা তাঁর কানে বিসদৃশ লাগছিল। কিম্বা তাঁর ভয় হচ্ছিল সায় দিলে পাছে তাঁর আনুগত্যের অভাব ও কর্ত্তাদের কাছে ফাঁস ক'রে দেয়। কিন্তু তরুণ যুবক চট করে ব'লে ফেলল, "হ্যাঁ, তা জানি।"

"তা'হলে যা পারেন সব বলুন, না হলে কোনোদিন ভারতবর্ষকে আমি বুঝতে পারব না। এই পাহাড়গুলিই কি বিকালে মাঝে মাঝে দেখা যায় ? এই গুহাগুলো কি ব্যাপার ?"

আজিজ বুঝিয়ে বলার ভার নিল ; কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল সে নিজেও কোনোদিন ঐসব গুহাতে যায় নাই, যাবার ইচ্ছা অবশ্যি সর্ব্বদাই ছিল, কিন্তু চাকরি বা নিজের কাজ, একটা না একটা বাধা ঘটেছে, আর তা ছাড়া ওগুলো দূরও কম নয়। অধ্যাপক গডবোলে আজিজকে নিয়ে একটু মজা করে নিলেন,

"আরে, মশায়, বলেন কি? চালনি আর ছুঁচের কথা শুনেছেন তো—মনে রাখবার মতন।"

এডেলা জিজ্ঞাসা করল, "গুহাগুলো খুব বড় নাকি?"

"না, খুব বড় নয়।"

"কি রকম একটু বলুন না।"

"নিশ্চয়।" অধ্যাপক মহাশয় চেয়ার কাছে টেনে বসলেন। মুখের ভাব হোলো তাঁর খুব গম্ভীর। সিগারেটের বাক্সটা নিয়ে এডেলা অধ্যাপক মহাশয় আর আজিজের সামনে ধ'রে নিজেও একটা ধরালো। বেশ খানিকটা চুপ করে থাকার পর গডবোলে বললেন, "পাহাড়ের গায়ে একটা ফাঁক আছে, তার মধ্য দিয়ে ঢুকতে হয়, ঢুকেই গুহা পাওয়া যায়।"

"কতকটা বুঝি এলিফান্টার মতন?"

"মোটেই না, এলিফান্টায় শিব আর পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে, মারাবারে মূর্ত্তিটুর্ত্তি কিছু নাই।"

আজিজ বর্ণনায় একটু সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে বল্‌ল, "কিন্তু খুব পবিত্র জায়গা ঐ গুহাগুলো, না?"

"না, না—একেবারেই তা নয়।"

"তবু, বেশ কাজ আছে তো?"

"না।"

"তাহলে ওদের এত নাম কেন? সবাই বলে মারাবার গুহার কথা, এমনি তাদের খ্যাতি। বোধ হয় আমাদের ফাঁপা গর্ব্বমাত্র।"

"ঠিক তা' মনে হয় না।"

"তা'হলে এঁকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলুন না ব্যাপারটা কি?"

"বিলক্ষণ।" কিন্তু তবু তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আজিজের মনে হোলো এই গুহাগুলো সম্বন্ধে তিনি কি একটা রহস্য ঢাকবার চেষ্টা করছেন। তার নিজেরও অনেক সময়ে এই রকম অনেক কথা জোর ক'রে চাপা দেওয়ার প্রবৃত্তি হোতো। অনেক সময়ে সে কোনো একটা বিষয়ের আসল কথাটা চেপে গিয়ে অজস্র খুঁটিনাটি নিয়ে এমন বাজে বকত যে, ক্যালেণ্ডার সাহেব একেবারে খাপ্পা হ'য়ে বলতেন, আজিজ লোকটা ভারি বাঁকা। হয়তো তাঁর কথা খানিকটা

সত্যি—শুধু উপর উপর দেখলে। সত্যি বলতে ও ছিল অসহায়, কোন এক খামখেয়ালী শক্তি যেন জোর ক'রে ওর কথা চাপা দিত। গডবোলেরও অবস্থা হয়েছিল তথৈবচ, কি একটা কথা—ইচ্ছে থাকলেও—কিছুতেই তিনি প্রকাশ ক'রে বলতে পারছিলেন না। কেউ ওঁকে তেমন ক'রে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলতেন যে মারাবার গুহায় আছে সব—কি জিনিষ? অদ্ভুত রকমের পাথর? আজিজ অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

এমন মধুর হালকা ভাবে কথাবার্ত্তা চলছিল যে এর আসল গতি কোন্‌দিকে এডেলার ধারণাতেই তা আসেনি। সে বোঝেনি ঐ সরল-প্রাণ মুসলমান যুবকটির মন উতলা হয়েছিল আদিম অন্ধকারের সন্ধান পেয়ে। আজিজের পক্ষে এ যেন একটা রোমাঞ্চকর খেলার মতন। হাতের খেলনা একটি মানুষ, কিছুতে এই খেলনাকে ও বাগ মানাতে পারছিল না। বাগ মানাতে পারলে তার বা অধ্যাপক গডবোলের যে অণুমাত্র সুবিধার সম্ভাবনা ছিল তা নয়, কিন্তু তবু সে মুগ্ধ হ'য়ে মেতেছিল শুধু বাগ মানানোর চেষ্টায়—এ যেন তার কাছে দার্শনিক চিন্তার সামিল। বেপরোয়া ও বক্‌বক্ ক'রে যাচ্ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশলে ওর চাল হচ্ছিল বারবার ব্যর্থ, তিনি মানতেই চান না যে ও আবার চাল দিচ্ছে। যত ও চেষ্টা করে মারাবার গুহার রহস্য জানবার জন্য ততই তা যায় দূরে স'রে।

এমন সময়ে হলো রণির আবির্ভাব। বাগানের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "ফিলডিং-এর কি হোলো? মা কোথায়?" তার গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে বেরোচ্ছিল, তার কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না তা লুকোবার।

মিস কেষ্টেড খুব সহজ ভাবে বললেন, "গুড্ ইভনিং"।

"আপনাকে আর মাকে এখনি যেতে হবে—পোলো খেলার কথা আছে।"

"আমি ভেবেছিলাম পোলো বুঝি আজ হবে না।"

"সব বদলে গেছে, কয়েকজন সোল্‌জার এসে উপস্থিত—এলে পরে সব বলব।"

"আপনার মা আসছেন"—অধ্যাপক গডবোলে এই কথা বললেন। রণির আগমনে তিনি খুব সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। "এই বাজে কলেজে দেখবার তো ভারি আছে"।

রণি তাঁর কথায় কান না দিয়ে শুধু এডেলাকে লক্ষ্য ক'রে তার বক্তব্য ব'লে যাচ্ছিল। পোলো দেখতে এডেলার নিশ্চয় ভালো লাগবে এই ভেবে সে নাকি

ওকে পোলো খেলা দেখাবার জন্মে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চ'লে এসেছিল। ওখানে আরো দুটি ভদ্রলোক ব'সেছিলেন; রণি যে ইচ্ছা ক'রে তাঁদের সঙ্গে অভদ্রতা করছিল তা নয়, তবে এক সরকারি কাজ ছাড়া আর কোনো সূত্রে দেশী লোকদের কথা সে ভাবতেই পারত না ; আর ঐ দুটি লোক আবার তার অধস্তন কর্ম্মচারীদের কেউ নয়, সুতরাং শুধু দুটি সাধারণ মানুষ হিসাবে তাদের কথা রণির মাথা থেকে একেবারে বেমালুম লোপ পেয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আজিজও ছাড়বার পাত্র নয়। এই খানিকক্ষণ ধরে যে অন্তরঙ্গ ভাব জ'মে উঠেছিল তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এমনি করে তা হঠাৎ মাঠে মারা যায়। অধ্যাপক গডবোলের সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ায়নি, তার ওপর আবার বেয়াড়ার মতন খুব পরিচিত স্বরে সে ডাকল, "মিষ্টার হিস্‌লপ, যতক্ষণ আপনার মা না আসেন, আমাদের কাছে এসে বসুন না।"

রণি তার উত্তরে ফিলডিং-এর এক চাকরকে হুকুম দিল চট্‌পট্‌ তার মনিবকে ডেকে আনতে।

"ও বেচারি হয়তো আপনার কথা বুঝবে না—এই যে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি"—ব'লে শুদ্ধ হিন্দিতে রণির হুকুম সে চাকরটিকে আবার শোনাল।

রণির ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে দুকথা শুনিয়ে দেয়। এই ধরণের—সব ধরণেরই—ভারতবাসীদেরই সে বিলক্ষণ চিনত। বিলিতি-ভাবাপন্ন আবদারে ধরণ হোলো এই আজিজ। কিন্তু কি করে? সে হোলো সরকারী কর্ম্মচারী—গণ্ডগোলের সৃষ্টি যাতে না হয় এই দেখাই তার কর্ত্তব্য—সুতরাং কিছু না ব'লে সে আজিজের সব বেয়াদবি একেবারে উপেক্ষা ক'রে গেল। আজিজের বেয়াদবির আর অন্ত ছিল না, প্রত্যেক কথার সুরে তার কেমন একটা বেখাপ্পা আওয়াজ ছিল। বেচারি উর্দ্ধে তার কল্পলোক থেকে মাটিতে নেমে আসছিল, কিন্তু কি তার চেষ্টা শূন্য আঁকড়ে থাকতে। হিস্‌লপ কখনো তার ক্ষতি করেন নি, তাঁর সঙ্গে বেয়াদবি করার অভিপ্রায় ওর মোটেই ছিল না—কিন্তু এই এংলো ইণ্ডিয়ানটি যতক্ষণ না সহজ মানুষের মতন হ'য়ে ওঠেন ততক্ষণ তার আর সোয়াস্তি ছিল না। মিস্ কেষ্টেডের সঙ্গেও ভীষণ অন্তরঙ্গতা করার জন্মে যে ও উৎসুক ছিল তা নয়, ও শুধু চেয়েছিল মিস কেষ্টেডের সমর্থন। আর গডবোলের সঙ্গেও খুব একটা হাসি ঠাট্টা করার আগ্রহও হয়নি। অদ্ভুত এই চারটি লোকের সমাবেশ।

আজিজ কল্পলোক থেকে ধরাশায়ী হবার উপক্রম, রণি তো প্রায় ক্ষিপ্ত বললেই চলে, মিস কেষ্টেড এই অতর্কিত বিশ্রী ব্যাপার দেখে একেবারে ভ্যাবাচাকা—আর ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিত যেন কিছুই লক্ষ্য করবার নাই—এই ভাবে হাতের ওপর হাত আর মাটিতে চোখ রেখে সবাইকে লক্ষ্য ক'রে চলেছেন। ঐ সুন্দর হল-ঘরটির নীল থামগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে এরা ছিল—বাগানের ওপারে দূর থেকে এদের দেখে ফিলডিং-এর মনে হোলো এ যেন এক নাটকের দৃশ্য।

রণি মাকে ডেকে বলল, "কষ্ট ক'রে এতটা এসে কাজ নেই, আমরা এখুনি যাচ্ছি।" তারপর তাড়াতাড়ি ফিলডিং-এর কাছে গিয়ে তাকে একপাশে টেনে খুব আন্তরিকতার সুরে বলল, "কিছু মনে করবেন না, ভাই, কিন্তু মিস কেষ্টেডকে ও রকম একলা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই।"

ফিলডিং-ও সেই রকম আন্তরিকতার ভাব দেখিয়ে বললেন "ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন, কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো?"

"দেখুন আমাকে হাড়ে-ঘুণ-ধরা সাহেব বলুন আর যাই বলুন, কিন্তু দুটি ভারতবাসীর সঙ্গে ব'সে একজন ইংরেজ মেয়ে সিগারেট ফুঁকছে,—এটা ঠিক আমার বরদাস্ত হয় না।"

"উনি তো নিজে থেকেই ওখানে ব'সে রইলেন—আর সিগারেট ফুঁকছেন তাও সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয়।"

"হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডে অবিশ্যি এসব চলতে পারে।"

"এখানে হানি কি সত্যি তা বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না তো পারছেন না। ঐ লোকটা একটা আস্ত অসভ্য—তাও বুঝছেন না?"

আজিজ মহা সমারোহে মিসেস্ মূরকে উপদেশ দিচ্ছিল।

"অসভ্য ও মোটেই নয়—একটু উত্তেজিত হয়ে আছে।"

"কি এমন ঘটেছে ওর উত্তেজনার কারণ?"

"কি জানি। আমি যখন উঠে যাই তখন তো ও ভালোই ছিল।"

রণি আশ্বাস দিয়ে বলল, "যাহোক আমার জন্মে কিছু হয়নি। আমি ওর সঙ্গে একটি কথাও বলিনি।"

"যাক্। ফাঁড়া তো কেটে গেছে। এখন তাহলে মেয়েদের নিয়ে যান।"

"ফিলডিং, সত্যি মনে করবেন না, আমি এতে একটুও চটেছি, কি কিছু। আপনি বোধহয় পোলো দেখতে আসতে পারবেন না? কিন্তু সবাই খুব খুসি হতাম।"

"না, আমার আর হ'য়ে উঠবেন না। তবু, আপনি যে কষ্ট করে বললেন খুব ভালো লাগল। সত্যি, ভারি খারাপ লাগছে আপনার চোখে আমার ত্রুটি ঘটেছে ব'লে। এ কিন্তু একেবারে আমার ইচ্ছাকৃত নয়।"

এই ভাবে হোলো বিদায়-সম্ভাষণের সুরু। প্রত্যেকেরই হয় বদ মেজাজ নয় মন খারাপ। মাটি থেকেই যেন বদ মেজাজ উঠে আসছিল। ফিলডিং-এর পরে মনে হয়েছিল যে স্কটল্যাণ্ডের কোনো 'মূর'-এ বা ইটালিয়ান পাহাড়ে কি কেউ এতটা ছোটলোকোমি করতে পারত? ভারতবর্ষে একবার মেজাজ বিগড়ে গেলে যেন কিছুতেই আর মন শান্ত হতে চায় না। শান্তভাব কোথাও নাই কিম্বা সব কিছুকে তা গ্রাস ক'রে বসে, অধ্যাপক গডবোলের বেলায় যা ঘটেছিল। এই আজিজ—এমনি জঘন্য একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দেয়, আর মিসেস্ মূর ও মিস কেষ্টেড—ছুটি আস্ত বোকা, তিনি নিজে আর মিষ্টার হিস্‌লপ—ওপর ওপর ছুজনেই ভারি ভদ্র, ছুজনেরই ব্যবহার যেমন ঘৃণ্য তেমনি ঘৃণা তাঁদের পরস্পরের প্রতি।

"মিষ্টার ফিলডিং, তবে আসি। কি সুন্দর সত্যি কলেজের বাড়িটা।"

"নমস্কার, মিসেস মূর।"

"আসি মিষ্টার ফিলডিং, চমৎকার কাটল।"

"নমস্কার মিস কেষ্টেড।"

"ডক্টর আজিজ নমস্কার।"

"নমস্কার, মিসেস্ মূর।"

"ডক্টর আজিজ, নমস্কার।"

"নমস্কার, মিস কেষ্টেড।" আজিজ নিজের সহজভাব দেখাবার জন্যে মিস কেষ্টেডের হাত ধরে প্রাণপণে নাড়া দিয়ে দিল। "ঐ সব গুহার কথা কিন্তু ভুলবেন না। কেমন? আমি চট্ ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেলব।"

"ধন্যবাদ।"

যেন শয়তানী বুদ্ধির প্রেরণায় সে শেষ কথা না ব'লে পারল না, "ভারি আক্ষেপের বিষয় এত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবেন। আর একবার ভেবে দেখুন না, থেকে যান, কেমন?"

হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত ভাবে মিস কেষ্টেড উত্তর দিলেন, "অধ্যাপক মশায়, নমস্কার! আপনি গান শোনালেন না, ভারি কিন্তু অন্যায়।"

"তা এখন গান করতে পারি"—বলে সত্যি তিনি গান গাইলেন।

তাঁর মিহি গলা থেকে অনবরত শব্দ হতে লাগল। এক একবার যেন তাতে ছন্দের দোল ফুটে উঠছিল, এক একবার মনে হচ্ছিল যেন বিলিতি গানের মতন। কিন্তু বারবার বোঝার চেষ্টার পর হার মেনে তাঁদের কান শব্দের চক্রব্যূহে শুধু পাক খাচ্ছিল।

শুনতে কটু নয়, কিন্তু কোনো অর্থ এই গানের ছিল না। অর্থ পেল শুধু চাকররা। তারা কানাকানি সুরু ক'রে দিল। পুকুরের জলে যে লোকটি পানিফল তুলছিল সে পরণে কিছু না পরেই জল থেকে উঠে এল, আনন্দে তার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল, খোলা মুখের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল তার টকটকে লাল জিভ। হঠাৎ শব্দ গেল থেমে, মাঝপথে গানের অবসান হোলো, একটা তালের প্রচেষ্টা শেষ হতে না হতেই।

ফিল্‌ডিং জিজ্ঞাসা করলেন, "অনেক ধন্যবাদ, ওটা কি হোলো?"

"বুঝিয়ে বলছি। এটা একটা ধর্ম্ম-সঙ্গীত। আমি যেন এক গোপিকা, শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে বলছি, এস, একলা আমার কাছে এস। কিন্তু দেবতা আসতে চান না। তখন আমার মনে বিনয় ভাব এলো, বললাম, শুধু আমার কাছে না, একশ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে আমার একশ সখীর কাছে যেয়ো—কিন্তু হে বিশ্বপতি একজন এস আমার কাছে। কিন্তু তিনি আসতে চান না। এই রকম চলল কয়েকবার। এখন বিকাল হয়েছে, তাই বিকালের রাগে গানটি বাঁধা।"

মিসেস্ মূর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু অন্য কোনো গানে তিনি নিশ্চয় আসেন?"

হয়তো তাঁর প্রশ্ন ঠিক বুঝতে না পেরে গডবোলে বললেন, "না, তিনি আসতেই চান না। আমি শুধু ডাকছি, এস, এস, এস, এস, এস। তাঁর আসার কোনো লক্ষণই নাই।"

রণির পায়ের শব্দ গিয়েছিল মিলিয়ে। মুহূর্ত্তের জন্য সব স্তব্ধ হয়েছিল। জলে একটি ঢেউ নাই, একটি পাতা কোথাও নড়ে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

বিশ্বরূপ

(Credo)

না-পাওয়ারও মাঝে চাওয়া রয় কেমনে—জানো তুমি,
“পাই না মলয়”—বলি: তবু ছায় ফুলে মোর মন-ভূমি।
থেকে থেকে শিহর আলো
বান ডেকে যায়—নেভে কালো:
তখন দেখি—ছিলে তুমিই তুলতে বন্ধ্যা বন কুসুমি',
মেলে নি দল বাইরে—ছিলে অন্তরে বীজ-রূপে তুমি।

তাই তো ভুবন হাসে—তোমার গহন-গানের গন্ধভরা,
ধায় নদী উচ্ছ্বাসে—তোমার উছল ঢেউয়ে কলস্বরা।
তাই তো তোমার সিন্ধুটানে
সীমা তরি অসীম তানে,
তাই অধরা নামে ধরায়: দিগ্বধূ—নীলবসনপরা,
কাঁটার ভ্রান্তি বিলাপ তোমার কান্তি-গোলাপ-গন্ধভরা।

শিশুর কলকণ্ঠে তাই তো হয় উদ্বেল সরলতা,
যৌবন-বসন্ত-গানে শুনি জীবনজয়বারতা।
সখার রাখী সখীর প্রীতি
আনে তোমার গভীর স্মৃতি,
মঞ্জু মধু যেথাই ঝরে তোমার কমল কয় যে কথা:
সহজিয়ার দীক্ষা আমায় দেয় তোমারি সরলতা।

জ্যোৎস্নারাতে কুহুধ্বনি বিছায় তোমার স্বপন-আভাস,
আন্‌মনা মন চম্‌কে ওঠে—বইলে তোমার চরণ-বাতাস!
ভুবন তোমার রত্ন-ব্রতী,
তাই না তোমার মগ্ন জ্যোতি

মন্ত্র শোনায় নীহারিকায় বহ্নিবীণা বাজায় আকাশ:
কাঁপে গানের ইন্দ্রধনু পেয়ে তোমার রঙের আভাস।

একলা ঘরে তাই প্রিয়, আর রইব না নিরুদ্ধ-নয়ন,
তোমার অতুল প্রেমবাগানে ফুল অফুরান করব চয়ন।
গাঁথতে মালা আজ সেখানে
ডাক দিয়েছ দোদুল গানে—
সুরের সোনায় রাগের চারু চুম্‌কি-কারু করতে বয়ন
সাজিয়ে তোমায় মণিহারে—রুদ্ধ কেন করব নয়ন?

কত জনাই প্রদীপ জ্বালে—সহায়শিখা তুমিই দিও:
তোমার বিভা যে-ই যাচে—সে-ই রইবে আমার বরণীয়।
ভাসুক তা'রা আপন ভাবে,
আমায় তুমি মোর স্বভাবে
ঠাঁই দিও পায়—আমার তরী তোমার লক্ষলহরপ্রিয়:
আমার পালে তোমার কৃপার একটি পবনকাঁপন দিও।

নিখিলপ্রীতির জলতরঙ্গে হোক আজ আমার স্বপন-বাওয়া,
আপনারে বিলিয়ে দিয়েই হোক পরিপূর শরণ-পাওয়া।
বিসর্জনীর গর্ব-বিলাস
নয় আর, নয় বিদায়-উছাস,
আমার আবাহনের তালে যাচি তোমার অপার হাওয়া:
কূলের যাচাই রেখে শেখাও অকূলবাগে তরী-বাওয়া।

কূল কেন চাই পারাবারে—তুমি যখন ধরো বাতি?
ভরাডুবির শঙ্কা কেন—তুমি যখন আছ সাথী?
ধূলায় কেন ধূলা মানি?
মাণিক যে কী—তাই কি জানি?
ক্ষণোচ্ছ্বাসী ঝিকিমিকি গণি' ধ্রুবতারার ভাতি
দেখি না তো—রূপরাজের নিঃশেষহীন বিহার-বাতি।

জ্বলে নিশায় সাঁঝ বিহানে, জ্বলে সুখে, অশ্রুব্যাথায়,
তাই তুফানে অচল দিশা ঝল্‌কে ওঠে অমানিশায়।
কর্মে তোমার বিজয়তিলক
মর্মে জাগায় মলয়পুলক,
নর্মে তোমার নৃত্যনিঝর ছরে অঝোর লাস্যলীলায় :
রণন তোমার বাজে প্রতি কাঁটায় ফুলে হর্ষে ব্যথায়।

বিশ্বপতি! তোমার বাঁশি বিশ্বরূপে করব বরণ,
নমি' সবায় প্রেমদীনতায় শুনব তোমার নূপুরচরণ।
ধুলায় আমার তীর্থ-আশা,
আনে সেথায় ভালোবাসা
আলোকলোকের জয়ধ্বনি—তাই দীপালিমুখর গগন :
আঁখিমণি হ'ল মণি তোমার মণি করি' বরণ।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গরুর গাড়ি

চলে জীবনের দুর্গম কান্তারে
বঙ্কিত পথে পান্থবৃষভযান,
প্রতি আবর্তে মুখরায় দুই ধারে
যুগল চাকায় ভারাক্রান্তপ্রাণ।
কোন্ সে প্রভাতে এসেছে পল্লী ছাড়ি,
দিন শেষ ক'রে দিয়েছে রাতের পাড়ি ;
আধেক রজনী এখনো অন্ধকারে,
এখনো সরণী সম্মুখে অফুরান॥

গাড়ির উপরে পাশা-পাশি সারি সারি
পুরানো চটের থলিগুলি যত রয় ;
কত সযতনে রেখেছে ভিতরে তারি
সোনার শস্য, সাধনার সঞ্চয়।
পাকা ফসলের প্রান্তরমন্থিত
মণি-মুক্তার অভিযান রঞ্জিত ;
বৃদ্ধ চালক আধঘুমে মাথা নাড়ি'
কোন্ সুদূরের স্বপনে মগ্ন হয়॥

ওরি সাথে যেন অনন্ত কাল চলে
ধরি মর্ত্যের সুবর্ণ-সম্ভার ;
দিবসনিশার যুগল চাকার তলে
কোন্ সে উষার পানে বহে অভিসার।
শত-শতাব্দী-আবর্ত্ত-সংঘাতে
ভরে দিগন্ত আকুল আর্ত্তনাদে,
তবু উজ্জ্বল স্বপনের শিখা জ্বলে
উদয়সূর্য্য-শশাঙ্ক-তারকার॥

কোন্ রাজধানী জেগেছে তাহার মনে,
কোন্ রাজপথ আহ্বান করে তারে ;
কোন্ সে রাজার উৎসব-প্রাঙ্গণে
উজাড় করিয়া ঢেলে দেবে আপনারে।
বাহনের মুখ পাংশু ফেনায় মাখা,
মাটি কেটে কেটে চলছে কাঠের চাকা
মেদিনীর বুকে গভীর আলিম্পনে
বিদীর্ণ করি' বিদ্রোহী পন্থারে॥

নিশিকান্ত

পুস্তক-পরিচয়

From Lenin to Stalin—by Victor Serge (Secker & Warburg.)

Victor Serge ট্রট্স্কি-মতাবলম্বী কম্যুনিষ্ট। তাঁর মতে মুখ্যত ষ্টালিন এবং আরও কয়েকটি স্বার্থান্বেষী কম্যুনিষ্ট ট্রট্স্কিয়িষ্টদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে 'dictatorship of the proletariat'-এর বদলে 'dictatorship of the secretariat' স্থাপন করে নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রুষ জনসাধারণকে প্রতারিত করে, রুষ বিপ্লবকে হত্যা করে এই মুষ্টিমেয় শক্তিগৃধ্নু বিশ্বাসঘাতকের দল এক নূতন স্বত্ব-বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের রাজ্য স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে আবার ষ্টালিনই হলেন সর্ব্বপ্রধান ষড়যন্ত্রকারী। নিজের ব্যক্তিগত শক্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে বজায় রাখা হল তাঁর এক মাত্র উদ্দেশ্য। আলোচ্য বইখানিকে Third International-এর ইতিহাসের ট্রট্স্কীয় অনুবাদ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর বইকে ঠিক ইতিহাসের কোঠায় ফেলা যায় না। যাই হোক এখানে ইতিহাসের সংজ্ঞা বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক হবে।

লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিন এবং ট্রট্স্কির মধ্যে কমিণ্টার্নের কার্য্যনীতি সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব বাধে। ট্রট্স্কি এবং তাঁর সমমতাবলম্বীরা Opposition দল হিসাবে গড়ে উঠেন। ক্রমে তাঁরা Party'র অনুশাসনদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ শেষে সমাজতন্ত্র গঠনের পথে এত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় যে তাঁদের শাস্তি এবং নির্ব্বাসন ভিন্ন একটা শিশু-রাষ্ট্রের পক্ষে গত্যন্তর আর কিছু থাকে না। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সরকারী মতের বিজয়কে ষ্টালিনের ব্যক্তিগত বিজয় বলা ঠিক হবে না, যদিও এ কথা কতকটা স্বীকার্য্য যে সঙ্ঘর্ষটা ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘর্ষও ছিল বটে। ষ্টালিন এবং ট্রট্স্কির মত-বৈষম্য প্রকাশ পায় ষ্টালিনের 'Socialism in one country' এবং ট্রট্স্কির 'Permanent revolution' মতবাদে। কোন্ মতটি শুদ্ধ এবং কোন্ মতটি ভ্রান্ত সে-বিচার সময়সাপেক্ষ। ইতিহাসের

সিদ্ধান্ত কি হবে আমরা তা আগে থেকে ধরে নিতে পারি না। কিন্তু ঘটনা-স্রোতের গতি নিরীক্ষণ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রেখে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি। সেই হিসাবে আমরা ষ্টালিনীয় কর্ম্মপদ্ধতির সার্থকতা দেখতে পাই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায়, সংস্কৃতির প্রগতিতে এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিমণ্ডলে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের শক্তিমত্তায়। ষ্টালিনের অধিনায়কত্বে সমাজতন্ত্রবাদ অগ্রসর হয়েছে। এক দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কার্য্য অনুসরণ করা সত্ত্বেও কমিণ্টার্ন আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যের কথা বিস্মৃত হয়নি (সোভিয়েট-রাষ্ট্র এবং কমিণ্টার্নের মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ নেই)। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ সারা জগতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেরণার উৎস এবং ভরসার স্থল। যে সর্ত্তগুলি পূরণ হলে সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ত আজ রুষদেশে সে-সর্ত্তগুলি পূরণ হয়েছে। লেনিন বলেছিলেন এবং ট্রট্স্কিও বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্রবাদকে বাঁচাতে হলে সোভি-য়েটের শিল্পোৎপাদিকা শক্তিকে ধনিকতন্ত্রী জগতের শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তাকে নিজের কলকব্জা উৎপন্ন করতে হবে। এ দুটিই আজ রুষদেশে ঘটেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ ধনিকতন্ত্রী জগতের মাঝে সগর্ব্বে মাথা উন্নত করে দাঁড়াতে পেরেছে। Serge অভিযোগ এনেছেন যে Five Year Plan সমরসজ্জার নামান্তর মাত্র এবং বেকার সমস্যার সাময়িক উপশামক সমাধান। তাঁর আরও অনেকগুলি যুক্তির মত এটিও তাঁর ব্যক্তিগত মতের অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত মাত্র। রাশিয়ার আত্মরক্ষার জন্য যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন আছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপাদিকা ক্ষমতা যে প্রধানতঃ অস্ত্রশস্ত্র উৎপন্ন করায় নিযুক্ত হয়েছে এ কথা নিছক অন্ধ পক্ষপাত না থাকলে বলা সম্ভব নয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্পের এবং শিল্পবিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই—'cooked statistics'-এর জন্য বাদ সাদ রেখেও। প্রত্যহের ব্যাবহারিক কার্য্যপদ্ধতিতে শাশ্বত বিপ্লব-বাদের সমর্থন না করা সত্ত্বেও সোভিয়েটের কৃতিত্ব অন্যান্য দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ব্যাহত না করে সাহায্যই করেছে। কমিণ্টার্নের যদি বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই ঘটে থাকে তাহলে ধনিকতন্ত্রী দেশগুলির এত ভীতি এবং স্নায়বিক চাঞ্চল্যই বা কেন, 'Moscow gold'-এর সর্ব্বব্যাপকতাই বা

কেন? চীনের সোভিয়েট আন্দোলন মস্কো থেকেই পরিচালিত হয়েছে এবং স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টও সোভিয়েট রাশিয়া থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। ট্রট্স্কিয়িষ্টদের দাবী সত্ত্বেও স্পেনের বিপ্লবী আন্দোলনে ট্রট্স্কিয়িজ্‌ম্-বাদী P.O.U.M. তেমন কার্য্যকরী প্রভাবসম্পন্ন হতে পারেনি।

ট্রট্স্কিয়িষ্টরা হ'লেন বিপ্লবী যুগের উচ্ছ্বাসপ্রবণ আদর্শবাদীদের দল। তাঁদের সে-যুগের রোমাণ্টিক স্বপন দৈনিক জীবনের কঠোর বাস্তবতার মধ্যেও তাঁরা ভুলে যেতে পারেননি বলেই ট্রট্স্কিয়িষ্ট্ মতবাদ জগতের একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে। মার্ক্সের মতামতকে পয়গম্বরের বাণীর মত অন্ধবিশ্বাসে প্রয়োগ করে ট্রট্স্কিয়িষ্টরা ডায়েলেকটিক্স সম্বন্ধে অজ্ঞতারই প্রশস্ত পরিচয় দিয়েছেন। যে eclectic দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন বিদ্রূপ করে গেছেন ট্রট্স্কিয়িষ্টরা সেই দৃষ্টিভঙ্গীই অবলম্বন করেছেন। ষ্টালিন ডায়েলেকটিকাল পদ্ধতি বোঝেন। তার নমুনা পাওয়া যায় তাঁর প্রসিদ্ধ "Dizzy with success" বক্তৃতায় যখন তিনি সম্পূর্ণ সমষ্টীকরণ স্থগিত রেখে artel farming—কৃষি জমীর আংশিক সমষ্টীকরণ—প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব করেন। সেই উপদেশ অনুসৃত হয়েছিল বলে আজ 'কুলাক'-বর্জ্জিত সোভিয়েট রাষ্ট্রে চাষের জমি সমস্ত কৃষাণদের যৌথ সম্পত্তি। ষ্টালিনিষ্টদের ভ্রান্তিস্বীকার প্রতিকূল সমালোচনার বলবত্তা হরণ করে নেয়।

সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব সারা ধনিক-জগতের ভীতির কারণ। আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার এই প্রবল অবস্থার জন্য ষ্টালিনিজ্‌ম্ই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কিন্তু ষ্টালিনিজ্‌ম্ মানে ষ্টালিনের ব্যক্তিগত শাসন নয়। লেনিনিজমের মত ষ্টালিনিজ্‌ম্ও মার্ক্স-বাদের যুগবিশেষ। মার্ক্সবাদ জড় বিশ্বাস নয় বলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে এইভাবে অভিহিত বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়। মার্ক্সবাদ যে জীবন্ত আন্দোলন এটা তারই প্রমাণ। এই তিনটি যুগই পরস্পরের সঙ্গে জৈবিক যোগসূত্রে সম্পর্কিত। ষ্টালিনের ব্যক্তিগত শাসন সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল Webb দ্বয় তাঁদের Soviet Communism-এ তা ভেঙে দিয়েছেন। সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে রাজনৈতিক সমালোচনার বলবত্তা নেই বলেই ট্রট্স্কিয়িষ্টদের আক্রমণ করতে হয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে এবং নীতি নিয়ে। "Justice is not made by iniquity." "It is untrue, a hundred times untrue that the end justifies the means", এই ধরণের চোখা চোখা নীতিকথা-সন্ধান। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই রকম নৈতিক cliché'র দ্বারা কণ্টকিত। যখন নীতিবচনের তূণীর শূন্য হয়ে যায় তখন বেদবাক্য প্রামাণ্য অস্ত্র হয়—"elementary Marxist truths!" কম্যুনিষ্ট পরিভাষায় এই বাম-বিমার্গগামী তথাকথিত গোঁড়া মার্ক্সবাদীরা—ট্রট্স্কিয়িষ্ট, I. L. P. ইত্যাদি, মার্ক্সবাদকে বিজ্ঞানের কোঠা থেকে Gospel-এর পঙক্তিতে টেনে নামিয়েছেন। ফলে ডায়েলেকটিক্স্-জ্ঞান এঁদের অগোচর। লেনিন কোন এক জায়গায় বলেছিলেন যে রাজনীতিতে 'subjective sincerity'র কোন মূল্য নেই। এঁরা সে-কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

Victor Serge-এর লেখায় তিনটি প্রধান যুক্তি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক, একটি ব্যক্তিগত এবং একটি নীতিগত। ট্রট্স্কিয়িষ্ট-সুলভ রাজনৈতিক যুক্তির অসারতা আমরা আগেই দেখেছি। তাঁর উক্তিগুলি নিছক উক্তিই এবং যুক্তিগুলি অযৌক্তিক—প্রমাণসিদ্ধ কিছুই নয়। অনেক সময় তিনি যে প্রমাণ দিয়েছেন তাদের আধেয় নৈতিক এবং ব্যক্তিগত। লেখকের তূণীরের রাজনৈতিক অস্ত্রটি স্থূলাগ্র। ষ্টালিনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করতে চান ট্রট্স্কিয়িষ্টদের নির্ব্বাসনের জন্য এবং জনসাধারণের দুর্দ্দশার জন্য। "Traitor of the low forehead" "and coarse moustache" লেনিনের সিংহাসন থেকে তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী ট্রট্স্কিকে বঞ্চিত করে নিজে সেই সিংহাসনারূঢ় হয়ে বসেছে শঠতা এবং ষড়যন্ত্র করে, নৃশংস অত্যাচার করে নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। "Traitor, gravedigger, fratricide, thermidorian, destroyer of the party; he is covered with disgrace". গোঁড়া মার্ক্সবাদী আদর্শ থেকে সাময়িক বিচ্যুতির জন্য ষ্টালিনকে বিশ্বাসঘাতক বলার ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই, যদি লেনিনকেও Nep-এর জন্য সেই আখ্যায় অভিহিত করা না হয়। লেখকের মতে ট্রট্স্কিয়িষ্টদের "mad proscriptions"-এর একটিমাত্র অর্থই থাকতে পারে—ষ্টালিনের প্রতি তার পার্শ্বচরদের ঘৃণা এবং নিজের জন্য ষ্টালিনের ভয়। এই ঘৃণা এবং ভয়ের জন্যই রক্তের স্রোত বইছে। তার "treacherous Oriental character which terror dominates but

blood cannot dismay"। "Stalin is the incarnation of fear, treachery, duplicity and terror"। যে bureaucracy'র উপর ষ্টালিনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই bureaucracy-র সঙ্গেই তার সঙ্ঘর্ষ বেধেছে। Bureaucracy যদি ষ্টালিনকে শক্তিভ্রষ্ট করতে পারে তাতেও জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। এই জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ অবস্থার মধ্যে রুষ জনসাধারণের কেবল একটি মাত্র আশা আছে—"...the Old Man remains", "at the head of a true party uncompromisng despite persecution; at the head of an international party with neither masses nor money, but preserving the tradition, preserving and renewing the doctrine."। ট্রট্স্কি আছেন এবং Fourth International গড়ে উঠবে। আগত মহাযুদ্ধ সুরু হলেই তৃতীয় মাসের মধ্যে "nothing will prevent the entire nation from turning to the organiser of victory."। তাই ট্রট্স্কিয়িষ্টরা শান্তি-পরিপন্থী এবং যুদ্ধকামী। অতীতের স্বপ্ন ট্রট্স্কিয়িজমের দেহ, ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রাণ।

কিছুদিন থেকে সোভিয়েট রাশিয়াতে যে রক্তপাত চলেছে তার সমর্থন কেউই করে না। Zinoviev ও Kamenev-এর মত এককালীন বলশেভিক নেতাদের প্রাণদণ্ড মনে হয়ত একটু দ্বিধা এবং সন্দেহ আনে। কিন্তু তার থেকেও বেশি মনে আনে বিস্ময় যে আবেগ এবং ঐতিহ্যের মোহ কি করে এঁদের মত লোকেদের মনকেও আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। Trotsky, Zinoviev, Radek প্রভৃতি হয়ত প্রতিভায় Stalin-এর শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্যাবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে Stalin-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে হিটলারী প্রথার সঙ্গে তথাকথিত ষ্টালিনিষ্ট প্রথার যে সামঞ্জস্যটা চোখে পড়ে তার পাতলা আবরণটুকু সরিয়ে না দিতে পারলে ষ্টালিনের প্রতি অবিচার করা হবে। ষ্টালিনের ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত নিরঙ্কুশ শক্তি বলা সহজ কিন্তু সত্য নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমতবিরোধী কোন ব্যক্তির পক্ষে dictatorship স্থাপন করা দুরূহ। ষ্টালিন এই দুরূহ ব্যাপার সংসাধিত করেছেন বলাও যেমন সহজ, বর্ত্তমান বলশেভিকদের মধ্যে ষ্টালিনই একাই ঠিক বলাও তেমনি সহজ। অতএব আমাদের মত দর্শকদের পক্ষে "wait and see" উপযুক্ত দৃষ্টিপদ্ধতি হবে।

Victor Serge যে-ন্যায়দণ্ডের মাপকাঠিতে বিচার করেছেন রাজনীতির ক্ষেত্রে তা অচল। ট্রট্স্কিয়িষ্টদের বিচার এবং দণ্ড সম্বন্ধে তিনি নিষ্পাপ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি একটা নৈতিক আবেদন করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এইরকম যুক্তি 'বুর্জ্জোয়াদের' দ্বারাও প্রযুক্ত হয়। যাদের উদ্দেশ্য হল সারা পৃথিবীকে যুদ্ধে বিজড়িত করে (যার জন্য তারা ফ্যাশিষ্ট দেশগুলির পর্য্যন্ত সহকারিতা করতে সঙ্কুচিত নয়) রক্তের স্রোতের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় ট্রট্স্কি-মার্কা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মুখে নীতিবচন এবং উপযুক্ত সোশালিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ ঠিক শোভন হয় না।

সোভিয়েট ইউনিয়ানে আজ যা হচ্ছে তার অনেক কিছুই আমাদের ভাল লাগে না। ষ্টালিনের মহিমাকীর্ত্তন, তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের এবং মহত্বের সিংহাসনে বসানো আমাদের অনেক কিছু ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। কিন্তু ব্যাবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ নৈতিক মূল্য দিয়ে বিচার করা চলে না। বহু-লাঞ্ছিত ম্যাকিয়াভেলীর নীতির সার্থকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। Political morality এবং ethical morality-র মধ্যের গণ্ডিরেখা মেনে নিতেই হবে।

এই ধরণের বইয়ের সম্বন্ধে নিরাসক্ত মত প্রকাশ করা শক্ত। বুর্জ্জোয়া liberal-এর চোখে বিচার করা হয়ত সম্ভব কিন্তু তার কোন অর্থ হয় না। উপরন্তু বইখানি নিরপেক্ষতার কোন দাবীই করে না। Victor Serge একটি Philippic রচনা করেছেন। আমরা হয় তার সমর্থন করতে পারি নয় ত তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

চোরাবালি—বিষ্ণু দে প্রণীত (ভারতীভবন)—মূল্য ১৷৹

বিষ্ণু দের কবিতা, সুধীন্দ্র দত্তের ভূমিকা ও আমার সমালোচনা, এই ত্র্যহস্পর্শের ফল কখনও মঙ্গলময় হতে পারে না। আমার ও সুধীন্দ্র দত্তের অমঙ্গলের জন্য আমি ততটা চিন্তিত নই যতটা বিষ্ণু দে'র জন্য। তাঁর ক্ষতি

হলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাঁর কবিতা সমালোচনার ভার অন্যের গ্রহণ করাই উচিত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মনে হয়, আমার নিজের বক্তব্য আমার কলম দিয়ে প্রকাশ হওয়াই শোভন। এবং বিষ্ণু দের কবিতার প্রধান গুণ এই যে ভিন্ন রুচির ওপর সেগুলি পৃথক ভাবেই আঘাত করে, কেবল ভাল-মন্দর ছকে পাঠকের মানসিক প্রক্রিয়াকে নির্ব্বাচিত করা যায় না। চোরাবালি বইখানি সমগ্রভাবে আমার ভালও লাগেনি, মন্দও ঠেকেনি, মনে আমার ধাক্কা দিয়েছে। আমি তারই বৃত্তান্ত লিখছি। ধাক্কার স্বভাবই হল সান্তরতা। একটানা ও একজোরের আঘাত স্থিতিরই সামিল, তাই এই বিবরণ একটু খাপছাড়া হতে বাধ্য। আবার উক্ত কারণেই আমার সমালোচনা চিঠির আকার আপনা থেকেই গ্রহণ করছে। অর্থাৎ, চোরাবালি পড়ে যদি গ্রন্থকারকে চিঠি লিখতে হত তবে খানিকটা এই ধরণেই লিখতাম :—

"বন্ধুবরেষু,

চোরাবালি পেলাম। ধন্যবাদের কি প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, দিলাম, গ্রহণ কর, যদি না থাকে, তবে সহ্য কর। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছ ও মানুষ হয়েছ, সহনশীলতা তোমার সহজ। অন্তত, তাই ভেবে প্রথম পাঠে যা মনে উঠেছে তাই লিখলাম। আচ্ছা, এই সহনশীলতার ক্ষতিপূরণ করতেই কি তুমি পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুর হও? সে যাই হোক, পাঠান্তরে একটু-আধটু মত পরিবর্ত্তনের স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করবে কি?

এতদিনে বুঝি বা, এক হিসেবে, (কি রকম সাবধান লোক দেখেছ ?) বাঙলা কবিতা মোহমুক্ত হল। তোমার চোখে মদিরাবেশ নেই, মনে আত্মরতির জড়তা নেই, ভাবে শৈথিল্য নেই। পড়তে পড়তে materiality কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চেষ্টা করছি তাড়াতে, এই ভয়ে পাছে materialism-এর অর্থ গ্রহণ করে। বিষয়বস্তু থেকে তুমি নিজেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখেছ নিশ্চয়। ব্যক্তিসম্পর্কহীনতার চিহ্ন কবিতায় ছড়ান, তবু মনকে নাকোচ করনি। এই দ্বৈত-বোধের ফলে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পেয়েছি যেটা আর একটু অতিরিক্ত হলেই pose হত। আত্মসচেতনতা আছে, কিন্তু সেটা মনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। তবু, তবু বলছি ঝোঁক তোমার রয়েছে

ঐ ধারে, সতর্ক থেকো। যেখানে ঝোঁক নেই, সেখানে তুমি না সাব্জেকটিভ, না অব্জেক্টিভ (লোকে ডেস্ক্রিপটিভ কবিতাকেই অব্জেক্টিভ ভাবে); তুমি material—অর্থাৎ আমি যা চাই, তাই।

এই ধর 'ঘোড়সওয়ার'। প্রথম যখন পড়ি তখনই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। এর গতি আমার মনকে উধাও করে নিয়ে যায় মধ্য এশিয়ার ষ্টেপ্-এ। এমন সংহত আবেগ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। অবশ্য এই কবিতাটির ব্যাখ্যা আছে—এর যৌন প্রতীক আমার কাছে অজ্ঞাত নেই, নৃতত্ত্বও আমি কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু সে-সব কথা অবান্তর—যেমন সুধীন্দ্র দত্তের উটপাখী কবিতার অর্থ প্রথম ও শেষ পাঠে (শেষ কখন হবে জানি না) অপ্রয়োজনীয়।

তোমার শক্তি বিচিত্র বিষয়-নির্ব্বাচনে এবং আঙ্গিকে। আত্মসর্ব্বস্বেরাই প্রধানতঃ একঘেয়ে লেখা লেখে। যদিও তোমার কবিতা দার্শনিক কবিতার শ্রেণীতে পড়ে না, তবু এই বৈচিত্র্যের কারণ খুঁজতে দার্শনিকেরই দ্বারস্থ হতে হয়। আমার বিশ্বাস তুমি জগৎকে মায়াময়ই বুঝেছ, কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎ পাওনি, বোধ হয় পরোয়াও কর না। দুটি প্রমাণ দিচ্ছি—(১) তোমার বিষয়গুলি আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের অনুগামী। ঠুনকো জিনিষ নিয়ে খেলা করতে (যাকে লক্ষ্ণৌএ দো দো পয়সা কা চীজ, ইংরেজীতে যাকে haberdashery বলে), আজকাল কেউ ওদেশে ভয় পায় না, কি কবিতায়, কি চিত্রে। সেইটাই হল আজকালকার ফ্যাশান। ফ্যাশান খারাপ নয়, সেটা সাহিত্যের মায়া। তুমি বিদেশী বিষয়বস্তুগুলি নাওনি, সাহিত্যের ভারতীয় ও সহুরে মায়া নিয়ে 'নখাড়া' করেছ। 'নখাড়া'র মানে জান? এর একটি চমৎকার বাঙলা প্রতিশব্দ আছে—কিন্তু অব্যবহার্য্য। যে বড়র সন্ধান পেয়েছে সে কখনও এতে মজে না। অনেক তর্ক উঠতে পারে জানি, তবু topical, কিংবা pretty কবিতা মহান কবিতার সমধর্ম্মী নয়। মহান কবিতা সেই লিখতে পারে যে রিয়ালিটির সন্ধানে থাকে। ব্র্যাডলের ভদ্রজনোচিত রিয়ালিটি নয় হে। সেটা অনেকটা রোলস্ রয়েসের রিয়ালিটি।

(২) তোমার শ্লেষযুক্ত কবিতায় একটু গলা খাঁকারীর আওয়াজ পাই। অথচ উইণ্ডহাম লুইসের মতোপযোগী satirist তুমি নও। দূরে রাখার

চেষ্টাতে যতটা বিদ্রূপ আসে ততটাই তোমার সামর্থ্য। বিদ্রূপের বিপদ কোথায় তোমাকে বলতে হবে না, বই বিক্রী হয় না ত' বটেই, কিন্তু অ-সাধারণত্ব-বোধের জন্য সমাজ-বোধ থেকে বিদ্রূপকারী নিজেই সরে যায়, এবং তাইতে, আমার মতে কবিত্ব-শক্তির হ্রাস হয়। প্রকৃত satire-এ একটা ঐতিহাসিক বোধ, অর্থাৎ tragic sense থাকা চাই। তা তোমার নেই। ওফেলিয়া ও ক্রেসিডায় তুমি আনতে চেষ্টা করেছ। চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়—কিন্তু ঐখানেই এক বড় কথা ওঠে। সমাজ-বোধ না থাকলে ঐতিহাসিক বোধ আসে না, আবার ঐতিহাসিক বোধ না থাকলে tragic sense জন্মায় না। কি করে ওফেলিয়া ও ক্রেসিডা আমার প্রাণের বস্তু হতে পারে? তোমার মতন কে অত বিদেশী সাহিত্যে পণ্ডিত বল? কে তোমার মতন সাহিত্যে sophisticated হতে পারে? আমি স্বীকার করছি ঐ ছুটি কবিতাগুচ্ছে একাধিক স্তর (strata) আছে, তাদের ভাবপরিবর্ত্তন ও সেই অনুসারে আঙ্গিকের পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু সেগুলি phase-এরই অদল-বদল, তার বেশী, যাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে ডাইন্যামিক বলি তা নয়। তোমার দেশী মেয়ে আমার মনে ধাক্কা দেয় না কেন? কেন আমার মনে রঙ ধরে না, কেন মুখে তেতো স্বাদ থেকে যায়? (রসিকতা নয়।) মামুলী ব্যাখ্যা, তুমি বুর্জ্জোয়া, গ্রহণ করি না। আদৎ কথা, অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যা, তোমার সমাজ-বোধ নেই। সমাজতত্ত্বের জ্ঞান হয়ত প্রচুর, কিন্তু সমাজ-বোধ অন্য কথা। সুধীন্দ্র দত্তেরও সমাজ-বোধ কম, কিন্তু তার পরিকল্পনা বৃহৎ, সে large terms-এ ভাবে, তাই খানিকটা রক্ষা পায়—খানিকটা, তবু পুরোপুরি নয়।

তোমার গদ্য কবিতার মুণ্ডিত রূপ আমার পছন্দসই। তার bleakness দার্জ্জিলিঙের নয়, মধ্যভারতের—ঘাস নেই, গরু পর্য্যন্ত চরতে পারে না—(কি করে সুখ্যাতি আশা কর?)। অন্য ভাষায়—তোমার একাধিক কবিতা কৃষ্ট্যালের মতন।

চিঠি বড় হয়ে গেল। দেশে অনেকে কবিতা লিখছেন, তাঁদের কবিতা স্মরণীয় বাক্যের মালা গাঁথা। কবিতা কিন্তু স্বয়ম্ভু ও সম্পূর্ণ হলেই আমার ভাল লাগে। তারই আশ্রয়ে বাক্য, শব্দ ও ঝঙ্কারের মহিমা খোলা চাই। কবিতায় অর্গ্যানিক ইয়ুনিটি আমি প্রত্যাশা করি। সেটা অবশ্য ভাবের বেগেও আসতে

পারে, অনেকের মতেই সেইটা একমাত্র ইয়ুনিটি। কিন্তু নাও হওয়া সম্ভব। সম্ভব, তুমি প্রমাণ করেছ। এইজন্য কৃতজ্ঞ। লোকে বুঝলে না বলে আফশোষ কোরো না। যে যাই বলুক, আমার স্থিরবিশ্বাস তুমি কবি। আমার বিশ্বাসের মূল্য আমার কাছে আছে—অতএব বই লিখলেই খবর পাই যেন।

ভাল কথা—একটা সন্দেহ হয়, তোমার মনের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে যেটা ঠিক আমরা যাকে এতদিন কাব্য-ভঙ্গী বলে এসেছি তা নয়…বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকের। নয় কি? ঠিক জোর করে বলতে পারছি না। ইতি

ভবদীয়
ধূর্জ্জটি

এই ধরণের চিঠি শ্রীবিষ্ণু দে-কে লিখতে পারতাম। এটা সাহিত্যের D.O. কিন্তু তাইতে অফিশিয়াল চিঠির চেয়ে বেশী কাজ হয় দেখেছি। তাই রচনাটি পরিচয়ে চোরাবালির সমালোচনা হিসেবে ছাপান অশোভন হবে না।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Inside India—by Halidé Edib, (Allen and Unwin)

লেখিকা আজ পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার আত্মজীবনী ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, তখন ইউরোপের মুগ্ধ সমালোচক-মণ্ডলী একবাক্যে তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। সুইডেনের বিখ্যাত সাহিত্যিক, F. Book, লিখিয়া ছিলেন, One must search for a long time among European women of fame to find any figure which can bear comparison with Halidé Edib.

আলোচ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধেও Book-এর প্রশংসাবাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রযোজ্য। মনোরম লিখনভঙ্গী, সূক্ষ্ম অনুভূতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, আন্তরিক সমবেদনা, এতগুলি গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ একই পুস্তকে বড় একটা দেখা যায় না। হালিদে

বেগম উচ্চ দরের সাহিত্যিক। তবে শুধু সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রনীতিবিদ পণ্ডিত Inside India-র মত পুস্তক রচনা করিতে পারিতেন না। গ্রন্থকর্ত্রী রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চয় করিয়াছিলেন কর্ম্মক্ষেত্রে, তুর্কীর দীর্ঘকাল ব্যাপী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে। হালিদে বেগম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা আধুনিক তুর্কী মহিলা। কিন্তু তিনি যে অন্তরে প্রাচীর কন্যা, ইউরোপের মোহ যে তাঁহার স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাহা আলোচ্য পুস্তকের প্রতি পরিচ্ছেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। দিল্লীতে গান্ধীজীর বৈঠকে তুলসীদাসের ভজন শুনিয়া তিনি যেরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন, কলিকাতায় নূরজাহানের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা সঙ্গীত তাঁহাকে যেরূপ মোহিত করিয়াছিল, আগরায় চন্দ্রালোকে তাজমহল দেখিয়া তিনি যেরূপ ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে পর বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। সত্যই তিনি আমাদের আপনার জন। তিনি যে লিখিয়াছেন—"I felt India to be nearer to my Soul climate than any other Country not my own. It was not merely because I am a Muslem and there are Muslems in India. Even among Hindu friends * * * I felt entirely at home. And it is this sense of belonging in a spiritual sense which has made me take the liberty of writing about Indians so freely," তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বাধীন পরাক্রান্ত তুর্কীর সন্তান, আধুনিক বিদ্যা ও সংস্কৃতির উচ্চশিখরে আরূঢ়, তিনি যদি দীন, হীন, মূঢ়, পরপদানত ভারতবাসীকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন ত আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। কত লোকেই ত দেখে। গরীবের সহিত কুটুম্বিতা পাতাইতে কে আর স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়? কিন্তু এই মহীয়সী মহিলা ভারতকে অবজ্ঞা করা দূরে থাক্, দয়াও করেন নাই, শুধু হৃদয়ের ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এরূপ মানুষকে কেবল বন্ধু বলিলে ভুল হয়, তিনি ভারতবাসীর ভগিনী। ভারত যে অতীত কালে অনেক মহাপাপ করিয়াছে, এখনও যে বহুদিন ধরিয়া তাহাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে একথা ভারতবাসী ভাল করিয়াই জানে। এই হীনতা, দৈন্য ও ঘোর লজ্জার দিনে তাহাকে কখন বা বিদেশী মুরুব্বীর পিঠ চাপড়ান, কখন বা "drain

inspectress"-এর অশিষ্ট গালিগালাজ, কখনও বা "Jesting Pilate"-এর ব্যঙ্গ কৌতুক সহ্য করিতে হইতেছে, বিরাম নাই। ইহাও তাহার প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। ক্বচিৎ তাহার অদৃষ্টে হালিদে বেগমের মত আপন জন জোটে, যাঁহার স্নেহস্পর্শে অপমান-ক্ষত হৃদয় জুড়ায়, প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এ হেন আত্মীয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাও হয়ত বাহুল্য মাত্র।

আলোচ্য পুস্তককে কোন ক্রমেই পক্ষপাত-দুষ্ট বলা যায় না। ভারতকে লেখিকা ভালবাসেন, কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজের প্রতি তাঁহার কোন বৈরভাব নাই। ইংরেজ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "A people I have known since very early life, a culture which has formed me side by side with my own."

এমনকি, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্বরূপ সম্বন্ধেও তিনি কোন অবিচার করেন নাই, "The hundred thousand Englishmen ruling over 350 million Indians have meant the triumph of the West with its technique, material civilisation and moral backbone"। ভারতবাসীকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য "is a force still to be reckoned with."

Inside India-তে ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা আছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা আছে, বর্ত্তমান যুগের দেশ-সেবকদের ত্যাগের কথাও আছে, কিন্তু মিথ্যা স্তোকবাক্য দ্বারা ভারতবাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা কোথাও নাই। যেখানেই ভারতীয় চরিত্রের দোষ লেখিকার নজরে পড়িয়াছে, তিনি তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, ঢাকিবার কোন প্রয়াস করেন নাই। ভারতের মুসলমান তাঁহার স্বধর্ম্মী, তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতাকে কোন প্রশ্রয় দেন নাই। পুস্তকের শেষ তিন পরিচ্ছেদ পড়িলে বোঝা যায় যে ডাক্তার আনসারী বা আবদুল গফর খানের মত মুসলমানকে তিনি পাকিস্তানী দল অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রদ্ধা করেন।

লেখিকার মতে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে ইংরেজের উপর। অর্থাৎ নানা রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে ইংলণ্ড যে দলের পশ্চাতে দাঁড়াইবে

সেই দলই ভারতের ভাগ্য নিয়মন করিবে। এ বিষয়ে আমাদের মত অন্যরূপ। আমরা মনে করি যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ যাহা নিষ্পত্তি করিবে, ইংরেজ সেই নিষ্পত্তি মানিয়া লইবে। জগতের নানা দেশে নানা জাতির উত্থানের ইতিহাস যিনি যত্নপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়াছেন তিনি অন্য মত স্বীকার করিতে পারিবেন না।

পৃথিবীতে আর এক মহাযুদ্ধ আসন্ন-প্রায়। গগনমণ্ডল বৈদ্যুতিকে ভরা কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। আসন্ন বিপদের দিনে ইংলণ্ডের হয়ত অনেক সুবিধা হইবে যদি অখণ্ড প্রবল স্বাধীন ভারত তাহার পার্শ্বে আসিয়া বন্ধু বলিয়া দাঁড়ায়। অনেকে মনে করেন এ কথা ইংলণ্ড একদিন বুঝিবে। হালিদে এদিব কিন্তু এ বিষয়ে সন্দিহান। তিনি বলেন, "Will she give complete independence to India and enlist her on her side in the coming fray? * * No one can tell what the British attitude in India will be"। আমাদেরও এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। ইতিপূর্ব্বে জগতের বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি পতন-কালে বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় নাই। হালিদে বেগমের মত আমরাও পাঠকবর্গকে বলি, "look at the clues of the Indian puzzle and reason as best you can."

গ্রন্থকর্ত্রী ভারতে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রচারের কথা অনেক কিছু বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজ-তন্ত্রবাদ গ্রহণ করা হিন্দুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন, মুসলমানের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। পণ্ডিত জহরলালেরও এই মত। সীমান্তের গান্ধী সম্বন্ধে হালিদে বেগম বলিতেছেন, "Abdul Gaffur Khan is a socialist—a moderate and liberal one. He also deems socialism the only political creed compatible with Islam"। দিনে দিনে সীমান্ত প্রদেশের রাষ্ট্রনীতির যে পরিণতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে কথাটা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে আমাদের মনে হয় ভারত যদি ভবিষ্যতে সমাজ-তন্ত্রবাদই গ্রহণ করে, সে সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের নিজস্ব একটা নূতন জিনিস হইবে। তাহার ভিত্তি হইবে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, তাহা বর্ত্তমান ইউরোপের চিন্তার চর্ব্বিত চর্ব্বণ হইবে না। তাহার কার্য্যক্রম হইবে ভারতীয়, রুষ বা ইতালীয় হইবে না।

হালিদে বেগমের ঠিক এই মত কি না, বোঝা যায় না। তবে গান্ধীজী সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক বিচার করিবেন। "Does Mahatma Gandhi mean the opening of a new era? Otherwise why should he be so much loved by millions, and revered by the Intelligentzia of this material world of ours? * * * Not only Gandhi, but the Indian masses who take sides with this ancient type of leader who represents love, seemed to me worthy of the world's gratitude. * * * No one in our age, or since the days of saints and prophets, has taken the fancy of the masses because of his resemblance to the good"। ইহার অর্থ এইরূপ করা যায় যে, যে ভারতে মহাত্মাজী এই ত্যাগের প্রেমের ও অহিংসার যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই ভারতের ভবিষ্যৎ কি কখন সাম্যবাদের নামে শ্রেণীমৎসর জাতিবিদ্বেষ ও আত্ম-কলহের দ্বারা কলঙ্কিত হইবে।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আর অধিক টীকা নিষ্প্রয়োজন, কেন না Inside India মূলতঃ রাষ্ট্রনীতিক গ্রন্থ নয়। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে লেখিকা স্বয়ং প্রস্তাবনাতে বলিতেছেন যে তিনি যথাসাধ্য সেকালের বিখ্যাত পর্য্যটক আলবেরুনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সত্যই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও দরদ দেখিয়া সেই মহানুভব আরবকেই মনে পড়ে। তবে আলবেরুনী রাষ্ট্রনীতির ধার ধারিতেন না, হালিদের মন অনেকটা গঠিত হইয়াছিল স্বদেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার মাঝে। সেইটুকুই দুজনের মধ্যে প্রভেদ। নতুবা ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির সন্ধান আলবেরুনীও যেমন পাইয়াছিলেন, হালিদে বেগমও তেমনই পাইয়াছেন।

লেখিকার ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ১৯৩৫ সালে যখন তিনি দিল্লীর জমিয়া-মিলিয়ার আমন্ত্রণে এদেশে বক্তৃতা দিতে আসেন। শৈশব হইতেই নানা কারণে হালিদের হৃদয়ে ভারতের একটি মনোরম রঙ্গীন মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল। বাস্তবের সংঘাতে সে মূর্ত্তি অপসারিত হইল না, বরং অধিকতর গৌরবমণ্ডিত হইল। নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, নানা লোকের সংস্পর্শে

আসিয়া এই তুর্কী মহিলার প্রতীতি জন্মিল যে প্রাচীন ভারত আজিও মরে নাই, নবীন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে, নূতন পথে যাত্রার আয়োজন করিতেছে। আর্য্য যুগের চিন্তাধারা, মোগল যুগের চিন্তাধারা, ইংরেজী যুগের নবীন শিক্ষা, এই তিন ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতেছে এক অপূর্ব্ব সুন্দর নবীন সৌধ। দরদী বন্ধুর এই আশ্বাসের বাণী আমাদের আপন স্বপ্নের সহিত মিলিয়াছে বলিয়াই আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছি।

লেখিকা লাট উলিংডন সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে তিনি একদিন "ভারতীয় চিত্রাবলী" বলিয়া এক কেতাব লিখিবেন। বাস্তবিক আলোচ্য গ্রন্থখানিকে মনোহর চিত্রাবলী বলিলে একটুকুও ভুল হয় না। প্রতিকৃতি ও দৃশ্যপটে, দুই রকম চিত্রেই ভরা এই পুস্তকখানি। অপূর্ব্ব সুন্দর চিত্রমালা! যেমন নিখুঁত রেখাঙ্কন ও অপূর্ব্ব রেখাভঙ্গী, তেমনিই আশ্চর্য্য বর্ণবিন্যাস। শুধু perspective নির্ভুল বলিলে এরূপ চিত্রের প্রশংসা করা হয় না। প্রত্যেকটি আলেখ্য সজীব, চিত্রকরের নিপুণ তুলিকাপাতে যেন তাহার অন্তরতম প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। ডাক্তার আনসারী, মহাত্মাজী, আবদুল গফর খান, ডাক্তার ভগবান দাস, সরোজিনী নাইডু, বেগম আনসারী, লেডী হায়দরী প্রভৃতি ভারতের খ্যাতনামা স্ত্রী পুরুষ, অনেকেরই জীবন্ত প্রতিকৃতি এই পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে। মহাত্মাজীর ত কথাই নাই, বহু পৃষ্ঠা ধরিয়া নানারূপ আলোকে, নানাদিক হইতে তাঁহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

"He is so important a happening in twentieth century history * * that every witness must bear as objective and honest a report as is humanly possible."

দুই একটি ব্যঙ্গচিত্রের মতও আছে, তবে তাহাতেও কোন বিষ নাই। মৌলানা শওকত আলী সম্বন্ধে এই কথাগুলি আছে—"I find it difficult to define his present political position * * His dress is suggestive of the vagueness of his politics. He wears a long shirt over tight Indian trousers and leggings and a loose Arab Mashlak with a Turkish Kalpak."

তাজের চিত্র—"It was dark. I sat and watched the slow

rise of the moon lighting the white dome...slowly giving relief to the mass of whiteness...It had a strange poignancy, this wonder of the world, symbolizing the devotion of man to woman throughout the ages...I had stepped out of the range of local influence of any kind, be it race, religion, or style in art..."

গান্ধীজীর ঘরে ভজন গান হইতেছে, রঘবর তুমকো মেরী লাজ—The music of the strings trailed on, and the whole crowd, the whole place, even the man who looked like Buddha dissolved in it. I had heard nothing like it in all my life,...one is no longer harassed by emotion, but aware only of a serene intellectuality, this time not only lacks the disturbance of emotion, but freed one from one's body"। গান্ধীজীর ক্ষুদ্র একটি রেখাচিত্র—"As the face bent forward there appeared a baldish dome with a Hindu lock, a tiny curl on the top of it...The head in that bent position reminded me of a picture of Chingiz Khan, the same top curl, the bald head and the delicate and narrow temples".

কলিকাতা সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ আছে। বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ ভাল নাও লাগিতে পারে, কারণ তেমন মন-জোগান মিষ্ট কথা কিছু নাই। লেখিকার মতে "the Bengali temperament is the pepper and salt to Indian thought and action", এবং "whatever is happening in New India has been influenced, directly or indirectly, by the modern movements which have taken place in Calcutta"। অতীতের কথা! কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক প্রচেষ্টার কেন্দ্র যে আজ আর বঙ্গদেশে নাই, দিল্লী ও সীমান্ত প্রদেশে সরিয়া গিয়াছে, একথা লেখিকা স্বীকার করিতেছেন। অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Moscow 1937—By Lion Feuchtwanger.—(Gollancz) 2/6.

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফয়েক্ট্ভেঙ্গার গত বৎসরের জানুয়ারি মাসে প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের হালচাল জানবার জন্য মস্কো বেড়াতে যান। মাত্র দশ সপ্তাহ কাল পরিভ্রমণ করবার ফলে তিনি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যথাযথ চিত্র দেবার

চেষ্টা না ক'রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে লেখকের মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে যুক্তিবাদী ছিলেন ব'লে বর্ত্তমান রাশ্যার বিরাট পরীক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব থেকেই তাঁর সহানুভূতি ছিল। কারণ, বিচার ও যুক্তির উপরেই এই বৃহৎ রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর এই সহানুভূতির সঙ্গে যে কিছু সন্দেহের খাদ মেশানো ছিল না, এমন নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হ'লেও তিনি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছিলেন যে, প্রকৃত আচার ও ব্যবহারে ততখানি স্বাধীনতা সেখানে নেই। আঁদ্রে জীদ্-এর গ্রন্থের দ্বারাও তাঁর এই মত সমর্থিত হয়েছিল। সাহিত্য ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুযায়ী শিল্পীদের কার্য্যকলাপ ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার মোটেই পছন্দ করেন না। আসন্ন যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে ব'লে অধিবাসী-দের সদা সজাগ রাখবার জন্য এ-সব বিষয়ে তাঁরা কড়া নজর রাখতে বাধ্য হয়েছেন। মস্কোর সর্ব্বত্র ষ্টালিন-বন্দনার ঘটা দেখে লেখক অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এই ব্যাপার যে অত্যন্ত বিসদৃশ এবং অশোভন, তা তিনি ষ্টালিন্‌-কেও জানান। কিন্তু ষ্টালিন্‌-এর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে তাঁর ভুল ভাঙ্গতে বেশি দেরি হয়নি। এই ক্ষুদ্রকায় সাধারণ লোকটির বিনয়ের পরিচয় পেয়ে ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার মুগ্ধ হন। 'ষ্টালিন ও ট্রট্‌স্কি' নামক অধ্যায়টি অতি সুলিখিত হয়েছে। ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের দ্বিতীয় দলের বিচার তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এ-সম্বন্ধে আগে থেকেই তাঁর মনে প্রবল সন্দেহ ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যে সত্যই অপরাধী, এবং মৃত্যুদণ্ডই যে তাঁদের যোগ্য শাস্তি এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হলেও বিচারালয়ে তাঁদের আচরণের সঠিক তাৎপর্য্য তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি।

বর্ত্তমান রাশ্যার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য প্রজ্ঞাবাদীদের প্রধান অভিযোগ দুটি। প্রথমতঃ আয়ের অসাম্যের জন্য সেখানে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হ'চ্ছে; দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে সেখান থেকে লোপ পেতে বসেছে। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী এই অভিযোগদ্বয়ের মধ্যে আংশিক পরিমাণে সত্য আছে ব'লে ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার মনে করেন। জীদ্-এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক বিষয়ে অমিল থাকলেও এ-ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবে ট্রট্‌স্কি প্রমুখাৎ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ব'লে জীদ্ যে-কথা বলেন নি, ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার তা বলেছেন : It is certain that, with the growth of prosperity, the

petit-bourgeois mentality will disappear just as quickly as the notorious conformism does with advancing education.

মোটের উপর, ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার্‌-এর মস্কোর অভিজ্ঞতার কাহিনী নানা দিক্‌ দিয়ে উপভোগ্য হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকদের হতাশ হ'বার তেমন কারণ নেই।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০) পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী।

এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। এত অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়েছে দেখে মনে হয় যে এ বই বাঙালী পাঠকের নিকট যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে যে সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে তা সম্পাদকের নিজের কথা হতেই বোঝা যাবে—"প্রথমত এই নূতন সংস্করণে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ড হইতে তুলিয়া আনিয়া বিষয় অনুসারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সঙ্কলিত করিয়া আমি তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করি। ইহাতে বহু নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত হইলেও একই যুগ সম্বন্ধে দুই জায়গায় অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইত।... বর্ত্তমান সংস্করণে তাঁহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগসংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র পাইবেন।"

যাঁরা এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন যে গ্রন্থকার কি পরিশ্রম স্বীকার করে নানা পুঁথিশালা হতে প্রাচীন সংবাদপত্রের দপ্তর ঘেঁটে এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যে সব তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম। এ ছাড়া 'বিবিধ' 'পরিশিষ্ট' ও 'সম্পাদকীয়' বিভাগেও নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হবার সঙ্গেই নানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম সংবাদপত্র ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই

প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনরীরা 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক দু'খানি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, প্রথমখানি মাসিক ও দ্বিতীয়খানি সাপ্তাহিক। 'সমাচার দর্পণের' প্রথম পর্য্যায় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে এ পত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় কিন্তু কতদিন চলে তা ঠিক বলা যায় না। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সে পত্র পুনরায় প্রকাশিত হয় ও মাত্র দেড় বৎসর চলে। 'সমাচার দর্পণ' আর পুনর্জ্জীবিত হয় নাই।

'সমাচার দর্পণে'র প্রাচীন দপ্তরই হচ্ছে এ গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন এবং এ গ্রন্থে যে সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা ঐ পত্রিকা হতেই উদ্ধৃত হয়েছে। 'বঙ্গদূত' ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে পত্রিকা হতেও কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করা হয়েছে। 'সমাচার-দর্পণ' বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করেছিল। পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গলা পত্রিকাগুলি যে সমাচার দর্পণের আদর্শ বহুপরিমাণে অনুসরণ করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই পত্রিকার লুপ্তপ্রায় দপ্তর হতে ব্রজেন্দ্র বাবু তৎকালীন শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করে যে বাংলা দেশের নূতন যুগারম্ভের ইতিহাসের প্রভূত উপকার করেছেন তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তাঁর অসীম ধৈর্য্য ও পরিশ্রম প্রশংসনীয়। 'বাঙালীবাবু সুলভ' 'দৈহিক আলস্য' তাঁর কিছুমাত্র নাই। তিনি যদি ইউরোপে জন্মাতেন তাহ'লে তাঁকে লোকে 'জর্ম্মাণ' আখ্যা দিত। কারণ তাঁর গ্রন্থে 'জর্ম্মাণ' পণ্ডিতদের গুণ ও দোষ উভয়ই বর্ত্তমান। সঙ্কলন কার্য্যে অগাধ পরিশ্রম ধৈর্য্য ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্কলিত তথ্যের সাহায্যে বাঙালী জাতীর তৎকালীন চিত্র অঙ্কন করবার প্রয়াস নাই। ভরসা করি সলভিন্স বা মিসেস বেলনস্‌ অঙ্কিত চিত্র প্রকাশ করেই ব্রজেন্দ্রবাবু সে কাজ সমাধা করবেন না এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর এই সঙ্কলিত উপাদান অবলম্বন করে এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবেন যা হবে সুখপাঠ্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্তৃক আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

পরিচয়

প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের 'দৃষ্টি'

আমি সম্প্রতি চিন্তাশীল জার্মান লেখিকা ডাঃ হাইমানের 'Indian and Western Phiolosophy' গ্রন্থ* অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ক্ষুদ্র গ্রন্থ কিন্তু বেশ চিন্তাকর্ষক। গ্রন্থকার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 'দৃষ্টি'র তুলনায় কয়েকটি জরুরি সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল সমস্যার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। প্রথমতঃ গ্রন্থকারের কিছু পরিচয় দিই।

ডাঃ হাইমান্‌ একজন দক্ষ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ (Philologist)—ব্যাকরণ (ব্যাকরণ অর্থে grammar নয়, ভাষাবিজ্ঞান) তাঁহার 'forte'—দর্শন নয়—যদিচ তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা-বিভাগের সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপক। বিলাতের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি ১৯৩৬ সালে তাঁহাকে Forlong Fund-লেকচারার পদে নিযুক্ত করিলে তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই বক্তৃতা-ধারার সাক্ষাৎ ফল।

ডাঃ হাইমান ভাষাতত্ত্বে বেশ সুপ্রবিষ্ট। এ গ্রন্থে তাহার অনেক পরিচয় আছে। এমনকি, দার্শনিক সমস্যাসকলের প্রতি তিনি যে ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহাও ভাষাবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি—দার্শনিকের দৃষ্টি নয়। ভাষাতত্ত্বে তাঁহার নিপুণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

* Indian and Western Philosophy (A Study in Contrasts) by Betty Heimann, Ph. D., pp 1-156 (George Allen & Unwin Ltd)

পাশ্চাত্যে অনেকে 'সৃষ্টি' শব্দকে creationএর সমানার্থক মনে করেন। কিন্তু সৃষ্টি = বিসর্গ (involuntary secretion)। ডাঃ হাইমান্ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম "is the vast reservoir from which all emerges and in which everything will be finally immersed—the reservoir from which all emanations originate and in which all manifestations end".

শরীরকে 'তনু' বলে কেন? পদার্থসকল পরস্পর 'পৃথক্' কিরূপে? জগতের নাম 'ব্যক্ত' হইল কিসে? ডাঃ হাইমান বলেন "All these terms mirror empirical facts as being the foundations of Indian terminology" যেহেতু, তনু = the extended, পৃথক্ = the spread-out, ব্যক্ত = the thing curved apart.

তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'সংবিদ্' শব্দ আছে—হ্রিয়া দেয়ম্ ভিয়া দেয়ম্ সংবিদা দেয়ম্। সংবিদ্ শব্দের অর্থ কি? সংবিদ্ = 'con-science' in its widest sense.

'ভক্তি' শব্দের মৌলিক অর্থ কি? ভজ্ ধাতু হইতে 'ভক্তি'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'ভজ্ = to share, to participate (এই 'ভজ্' ধাতু হইতেই 'ভাগ')। অতএব ভক্তি 'means not devotion offered to a single God but reciprocal participation or sacrificial partnership between God and Man'.

হিন্দু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 'ধর্মের' উপর। 'ধর্মের' মৌলিক অর্থ কি? ডাঃ হাইমান্ বলেন ধর্ম ধাম-শব্দের সহিত সংপৃক্ত—'The Indian term for duty is ধর্ম or in the Rig Vedic texts ধামন্, both of which, when rendered literally, mean the fixed position—and Dharma is everything that is fixed or to which the individual is bound and this in a twofold sense of duty and right simultaneously (যেমন 'অধিকার' একাধারে Duty এবং Right)।

বৈদিক 'ঋত' ঐরূপ আর একটি শব্দ। অনেকে 'ঋত' ও 'সত্য'কে এক পর্য্যায়ে ফেলেন। ভগবান্ কিন্তু 'ঋত-সত্য নেত্র'। সত্য যদি হয়

Truth—তবে 'ঋত' কি? 'ঋত' ভগবানের সেই ভাব যাহা "sweetly and mightily ordereth all things"—'যাথাতথ্যতো ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। ডাঃ হাইমান্ ঠিকই বলিয়াছেন—'ঋত' plainly means the immanent dynamic order or inner balance of the cosmic manifestations themselves। এই ভাবেই বৈদিক ঋষি বলেন—'Rita commands the winds to blow, the waters to flow and man to know'.

শূন্য শব্দ লইয়া পাশ্চাত্যে অনেক বিপ্রতিপত্তি (confusion) ঘটিয়াছে। ডাঃ হাইমান্ দেখাইয়াছেন শূন্যের অর্থ zero or nothing নহে—it also signifies the indefinite, that which transcends all limits। শূন্য must therefore be derived from the same stem as শূন which means 'excessive', 'swollen', from the root শূ।

প্রাচীন গ্রন্থে 'সৎ' ব্রহ্মের একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা—একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋগ্বেদ)। 'In accordance with Indo-European linguistics, সৎ is merely the present participle of the root *as* (Greek *asti*, Latin *est*); সৎ therefore means "Being" but in India সৎ also means "good" : whatever exists, in other words, is justified by its very existence.'

কিন্তু ব্যাকরণের পথ সর্ব্বত্র নিরাপদ নয়। এ গ্রন্থেই তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আশ্রম নাকি 'coming to rest'! Aryans নাকি 'inhabitants of Iran'! দর্শন নাকি 'to look, to contemplate, to be receptive', from the root দৃশ্—গ্রীক্ Derkomai—(দর্শনের অর্থ দৃষ্টি বটে কিন্তু সে দৃষ্টি vision নয়—viewpoint)! মন্দিরের 'গোপুর' নাকি—'the towns or confined areas from which cattle (গো) are driven to pasture!

ডাঃ হাইমান্ 'অন্বীক্ষা' শব্দে ফিলজফি বুঝিয়াছেন। অন্বীক্ষা কিন্তু inference—সমীক্ষা (observation), পরীক্ষা (experiment) এবং অন্বীক্ষা (inference)। পঞ্চাবয়ব ন্যায় (যাহাকে ইংরাজীতে syllogism বলে)

তদ্দ্বারা এই অন্বীক্ষা সিদ্ধ করিতে হয়। সেইজন্য ন্যায়শাস্ত্রের নাম 'আন্বীক্ষিকী'—'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা'।

মায়া ও অবিদ্যা শব্দ লইয়াও ডাঃ হাইমান্ বেশ গোল পাকাইয়াছেন। 'মায়া' সম্ভবতঃ মা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং মূলতঃ 'মান'-শব্দের সহিত সংপৃক্ত। মা-ধাতুর মৌলিক অর্থ মাপ করা (to measure) বটে, কিন্তু ডাঃ হাইমান যখন বলেন—'Actual objects, then, possess reality and are therefore called *Mayas*, measurable definite forms. Thus both মায়া and নির্বাণ are realities and not, as is generally assumed in the West, unrealities'; অথবা তিনি যখন অবিদ্যা সম্পর্কে বলেন—'অ-বিদ্যা is only the fiction of the actual world, in so far as all things are taken as separated in their diversity'; তখন বলিতে ইচ্ছা হয় 'ব্যাকরণ! তুমি রসাতলে যাও!' ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। উপনিষদে দেখিতে পাই—মায়িনং তু মহেশ্বরম্ * * মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ * * অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ * * তদ্ অত্র অবিদ্যয়া মন্যতে। শুধু তাই নয়, উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে বলেন—যত্র দ্বৈতম্ ইব ভবতি * * অন্যৎ ইব স্যাৎ * * নানা ইব পশ্যতি। অথচ ডাঃ হাইমান্ বলিতেছেন—A pure idealism is ruled out by India's characteristic conceptions of the Divine।

ডাঃ হাইমান্ দক্ষ বৈয়াকরণিক বটেন, কিন্তু তিনি যে নিপুণ দার্শনিক এরূপ আমার বোধ হইল না—অন্ততঃ হিন্দুদর্শনে তিনি সুপ্রবিষ্ট নন। নহিলে তিনি একথা বলিলেন কিরূপে—'for Indian speculation, God is not almighty'? অথচ আমরা উপনিষদে শুনিয়াছি, তিনি সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ। সেইজন্য হিন্দু দর্শনে God-এর নাম ঈশ্বর—তিনি 'মহদ্ভয়ম্ বজ্রমুদ্যতম্'। আবার হিন্দু মতে নাকি 'God is the personation of atmospheric phenomena' (সেই অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের পুরাতন Kathenotheism)। ঈশ্বর নাকি reincarnates ("বিষ্ণু is conceived as being dependent on the law of the so-called *Avataras*')—অথচ হিন্দুরা ভগবান্‌কে অবতার বলেন না—তিনি 'অবতারী'।

যে হিন্দু বলিয়াছেন ভগবান্ শুধু এক নন তিনি অদ্বিতীয়—এক এব মহেশ্বরঃ, একমেবাদ্বিতীয়ম্,—অর্থাৎ তিনি কেবল Unit নন—তিনি Unique, সেই হিন্দু নাকি বহুদেববাদ ছাড়াইয়া একেশ্বরবাদের (Monotheism-এর) পরব্যোমে উঠিতে পারেন নাই! ইহার পর ডাঃ হাইমান্ যে সাংখ্যীয় পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে ভুল করিবেন—পুরুষ যে Monad—'সাক্ষী, চেতাঃ, কেবলো নির্গুণশ্চ'—ইহার মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া ঐ পুরুষকে Deus Otiosus বলিবেন অথবা মহৎতত্ত্ব কি ভাবে cosmic (সমষ্টি-) বুদ্ধি তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন না, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখি না। বস্তুতঃ দেখা যায় ডাঃ হাইমান্ হিন্দুদর্শনের জড়তত্ত্ব ঠিক অনুধাবন করিতে পারেন নাই। অবশ্য হিন্দু *creation ex nihilo* স্বীকার করেন না। কিন্তু এ কথা আদৌ ঠিক নহে যে হিন্দুর দৃষ্টিতে 'there is always primeval Matter beside Him and beyond Him impersonal laws like those of *Karma, Rita* and Reincarnation.

হিন্দুর ত কথা এই যে, ভগবান্ 'সর্ব্বকারণ-কারণ'। চিৎ ও জড়, Spirit ও Matter, সৎ ও ত্যৎ—সেই একমেবাদ্বিতীয়েরই বিভাব বা বিধা (Modes of manifestation) মাত্র—তিনি 'প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ'—যতঃ প্রধানপুরুষৌ—অর্থাৎ static 'Being' এবং transient 'Becoming'—সম্ভূতি ও বিনাশ উভয়ই তাঁহার লীলাকৈবল্য মাত্র। ডাঃ হাইম্যান্ নিজেই স্থানে স্থানে একথা বলিয়াছেন—

> Even Matter and Spirit in fact are only two aspects of one and the same thing* * This is the consistent cosmic outlook tending towards ultimate oneness—the real *Uni-verse*—that is, towards the primal and final *Sat*, static 'Being' which can nevertheless be grasped only in its derived forms of transcient "Becoming" in the empirical *Bhavas*.

ডাঃ হাইমান্ একস্থানে বলিয়াছেন 'the ideal of humanity as a totality' হিন্দুদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল। তিনি কি বেদান্তের ব্যষ্টি-সমষ্টির কথা শুনেন নাই? উপনিষদের বিরাট্ পুরুষ তথা গীতার বিশ্বরূপের সহিত তাঁহার কি পরিচয় নাই? অত দূরই বা কেন—যে 'gigantic organism', বিশাল সমাজ-

শরীর—ব্রাহ্মণ যাহার মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু ও শূদ্র পদ—সেই 'সর্ব্বানন-শিরোগ্রীব' সংঘাত কি তাঁহার পরিচিত নয়? অবশ্য হিন্দু 'All men are born equal' একথা বলেন না—হিন্দু অধিকারভেদ স্বীকার করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বধর্ম ও তদনুযায়ী স্বতন্ত্র কর্ম স্বীকার করেন। সেইজন্য আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম, রাজধর্ম, স্ত্রীধর্ম, আপদ্‌ধর্ম প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। কিন্তু তাহা হইলেও 'লোকসংগ্রহ'—সমস্ত জীবের মৌলিক ঐক্য, হিন্দু কখনও বিস্মৃত হন নাই। এই জন্য প্রাচীন উপনিষদ্ যুগেও শুনিতে পাই—ব্রহ্মদাশাঃ ব্রহ্মকিতবাঃ।

কিন্তু ডাঃ হাইমানের মুখ্য বক্তব্যের কথা এখনও বলা হয় নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে মানবের দ্বিবিধ দৃষ্টি আছে—Cosmic (বিশ্বাত্মিক) ও Anthropomorphic (আধ্যাত্মিক)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে—Man is the measure of the universe, অর্থাৎ বিশ্বের কেন্দ্রস্থ মানুষ। যিনি ঐরূপ দৃষ্টিশীল, তিনি বলেন 'Make your own ego the starting point', অর্থাৎ চণ্ডীদাসের ভাষায়—তিনি বলেন, 'সবার চাইতে মানুষ বড়, তাহার সমান নাই।' আর বিশ্বাত্ম (cosmic)-দৃষ্টিতে 'Man is only part and parcel of the Universe'—অর্থাৎ মানুষ বিশাল বিশ্বের ভগ্নাংশ মাত্র। যিনি এইরূপ দৃষ্টিশীল, তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি—এক কথায় বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাকেই ডাঃ হাইমান বলিয়াছেন—'the super-rational perception of the unity, immanent in all manifoldness.'

ঐ দ্বিবিধ দৃষ্টিশীল ব্যক্তি সকল দেশে সকল কালে সকল সমাজেই ছিলেন ও আছেন। ডাঃ হাইমান এ কথা স্বীকার করেন না—তিনি বলেন, অধ্যাত্ম-দৃষ্টি য়ুরোপের নিজস্ব এবং বিশ্বাত্ম-দৃষ্টি ভারতবর্ষের নিজস্ব—

Both climatically and geographically India was predestined for the full development of cosmic speculation * * Here therefore Man was, and ever remained, no more than part and parcel of the mighty whole. * * * The basic dogma—which has held good in the West ever since—was, 'Man is the Measure of all things'* * This comparative method yields different results, springing from markedly different fundamental principles —Western Anthropology on the one hand and Indian Cosmology on the other.

সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থের উপনাম—'A study in contrasts' এবং সকল ক্ষেত্রে—in Theology, Ontology, Eschatology, Ethics, Logic, Æsthetics, History and Science—তিনি এই বিরোধ প্রতিপন্ন করিবার উদ্যম করিয়াছেন। তাঁহার এ উদ্যম যে বেশ সফল হইয়াছে, তাহা আমার বোধ হইল না। বরং স্থানে স্থানে তাঁহাকে কয়েকটা অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেখিতে পাই।

'Even Indian Ethics is biological and cosmic'. 'In Indian Aesthetics the immediate purpose of the artefact is not aesthetic'. 'There is no action, as in the Greek Drama, but typical representatives of all classes'. 'According to the Indian conception, the history of individuals, families and races is a continuous process of emerging and vanishing' ইত্যাদি।

তবে হিন্দুরা যে একেবারে স্বপ্নাবিষ্ট dreamers ছিলেন না—প্রত্যুত 'in both the kindred points of Heaven and Home'—স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয়ত্রই তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসরণশীল ছিল—ডাঃ হাইমান এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—

Keen observation and a deep knowledge of plant life make the Hindu a strikingly successful pharmacologist * * * Hindus are therefore past masters in experiment and patient observation of minute details * * It is usually only after a large number of experiments have been meticulously performed that any important generalization is discovered, and in this vital respect India's traditional outlook is at one with the most recent tendency in Western Science.

বুদ্ধদেব যাহাকে 'সম্মা দিট্‌ঠি' (True Vision) বলিতেন, সেই দৃষ্টি ভেদে অভেদ দেখে; কিন্তু ডাঃ হাইমান অভেদে ভেদ দেখেন। তাঁহার মতে Deep elemental differences divide East from West.

"We seem driven to conclude, therefore, that the divergent lines of West and East belong to wholly different planes, so that even if they sometimes appear to converge, still they will never meet."

সেই কিপ্‌লিং-এর পুরানো কথা—

For East is East and West is West
And ne'er the twain shall meet
—প্রাচ্য সে প্রাচ্যই রবে, প্রতীচ্য পশ্চিম
কভু না মিলিবে দুহুঁ কালেও অন্তিম।

এমন কি বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে সাম্য ও সমন্বয়ের ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে ডাঃ হাইমান্ অনেক কষ্টকল্পনা করিয়া তাহারও প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্য বটে—

There appear (in the West) recent outbreaks which, after two and a half millennia of the uncontested reign of anthropolgical ideas, flame up here and there from the depths of the emotioinal Western soul, alike in religion and politics, in natural science and art, as a fully conscious reaction against Western rationalism and individualism.

কিন্তু ডাঃ হাইমান্ বলিতে চান—উহা 'true rapprochement between Western and Eastern thought' নহে। এ সম্পর্কে ডাঃ ইয়ুং-এর কথা যুক্ততর মনে হয়—

'The spirit of the East penetrates through all our pores and reaches the most vulnerable places of Europe.'

আর এক অভিজ্ঞ সমালোচকও বলিয়াছেন—

We find millions of people (in the West) are included in these movements and Eastern ideas dominate all of them.—Cary Baynes.

ভারতীয় দৃষ্টি য়ুরোপীয় দৃষ্টির মত আধ্যাত্মিক না হইয়া বিশ্বাত্মিক হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ হাইম্যান্ বলেন—Its tropical environment accounts for India's cosmic viewpoint.

এই 'tropical environment'-এর কথা তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমধ্যে এতবার এতভাবে বলিয়াছেন যে ইহাকে তাঁহার mental obsession বলিলে অত্যুক্তি হয় না—ইহা তাঁহার বায়ুর সামিল বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে ভারতের নৈদাঘিক বেষ্টনীই ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান। অথচ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই এ মতের যথেষ্ট প্রতিবাদ করা যায়। তিনি স্বীকার করেন যে—যে আর্য্যজাতির ঐরূপ বিশ্বাত্মিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাঁহারা ভারতের আদিম নিবাসী ছিলেন না—তাঁহারা ভারতের বহিঃস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং 'these Aryan intruders brought with them an Indo-European language and culture। তবেই ত' গোড়ায় গলদ ঘটিল। ডাঃ হাইমান ইহার সমাধানে বলেন—যদিও আর্য্যদিগের দৃষ্টি আদিতে আধ্যাত্মিক ছিল, তবু ভারত-নিবাসী দ্রাবিড় জাতির সম্পর্কে ঐ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিশ্বাত্মিকে রূপান্তরিত হইল। একথাও ঠিক নহে;—কারণ, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর্য্যধারা ও দ্রাবিড়ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিল। তা' ছাড়া এক বেদান্ত ভিন্ন অন্যান্য হিন্দুদর্শন—যথা ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতির দৃষ্টি বিশ্বাত্মিক নয়, আধ্যাত্মিক—cosmic নহে, individualistic। অতএব ডাঃ হাইমান্ যখন বলেন যে—

The Western standpoint is therefore totally different from the non- but not anti-individualistic attitude of India, where the problem of individuality had never been seriously considered.

—তখন তাঁহার ঐ কথার অনুমোদন করা অসম্ভব হয়।

আর এক কথা। ভারতের বিশ্বাত্মিক দৃষ্টি যদি নৈদাঘিক আবেষ্টনীর (Tropical Environment-এর) ফল, তবে Pre-Sophist গ্রীসের বিশ্বাত্মিক দৃষ্টি হইল কিরূপে? ডাঃ হাইমান্ স্বীকার করিয়াছেন যে—'Æschylus creates all his immortal tragedies in the genuinely cosmic mood'। ইস্কিলাসের কাল খৃঃ পূর্ব্ব ৫২৫—৪৫৬। তাঁহার পরবর্ত্তী সফোক্লিস্—তাঁহার কাল খৃঃ পূর্ব্ব ৪৯৫—৪০৫। ডাঃ হাইমান্ নিজেই বলিয়াছেন যে সফোক্লিসের বিখ্যাত Œdipus-trilogyর প্রথম নাটক Œdipus Basileus বিশ্বাত্মিকভাবে রচিত, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় নাটক Œdipus in Kolonos

আধ্যাত্মিকভাবে ভাবিত। 'In this he regards Œdipus' guilt from the new Sophistic angle :—Man is the measure of all things'

সোফিষ্ট যুগের আরম্ভ খৃঃ পূর্ব্ব ৪৫০। সফোক্লিসের অধ্যাত্মদৃষ্টি—যাহার অভিব্যক্তি তাঁহার দ্বিতীয় নাটকে—ঐ দৃষ্টি যে সোফিষ্টদিগের new anthropological principle হইতে সঞ্জাত, ইহার প্রমাণ কি? বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতে পাই যে, পরবর্ত্তী যুগে প্লেটো (যাঁহার কাল খৃঃ পূর্ব্ব ৪২৮—৩৪৮) ঐ বিশ্বাত্মিক ভাবেই ভাবিত। ডাঃ হাইমানের ভাষাতেই বলি,—Plato, the ontological and, indeed, the last great *cosmic* thinker of the West, continues under the influence of pre-Sophistic *cosmic* conceptions * * *

অতএব এ সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উভয়ত্র বিশ্বাত্মিক (cosmic) ও আধ্যাত্মিক (anthropologic) দৃষ্টি বরাবরই প্রচলিত ছিল। তবে য়ুরোপে সোফিষ্টদিগের পর আরিস্টটলের প্রভাবের ফলে এবং বিশেষতঃ Christianityর উদ্ভবে (যাহার ভিত্তি ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত)—অনেকদিন পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় চিন্তার ধারা anthropomorphic-খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং তাহার বিশ্বাত্মিক দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার সুদিন আসিয়াছে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের rapprochement-র ফলে য়ুরোপ তাহার নষ্ট বিশ্বাত্মিক দৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তাহার ঐ দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রাখুন!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শেষ-রাত্রির চাঁদ

নরহরির বৌ আসিল ঘর আলো করিয়া।

গ্রামে এমন বৌ আর একটিও নাকি আসে নাই এর পূর্ব্বে। খাল পার হইয়া দলে দলে মেয়েরা আসিতে লাগিল অপরূপ এই কন্যাকে দেখিবার জন্য। পরিশ্রম আর শরীরের দোহাই দিয়া নরহরি কয়েক দিন কাছারী বাড়ীর দিকে আর গেল না। আসিবার সময় কোকিলের হাতে পায়ে ধরিয়া সে বলিয়াছিল, 'দেখিস চাকরীটা যেন বজায় থাকে, দু'একদিন দেরী হতে পারে, পাতা ক'খান লিখে দিস্। যাবি কিন্তু? একদিনের ছুটি তুই চেয়েই নিবি।'

কোকিল হাতের কলমটা নামাইয়া দোয়াতে ঠেকাইয়া রাখে, বেড়ার ফাঁক দিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখে তহশীলদার বাবু চলিয়া গেছেন কিনা, তারপর ঝাঁকড়া চুল নাচাইয়া মৃদু কণ্ঠে গাহিয়া উঠে—

'তোমার পায়ের নূপুর আমার বুকে
রাতদুপুরে বাজে (বঁধু রে)
তোমার হাতের কাঁকন অহোরাত্র
দেয় গো বাধা কাজে (বঁধু রে)'

'রাখ্ তোর গান', নরহরি ধমক দিয়া বলে, 'খালি গান আর গান, সিধে ভাষায় কথা বল্‌তে পারিস না? যা বল্‌লাম গেছে কানে?'

কোকিল কলমটা তুলিয়া হঠাৎ কানে গোঁজে তারপর আবার গান ধরে—

'বঁধু আমার আসবে গো
তাইত আমি গানের মালা—'

'থাম্!' নরহরি সত্যই এবার রাগিয়া যায়।

'চট্‌ছিস্ কেন?' কোকিল জিজ্ঞাসা করে।

'না, চট্‌বে না! কথা যা বল্‌লাম তা গেছে কানে?'

'যাবে না কেন? অর্থাৎ সিধে ভাষায় তুমি বৌয়ের সঙ্গে কিছু দিন লট্‌ঘটি

চালাবে এই ত ?' কোকিল হাসে, 'বেশ ভাই বেশ। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু পুরস্কার ?'

'আগে ত বৌ আসুক তারপর দেখা যাবে। কপালে আগে কি জোটে দেখি ?'

সেই নরহরি বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল। শুনিয়াছিল তাহার স্ত্রী সুন্দরী, কিন্তু সে যে এতখানি তাহা সে কল্পনা করে নাই। ফিরিবার পথে নৌকায় ছই-এর উপর বসিয়া কোকিল গান ধরিয়াছিল—

'রাখাল ছেলে ডিঙ্গি বাইয়া
বৌ আনিতে যায়,
কপালে তার লেখা ছিল
রাজকন্যা হায়।
রাখাল ছেলের ভাঙ্গা ঘরে
চাঁদের আলো পড়বে ঝরে,
সোনার বধূর মুখের পরে
রাখাল ছেলে চায়,
রাজকন্যা হায় !'

ছই-এর নীচে নরহরি অবগুণ্ঠিতা কাজললতার গৌরবরণ হাতখানি স্পর্শ করে, কাজললতা হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করে, নরহরি হাতখানি তুলিয়া লয় নিজের হাতে ; বৌ-এর নাম কাজললতা। নরহরির হাত কাঁপিতে থাকে। বাহিরে কোকিল তখন গাহিয়া চলিয়াছে—

'সোনার বধূর মুখের পরে
রাখাল ছেলে চায়।
রাজকন্যা হায় !'

লগ্নটা বিবাহের। নদীর ওপারে কোন্ গাঁ হইতে সানাই-এর শব্দ আসিতেছে। রাজাতলার ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়াছিল তখন বেলা বারোটা ; আর এখন প্রায় সন্ধ্যা গড়াইয়া আসিয়াছে। দাঁড়ের একটানা ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা যাইতেছে। নরহরিও এতক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে ছই-এর ওপর বসিয়াছিল ; এই মিনিট কয়েক হইল সে ভিতরে আসিয়া বসিয়াছে। পিছনে আরও

দুইখানি প্রকাণ্ড নৌকা আসিতেছিল লোক বোঝাই হইয়া, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব।

'যা না, ভেতরে গিয়ে বোস্ না।' এই খানিক আগে কোকিল তাহাকে ঠেলা মারিয়া বলিয়াছিল, 'বৌ একা।'

'থাক্ না, কি হয়েছে তাতে ?' নরহরি বিঁড়ি টানিতে টানিতে জবাব দিয়াছিল।

'খুব যে অবহেলা দেখ্ছি ?' কোকিল চোখ ঠারিল।

'না, অবহেলা নয়, এই বসেছি বাইরে, বেশ লাগ্ছে।'

'না, তুই ভেতরে গিয়ে বোস্।'

নরহরি ভিতরে আসিয়াছিল।

'লজ্জা কি ? এখানে ত নেই কেউ, শুধু তুমি আর আমি।' মৃদু কণ্ঠে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে নরহরি কহিল। শুধু তুমি আর আমি—এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত রক্তস্রোতে উঠিল একটা তুফান। অনেক কথা ভিড় করিল তাহার কণ্ঠে, কিন্তু কোন্‌টা বলা উচিত আর কোন্‌টা বলা অনুচিত সেটা নরহরি বুঝিতে পারিল না।

'তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে ?' এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাহাকে ভাবিতে হইল না।

কাজললতা এবার চাহিল তাহার দিকে মুখ তুলিয়া। ছই-এর মধ্যে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে নরহরি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহার মুখের দিকে। প্রশস্ত কপাল, দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষু, বাঁকা সিঁথিতে সিন্দুরের উজ্জ্বল একটি রেখা।

'তোমার নাম কি ?' নরহরির মনে এ প্রশ্নটা অনেকক্ষণ গুন্ গুন্ করিতেছিল।

কাজললতা মুখ নামাইল ; উত্তর দিল না।

'বল না কি নাম তোমার ?' নরহরি কহিল, 'সবাই ত লজ্জা করে, জড়সড় হয়ে থাকে, কথা বলে না ; তুমি ত আর সবাইর মতন নও, যাদের দেখেছি সবাইর চেয়ে তুমি যে আলাদা।' নরহরির নিজের কানেই তাহার কথাগুলি অপূর্ব্ব শুনাইল। সে কখনও জানিত না এমন কথা সে বলিতে পারে।

'বল না তোমার নাম কি ?' নরহরি কাজললতার কোলের কাছে একটা বালিসে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মাথাটা প্রায় বধূর কপাল ছুঁইল বলিয়া।

'বলবে না ?'

'কাজললতা।'

'আর একবার বল।' নরহরি অনুরোধ করিল; সঙ্গীতের একটা ঝঙ্কার যেন তাহার বুকের মধ্যে ঝন ঝন করিয়া উঠিল।

'কি ?'

'তোমার নাম ?'

'কাজললতা গো !

'কিন্তু এত বড় নামে আমি তোমায় ডাকবো না, কি বল ? আপত্তি নেই ত ? আমি তোমায় ডাক্‌বো লতা। আচ্ছা বাড়ীর জন্যে তোমার মন কেমন করছে না লতা ?'

বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে হ্যাঁ, বাড়ীর জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।

'সয়ে যাবে বুঝলে লতা ? সবাইর মন অমন খারাপ হয়, হবার কথাই ত ! কিন্তু'—নরহরি থামিল; কথাটা বলিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল; কাজললতা মুখ তুলিয়া চাহিল, নরহরি বলিয়া ফেলিল, 'কিন্তু আমি ত আর তোমায় দুঃখে রাখবো না লতা।'

বধূ মুখ নামাইল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার ! মাঝিদের একটানা ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। তীরে গাছপালা সব ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, গুপারি গাছের আগায় উঠিয়াছে চাঁদ; চাঁদের বাঁকাচোরা আলো আসিয়া পড়িয়াছে ছইয়ের মধ্যে, কাজললতার মুখের উপর। ছইয়ের উপর কোকিল তখনও গাহিতেছিল—

'রাখাল ছেলের ভাঙ্গা ঘরে
চাঁদের আলো পড়বে ঝরে,
সোনার বধূর মুখের পরে
রাখাল ছেলে চায়;
রাজকন্যা হায় !'

এক মাস অতীত হইয়াছে।

কাছারীতে কাজের ফাঁকে নরহরি কহিল, 'কৈ তোর উৎসাহ এর মধ্যে নিবে গেল ?

'কিসের ?' কোকিল কলমটা কানে গুজিয়া রাখে।

'কিসের আবার ?' কোকিলের এই উদাসীনতা নরহরির সহ্য হয় না; 'তুই না বলেছিলি বৌ-এর হাতে চা খাবি, আলাপ ক'রে আস্‌বি বৌ-এর সঙ্গে ? আর আমাদের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াস না, ব্যাপার কি বল্ ত ?'

'কি আবার ব্যাপার ?' কোকিল কহে, 'তুইও যেমন ! চা খাবার জন্যে আমি তিন পোয়া পথ ভাঙ্গি আর কি ! যাবো একদিন ! বুঝলি ?'

কোকিল আবার কলম লইয়া লিখিতে থাকে। নরহরি একটা পেন্‌সিল কাটিতেছিল।

'হ্যাঁরে বৌ কি বলে জানিস্ ?'

'কি ?' কোকিল কলম আবার যথাস্থানে রাখে, অর্থাৎ কানের পাশে।

'বল্‌ছিল, কৈ তোমার সে বন্ধুকে আর দেখি না ত ! যে নৌকায় গান গাইছিল ! ভারি মজার লোক কিন্তু ! আমি বল্‌লাম, হ্যাঁ, ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু ! ও আবার জিজ্ঞেস করলো, বন্ধুর বাড়ী বুঝি অনেক দূরে ? আমি বল্‌লাম— না, দূরে আর কি ! ও একটি অপদার্থ, কিছুই ঠিকঠিকানা নেই তার !'

'বেশ বলেছিস্। বৌ কেমন রে ?' কোকিল কলম তুলিয়া লয়।

'চমৎকার।'

চমৎকার বৌ দেখিতে কোকিল একদিন সাজিয়া গুজিয়া হাজির হইল। সেদিন কি একটা ছুটি উপলক্ষে কাছারী বন্ধ। কোকিলের পায়ে লপেটা, পরণে তাঁতের পাতলা ধুতি, গায়ে সিল্কের জামা, লাল সিল্কের রুমালটা পকেট হইতে খানিকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে বাহিরের দিকে। পরিপাটিরূপে মাথা আঁচড়ানো।

'কি হে নরহরি পাল বাড়ী আছ নাকি !' কোকিল সারাসরি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসে।

বাড়ীতেই ছিল নরহরি। অলস প্রাতঃকালটা বধূর সহিত রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। হাতে তাহার চায়ের ধার-ভাঙ্গা চিনেমাটির পেয়ালা, চা কখন শেষ হইয়া গেছে।

কোকিলের গলা শুনিয়া উঠিয়া বসিল সে। 'আরে এসো, এসো।' নরহরি

তাহাকে সাদরে আহ্বান করিল। কাজললতা পালাইতেছিল, নরহরি তাহার আঁচল ধরিয়া ফেলিল, 'ওকি পালাচ্ছ কেন? বন্ধু যে! সেই আমার বন্ধু, যে নৌকায় গান করেছিলো, যার কথা তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে। কাজললতা বেড়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, তরকারির খাঁচার পাশে খোলা বঁটি, খানিকটা কাটা তরকারী।

নরহরি পিঁড়ি পাতিয়া দিল, কোকিল বসিল। 'কি বৌঠান, একেবারে জড়সড় যে? কোকিল কহিল, 'চল বাইরে গিয়ে বসি, তোর বৌ তরকারী কুটুক।'

'তরকারী কি এখানে বসে কাট্‌তে পারে না নাকি?' নরহরি কহিল, 'বোস্ তুই। শুনছো, একটু চা বানাও, আর একটু হালুয়া।'

'কি দরকার ও-সব হাঙ্গামায়।' কোকিল কহে 'মিছিমিছি আবার হায়রানি।

কাজললতা রান্নাঘরে ঢুকিল, এ্যালুমিনিয়ামের বড় বাটিতে গরম জল চাপাইল।

'এদিকে ডাক্‌বো, কথা বল্‌বি?' নরহরি হাসিয়া বলিল।

'ক্ষেপেছিস্? নাঃ, দরকার নেই।'

কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইল; দাওয়ায় বসিয়া দু'জনেই চুড়ির টুং টাং শব্দ শুনিতেছিল।

কাজললতা দুই পেয়ালা চা রাখিয়া গেল।

'কৈ হালুয়া কোথায়?' নরহরি কহিল।

কাজললতা গেল ভিতরে; কয়েক মিনিট পরে থালায় করিয়া দুইভাগ হালুয়া লইয়া আসিল।

চায়ে চুমুক দিয়া কোকিল কহিল, 'খাশা চা হয়েছে।' কাজললতা দাঁড়াইয়াছিল আড়ালে। সেখানে দাঁড়াইয়া দেখা যায় বাহিরে। কোকিলকে সে দেখিতেছিল, কান তাহার উৎগ্রীব হইয়া আছে, বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি চাপিয়াছিল এতক্ষণ, বলা যায় না কোকিল চা পান করিয়া কি বলে, চা ভালো হইয়াছে এ-কথা জানিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল একটা তৃপ্তির চিহ্ন। সে চাহিয়াছিল কোকিলের ঝাঁকড়া চুলের দিকে, তাহার পকেট হইতে ঝুলিয়া পড়া লাল সিল্কের রুমালটির দিকে।

'বৌ চা খায় না?' কোকিল কহিল। কাজললতার বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

'খায়।' নরহরি উত্তর দিল।

'একেবারে হাল ফ্যাশানের বল্।'

'অনেকটা তাই বটে। কোনো রকম গেঁয়োমি নেই।'

পাশে বাল্‌তি ভরা জলে কাজললতা কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া রহিল। চমক ভাঙ্গিল তাহার হঠাৎ কোকিলের গান শুনিয়া। চা শেষ করিয়া কোকিল তখন নীচু কণ্ঠে গাহিতেছিল—

'তোমার হাতের মিষ্টি চা
ত্রিভুবনে মিল্‌বে না তা
(তুমি) হৃদয় সুধা ঢেলে
মন-শতদল মেলে
বানিয়ে থাক যা,
খুব মিষ্টি চা॥'

গান শুনিয়া নরহরি না হাসিয়া পারিল না। 'এবারে হালুয়া দিয়ে একটা হয়ে যাক। আচ্ছা, অমন কথায় কথায় গান বাঁধিস্ কি করে বল্ ত, শিখিয়ে দিবি আমায়?'

'শেখবার কি আছে রে?' কোকিল উত্তর দেয়, 'আমি ত চেষ্টা করি না, এসে যায় আপনা থেকে।

'বৌ বল্‌ছিল।' চা শেষ করিয়া নরহরি কহিল।

'কি রে?' কোকিলেরও খাওয়া শেষ হয়েছিল।

'বল্‌ছিল, বন্ধুটি তোমার বেশ! কাথায় কথায় গান, বিয়ে করেনি কেন?'

'ও, তাই নাকি?' কোকিল রীতিমত হাসিয়া ফেলিল, 'কি বল্‌লি তুই?'

'বল্‌লাম, সে কথা বন্ধুকেই জিজ্ঞেস করে দেখো, আর বল্‌লাম, তোমার মত মেয়ে ক'জনের কপালেই বা জোটে।'

কাজললতা কান খাড়া করিয়া শুনিতেছিল, উনানে ফুটিতেছিল ডাল, কাঠের আঁচ প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই তাহার। সে ভাবিতেছিল

৩

তাহার স্বামীটি যেন কি ? সব কথাই কি বন্ধুকে বলিতে হয়, মানুষের কিছুই কি গোপন থাকিতে নাই ? কিন্তু এমন লোককে বোধ হয় বলা যায় সব।

কোকিল চলিয়া যাইবার পর নরহরি জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধুকে কেমন লাগল ?'

'সং একটি।' নরহরি দেখিতে পাইল না কাজললতা হাসিতেছিল। চটিয়া গেল সে, প্রশ্ন করিল, 'সং কেন ? কটা দেখেছো তুমি অমন লোক ?'

'সং নয় ত কি ? কথায় কথায় গান গায়'—গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কাজললতা বলে, 'যাত্রা ক'রে বুঝি ?'

'যাত্রা না করলে আর অমন গান কেউ গাইতে পারে না ? জানো ওর জন্য সবাই কত প্রশংসা করে ওকে ? বলে কবি; অমন কবিতা বানাতে পারে ক'জন ? দেখেছো কাউকে ?'

'কবিতা বানাবার দরকার কি খামখা ?' কাজললতা তর্ক করিয়া চলে, 'এমনি কথা বল্‌লে লোকে বোঝে না বুঝি ?'

'বুঝবে না কেন ? আচ্ছা জ্বালাতন, ওটা একটা ক্ষমতা ?'

'সবাইর ওই ক্ষমতা আছে।' কাজললতা অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গি করে।

'কি বল্‌ছো যা তা। সবাই পারে কবিতা তৈরী করতে ? তুমি পারো ?'

'কেন পারবো না ? যেমন—

তোমার বন্ধু সং
কথায় কথায় কেবল ঢং'

হাসিয়া উঠিল দু'জনেই। উনুন তখন নিবিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

এক সন্ধ্যায় কোকিল আসিয়া হাজির। নরহরি বাড়ী ছিল না। নরহরির পিসি গিয়াছিল পুকুরে। সংসারে পিসি, নরহরি এবং কাজললতা।

'কৈ হে। নরহরি বাড়ী আছ নাকি ?' কোকিল বাড়ীর ভিতরে আসিল।

কাজললতা ঘোমটা টানিয়া বাহিরে আসিল। 'কৈ, নরু কোথায় ?'

'বাড়ী নেই।' কাজললতা জবাব দিল, 'বেনাই গেছে, আস্‌তে রাত হ'বে।'

'পিসি ?'

'ঘাটে।' কাজললতা আসন পাতিয়া দিল।

'না, বস্‌বোনা', কোকিল কহিল, 'ওর ত আস্‌তে অনেক দেরী হ'বে, কাল সকালে একবার আসা যাবে।'

'বন্ধু না থাক্‌লে বসা যায় না নাকি ?' কাজললতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল। কোকিল বিস্মিত হইল, এমন চট করিয়া সে তাহার সঙ্গে কথা কহিবে ইহা সে মনে করে নাই। বাহির দিকে একবার তাকাইল পিসি আসিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য।

'না, তা নয়, এই কেউ বাড়ী নেই—'

'বাঃ আমি বুঝি কেউ নই।'

কোকিল উত্তর দিল না। উত্তর দিবার কোন কথা সে খুঁজিয়া পাইল না।

'বসুন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান; শেষে আবার বন্ধুর কাছে নিন্দে করবেন।' কাজললতা রান্নাঘরে গেল।

এমনি একা এই অন্ধকারে বসিয়া থাকা উচিত কিনা সেটা ঠিক করিতে কোকিলের কয়েক মিনিট লাগিল। সে না পারিল বসিতে না পারিল চলিয়া যাইতে।

'কৈ এখনও দাঁড়িয়ে আছেন দেখ্‌ছি ?' কাজললতা একবার বাহিরে আসিয়া তাহাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিয়া কহিল, 'কি ভাবছেন বলুন ত ?'

কোকিল চমকিয়া উঠিল, বলিল, 'একটা আলো দিয়ে যাও, বড্ড অন্ধকার।'

কাজললতা হাসিয়া উঠিল, 'আসনটা দেখা যাচ্ছে না বুঝি ?' সে আলো আনিতে গেল, কোকিল ঠিক তেমনি রহিল দাঁড়াইয়া।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া কাজললতা কহিল, 'বসুন এবার, নীচে দাঁড়িয়েছিলেন সাপে কামড়াবার ভয় ছিল কিন্তু!' সে চলিয়া গেল।

কোকিল চাহিয়াছিল অন্ধকার আকাশের দিকে। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে।

কতক্ষণ পরে কাজললতা এক হাতে চা এবং অন্য হাতে তেলে ভাজা খান-কতক লুচি লইয়া আসিল।

'একি ? পাগল না কি ?' কোকিল কহিল, 'এত খাবার খাবে কে ? খেয়ে বেরিয়েছি আমি।'

'বেশি আর কি ? খান।' কাজললতা কহিল।

'অর্দ্ধেক নিয়ে যাও, নরুর জন্য রাখ।'

'কেন, আমার জন্য যদি রাখি।' কাজললতা হাসিল।

'তা রাখ্তে পারো বৈ কি। তাই রাখ না।'

'না, আপনি ত আগে বলেননি।'

'তাতে কি? পরে ত বল্‌ছি, নাও, নিয়ে যাও।'

কাজললতা হাসিতে লাগিল, নড়িল না এক পাও।

'হাসছো যে?'

'এমনি, খান আপনি, আমাদের জন্যে রেখেছি।'

আর অনুরোধ করিলে ভালো দেখায় না; কোকিল খাইতে লাগিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, 'তোমার চা?'

'রাত্রে আমি চা খাই না।'

'ও।'

কোকিল খাওয়া শেষ করিল। কাজললতা উঠানের খুঁটিতে হেলান দিয়া।

'এবার যাই,' কোকিল উঠিয়া কহিল, 'রাত হ'ল, নরু এলে বোলো আমি এসেছিলাম।'

'দাঁড়ান, পান নিয়ে আসি।'

কাজললতা পান আনিয়া দিল। আঙুলের ডগায় চুণ আনিয়াছিল, হাত বাড়াইয়া কহিল, 'নিন, চুণ।'

'চুণ আমি একটু কম খাই।' কোকিল কহিল।

'একেবারেই দেওয়া হয়নি চুণ, ভুলে গিয়েছিলাম।' কাজললতা হাসিতেছিল কিনা অন্ধকারে কোকিল বুঝিতে পারিল না।

কাজললতার আঙুল হইতে চুণ লইয়া কোকিল মুখে দিল। পানে আগেই চুণ দেওয়া হইয়াছিল।

কোকিলের পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই পিসি ঘাট হইতে উপস্থিত, কোমরে জলের কলসী। 'কে গেল বৌ বাঁধের ওপর?' পিসি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মনে হ'ল যেন আমাদের বাড়ী থেকে বেরুলো।' পিসির বয়েস বছর পঞ্চাশ; চেহারা সাধারণ, একটু বাঁকা হইয়া চলেন।

'কৈ কেউ ত আসেনি এখানে।' কাজললতা কহিল।

'মনে হ'ল যেন কোকিল।' কলসী নামাইয়া রাখিয়া পিসি কহিলেন।

'ও! ওর কথা বল্‌ছেন, হ্যাঁ এদিক দিয়ে যাবার সময় একবার হাঁক দিয়ে গেল বাড়ী আছে কিনা।'

'হাঁক দিয়ে গেল কি বাছা?' পিসি এবার রাগিয়া গেলেন, 'দেখ্‌লাম ঢুকলো বাড়ীর মধ্যে। তুমি তাকে ঘটা করে খাওয়ালে, পান দিলে, মস্করা করলে ওর সঙ্গে, আর বল্‌ছো হাঁক দিয়ে গেল।'

'আপনিই বা সব দেখে শুনে কেন জিজ্ঞেস করছেন কে এসেছিল বাড়ীতে?'

'দেখ্‌ছিলাম কি বল তুমি?' পিসি কহিলেন।

'আমিও দেখ্‌ছিলাম আপনি কি বলেন।' কাজললতা জবাব দিল।

'তোমার আস্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে বৌ!'

'আপনার আস্পর্দ্ধাও ত কমেনি!'

পিসি নিজের ঘরে গেলেন আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া; শাসাইয়া গেলেন নরহরি আসিলে তিনি একবার দেখিয়া লইবেন সে কেমন মেয়ে। একে ত লজ্জা সরম কিছুই নাই, তারপর রাত্রে পরপুরুষের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা।

অনেক রাত্রে আসিল নরহরি। কাজললতা তখন অভুক্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নরহরি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল বার বার, আদর করিয়া। কাজললতার ঘুম ভাঙ্গিল।

'তোমার বন্ধু এসেছিল যে!' কাজললতা কহিল।

'বল কি? কখন?'

'বিকেলে।'

'এক পেয়ালা চা বানিয়ে দিলে না কেন?'

'দিয়েছি গো দিয়েছি, আমি কি গরু নাকি একেবারে।'

'কি বলে বন্ধু?'

'কিচ্ছু না। বাব্বা কি ভীষণ লাজুক। কথা নেই বার্ত্তা নেই।'

'তুমি কিছু জিজ্ঞেস করলে না কেন?'

'দূর।'

ঘুমাইয়া পড়িল কাজললতা।

পিসি কিন্তু নরহরিকে বলিলেন না কিছুই, তিনি জানিতেন তাঁহার নালিশ টিঁকিবে না।

ইহার কয়েকদিন পরে এক রবিবার অপরাহ্নে কোকিল আবার আসিল। আজও নরহরি বাড়ী ছিল না। কোকিল সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছিল, নরহরি বাড়ী না থাকিলে সে এক মিনিটও অপেক্ষা করিবে না।

'এই যে! বসুন।' কাজললতা কহিল, তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন আছে, কিন্তু মুখ অনাবৃত।

'নরু কই?'

'দোকানে গেছে, আস্‌ছে এখুনি কয়েকটা জিনিষ কিনে।' কাজললতা আসন পাতিয়া দিল।

নরহরি গিয়াছিল সকালে আহার সারিয়া কাজলাগড়ে একটা সায়রাত জমা বন্দোবস্ত করিতে, ফিরিতে তাহার রাত্রি না হইলেও সন্ধ্যার আগে যে সে আসিবে না একথা কাজললতা জানিত।

কোকিল বসিল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের জায়গায় পঁয়ত্রিশ মিনিট হইল নরহরির দেখা নাই।

'একটু তামাক সেজে দেবো!' কাজললতা কহিল।

'না।'

'আপনার ত চায়ের সময় হ'ল।'

'এখনও হয়নি। চা খাবো না আজ।'

'গরম গরম ছোলা চারটি ভেজে দেবো খাবেন?'

'না।'

'না, না, না; সব না', কাজললতা হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'না কেন? আমার হাতে খেতে নেই? আমি কি নীচু জাত?' কাজললতা হঠাৎ সে স্থান হইতে পলাইল।

কোকিল অবাক হইয়া গেল। এ সব কি? অদ্ভুত মেয়ে বাবা! কথা নাই বার্ত্তা নাই, শুধু শুধু রাগিয়া যায়! সে বসিয়া রহিল চুপ করিয়া, কাজললতার দেখা নাই। কোথায় গেল সে? কোকিল ধীরে ধীরে রান্নাঘরে আসিয়া

উপস্থিত হইল। চৌকাঠের পাশে মুখ নীচু করিয়া কাজললতা বসিয়া আছে। কোকিল পাশে গিয়া দাঁড়াইল, গলার শব্দ করিল। কাজললতা তেমনি কাঠের পুতুলের মত স্থির হইয়া বসিয়া।

'কাজল!' কোকিল ডাকিল।

সাড়া নাই।

'কাজললতা!' আবার ডাকিল সে।

কোন সাড়া নাই।

অদ্ভুত! কোকিল ভাবিল। কি হইয়াছে উহার? সে ত বলে নাই এমন কিছু যাহার জন্যে সে রাগ বা অভিমান করিতে পারে। নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে কি না সে বুঝতে পারিল না; এমন অবস্থায় চলিয়া যাওয়াও বিসদৃশ ঠেকে। আর কি বলিয়া সে ডাকিতে পারে! নরহরি যে কাছে কোন দোকানে যায় নাই এ কথা সে কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিল; কখন আসিবে তাহারও ঠিক নাই।

সে আবার ডাকিল মৃদু কণ্ঠে—'বৌ!'

কোন উত্তর দিল না কাজললতা; কোকিল হঠাৎ এক কাণ্ড করিয়া বসিল, নীচু হইয়া কাজললতার মুখখানি তুলিয়া ধরিল; কাজললতা মুখ উঠাইল, তাহার দুই গালে চোখের জলের দাগ।

'একি! কাঁদছো?' কোকিল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ঠিক এই সময়ে পশ্চাতে পায়ের শব্দে দুইজনেই ভীষণ চমকাইয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইল; নরহরি দাঁড়াইয়া; তাহার দুই চোখে নিষ্ঠুর জ্বালাভরা তীব্র চাহনী। তখনও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কোকিলের হাত কাজললতার চিবুক স্পর্শ করিয়াছিল।

কাজললতা ধাক্কা মারিয়া কোকিলের হাত সরাইয়া চক্ষের নিমেষে সেই স্থান হইতে ছুটিয়া পালাইল।

কোকিল সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই নরহরি বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্ধ্যার আর দেরী নাই। বাঁধের উপর দিয়া গরু লইয়া কেহ কেহ ঘরে ফিরিতেছিল। পথ জনবিরল। একটা আকন্দ গাছে ঠেস দিয়া নরহরি

দাঁড়াইয়াছিল। কোকিল তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের শব্দ শুনিয়া নরহরি চাহিল না পশ্চাতে।

'শোন!' কোকিল ডাকিল।

নরহরি মুখ ফিরাইল। তাহার সমস্ত চক্ষে অসহ্য ঘৃণা কোকিলের দৃষ্টি এড়াইল না।

'অমন করে হঠাৎ চলে এলে কেন?' কোকিল কহিল, 'কিছুই ত অন্যায়'—'চুপ কর', নরহরি ধমক দিয়া উঠিল, 'সাফাই গাইতে হবে না, বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম!'

'কি বক্‌ছিস্ নরু', কোকিল শান্ত কণ্ঠে কহিল, 'শোন্ না আগে আমার কথা, তারপর যা বল্‌তে হয় বলিস্।'

'তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না আমি', নরহরি কহিল, 'মুখ তুলে কথা কইতে লজ্জা হচ্ছে না তোমার? বাড়ীতে কেউ নেই, উনি এসে পরের বৌ-এর সঙ্গে—এতবড় শয়তান তুমি কখনও ভাবিনি, আর কোন ছলে যদি তুমি আমার বাড়ী ঢুক্‌তে চেষ্টা কর তা হ'লে জুতিয়ে লাট করে দেবো।' নরহরি রাগে কাঁপিতে লাগিল।

কোকিল কোন উত্তর দিল না; নিঃশব্দে বাড়ীর পানে পা বাড়াইল। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশে দেখা দিয়াছে নক্ষত্র। কোকিলের চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছিল, হাঁটিতে হাঁটিতে এক সময়ে তাহার সমস্ত শরীরে নামিয়া আসিল ক্লান্তি।

বাড়ীতে না গিয়া সে মাঝিদের পাড়ায় গেল।

'কুঞ্জ বাড়ী আছ হে? ও কুঞ্জ!'

মাটির ঘর হইতে কুঞ্জ বাহির হইয়া আসিল, 'আছি কর্ত্তা, এত রাত্রে, কি কারণ?'

'আমায় একবার ষ্টেশানে পৌছে দিতে পারবে?' কোকিল কহিল, 'কলকাতায় যাবো।'

'পারবো, কিন্তু জোয়ার ত সেই শেষ রাত্রে। ইষ্টিশানে আপনাকে ত ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত বসে থাক্‌তে হ'বে।'

'তা থাক্‌বো, তুমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখো; কটার সময় আস্‌বো?'

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, দুটোর সময়?'

'পারবো।'

রাত্রি দুইটা, আকাশে একখণ্ড চাঁদ উঠিয়াছে। ঘন গাছ-পালার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে ভাঙ্গাচোরা চাঁদের আলো।

কোকিল চলিয়াছে জোরে, হাতের বিড়িটা কখন নিবিয়া গিয়াছে, একটি মাঝারি সুটকেস্ তাহার হাতে, গলায় সিল্কের চাদর বাতাসে উড়িতেছে। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সে পথ দেখিয়া চলিতেছে।

দূরে ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে দেখা যাইতেছে। বোধ হয় নৌকার মধ্যে একটা কোরোসিনের কুপি জ্বলিতেছে টিম টিম করিয়া।

কোকিল আসিয়া পৌঁছাইল। 'কি হে। জোয়ার ত হচ্ছে, নাও বাক্সটা তোল!' কুঞ্জ কোকিলের হাত হইতে সুটকেশ টানিয়া লইল।

পাটাতনে বেশ আরাম করিয়া বসিয়া কোকিল কহিল, 'তোমার কেরোসিনের কুপিটা বাপু নিবিয়ে দাও, হ্যারিকেন নেই?'

'আছে, তাই জ্বালছি!' কুঞ্জ লণ্ঠনটা ধরাইল।

'বেশ চমৎকার রাত্রি! কি বল?' আকাশের দিকে তাকাইয়া কোকিল কহিল।

'হ্যাঁ বাবু, তা আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কেন? এ অসময়ে? এখন ত সব সাট্টিফিকেট করবার সময় হল, বছরের শেষ!'

'আর ভালো লাগে না কুঞ্জ, বুঝলে? কি হবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে? কে আছে যার জন্যে দেহপাত করবো? যাচ্ছি কল্‌কাতা বুঝলে? মামাতো ভাই-এর ওখানে উঠবো; বড়বাজারে তার প্রকাণ্ড দোকান, কতদিন ধরে সে আমায় যেতে লিখছে। তাই যাচ্ছি! এক ছিলিম তামাক সাজো কুঞ্জ, তারপর দাও নৌকা ছেড়ে, সময় হোল, শেষকালে ট্রেন পাওয়া যাবে না।'

কুঞ্জ তামাক সাজিয়া কোকিলের হাতে দিল। কোকিল তামাক টানিতে লাগিল। কুঞ্জ তীরে উঠিয়া নৌকার বাঁধন খুলিয়া দিতে গেল। জোয়ার আসিয়াছে বেশ জোরে। জলের ছলছলি শব্দ শোনা যাইতেছে।

হঠাৎ কোকিল চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, 'রাখো মাঝি দড়ি খুলো না। ওদিকে চেয়ে দেখ ত কে যেন আস্‌ছে না?' হুঁকো রাখিয়া কোকিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুঞ্জ চাহিয়া দেখিল সত্যই দূরে অন্ধকারে নদীর দিকে একজন স্ত্রীলোক দ্রুত হাঁটিয়া আসিতেছে।

'দড়িটা বেঁধে ফেল মাঝি।' কোকিল লণ্ঠন লইয়া কাদার মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। 'বোস তুমি, দেখি কি ব্যাপার?

কোকিল কাপড়টা বাঁ হাতে হাঁটুর উপর তুলিয়া ডান হাতে লণ্ঠন ঝুলাইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে কাদার মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

লণ্ঠনের আলো অতদূর পৌছায় নাই। মেয়েটাও একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কোকিল প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সে দেখিতে পাইল মেয়েটার কাপড়ের প্রান্ত লুটাইতেছে কাদায়, খোলা চুল।

কোকিল ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল সে। কাজললতা।

'একি। কাজল? এখানে কেন?' কোকিল জিজ্ঞাসা করিল।

'ছেড়ে দিন।' কাজললতা তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল।

কোকিলের ব্যাপার বুঝিতে আর দেরী হইল না। 'কি ছেলেমানুষি হচ্ছে? বাড়ী চল।'

'তার চাইতে নদীর জলে যাওয়া আমার কাছে অনেক সোজা।' কম্পিত কণ্ঠে কাজললতা উত্তর দিল।

'কিন্তু এই কাদার মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না', কোকিল কহিল, 'চল ঘাটে চল।'

'ঘাটে কেন?'

'চল না।'

কোকিল কাজললতার হাত ধরিয়া ঘাটে আসিল। কুঞ্জ তখনও দাঁড়াইয়াছিল সেখানে। ভালো করিয়া দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল এই স্ত্রীলোক আর কেহই নহে, নরহরির বৌ।

লণ্ঠনটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া কোকিল কহিল, 'চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দি।'

'বাড়ী আমি যাবো না।' দৃঢ় কণ্ঠে কাজললতা উত্তর দিল।

'এখনও সময় আছে কেউ জানবে না; চুপি চুপি বাড়ী ফিরে যাও।'

কাজললতা উত্তর দিল না।

'ঝোঁকের মাথায় যা করছিলে তা করতে পারোনি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।'

'তা করতে পারলেই ভালো হ'ত, মেয়েমানুষের জীবনের দাম নেই।'

মেয়েমানুষের জীবনের দাম আছে কি না সে কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় কোকিল পায় নাই কখনও, আজ যদিও বা সে সুযোগ আসিয়াছে কিন্তু অবসর নাই। 'বাড়ী ফিরে যাও কাজল', সে কহিল, 'স্বামীর ওপর রাগ করতে নেই। গুরুজন, অন্যায় করলেও সয়ে যেতে হয়, স্বামী ছাড়া কেউ নেই সংসারে এ কথা তুমি জানো না?'

'না, আমি জানি না', কাজললতা কহিল।

এর পর কি বলা যায় কোকিল ভাবিতে লাগিল। নদীর ঢেউ নৌকাখানা নাচাইতেছে। চাঁদের আলো জলে প্রতিফলিত হইয়া চক্ চক্ করিতেছে। তারের উপর প্রকাণ্ড বট গাছের মাথায় বাতাসের সর সর শব্দ হইতেছে। অন্ধকারে নদীবক্ষে দেখা যাইতেছে দু'একখানি জেলে নৌকা।

'শোন', কোকিল কহিল, 'স্বামীর ঘরে না গিয়ে তোমার আর যাবার জায়গা নেই। এই রাত্রে তুমি যাবে কোথায়?'

কাজললতা উত্তর দিল না।

'তা ছাড়া ওর কথা একবার ভেবে দেখ। হয়তো রাগের বশে তোমাকে গাল দিয়েছে। কিন্তু কালকেই তুমি দেখ্‌তে পাবে তার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়ে সে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে। তাকে তুমি এখনও ভালো করে বুঝ্‌তে পারোনি, তার অন্তর খুব ভালো। সে তোমাকে ভালোবাসে।'

হঠাৎ কাজললতা কোকিলের হাত ধরিয়া নিজের চুলের মধ্যে রাখিয়া বলিল, 'দেখুন এখানটায় ভালোবাসার চিহ্ন।'

কোকিল কাজললতার চুলের মধ্যে স্পর্শ করিয়া বুঝিল কয়েক জায়গায় বেশ

বড় হইয়া ফুলিয়া গেছে। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নরহরি যে সামান্য কারণে স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে পারে একথা না দেখিলে সে বিশ্বাস করিতে পারিত না কখনও।

'এর পরেও আপনি আমায় যেতে বলেন তার কাছে?' কাজললতা চাহিল কোকিলের মুখের পানে।

'বলি; সে তোমার স্বামী।'

'আমি যাবো না।' কাজললতা এমন ভাবে কথা কয়টা উচ্চারণ করিল যেন দীর্ঘ নাটিকার উপর শেষ যবনিকা, বিরাট কাহিনীর পরে দৃঢ় হস্তের একটি পূর্ণচ্ছেদ।

কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতার পর কাজললতা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'কোলকাতা।'

'কেন?'

'কাজ পড়ে গেল একটা।'

'আমিও যাবো।'

'কোথায়?' কোকিল বিস্মিত হইল।

'কেন কোলকাতায়।' কাজললতা কহিল।

'আমি যাচ্ছি জমিদারি কাজে, তুমি সেখানে কোথায় যাবে?'

'সেখানে আমার দাদা থাকে বৌ নিয়ে, হাটখোলায়। আমাকে পৌঁছে দেবেন দাদার কাছে।'

'না, কাজল, তা হয় না, একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি হ'বে, লোক জানাজানি—'

'কে আর জানবে? বাড়ী থেকে আসবার সময় কেউ ত দেখেনি আমায়, আর ঘাটেও ত কেউ নেই।' দুই জনেই এক সঙ্গে তাকাইল মাঝির দিকে।

কুঞ্জ মুখ নামাইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিল, 'না, আমি বলতে যাবো কেন? আমার কি দরকার? গরীব মানুষ।'

'আর একবার ভেবে দেখ কাজল।' কোকিল কহিল।

'ভেবেছি, আসুন।'

নৌকায় উঠিয়া বসিল তাহারা। নৌকা ছুটিয়া চলিল বেগে।

ষ্টেশানে যখন তাহারা পৌঁছিল তখনও ভোর হইবার কিছু বাকি আছে। কোকিল কুঞ্জের হাতে দুইটি টাকা অতিরিক্ত দিয়া কহিল, 'বোলো কিন্তু এখুনি গিয়ে, যা বললাম।'

'বলতে হবে না আর!' কুঞ্জ হাসিয়া কহিল।

ভোরের অস্পষ্ট আলোর মধ্যে দূরে ট্রেন দেখা দিল।

নরহরি হাতমুখ ধুইয়া চায়ের জন্য রান্নাঘরে গেল। গতরাত্রির কথা স্মরণ করিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আচরণটা তাহার অত্যধিক রকমে উগ্র এবং অভদ্র হইয়া গিয়াছে। অতখানি রূঢ় হইবার তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। যা হোক্ সে স্থির করিল তাহার মনের ভাব কাজললতাকে কিছুতেই জানিতে দেওয়া হইবে না।

নিজেই সে উনুন ধরাইয়া চায়ের জল চাপাইয়া কাজললতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কেটলিতে জল ঢালিয়া সে একবার সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া আসিল, কাজললতা নাই কোথাও, পিসি উঠানে ঘুঁটে দিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌ কোথায়? দেখ্ছি না ত কোথাও?'

'কেন রান্নাঘরে! উনুন জ্বাল্‌লে কে?'

'আমি!'

'কতদিন বলেছি তোকে অতখানি লাই মেয়েমানুষকে দিতে নেই, তুই শুনবি না আমার কথা; কথায় বলে কুকুরকে মুগুর আর বাঁদিকে লাথি। বৌ বাঁদি ছাড়া আর কি? কেন তর সইল না তোর? কেন তুই গেলি উনুন ধরাতে?'

'থাম তুমি বাপু!' বিরক্ত হইয়া নরহরি কহিল, 'ও গেছে কোথায় বলতে পারো?'

ধমক খাইয়া পিসি ঠাণ্ডা হইল, বলিল, 'কি জানি বাবু, সকাল থেকে ত দেখ্ছিনে, আমি ত জানি রান্নাঘরে রয়েছে বুঝি, ঘরদোর নিকোচ্ছে!'

'রান্নাঘরে ত নেই।' আশ্চর্য্য হইয়া নরহরি কহিল।

'নেই? গেল কোথা?' পিসির কপালে পড়িল সন্দেহের রেখা।

খোঁজা হইল সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায়, কাজললতাকে পাওয়া গেল না কোথাও।

নরহরি পুকুর ঘাটের দিকে ছুটিল, নিশ্চয় জলে ডুবিয়াছে। পুকুরের চারিটা পাড় সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কোথাও নরম মাটির উপর পায়ের দাগ নাই। শান্ত জল; দেখিয়া মনে হয় না গত রাত্রে এই জলে বিন্দুমাত্র আলোড়ন হইয়া গেছে।

নরহরি ঘরে ফিরিল। কেটলিতে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল চায়ের জল। সে ঠিক করিতে পারিল না ইহার পর তাহার কর্ত্তব্য কি! বাহির হইতে কে ডাকিল 'বাবু আছেন নাকি?'

'কে?' নরহরি সাড়া দিল, সমস্ত শরীরে তার প্রবাহিত হইল একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

'ও কুঞ্জ? কি খবর বল ত!'

'দেখুন ত সাড়ীখানা বৌমার বলে মনে হচ্ছে!' কুঞ্জ গামছার পুঁটলি হইতে কাজললতার ভিজা, কর্দ্দমাক্ত সাড়ীখানা বাহির করিয়া স্তম্ভিত নরহরির প্রসারিত হাতে দিল, 'ভাবলাম এমন সাড়ী কার আর হ'বে? এ-পাড়ার ত নতুন বৌ আর একটিও নেই!'

'হাঁ কুঞ্জ, এ সাড়ী তারই', মন্ত্রমুগ্ধের মত নরহরি কহিল, 'কোথায় পেলে তুমি?'

'সকালে নৌকো খুলতে গিয়ে দেখি দড়িতে আটকেছে, তা—'

'হ্যাঁ, মাঝি ঠিক তাই', অদ্ভুত কণ্ঠে নরহরি বলিয়া উঠিল, 'তুমি যা ভেবেছো তাই সত্যি; অভিমানী মেয়ে তা কি আগে জানতাম? ঝগড়া কোন্ বাড়ীতে না হয় বল না মাঝি? কিন্তু এমন করে তাই বলে জীবনটাকে নষ্ট করবি?' শেষের দিকে নরহরির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। সাড়ীখানা হাতে লইয়া সে ছুটিয়া চলিয়া আসিল।

সমস্ত গ্রামে রটিয়া গেল নরহরির বৌ আত্মহত্যা করিয়াছে। অনেকে আসিল তাহাকে সান্ত্বনা দিতে। নরহরি অনেক আগেই শান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীতে অনেক দূর খোঁজা হইল, কোথাও মিলিল না কাজললতার দেহ।

কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। কাজললতার কাহিনী গ্রাম্য ইতিহাসে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আজকাল আর সে কাহিনী লইয়া আলোচনা করে না কেহ। নরহরির মনে কাজললতার মুখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে।

পাড়ার হিতৈষীরা, বন্ধুরা এবং পিসি তাহাকে পিড়াপিড়ি করিতে লাগিল বিবাহের জন্য। শোক সে যথেষ্ট করিয়াছে মৃতা পত্নীর জন্যে; এবং অবিবাহিত থাকিবার বয়েস তাহার এখনও হয় নাই। সম্মুখে পড়িয়া আছে দীর্ঘ জীবন। এ সব কথা নরহরি বুঝে।

সুতরাং বেশী বুঝাইতে হইল না তাহাকে, সে সম্মতি দিল। পাশের গাঁয়েই ইন্দ্রনারায়ণের সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যাকে সে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। চমৎকার মেয়ে! কাজললতার মত রূপের জৌলুষ তাহার নাই সত্য কিন্তু তাহার চাইতে অনেক শান্ত, অনেক নম্র এই মেয়ে; সমস্ত মুখে একটা গম্ভীর সমাহিত শ্রী। মাথায় এক রাশি কালো চুল, বড় বড় দুইটি চোখ, সমস্ত শরীরে একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। নরহরি এতখানি আশা করে নাই। অন্তর তাহার ভরিয়া গেল। প্রথম রাত্রিতে বধূকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমিও আমায় ছেড়ে চলে যাবে না ত?' বধূ মুখ লুকাইয়াছিল তাহার বুকে।

সাত মাস পরে এক সন্ধ্যায় নরহরি দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। কমলা গিয়াছে ঘাটে। বাহিরের দরজায় একখানি পাল্কি আসিয়া থামিল। হুঁকো রাখিয়া নরহরি দাঁড়াইল। আশ্চর্য্যের কথা, কে আসিবে তাহাদের বাড়ীতে পাল্কি করিয়া? নরহরি পাল্কির কাছে গিয়া পিছাইয়া আসিল; কিন্তু ভুল হইবার কোন কারণ নাই, তাহারই সম্মুখে রক্তমাংসের মানুষ কাজললতা দাঁড়াইয়া।

নরহরি তাকাইল কাজললতার দিকে, কাজললতা তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মিনতির সুরে কহিল, 'আমাকে ক্ষমা কর তুমি, আমি অপরাধ করে গিয়েছিলাম, আমাকে তুমি ঘরে নাও, আমি তোমার সেই কাজললতাই, তেমনি আছি, নিষ্পাপ। আমার মুখের দিকে চাইলেই তুমি বুঝতে পারবে। আমাকে ঘরে নাও, তোমার কাছেই আমি এসেছি। এতদিন বুঝতে পারিনি তুমি ছাড়া আমার আর কেউই ছিল না।' নরহরি অনুভব করিল তাহার পায়ের উপর কাজললতার গরম চোখের জলের ফোঁটা। সে নীচু হইয়া কাজললতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, 'চল, ঘরে চল।'

কাজললতা শুনিয়াছিল তাহার স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে।

কমলা ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল স্বামীর একান্ত নিকটে বসিয়া একটি মেয়েমানুষ। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নরহরি দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিল, 'শোন, কমলা, এদিকে এসো, কাজললতা মরেনি; সে রাগ করে কলকাতায় তার দাদার কাছে চলে গিয়েছিল। আজ থেকে তোমরা ছু'বোন হ'লে। এই সেই কাজললতা।'

কমলা কোন উত্তর দিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর এক ফাঁকে নরহরিকে নির্জ্জনে পাইয়া কমলা কহিল, 'আমার কোন দুঃখ নেই, শুধু তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও।'

নরহরি কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

দিন কাটিতে লাগিল। কাজললতা কমলার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করে; হাসিয়া কথা বলে, ঠাট্টা করে, কলিকাতার গল্প করে। নরহরি দুইজনের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে। সময়ে অসময়ে কমলাকে কাছে টানিয়া আদর করে। কাজললতার মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। কমলাকে আদর করে সে কাজললতার সম্মুখেই. কিন্তু কমলা কখনও দেখে নাই কাজললতাকে স্বামীর সঙ্গে বসিয়া থাকিতে বা কথা কহিতে, যতক্ষণ কমলা থাকে ততক্ষণ কাজললতার দেখা পাওয়া যায় না। দৈবাৎ কাজললতা সাম্‌নে আসিয়া পড়িলেও নরহরির সঙ্কোচ নাই, সে কমলাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া দেয় না। কিন্তু কমলা নিকটে আসিলেই কাজললতা সামলাইয়া লয় নিজেকে, নরহরির সহিত ভালো করিয়া কথা কহে না। একদিন দুপুরে নিদ্রাভঙ্গের পর কমলা বাহিরে আসিয়া দেখিল নরহরি কাজললতার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কাজললতা হাসিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, কমলাকে দেখা মাত্র নরহরি তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। আর একদিন নরহরি প্রায় কাজললতার মুখের উপর মুখ নামাইয়া আনিয়াছিল, হঠাৎ কমলা আসিয়া পড়াতে সে মুখ সরাইয়া আনিল।

একদিন সন্ধ্যার পর নরহরি কহিল, 'তুমি একটু বাড়ীতে থাকবে কমলা, আমরা একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। ওর নাকি মাথাটা বড্ড ধরেছে। আগুনের কাছে থাক্‌লে বেড়ে যেতে পারে, আমরা আস্‌ছি এখুনি।'

উহারা গেল নদীর তীরে হাওয়া খাইতে আর কমলা অন্ধকারে ঘরের কোণে কাঁদিয়া বুক ভাসাইল।

অনেক্ষণ কাঁদিবার পর কমলা শান্ত হইল। লণ্ঠনটা ছোট করিয়া দিয়া সে নিঃশব্দে খিড়কির দরজা দিয়া পুকুর ঘাটে আসিল। এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল জলে। জলের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত একটা প্রচণ্ড আলোড়ন হইল। তারপর কমলার সংজ্ঞাহীন দেহ আস্তে আস্তে নামিয়া গেল তলায়।

নরহরি এবং কাজললতা বাড়ী ফিরিল অনেক রাত্রে। কাজললতা নরহরির হস্তবন্ধন হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, নরহরি হাত ছাড়িল না। তাহাদের সমস্ত রক্তে তখনও একটা প্রচণ্ড ঝড়ের আলোড়ন।

'মাথা ধরা সেরেছে?' নরহরি অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

'বেড়ে গেছে!' চাপা হাসির উচ্ছ্বাসে কাজললতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

'চুপ্ চুপ্!' নরহরি ত্রস্ত কণ্ঠে তাহাকে সাবধান করিল।

বাড়ীতে ঢুকিল তাহারা। রান্নাঘরে আলো নাই। কমলা বোধ হয় এতক্ষণে সমস্ত রান্না সারিয়া ফেলিয়াছে। পিসি বলিয়াছিল যাত্রা শুনিতে যাইবে; বোধ হয় গিয়াছে।

নরহরি ডাকিল, 'কমলা! কমলা!'

কোন সাড়া নাই, সমস্ত বাড়ীটা নিঃস্তব্ধ, নিঝুম। কান পাতিলে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। নরহরির বুকের মধ্যে হঠাৎ ধক্ করিয়া উঠিল। মনে পড়িল অতীতের আর একটি দিনের কথা। আবার ডাকিল সে, প্রাণপণে। নিঃস্তব্ধ বাড়ীটা যেন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

লণ্ঠন লইয়া তাহারা সমস্ত বাড়ী খুঁজিল। কোথাও নাই কমলা। নরহরির মেরুদণ্ডের মধ্যে শির্ শির্ করিতে লাগিল।

'বোধ হয় ঘাটে গেছে।' কাজললতা কহিল।

'চল, দেখি।'

উহারা আসিল পুকুর পাড়ে। কোথায় কমলা? নরহরি ডাকিল চীৎকার করিয়া। সে শব্দে পুকুরের জল বুঝি কাঁপিয়া উঠিল। নিনাদিত হইল রাত্রির দিগন্ত!

'লণ্ঠনটা ধর!' নরহরি ঘাটের শেষ ধাপে নামিয়া আসিল। আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রেতের মত সে বলিয়া উঠিল; 'দেখি! লণ্ঠনটা নিয়ে নেমে এসো ত!'

কাজললতা লণ্ঠন লইয়া নামিয়া আসিল।

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোকে জলের কিছু দূরে দেখা গেল সাড়ীর সাদা প্রান্ত ভাসিতেছে!

আকাশে তখন খুব বড় একটা চাঁদ উঠিয়াছে!

রজত সেন

ইউরোপ ও অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা

"So I take my leave of the Austrian people with the German word and heartfelt wish that God will protect Austria"। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার সমাধি উপলক্ষে বর্ত্তমান পুরোহিত ডাঃ শুশ্‌নিগের (Dr. Schuschnigg) ইহাই funeral oration। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মাণ প্রভুত্ব-প্রসারের ইহাই প্রথম অভিযান। অষ্ট্রিয়া আজ Greater Germanyর অন্তর্গত একটি প্রদেশ, ভের্সাই সন্ধিপত্র বা ষ্ট্রেসা চুক্তি (Stressa Agreement), কিম্বা Rome Protocol, কেহই অষ্ট্রিয়াকে হিটলারের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯৩৬ সালের তথাকথিত Austro-German Agreement স্বাধীন অষ্ট্রিয়াকে স্বীকার করিয়া লইলেও, ১৯৩৮ সালে ইহা একরকম প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণীর অন্তর্গত করিবার বিফল প্রচেষ্টা পূর্ব্বে ১৯১৮, ১৯২২, ১৯৩১ ও ১৯৩৪ সালেও করা হইয়াছিল, এবং হিটলারের বৈদেশিক নীতির ইহাই ছিল প্রথম লক্ষ্য। পূর্ব্বে অবশ্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ Geneva Protocol সমর্থন করতঃ অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ "discretion is the better part of valour" নীতির একটু বেশী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার পতনের পর Little Entente-এর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে ও Czechoslovakiaতে সঙ্কট ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। গত ১০ই এপ্রিল গণভোট গ্রহণ দ্বারা হিটলার এই কার্য্যের সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছেন—এ গণভোট বাহুল্য বলিয়াই মনে হয় ও ইহার ফলাফল ১০ই এপ্রিলের পূর্ব্বেও জগতে অবিদিত ছিল না। অগণিত আত্মহত্যার, ইহুদি-পীড়ন ও বন্দীত্বের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার শাসনতন্ত্র হিটলারী কায়দায় কায়েমী করা হইতেছে।

অষ্ট্রিয়ার লৌহসম্পদ, ডানিয়ুবীয় শস্যসম্ভার ও রুমানিয়ার তৈলসম্পদের প্রলোভন নাৎসী জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্বরণ করা যে অসম্ভব তাহা খুবই সহজবোধ্য।

দুর্দ্ধর্ষ বৈদেশিক নীতি ব্যতীত ডিক্টেটারী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হয় না। সার্দ্ধছয় মিলিয়ন অষ্ট্রিয়াধিবাসী জার্ম্মাণদের জার্ম্মাণীর অন্তর্গত করিতে পারিলে হিটলারের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পথ সুগম হইয়া উঠিবে ও অতঃপর প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পরে হাঙ্গেরীকে করতলগত করিতে পারিলে মধ্য ইউরোপের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব হিটলারের ভাগ্যে জুটিতে পারে। এ কার্য্যে বাধা অনেকটা কম, কারণ চেকোশ্লোভাকিয়াতে Sudetan German-রা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও বেশ প্রতিপত্তিশালী, আর হইবে নাই বা কেন, যতক্ষণ বার্লিন আছে ও হিটলারী প্ররোচনা বেশ প্রবলই রহিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার অবস্থা হিটলারের আরও অনুকূল ছিল কারণ সেখানে মুষ্টিমেয় ইহুদি ছাড়া, প্রায় অধিকাংশই জার্ম্মাণ। অষ্ট্রিয়ার সমস্যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির ও রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্ঘর্ষ—"Republican versus Nazi, democratic vs totalitarian, Catholic vs Protestant।" সেইজন্যই আজ ভের্সাই সন্ধিপত্রের অশীতি ধারা (Article 80) হিটলার সগর্ব্বে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ঔদাসীন্যে হিটলার অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারে সফলকাম হইয়াছেন,—দোহাই দিবার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি বিন্দুমাত্রও নাই।

ইউরোপের ইতিহাসে ১২ই মার্চ্চ স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। জার্ম্মাণ সামরিক শক্তি ঐদিন প্রকাশ্যভাবে অষ্ট্রিয়ান স্বাধীনতাদীপ নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে মুসোলিনী ১৯৩৪ সালে জার্ম্মাণীর কবল হইতে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতারক্ষার জন্য Brenner Passএ সৈন্যসমাবেশ করিতে দ্বিধা করেন নাই, সেই মুসোলিনীই আজ অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণ আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে সদুপদেশ দিতেছেন। "Germans now know that the Rome-Berlin axis was not an artificial diplomatic construction but a solid reality।" আবিসীনিয়া, লিবিয়া ও স্পেনের সমস্যা লইয়া মুসোলিনী আজ একটু বিব্রত, Mediterraneanএ শক্তিসঞ্চয় অভিপ্রায়ে ইতালীর জার্ম্মাণ সাহায্য ও সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ইহার অগ্রিম মূল্যস্বরূপ। হিটলার এই মূল্য স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছেন, "I shall never forget this" এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইতালীর প্রয়োজনে জার্ম্মাণীও অনুরূপ প্রতিদান দিবে। ইতালী, বৃটেন ও ফ্রান্স ইতিপূর্ব্বে Stressa

Agreement-এ অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতারক্ষায় চুক্তিবদ্ধ ছিল, বিশেষতঃ Rome Protocol ইতালীকে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর স্বাধীনতারক্ষায় প্রথম উদ্যোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য ফরাসী জার্ম্মাণীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু ইতালী এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়া দূরে থাক, ৭ই মার্চ্চ ডাঃ শুশ্‌নিগ যে Austrian plebiscite অর্থাৎ গণভোটের আয়োজন করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে মুসোলিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "It is a bomb which would explode in your hand।" বৃটেন একবার নামমাত্র প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল, উপরন্তু ডিক্টেটারী কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, চেকোশ্লোভাকিয়াকেও কোন আশ্বাস দৃঢ়ভাবে দিতে স্বীকার করে নাই। দুর্ব্বল বৃটিশ বৈদেশিক নীতির সম্মুখে ফ্রান্স দোটানায় পড়িয়া গিয়াছে, তথাপি সাহসে ভর করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে আশ্বাস দিতে কুণ্ঠা করে নাই ও সাফ বলিয়া দিয়াছে যে সে Franco-Soviet Pact যথারীতি বলবৎ রাখিবে। সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি অবশ্য ইহাদের অপেক্ষা আরও একটু দৃঢ়তর। পররাষ্ট্রসচিব মিঃ লিটভিনফ নাৎসীশক্তির বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন একটু করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অন্য কোন শক্তি তাহাতে যোগ দিতে স্পষ্টতঃই পরাঙ্মুখ।

অষ্ট্রিয়ার এই নাটকীয় পরিণতির প্রথম অনুষ্ঠান ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হিটলারের Brechtesgaden বাসভবনে। তিনি অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডাঃ শুশ্‌নিগকে চারটি দাবী মানিয়া লইতে বলেন। প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়ার নাৎসীদলপতি Dr. Seyss Inquartকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ ডলফুস হত্যাকারিগণ প্রমুখ নাৎসী বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ত্রিশহাজার পলাতক বিদ্রোহী নাৎসীদলভুক্ত অষ্ট্রিয়াধিবাসীকে অষ্ট্রিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিতে হইবে; ও চতুর্থতঃ নাৎসীদলভুক্ত অষ্ট্রিয়াবাসিগণকে Patriotic Front বা Fatherland Front নামক সরকারী দলে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। দাবীগুলি অন্যায় ও স্বাধীন দেশের পক্ষে অপমানজনক হইলেও অষ্ট্রিয়ান গভর্ণমেণ্ট একে একে সমস্তগুলিই মানিয়া লইয়াছিলেন ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। Dr. Seyss Inquart হিটলারের জনৈক প্রধান অনুচর ও বর্ত্তমানে হিটলার কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার President ও Chancellor এই উভয়পদেই অধিষ্ঠিত

হইয়াছেন। হিটলারের এই সর্ত্তগুলি অষ্টাদশ ঘণ্টার মধ্যে অষ্ট্রিয়ার গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইতে বলা হইয়াছিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই দাবী মানিয়া লওয়ার পর ডাঃ শুশ্‌নিগ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "We realise we have gone to the limit···Herr Hitler had given an assurance that no further interference in Austrian domestic life would occur।" কিন্তু তাহা ত' হইবার নয়, হিটলারের অভিপ্রায় হইতেছে কোন অজুহাতে অষ্ট্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা এবং সেইজন্যই দাবী মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে সৈন্যসমাবেশের আয়োজন করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনা হইতেও জানা যায় যে ডাঃ শুশ্‌নিগের মারফৎ হিটলারের এই আশ্বাসবাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিটলার ইহার পূর্ব্বেও ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে Austro-German Agreement-এ অষ্ট্রিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষায় স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ৯ই মার্চ্চ ডাঃ শুশ্‌নিগ ঘোষণা করেন যে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতারক্ষার সঙ্কল্পে ১২ই মার্চ্চ রবিবারে plebiscite বা গণভোট গ্রহণ করা হইবে। ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার ডাঃ ডল্‌ফুসের সময় বিরচিত শাসনতান্ত্রিক আইনের পঁয়ষট্টি ধারানুযায়ী কেবলমাত্র চব্বিশ বৎসর বা তদূর্দ্ধবয়স্ক অধিবাসীগণই ভোট দিতে পারিবেন। চ্যান্সেলর ডাঃ শুশ্‌নিগ দেশবাসীকে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঘোষণা করেন, "They would not tolerate Nazi threats···Sunday must be a mighty profession of faith in Austria's freedom and independence।" অধিকাংশ অষ্ট্রিয়াধিবাসী একবাক্যে তাঁহার সমর্থক হইলেও, নাৎসীসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ইহার বিরোধিতা করিতে সুরু করে। গণভোটের ফলাফল কি হইবে তাহা কাহারও, এমনকি জার্ম্মাণীরও, অবিদিত ছিল না। বিপুল ভোটাধিক্যে ডাঃ শুশ্‌নিগ জয়লাভ করিতে পারিতেন, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা-সৌধ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত ও জার্ম্মাণ চক্রান্তের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়াকে গ্রাস করিতে অস্থির ও সেই জন্যই এই গণভোট গ্রহণের বিরোধী। হিটলার ডাঃ শুশ্‌নিগকে এই সিদ্ধান্তের জন্য জার্ম্মাণীর নিকট বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন ও জার্ম্মাণ স্বার্থরক্ষার ছলে অষ্ট্রিয়ায় প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই গণভোটে জয়লাভ করিলে ডাঃ শুশ্‌নিগ নাৎসী দুরভিসন্ধি সমূলে নাশ করিবার

শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেন—এই আক্রোশে হিটলার দেড় ঘণ্টার মধ্যে ডাঃ শুশ্‌নিগের পদত্যাগ দাবী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও অষ্ট্রিয়া আক্রমণের সমস্ত আয়োজনই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার নাৎসীদলও প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে সুরু করিয়া দেন। বলপ্রয়োগের চেষ্টা দেখিয়া ডাঃ শুশ্‌নিগ পদত্যাগ করেন ও শান্তি যাহাতে ব্যাহত না হয় তজ্জন্য অষ্ট্রিয়ানদিগকে জার্ম্মাণ শক্তিকে বাধা না দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার President Miklas প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও পরে বাধ্য হইয়া শুশ্‌নিগের পদত্যাগ গ্রহণ করেন। Dr. Inquart চ্যান্সেলরের পদগ্রহণ করিয়া অষ্ট্রিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে জার্ম্মাণ সামরিক সাহায্য চাহিয়া পাঠান, যদিও গণভোট গ্রহণ ইতিপূর্ব্বেই ডাঃ শুশ্‌নিগ জার্ম্মাণীর আদেশে স্থগিত রাখিয়াছিলেন। হিটলার জার্ম্মাণ সামরিক শক্তি সমভিব্যাহারে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিলেন—শান্তি আসিল সত্য কিন্তু স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে। ডাঃ ইনকোয়ার্টের অনুরোধে প্রেসিডেণ্ট মিকলাস পদত্যাগ করেন ও ডাঃ ইনকোয়ার্ট প্রেসিডেণ্টের পদও গ্রহণ করেন। ১৩ই মার্চ্চ জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়াকে একদেশবর্ত্তী করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে ও ঐদিন হইতে অষ্ট্রিয়া Greater Germanyর অন্তর্গত একটি প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। অষ্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি জার্ম্মাণ সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ও হিটলার এই Greater Germanyর সর্ব্বময় কর্ত্তা। ১০ই এপ্রিলের গণভোটে ইহার অনুমোদন করা হইয়াছে—ইহার মূল্য যে কতটুকু তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। হিটলারও যে অবস্থাবিশেষে অষ্ট্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা তিনিও স্বীকার করেন, "I did not take the decision in 1938 but immediately after the end of the Great War···I have believed in this mission, I have lived and fought for it and I have now fulfilled it।" তাঁহার দাবীগুলি অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নয় ও যখন তিনি বলেন, "Germany could not look on calmly when millions of Germans in Austria were illtreated", তখন ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না। মুসোলিনীর নিকট প্রেরীত তাঁহার পত্রও অনুরূপ অজুহাত মাত্র। ডাঃ ইনকোয়ার্ট যখন শান্তিরক্ষার নামে জার্ম্মাণ সামরিক সাহায্য চাহিয়াছিলেন তখন ডাঃ শুশ্‌নিগই ঘোষণা করিয়াছিলেন, "I declare before the

world that reports spread in Austria that there have been labour disputes, that streams of blood are flowing, that the Government is not master of the situation and could not keep order, were invented from A to Z"। হিটলারের "Mittel-Europa"র স্বপ্ন আজ নূতন নয়, অষ্ট্রিয়া ইহার প্রথম লক্ষ্য, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও Little Entente ইহার অবসান।

অষ্ট্রিয়ার যে রাজনৈতিক নেতারা আজ স্বাধীনতাকামী তাঁহারাও অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতার এই পরিণতির জন্য অনেকটা দায়ী। ১৯৩০ সালে অষ্ট্রিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচনে নাৎসী সহানুভূতিসম্পন্ন একজনও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, যদিও ঐ সময়ে জার্ম্মাণীতে হিটলারের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল ছয় মিলিয়ন। অষ্ট্রিয়ান সংগ্রাম-বিমুখতা হিটলারের প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। হিটলারী অভিসন্ধির প্রধান শত্রু ছিল অষ্ট্রিয়ার শ্রমিকবৃন্দ এবং তাহারাই অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়। অথচ ১৯৩৪ সালে ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার ডাঃ ডল্‌ফুস এই শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই প্রথম অভিযান সুরু করিয়াছিলেন। সোশ্যালিষ্ট অপবাদ পাইবার ভয়ে তিনি ও অন্যান্য অষ্ট্রিয়ান রাজনৈতিক নেতারা ডিক্টেটারী মতবাদের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ফাশিষ্ট কার্য্যপন্থা নাৎসী-শক্তির সাহায্য করিয়াছিল। "Independence of Austria was doomed in those cold February days four years ago when the cannon of Chancellor Dolfuss bombarded for days the working class quarters of Vienna and massacred the flower of Austrian working class, the only class most vitally interested to defend Austria against Hitlerism"। পরবর্ত্তী চ্যান্সেলর ডাঃ শুশ্‌নিগও অষ্ট্রিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কম বিরূপ ছিলেন না। ফাশিজমের একমাত্র শত্রু বর্ত্তমানের working class movement, ডিক্টেটারী শক্তির একমাত্র বাধা শ্রমিক ও মজুর। এইজন্যই অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার আজ কেহ নাই। ১৯৩৫ সালে নাৎসী দল ডল্‌ফুসের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ২৫শে জুলাই তাহাকে হত্যা করে।—কিন্তু এই নাৎসী সন্ত্রাসবাদের ফলে অষ্ট্রিয়ায় জার্ম্মাণ প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট

বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেকের অনুমান, ১৯৩২ সালে শতকরা ৮০ জন অষ্ট্রিয়াবাসী জার্ম্মাণীর সহিত মিলনের অনুকূলে ছিল, কিন্তু ১৯৩৩ সালে হিটলারের কার্য্যপদ্ধতির ফলে শতকরা ৬০ জন হিটলারী জার্ম্মাণীর প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃ নাৎসীপ্রভাব ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিলেও অধিকাংশ অষ্ট্রিয়ান হিটলার-চক্রান্ত আন্তরিকভাবে ঘৃণা করিয়াই আসিতেছিল। এই অবস্থাই ছিল ডাঃ শুশ্‌নিগের সহায় ও সুযোগ এবং এই অষ্ট্রিয়ানরাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিয়াছিল। ইহাদেরই সমর্থনে ডাঃ শুশ্‌নিগের স্বাধীনতারক্ষার শেষ উদ্যম। কিন্তু শান্তিপ্রিয় অষ্ট্রিয়াবাসী তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে নাই, কারণ সাহায্য যাহারা করিতে পারিত সেই শ্রমিক মজুরের দলন অষ্ট্রিয়ান রাজনৈতিক নেতারা বেশ ভাল ভাবেই করিয়াছিলেন।

ইউরোপে ফাশিষ্ট শক্তিবর্গের এই কার্য্যকলাপের জন্য ডেমোক্রেটিক রাজ্যসমূহও অনেকটা দায়ী। বৃটেন জার্ম্মাণীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণী এইরূপ প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না। জার্ম্মাণী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, "it comes twenty years too late।" শুধু তাহাই নহে, Reichstag-এর বক্তৃতায় হিটলার ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে পাল্টা আক্রমণ করিয়াছেন, "It is regrettable that the democracies have failed to understand the development. Their reaction is unintelligible and insulting।" অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা রক্ষার্থে যে চুক্তি হইয়াছিল, বৃটেন তাহাতে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও জার্ম্মাণ অভিসন্ধিতে কোন বাধা দেয় নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বিবৃতি দিয়াছিলেন যে বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলেই বৃটেন বাধা দিবে নচেৎ নয়। Harry Pollit উত্তর দিয়াছেন বেশ ভালরকমই, "Chamberlain refused to help Schuschnigg just as the National Government betrayed Spain, China, Abyssinia and Manchuria।" টাইমস পত্রিকা মনে করিয়াছিলেন যে এইরূপ সঙ্কটে বৃটিশ রাজনৈতিক কর্ত্তাদের "cool heads" বজায় রাখা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু, যে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা একেবারে "cold feet"-এর লক্ষণ। কেবল তাহাই নহে, ফাশিষ্ট শক্তিবর্গকে তুষ্ট করিতে বৃটেন তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। ইতালীর সহিত মিতালি করিবার জন্য চেম্বারলেন এণ্টনি ইডেনকেও সরাইয়া দিলেন। ইডেনের

অপরাধ যে তিনি স্পেনীয় সমস্যার সমাধান সর্ব্বাগ্রে চাহিয়াছিলেন ; ইতালী স্পেন ব্যাপারে অকৃত্রিমভাবে নিরপেক্ষ না থাকিলে তিনি ফাশিষ্ট ইতালীর সহিত সখ্যতা স্থাপনে রাজী হন নাই। ইতিমধ্যে ১৮ই মার্চ্চ ইতালীর সহিত বৃটেনের বাণিজ্যচুক্তি পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে এবং রাজনৈতিক চুক্তির জন্য রোমে Lord Perth ও Count Cianoর মধ্যে পরামর্শ চলিতেছিল। সম্প্রতি এই রাজনৈতিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে—ইহাতে স্পেন সমস্যার উল্লেখ নাই, আছে কেবল পরস্পরকে তুষ্ট করিবার ফন্দী। ফাশিষ্ট শক্তিকে তুষ্ট করিবার জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর ইতালীয় গভর্ণমেণ্টকে সমগ্র আবিসীনিয়ার গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই রাজনৈতিক চুক্তির মারফৎ বৃটেন ও ইতালী পরস্পরকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই দুই জাতির মহামিলন জগতের শান্তিস্থাপনের নূতন অধ্যায়, পরে নাকি জার্ম্মাণীর সহিতও অন্তরঙ্গভাবে বোঝাপড়া বৃটেনের হইতে পারে, ফ্রান্সও যদি বৃটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে তাহা হইলে ইউরোপের শান্তি অবশ্যম্ভাবী! ডেমোক্রেটিক ও ডিক্টেটারী শক্তিবর্গের এই মিলনের পথের কণ্টক ছিল, বোধ হয়, আবিসীনিয়া, স্পেন ও অষ্ট্রিয়া। তবে, একটু ভাবিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে ফাশিষ্ট শক্তিবর্গের চুক্তি ও আশ্বাসের মূল্য কতটুকু। কেবল একটু সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা মাত্র। ইউরোপের ইতিহাসে বহু চুক্তি ও বহু আশ্বাসই ফাশিষ্টশক্তি দিয়াছে—অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার্থেও ইহাদের অভাব ছিল না। General Goering বলিয়াছেন, "A new map of Europe has been created", এবং মনে হয়, দু'দিন পরে জার্ম্মাণীর সহিত বোঝাপড়া হইলে, বৃটেন এই নূতন মানচিত্র সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইবে। তবে সমস্যা হইতেছে যে মানচিত্র পরিবর্ত্তনের এইমাত্র সুরু। মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব্ব ইউরোপকে পরে চেনা দুষ্কর হইতেও পারে। হিটলার ২০শে ফেব্রুয়ারীর বক্তৃতায় স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন, "The claim for German colonies will therefore be voiced from year to year with increasing vigour..." বৃটেন যদি ফাশিষ্ট ইতালীকে জার্ম্মাণীর দল হইতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে বলিয়াই মনে হয়, কারণ ফাশিষ্ট শক্তিবর্গের স্বার্থ ও সাধনা প্রায় একরূপ। মুসোলিনী বা হিটলার কার্য্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বৃটেনকে

স্তোকবাক্য দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মুসোলিনী ইতালীকে এখন Mediterranean Power-এ পরিণত করিতে চায় এবং এই প্রচেষ্টায় জার্ম্মাণীর সাহায্য ও সমর্থন ষোল আনাই পাইবে। পরিবর্ত্তে মুসোলিনী হিটলারের দক্ষিণপূর্ব্ব ইউরোপে সাম্রাজ্যবিস্তারে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। উভয়ের এই স্বার্থে যাহাতে সত্যসত্যই বাধা উপস্থিত না হয় তজ্জন্য ডেমোক্রেটিক শক্তিদ্বয় যথা বৃটেন ও ফ্রান্সকে আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি নিজেদের অবস্থা ভাবিয়া বিশেষ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ডেমোক্রেটিক মহাশক্তিগুলির তথাকথিত নিরপেক্ষতা ও প্রকৃতপক্ষে নিষ্ক্রিয়তা ও অক্ষমতা তাহাদের চক্ষে ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যর্থতা আবিসীনিয়া ও চীনের সমস্যায় প্রকট হইয়াছে। ক্ষুদ্র শক্তিবর্গের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়ার পতনের পর সকলেই সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীর অবস্থাও অবিলম্বে অষ্ট্রিয়ার অনুরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই অশান্তি দেখা দিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্ম্মাণ সম্প্রদায়ের সংখ্যা সার্দ্ধ তিন মিলিয়ন। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত স্বায়ত্তশাসন ও সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার দাবী করিতেছে ও ফলে ইতিপূর্ব্বেই তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯শে মার্চ্চ ঘোষণা করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা বাইশটি পদ জার্ম্মাণরা পাইবে ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংখ্যা অনুযায়ী আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকটি প্রদেশে জার্ম্মাণ সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাও আশ্চর্য্য নয় যে এই প্রদেশগুলি পরে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র থাকিবার দাবী করিবে ও Greater Germanyর অন্তর্গত হইয়া যাইবে। এইরূপে অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের দাবী করাইতে পারিলে চেকোশ্লোভাকিয়ার অনেকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ও জার্ম্মাণী অতি সহজেই এই প্রদেশগুলিকে একে একে গ্রাস করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ আন্দোলন চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে খানিকটা দেখা গিয়াছে—এখন মাত্র নাৎসী-প্রভাব বিস্তারের অপেক্ষা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে নাৎসী-আন্দোলন

চালাইতে পারিলেই হিটলারের পথ সুগম হইয়া উঠে। চেকোশ্লোভাকিয়ার গভর্ণমেণ্ট একক হিটলারী প্রভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে অক্ষম। ফ্রান্স ও রাশিয়া চেকোশ্লোভিয়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়েরই প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করিবার প্রধান অন্তরায় হইতেছে অবস্থিতির দূরত্ব। নিকটতর প্রতিবেশী রাশিয়া ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ও রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত সোস্যালিজ্‌মের প্রতিকূল দুইটি শক্তি পোলাণ্ড ও রুমানিয়া। বৃটেন স্পষ্ট করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে কোন আশ্বাস দেয় নাই, দেখিয়া মনে হয় সত্যই "Czechoslovakia has been thrown to the wolves।" রুমানিয়ার অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। গত ১৭ই এপ্রিল তথাকার ফাশিষ্ট "Iron Guard" দল তাহাদের নাৎসীপন্থী নেতা M. Codreanuর অধিনায়কত্বে "Coup d' etat"-এর চেষ্টায় ছিল কিন্তু সফলকাম হয় নাই। এই ডিক্টেটারী প্রচেষ্টা সফল না হইলেও, ইহার শেষ পরিণতি হয় নাই। রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়ভাবে তাহাদিগকে দমন করিলেও ইহার পশ্চাতে যে ফাশিষ্ট শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতেও এইরূপ অশান্তি অবিলম্বে দেখা দিতে পারে। সুতরাং ইউরোপের বুকে ডিক্টেটারী শক্তিবর্গের এই অভিযানে বাধা দিবার কিছুই নাই—কাহারও বা ইচ্ছা নাই, কাহারও ইচ্ছা থাকিলে শক্তি নাই। সকল দৃষ্টিই এখন চেকোশ্লোভাকিয়াতে নিবদ্ধ কারণ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রসারের ইহাই দ্বিতীয় লক্ষ্য। "Czechoslovak independence is the heart of Central European politics", এবং ইহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই ইউরোপের অশান্তি ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে ও ডিক্টেটারী অনাচারের সম্যক প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

সোমলতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

আখড়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গৌরহরি খুব বেশী লোককে আনতে পারেনি। তার সম্বল গ্রামের লোকের চাঁদা। তার উপর নির্ভর ক'রে বড় মহোৎসব যে করা যায় না তা নয়, কিন্তু মিছামিছি সামান্য একটা উপলক্ষে বৃহৎ ব্যাপার করতে গৌরহরি যায়নি। এসেছে কাছাকাছি গ্রামের বৈষ্ণবেরা। দূর থেকে কেবল এসেছে ললিতা আর রসময়, ছোট বাবাজি আর তমাললতা।

ছোট বাবাজির শরীর সত্যই খারাপ। তাঁর আসার ইচ্ছা ছিল না, এই শরীরে অতখানি পথ হেঁটে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু গৌরহরির মিনতি এড়াতে পারেননি। তা ছাড়া নিজের শরীরের এই অবস্থা দেখে তমাললতার একটা সুব্যবস্থা করবার জন্যেও ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু এর বেশী আর কারও আসবার দরকারও ছিল না। যারা এসেছে তাদেরই নৃত্যে, গীতে, বাদ্যে একদিনেই গ্রাম টলমল ক'রে উঠল। আখড়ার দাওয়ায় ছোট বাবাজির বসবার জায়গা হয়েছে। ঘরের ভিতর ভাণ্ডার। সেখানে কখনও থাকে তমাললতা, কখনও ললিতা। তমালই বেশী থাকে, কারণ ললিতা এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। বিশেষ গায়িকা হিসাবে বৈষ্ণব-সমাজে সে প্রসিদ্ধ। কেউ না কেউ প্রায়ই এসে তাকে টানতে টানতে গানের আখড়ায় নিয়ে যায়।

গানের আখড়াও একটা নয়। তারা খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা দল এক এক জায়গায় আসর জমিয়েছে। এক এক দলে পাঁচ-ছয় জন পুরুষ, আর দু'তিন জন স্ত্রীলোক। এরা সবাই ভালো গাইতে পারে। ললিতা গৃহস্বামীর বোন। তাকে সব জায়গায় গিয়ে বসতে হয়। দু'একখানা গান গাইতেও হয়। রোদ তেমন তীব্র নয়। সামনের খোলা উঠানে মাথার উপর চট টাঙিয়ে এদের বসবার যায়গা হয়েছে।

আর পিছনের দিকের উঠানে হয়েছে রান্নার জায়গা। খোলা উঠানে বড় বড় জোল কেটে রান্না চড়েছে। তার ভার নিয়েছে কতকগুলি স্থূলাঙ্গী বর্ষিয়সী বৈষ্ণবী। আর পাড়ার ক'টি লোক জল তোলা থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য অনেক বিষয়ে এদের সাহায্য করছে। লোক ক'টি অভিজ্ঞ রসিক ব্যক্তি। এরই মধ্যে এরা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস বেশ জমিয়ে তুলেছে। এরা কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কাউকে কখনও দেখেনি, হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনো দিন দেখবেও না। বোধ হয় সেই কারণেই সঙ্কোচের ব্যবধান একেবারেই গেছে উঠে। এই একটা দিনের জন্যে যাকে যার প্রয়োজন সে তার একটা নামকরণও ক'রেছে।

—ও বকুল ফুল, ব'সে ব'সে দিব্যি পান তো চিবুচ্ছ। আর এদিকে জল ব'য়ে ব'য়ে আমার কাঁধ ফুলে উঠেছে। বেশ!

বকুল ফুল এক গাল হেসে বললে, এই কথা! তা নাও না একটা পান। দুঃখ ক'রে লাভ কি।

বকুল ফুল আঁচলে বাঁধা কলাপাতার ঠোঙা থেকে একটা পান বার ক'রে দিলে।

—কি ঘেমেছ গো!

—ঘামব না। পরিশ্রমটা কি সোজা। কিছু না হোক বিশ ঘড়া জল তুলেছি।

বকুলফুল অপাঙ্গে মধুর হেসে চুপি চুপি বললে, মেলা লোক রয়েছে তাই, নইলে আঁচলে ঘাম মুছিয়ে বাতাস করতাম।

—কই গো, এইখানকার সেই মানুষটি গেল কোথায়? ডাল যে পুড়ে যাবে।

স্থূলাঙ্গিনী সেই মানুষটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে একটা কাঠি দিয়ে ডাল নাড়তে নাড়তে ভারী মোটা গলায় বললে, যাব আবার কোন চুলোয়। পাশেই ছিলাম দেখতে পাওনি?

—না, না, যাবে আবার কোথায়? এসে দেখতে পেলাম না কিনা তাই।

স্থূলাঙ্গিনী অন্য দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

পুরুষটি উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগল, সত্যি বলছি, এদিক ওদিক ঘুরছি, ফাই-ফরমাস খাটছি, কিন্তু মন প'ড়ে রয়েছে আমার এইখানে। এসে দেখতে না পেলে,

—চুপ কর, কেউ শুনতে পাবে।

—কি সুন্দর গানই গায় ভাই! ললিতার গলা যে এমন মিষ্টি তা জানতাম না।

—সে কি! ওর গান শোননি কখনও?

—না। ছোট বাবাজি মাথায় হাত রেখে কত আশীর্ব্বাদ যে করলেন তার ঠিক নেই।

—আমার ভাই ভালো লাগে না।

—গান?

—গান নয়। সব সময় যেন হেলে দুলে নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন। মেয়ে মানুষের অত কি?

—তা যা ব'লেছ ভাই। দেখলে গা জ্বলে।

—গঙ্গাজল, তোমার মনটি ভাই ঠিক গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কাছে বসলে মনটা যেন জুড়িয়ে যায়।

—তা একটুক্ষণ ব'সেই না হয় মনটা জুড়িয়ে যাও। ওই কাঠখানা টেনে নিয়ে এসে ব'স।

—তার কি যো আছে ভাই, এখনও মশলা পেশা বাকি।

—তবে আর আমি কি করব বল?

—মেয়েটি কে ভাই?

—কোন মেয়েটি? ও, ওর নাম বিনোদিনী।

—আমাদের বোষ্টম তো নয়।

—না। বড় দুঃখী মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে বনে না, এখানে ভায়ের বাড়ীতে থাকে। বড় ভালো মেয়ে।

—তা হ'তে পারে। কিন্তু একটু দেমাক আছে।

—কি রকম?

—মানুষকে যেন তাকিয়ে দেখে না।

—হা হা হা। না দেমাক নয়, ওই রকমই স্বভাব।

—এস, এস, ললিতা এস। সার্থক গান শিখেছিলে ভাই। যেমন দরদ, তেমনি লহর।

—তুমি এখানে ব'সে কি করছ সুরেনদা?

—কিছুই করেনি, আমার কাছে ব'সে প্রাণটা জুড়চ্ছে। এইবার অনেকখানি জুড়িয়েছে ভাই। এখন মশলাটা নিয়ে এস।

ললিতা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে।

—তোমার আর কত দেরী ভাই?

—আর বেশী দেরী নেই।

সকাল থেকে বিনোদিনী অন্ততঃ দশবার এসেছে, দশবার গেছে। একসঙ্গে ভাঁড়ার এবং রান্নার তদারক, তার উপর মাঝে মাঝে গানের আখড়া,—সুতরাং ললিতার দেখা পাওয়াই ভার। গৌরহরিরও একই প্রকার অবস্থা। যখনই বিনোদিনী আসে, দেখে গৌরহরি মাথায় গামছা জড়িয়ে হয় ছুটোছুটি করছে, নয়তো ছোট বাবাজির কাছে পরম ভক্তিভরে ব'সে আছে, কিম্বা ভাণ্ডারে তমাল-লতার সঙ্গে নিরিবিলি ফিসফাস ক'রে কি যেন পরামর্শ করছে।

তমাললতাকে সে চেনে না। সে যে কে, এবং কেনই বা এখানে এসে একেবারে ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব করছে তাও জানে না। তমাললতা সুন্দরী, কৈশোর

ছাড়িয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। কিন্তু ওইটুকু মেয়ে যে রকম গাম্ভীর্য্য এবং তৎপরতার সঙ্গে ভাণ্ডারের সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে তত্ত্বাবধান করছে, তা তার ভালো লাগেনি। এতখানি যোগ্যতা যেন ওই বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না,—ওই গাম্ভীর্য্যও না। মেয়েটির মন যেন নিতান্ত অশোভনভাবে বয়স এবং দেহের আগে আগে চলেছে।

বিনোদিনীর তাকে ভালো লাগল না। তবু আর কাকেও না পেয়ে তারই কাছে গিয়ে একবার বসল। হয়তো আরও একটু উদ্দেশ্যও ছিল। গৌরহরি নানা কাজে বারেবারেই এখানে আসছে, এই সুযোগে তার সঙ্গে একটু দেখাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমনি তার অদৃষ্ট যে, যতক্ষণ সে ভাণ্ডারে রইল গৌরহরি যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বোধ হয় সেই সময়েই তার বাইরের কাজ বেড়ে গেল।

অগত্যা তমাললতার সঙ্গেই বিনোদিনী আলাপ জমাতে বসল:

—তোমার নামটি কি ভাই?

—তমাললতা।

—তোমাদের আখড়াটা কোথায়?

—ছোট বাবাজির আখড়াতেই থাকি।

—তোমার বাপ-মা আসেনি?

তমাললতা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

দুঃখ সয়ে সয়ে এই বয়সেই সে আবশ্যকেরও অতিরিক্ত শক্ত হয়ে গেছে। নিজের সম্বন্ধে আলোচনায় রমণীসুলভ স্বাভাবিক উৎসাহ তার নেই। তার বাপ-মা আসেনি। কেন আসেনি তা আর বলার প্রয়োজন বোধ করলে না। তারা যে তাকে অসহায় ফেলে এই পৃথিবীর মমতা কাটিয়ে অন্য লোকে চলে গেছে, কি হবে সে কথা বিনোদিনীকে জানিয়ে?

এই দিক দিয়েই গৌরহরি তার সঙ্গে বিনোদিনীর মিল খুঁজে পেয়েছিল।

কিন্তু এমন ক'রে গল্প করারও তমাললতার সময় নেই। একজনের পর একজন লোক এসে ক্রমাগত একটা না একটা জিনিস চাইছে। কেউ তেল, কেউ নুন, কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ বা জলখাবার। তমালের বসবার সময় নেই।

বিনোদিনী অগত্যা সেখান থেকেও উঠে এল।

হতাশ হয়ে সে ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে ললিতা এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

—পালাচ্ছিস যে বড়!

—কি করব ? তোর তো দেখাই নেই।

ললিতা হেসে উঠল। বললে, আর পারি না। খেটে খেটে হাঁপিয়ে উঠেছি। চল, ওই বাতাবি লেবুতলায় নিরিবিলি একটু বসা যাক।

বললে, তবু তো তমাললতার জন্যে ভাঁড়ারের দায় থেকে বেঁচেছি। নইলে কি যে করতাম ভেবে পাই না। নিশ্চয় পাগল হয়ে যেতাম।

বাতাবি লেবুতলার এই দিকটাই যা একটু নিরিবিলি। মধ্যেখানে চালাটা পড়ায় জনতা থেকে আড়ালও হয়েছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, ও মেয়েটি কে ভাই ?

—কোন মেয়েটি ? তমাললতা ? কে জানে ! আমিও চিনি না। শুনেছি বছর কতক আগে ওর বাপ, মা, স্বামী সব মারা গেছে। তারপর থেকে ছোট বাবাজির আশ্রয়েই আছে। বেশ মেয়ে, না ?

—হুঁ।

—ওইটুকু মেয়ে এমন ভাঁড়ার চালাচ্ছে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

—হুঁ।

বিনোদিনীর আঁচলে পাকা কুল ছিল। ললিতার হাতে কতকগুলো দিয়ে বললে, খা।

—কোথায় পেলি ভাই ? তোদের বড় গাছটার কুল, না ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক চিনেছি। এ সব কি ভোলবার যো আছে। লুকিয়ে কুল পাড়তে গিয়ে তোদের দাদার কাছে কম তাড়াটা খেয়েছি !

অতীত কথা স্মরণ ক'রে দু'জনেই হেসে উঠল।

একটু পরে ললিতা বললে, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

বিনোদিনী ঘাড় নাড়লে।

ললিতা নিবিষ্ট মনে কুল খেতে লাগল। কিছু পরে বললে, একটা কথা বলব বিনোদিনী। রাগ করবি নে তো ?

—রাগ করব কেন ?

—বলছিলাম, একটু সাবধানে চলিস। ব্যাপারটা জানাজানি হ'লে বড় কেলেঙ্কারী হবে।

বিনোদিনী চুপ ক'রে রইল।

—বুঝলি ?

—আমি যে সাবধানে চলতে পারি না ভাই। আমার ঘাড়ে যখন যেটা চাপে, ভূতের মতো চাপে। আমি আর তাল রাখতে পারি না।

—তা বললে তো হবে না।

বিনোদিনী কেমন যেন মুষড়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে ভাই। আমি আর ভাবতে পারি না। আমার আর কি আছে ? ভয়ই বা কিসের ?

ক'টি কাক কোথা থেকে কি একটা মুখে ক'রে নিয়ে এসে দ্বিতীয় মহোৎসব আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ললিতা তাদের দিকে ঢিল ছুঁড়তেই তারা পালিয়ে গেল।

বিনোদিনী বললে, এ যে আমার কি হ'ল ভাই, মনে আমার এক তিল সুখ নেই। সমস্ত সময় কি যে ভয়ে ভয়ে বেড়াই, সে আমি জানি আর ভগবান জানেন।

বললে, কাজে মন বসে না। একদণ্ড কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারি না। সর্ব্বক্ষণ মনটা কি যে উড়ু-উড়ু করে সে আমি বোঝাতে পারব না।

বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ললিতা চুপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল। একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পারলে না। ওদিকে মহা কলরব উঠছে। বেশীক্ষণ বন্ধুর পাশে ব'সে থাকারও সময় নেই।

বললে, ওদিকে আবার কি হাঙ্গামা বাধল কে জানে। এ আপদ চুকলে বাঁচি।

বিনোদিনী উঠে দাঁড়াল। বললে, হ্যাঁ, তুই যা ! কাল কথা হবে।

আহারাদির ব্যবস্থাটা অবশ্য 'দীয়তাং ভুজ্যতাম' নয়, কিন্তু কলরব এবং

সমারোহটা সেই রকমই। খাওয়া-দাওয়া মিটল সন্ধ্যাবেলায়, কিন্তু আনুষঙ্গিক গোলযোগ মিটতে রাত এগারোটা। সমস্ত দিনের নৃত্য, গীত এবং গঞ্জিকা-সেবনের পরে ভূরিভোজন ক'রে অভ্যাগতদের কারও আর নড়বার ক্ষমতা রইল না। পুরুষবর্গকে পরিবেশন করলে মেয়েরা। কিন্তু মেয়েদের কে যে পরিবেশন করে তার লোক নেই। ক্লান্তদেহ বাবাজিরা সাফ জবাব দিয়ে দিলে। অবশেষে ললিতা এবং তমাললতাই তাদের পরিবেশন করলে বটে, কিন্তু অত লোককে পরিবেশন করা কি দু'জনের কাজ? ফলে গোলযোগ এবং বিশৃঙ্খলা হ'ল অনেক। কলহও কিছু না হ'ল তা নয়। এমনি ক'রে রাত এগারোটায় মহোৎসব শেষ হ'ল। মেয়েরাও কেউ এক আঁটি খড়, কেউ বা ভিক্ষার ঝুলি মাথায় দিয়ে উঠানে, বারান্দায়, গাছতলায়, যে যেখানে পারলে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ছোট বাবাজি সমস্ত দিন শুধু একটু কাঁচা দুধ খেয়ে আছেন। সকল লোকের খাওয়া-দাওয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক ক'রে একটু আগে ভজনে বসেছিলেন, এখন বাইরে এসে নিজের আসনটিতে বসলেন।

তমাললতা একটা শালপাতায় সামান্য কিছু ফল মিষ্টি নিয়ে এল। গৌরহরি আনলে তামাক সেজে। ললিতা একটু আগেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অদূরে ব'সে-ছিল। এরই মধ্যে কখন গুটিসুটি দিয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে।

সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। নারিকেল গাছের মাথার উপর ঝকঝক করছে ষোলো কলায় পরিপূর্ণ চাঁদ। মেঘমুক্ত আকাশ নীলাভ পরিচ্ছন্নতায় ঝলমল করছে।

ছোট বাবাজি বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল বাবা, উপস্থিত বৈষ্ণব-সজ্জনদের সামনে তোমাদের মালাবদলের কথাটা আজই পাকা করে রাখি। কিন্তু দিনটা গেল গোলমালে, রাত্রে সব অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তা থাক এখন। কাল সকালে সবাইকে বিদায় দেবার আগেই কথাটা পাকা ক'রে সকলের অনুমতি নেব। কি বল?

গৌরহরি অপাঙ্গে একবার তমাললতার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলে। ভালো দেখা গেল না।

তমাললতা ছোট বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার বিছানা কি বাইরে হবে, না ঘরে?

—না, না, ঘরে। এখনও হিম আছে, বাইরে শোওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

ছোট বাবাজি খুক খুক ক'রে কাশলেন।

ঘরের মধ্যে বিছানা ক'রে এসে তমাললতা ডাকলে, আসুন। বিছানা হয়েছে।

ছোট বাবাজি গৌরহরির দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা বাবা, তাহ'লে তুমি শোওগে। রাতও হয়েছে।

—আজ্ঞে না, রাত আর বেশী কি হয়েছে? আপনার একটু পদসেবা ক'রেই…

বাধা দিয়ে ছোট বাবাজি বললেন, কিছু দরকার হবে না, কিছু দরকার হবে না। আমি এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি। সমস্ত দিন খেটেছ, একটু বিশ্রাম দরকার। তুমি যাও। তমাল তো রয়েছে।

ছোট বাবাজির পায়ের ধুলো নিয়ে গৌরহরি উঠে এল।

সমস্ত দিন সে খেটেছে বটে, কিন্তু দেহে মনে ক্লান্তি কোথাও ছিল না। দেহ যেন তার পালকের মতো হালকা বোধ হচ্ছিল। ঘুম যেন তার চোখ ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে।

গৌরহরি চারিদিকে চেয়ে দেখল। সামনের অনতিপরিসর উঠানে শোয়া দূরে থাক পা বাড়াবার জায়গা নেই। পিছনের দিকে মেয়েরা শুয়েছে। সেদিকে যাওয়া দূরে থাক, চাইবারই উপায় নেই। রান্নার চালাতেও কয়েকজন শুয়ে আছে। সেখানে একটুখানি হাত-পা ছড়াবার জায়গা অবশ্য আছে। কিন্তু এখনই গা গড়াতে তার ইচ্ছা করল না। সে পিছনের বাতাবি লেবুর গাছের কাছটিতে ধীরে ধীরে পাইচারি করতে লাগল।

এইখান থেকে পিছনের খিড়কি এবং তারও ওপারের পুকুর পর্য্যন্ত বেশ নজর চলে। ফুট ফুটে জ্যোৎস্না। কানায় কানায় ভরা পুকুরের জল চাঁদের আলোয় চিকমিক করছে। মৃদু হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউগুলি অস্পষ্ট কুলকুল শব্দে পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছে। ওপারের অশ্বত্থ গাছের নীচেটা আলো-ছায়ায় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আর তার পরে চলে গেছে শস্যহীন বিস্তীর্ণ মাঠ।

মাঝে মাঝে দু'একখানি আখের জমি। দূর মাঠে আলুর ক্ষেত পাহারা দেবার জন্যে যে ছোট ছোট চালাগুলি তৈরী হয়েছে, চাঁদিনী রাত্রি হ'লেও এতদূর থেকে তা ঠাহর হয় না।

হঠাৎ মনে হ'ল, কে যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে খিড়কির আগড় ঠেলে ভিতরে ঢুকছে।

গৌরহরি চমকে উঠল। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই। এত রাত্রে কেউ কি বাইরে গিয়েছিল? কিন্তু না তো, যেদিকে মেয়েরা শুয়ে আছে, সেদিকে তো ও গেল না? আখড়ার দিকেই আসছে যে!

গৌরহরি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। মেয়েটি যেন তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ থমকে গেল। ঘোমটার আড়াল থেকে ভালো ক'রে চেয়ে চেয়ে যেন দেখলে। তারপর ক্ষিপ্র লঘুপদে তার দিকে আসতে লাগল। ছুটতে ছুটতে এসে তার একখানা হাত চেপে ধরল।

গৌরহরির বিস্ময় তখন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললে, বিনোদিনী?

—হ্যাঁ, আমি। একটু আড়ালে চল। বাতাবি লেবুগাছটার নীচে।

বিনোদিনী হাঁফাচ্ছিল।

গৌরহরি যন্ত্রচালিতের মতো তার পিছু পিছু গিয়ে অন্ধকার ছায়ার নীচে দাঁড়াল।

একটা উঁচু ঢিবির উপর বিনোদিনী বসল। গৌরহরিকে বললে, এখানে বোসো।

গৌরহরি বসল।

বিনোদিনী তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অকারণ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে বললে, বিয়ের খবর শুনলাম।

গৌরহরির মুখ শুকিয়ে গেল। এ ভয় তার বরাবর ছিল। কথাটা জানাজানি হবেই। তখন বিনোদিনীর সামনে দাঁড়াবে কি ক'রে? আর বিনোদিনী যা মেয়ে!

বললে, আমার বিয়ে? কে বললে?

—তোমার নয় গো!

—তবে?

বিনোদিনী রেগে ওর হাতখানা ছুড়ে ফেলে দিলে। বললে, জানি না।

এতক্ষণে গৌরহরির দেহে যেন ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্চার হ'তে লাগল। বললে, হারাণের বিয়ে?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বিনোদিনী সায় দিলে।

—কি ক'রে খবর পেলে?

—তারাপদ ঠাকুরপো এসেছে, সেই বললে।

—তারাপদ, কে?

—তুমি চিনবে না। পাড়ার একটি ছেলে। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

গৌরহরি চিন্তিতভাবে ব'সে রইল। বললে, এবারে তোমার যাওয়া উচিত বিনোদিনী।

গৌরহরি ধীরে ধীরে একখানি হাত ওর কাঁধের উপর রাখলে। বললে, ফিরে যাও। এর চেয়ে বেশী জেদ ভালো নয়।

বিনোদিনী একেবারে ওর বুকের কাছে ঘেঁসে এল। বললে, আর তুমি?

—আমি কি? আমি পথের পথিক, দু'দিন পরে আবার আগের মতো ক'রে আমায় ভুলে যাবে।

বিনোদিনী যেন ছিটকে ওর কাছ থেকে স'রে এল। বললে, এই খোঁটা যখন-তখন তুমি আমায় কেন দাও বল তো? তুমি কি মনে কর, কোনোদিন তোমাকে ভুলতে পেরেছিলাম?

—মনে করব কেন, দেখেই তো এসেছি। প্রথম দিন দেখে তুমি আমাকে চিনতেই পারনি।

অপ্রস্তুত হাস্যে বিনোদিনী ওর বুকে মুখ লুকোল। বললে, না পারিনি! তুমি ছাই দেখেছ। চোখ আছে, তাই দেখবে?

ওর মাথার হাত বুলুতে বুলুতে গৌরহরি বললে, তুমি কি বলতে চাও, আমাকে তুমি একদিনও ভোলনি?

—বলতে আবার চাইব কি! তুমি নিজে বুঝতে পারতে না, কেন তোমায় অত ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতাম?

—আর এখন ?

বিনোদিনী হাসলে। বললে, ভয়ের বালাই তুমিই তো উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিলে।

—আমি ? কি ক'রে ?

ওকে একটা ঠেলা দিয়ে বিনোদিনী বললে, মনে নেই ? সেই ভোর রাত্রে··· খিড়কির ঘাটে···

গৌরহরি অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, সে একটা ভুল করেছিলাম বিনোদিনী। এখন অনুতাপ হয়।

—অনুতাপ হয় ?

—হ্যাঁ। তুমি স্বামীর ঘরে ফিরেই যাও। তাতে তোমার ভালো হবে।

বিনোদিনী সোজা হয়ে বসল। ধমকে বললে, থাক। আমার ভালো তোমাকে ভাবতে হবে না।

তারপর বললে, তুমি পুরুষ মানুষ, ভুল ক'রেছিলে, অনুতাপ হচ্ছে, বাস্ চুকে গেল। কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ, আমার তো অত সহজে ভুল শোধবার উপায় নেই।

—কেন নেই ?

—সে তুমি বুঝবে না ? মরণ ছাড়া আমার আর উপায় নেই। দেখছ না, তুমি যে আমাকে চাও না তা বুঝতে পেরেও কাঙ্গালের মতো বারে বারে আসছি ? কেন আসি ? উপায় নেই ব'লেই।

গৌরহরি অপরাধীর মতো নিঃশব্দে ব'সে রইল।

হঠাৎ বিনোদিনী ওর পা চেপে জড়িয়ে ধরল। আর্তকণ্ঠে বললে, তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি আমাকে এখান থেকে যেখানে খুশী নিয়ে চল। আমি বলছি, আমার জন্যে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে না।

ভয়ে গৌরহরি শিউরে উঠল।

বললে, অসম্ভব। তোমাকে স্বামীর ঘরেই ফিরে যেতে হবে।

—যাব না। আমি মরব।

—গৌরহরি চুপ ক'রে রইল।

—তবু তোমার কষ্ট হবে না ? আমি ম'রে গেলেও না ?

গৌরহরি জবাব দিলে না।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিনোদিনী বললে, ছোটলোক। তুমি একেবারে ইতর! জানোয়ার!

গৌরহরি তথাপি সাড়া দিলে না।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে বিনোদিনী আবার বললে, কোথায় ফিরে যাব বল তো ? সতীনের ঘরে ?

—উপায় কি ?

বিনোদিনীর বুকে যেন একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল, এমনি ভাবে বলে উঠল, উঃ!

চাঁদের আলোয় গৌরহরি স্পষ্ট দেখলে, ওর মুখে রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। সমস্ত দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ ফিটের অসুখের কথাটা স্মরণ হতেই গৌরহরি ভয় পেয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা, আমাকে আর দুটো দিন ভাবতে দাও। দেখি কি করতে পারি। তুমি এখন বাড়ী যাও, তার পরে তোমায় বলব।

গৌরহরি আবার ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে। স্নেহভরে বললে, বাড়ী যাও এখন, বুঝলে ?

বিনোদিনীর শরীর তখনও থেকে থেকে কাঁপছিল। অস্ফুটস্বরে বললে, তুমি দিয়ে আসবে চল। আমার কেমন ভয় করছে।

—ভয় করছে ? তাহ'লে এলে কি ক'রে ?

—তা জানি না।

গৌরহরি ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু উপায় নেই। পথেই যদি ওর ফিট হয় ? সে তো আরও কেলেঙ্কারীই হবে। তার চেয়ে নিজে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসাই ভালো।

বললে, এস।

জনবিরল গ্রাম্যপথ চাঁদের আলোয় ফুট ফুট করছে। দু'পাশের গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল যেন জ্যোৎস্না ঢাকা দিয়ে ঝিমুচ্ছে। ক'টি পাখী হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে কলরব করছে। দু'জনে নিঃশব্দে খিড়কির পথে ডোবার ধারে গিয়ে পৌঁছুল। দু'জনেই একবার ডোবার দিকে চাইলে। বাঁশঝাড়ের কল্যাণে জ্যোস্নারাত্রেও স্থানটি ঠিক সেদিনের মতোই অন্ধকার।···

কলেজে ফিরে গিয়েই তারাপদ রসময়কে একখানা পত্র দিয়েছিল। তাতে হারাণের যে সব কথাবার্তা হচ্ছে তার বিস্তৃত সংবাদ ছিল। তার উত্তর না পেয়ে তারাপদ চিন্তিত হয়ে পড়ে। উত্তর দেবে কে? ললিতা তখন এখানে, আর রসময় ঘুরছে। তারাপদও উত্তর না পেয়ে সেই রকমই অনুমান করল যে, তারা সাতগাঁয়ে নেই। অথচ ব্যাপারটা এতই জরুরী যে সে আর স্থির থাকতে পারল না। কালকে রাত্রি ন'টার ট্রেনে এখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

বিনোদিনী তার মুখ থেকে সমস্ত কথাই শুনল। শুনে বিমূঢ়ের মতো ব'সে রইল। মনে পড়ল, তাদের সেই বড় ঘরখানির কথা, সামনের পরিমার্জ্জিত উঠান, ওদিকের তরকারীর ক্ষেত, মাছে ভরা খিড়কির পুকুর;—মনে পড়ল অতীত দিনের হাজারো টুকরো কথার স্মৃতি। এই গৃহ যা সে অসীম নিষ্ঠায় ও ধৈর্য্যে নিজের হাতে রচনা করেছে, তাকে ভোলা এত সহজও নয়। সে যেন তার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জুড়ে গেছে, ছেঁটে ফেলতে গেলে হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যায়।

দূরে থেকেও সেই গৃহ এখনও তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। এখনও সে গৃহ তারই গৃহ, মাছে ভরা পুকুর, গোয়াল ভরা গরু তারই। ও বাড়ীর প্রত্যেকটি বিন্দুর উপর এখনও তার অধিকার রয়েছে। সমস্ত গেলেও মনের মধ্যে থেকে সেই বোধটি এখনও যায়নি।

সেখানে ফিরে যেতে তার ইচ্ছা হয়, তার ইচ্ছা হয় না। গৌরহরি তার জীবনের সঙ্গে যেন শেয়াকুলের কাঁটার মতো জড়িয়ে গেছে। ছাড়ান অসম্ভব।

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, কি করা যায় বল?

বিনোদিনী কিছুই বলতে পারলে না। সে মনঃস্থিরই করতে পারেনি। হারাণ যদি আবার একটা বিয়ে করেই, কি করতে পারে সে? যদি তাকে না নেয় তাহ'লেই বা কি করতে পারে? গৌরহরিও তাকে ফিরে যাবার জন্যে বলছে। কিন্তু সে দম্ভ-ভরে ছেড়ে এসেছে, আবার মাথা নীচু ক'রে সেখানে ফিরে যায়ই বা কি ক'রে? এর উপর সমাজ আছে। হারাণ নিতে চাইলেও সমাজ যে তাকে ফিরে নেবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? সমাজের কথা ভাবতেই সে শিউরে উঠল।

সমস্ত রাত ভেবেও সে এই সমস্যার কূল-কিনারা পেলে না। তার মন যে কি চায় তাও সে বুঝতে পারলে না।

হাবল এবং মেনীর সঙ্গে তারাপদর যে আগে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল তা নয়। কিন্তু তারাপদ আসা পর্য্যন্ত এমন ক'রে তারা তার সঙ্গ নিয়েছে যে, একটি মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করছে না।

—আমাদের তুমি নিতে এসেছ, না কাকা?

—হাঁ রে।

ওরা আনন্দে নেচে উঠল। পাছে তারাপদ ফাঁকি দিয়ে কখন চ'লে যায়, সেই ভয়ে আর সঙ্গ ছাড়ে না।

—হ্যাঁরে, তোদের বাড়ীর কথা মনে পড়ে?

—হুঁ।

হাবলের অবশ্য মনে পড়ে, কিন্তু ক্রমেই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। মেনীর কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু মনে মনে বাড়ীর কথা একটা সে কল্পনা ক'রে নিয়েছে। সেই কল্পনার সঙ্গে আসল বাড়ীর চেয়ে এই বাড়ীরই মিল বেশী।

ওদের কথা শুনে বিনোদিনীর চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে।

তারাপদ আবার জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছ বল, বড়বৌ!

বিনোদিনী বললে, তুমি ফিরে যাও ঠাকুর পো। আমার যাওয়ার উপায় নেই

তারাপদ ললিতা এবং রসময়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ওরা তো তাকে দেখে অবাক!

রসময় বললে, বিলক্ষণ! বাবুমশায় যে!

ললিতা তো আনন্দে কি করবে ভেবে পায় না। তারাপদ দু'জনকে নিরিবিলি ডেকে সব কথা বললে। শুনে ওদের মুখের হাসি গেল মিলিয়ে।

রসময় জিজ্ঞাসা করলে, বিনোদিদি কি বলে?

—যেতে চায় না।

—বিয়ের দিন হয়েছে না কি?

—এখনও হয়নি, তবে আজকালের মধ্যেই হবে।

তিনজনে নিঃশব্দে ব'সে রইল। অবশেষে ললিতা রসময়কে বললে, তুমি নিজে একবার যাও বরং।

—আমি তাই ভাবছিলাম। আজই যাই। আপনার কাছে টাকা পয়সা আছে বাবুমশায়?

—কি হবে?

রসময় বললে, গাড়ীর ভাড়া তো লাগবে। আমার কাছে কিছুই নেই। ক'টায় গাড়ী?

—তা আছে। বারোটায় একটা গাড়ী আছে।

—তাহ'লে সেইটেতেই যেতে হবে। আপনি তৈরী হয়ে নিন গে। বিনোদিদিকে আমার কথা কিছু বলবেন না।

ললিতাকে দেখে তারাপদর এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করা যায়? দু'জনে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর যাওয়ার আয়োজন করবার জন্যে তারাপদ চ'লে এল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

শুভ্রা

শরৎ আলোর শ্বেত বিমোহন রূপে
কবে হৃদাকাশে উঠেছিলে চুপে চুপে,
সেই আলো আজ ভরেছে গগনতল,
আমার আঙিনা তারি রঙে ঝলমল॥

তুমি ত জানো না কোন যাদুমন্তরে
প্রেম পূজা হয়, পূজা প্রেমরূপ ধরে।
পরশি চরণ পদধূলি লই মাথে,
হৃদয় মথিয়া হাহাকার জাগে সাথে॥

তন্বী, তোমার তনুতটে নিলো কায়া
নিখিল-মানস-সম্ভূত রূপছায়া;
বহ্নির মতো তব লাবণ্য-শিখা
অরূপের ভালে আঁকে রূপললাটিকা॥

শুভ্র তোমার সুষমা, নিরাভরণা,
পূজা নয়, প্রেমে করিলাম বন্দনা॥

তার পরে

তার পরে? তারো পরে আছে বলিবার
কত কথা, যত বলি ফুরায় না আর।
দুখের পসরা মাথে দুয়ো অভাগিনী
বনে গেল, তবুও না ফুরায় কাহিনী॥

কালফণী দংশিয়াছে রাজার দুলালে,
হিম্‌সিম্ ঘুমপুরী অতল পাতালে।

পক্ষীরাজ ছোটে সপ্তসিন্ধু অতিক্রমি,
ভোর রাতে উড়ে গেল ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী ॥

দুঃখসুখ, ভালোবাসা, আশাআশঙ্কার
ঢেউ তুলি অনলস কাল পারাবার
সুচির মরণ পানে বহে নিরবধি,
উজানে শুকায়ে আসে স্মরণের নদী ॥

তবু শেষ নাহি হয়। তবু নিরন্তর
আর্ত প্রশ্ন জাগে তারো পরে, তার পর !

মণীশ ঘটক

ওরা

তামাটে মাংসের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি :
এক টুকরো তামার জন্যে হাত পাতে ওরা—
ন্যাকড়ায় ওদের ধুলোর গন্ধ
ঘামের গন্ধ আর ঘায়ের গন্ধ :
রাস্তার হাওয়ায় হোটেলের শিককাবাবের গন্ধ—
রাস্তার শানে ধুঁকে রোগা কুকুর আর ওরা।

বসন্ত এলো—
এলো লেকের জলে
এলো কত মেয়ের কালো চোখে
বুঝিবা এলো তোমার আমার রক্তের রঙে :
বসন্ত এলো না কিন্তু ওদের।

শহরের বসন্ত ঘোরে
বুইক-বেঞ্জ-বেলিলার চাকায়—
ওরা তখন চেয়ে থাকে কাবাবের মাংসের দিকে
আর ওদের মাংসে ওড়ে মাছির ঝাঁক ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সহচরী

এইখানে সখি, ফেলো তাঁবু তব শ্রান্ত দিনের তীরে
বনানীর ব্যথা কাঁদিছে যেথায় আকাশ-বীণার মীড়ে।
এইখানে সখি, এই বন-বাটে থামাও তোমার রথ,
রবির বাঁশীর শেষ পূরবীতে শিহরে ধূসর পথ।
ফুল পাখী আলো দিবসে আসিলো, সাঁঝে সুর-সমারোহ ;
কাজের বোঝায় স্বপন-নেশায় বাড়া'নু জীবন-মোহ।
তাপসী সন্ধ্যা দাঁড়ায়েছে এবে তারার দীপিকা হাতে—
সহচরী, তব আরতি রচিব জীবনের বাকী পাতে ॥

আর্দ্র অলক আলুলিয়া তোলো সুরভিয়া ধূপ-বাসে,
নীবি-বন্ধন শ্লথ করি' পরো কেয়া-হার কটি-পাশে।
গাঙশালিকেরা উড়ে যাক্ দূরে ঠোঁটে লয়ে তৃণগুছি,—
তুমি ডানা বাঁধো আমার ডানায়, সব ব্যথা যাক্ মুছি'।
এইখানে কবে কলসে কাঁপিয়া কেঁদেচে কাঁকণ কার—
অশ্রুরাশিতে আমার বাঁশীতে জাগিল বিরহ-ভার !
অতীত সে-কথা গুমরি' ঘুমোক্ ঝোপ-ছায়ে অধোমুখে—
সহচরী, তব স্তনমঞ্জরী শিহরি উঠুক সুখে ॥

অপরাজিতার নীল চোখে কেন লেগেচে বিষের নেশা !
নাগকেশরের ফাগ মিঠে নয়, মধু যেন খুন্-পেষা !
ফুরায়েচে যত জগতের সুধা !—সুরা আছে তব দেহে,
ঠোঁটের গেলাসে ঢালো মোর ঠোঁটে আজিকে অসীম স্নেহে।
নীল শাড়ীখানি নিঙাড়িয়া পরো, আঁচলে আমারে ঢাকো ;
দূর ছায়ে ছায়ে প্রেতিনীর কায়া দুলিচে, দেখিছ না-কো !
মরণের বীণা ক্ষীণ শোনা যায় অস্ত-আলোর সুরে—
সহচরী, তব প্রেম-ভাষে মোরে জাগাও জীবন-পুরে ॥

পাহাড়ের বুকে এলাইয়া বসো আমার বুকের পাশে,
মোর দেহ-বীণা বাজুক তোমার প্রতি লঘু নিঃশ্বাসে।
নীপ-পথ দিয়া ওই দেখা যায় ও-পাড়ার বেদেনীরা,
তৃণ-মুকুলের গন্ধে শিথিল তন্বীর স্নায়ু-শিরা।
ইহাদের সাথে চলে মোর মন নিশিদিন অনুরাগী,—
বিশ্বজনারে বাসিয়াছি ভালো একটি নারীর লাগি'।
মরণ-অধিক ভেবেছি জীবন তারি মুখ-মদ পি'য়া—
সহচরী, সেই পুরাতন স্মৃতি তুমি তোলো আকুলিয়া॥

তরুণ চরের বালিতে ঢেকেচে পুরানো পায়ের চিন্ ;
ঝরা-পালকের স্মৃতি মুছে কোথা গেছে ঘূর্ণির দিন।
গত বরষের নীড় উড়ে গেছে বরষার ঝড় লেগে,
প্রাচীন পাখার বিদায় বেজেছে গগনে নবীন মেঘে।
স্খলিত কলির দ্বারে অলি আর নাহি ফিরে মধু যাচি ;
সাঁওতালী মেয়ে খোঁপায় গুঁজেনি পুরাতন মালাগাছি।
শুষ্ক শাখার ব্যথারে ঢাকিয়া শ্যাম কিশলয় জাগে—
সহচরী, মোর ভগ্ন বেহালা বাঁধো নব অনুরাগে॥

যৌবনে কবে এই বনে দোঁহে দেখেছিনু : দু'টি পাখী
জ্যোৎস্না-নিশীথে নি-শব্দ নীড়ে ঢুলিছে নিমীল আঁখি !
সহসা ব্যাধের শর একটিরে বিঁধিল অতর্কিতে—
ঝাপটিয়া পাখা পড়ে সে ভূতলে ; আরটি গুমরি' চিতে
আহতেরে ঘেরি' দুই পাক ঘুরি' উড়িয়া চলিল শেষে
নূতন সাথীর সন্ধানে কোথা নব প্রভাতের দেশে !
হেথায় আঁধারে রক্তের দাগে ক্ষত পাখা ওঠে ভরি',—
মৃত্যু-কাতর আমি সে-বিহগ,—চুমু দাও, সহচরী !

আবদুল কাদির

ভারত-পথে

(১২)

বিষ্ণুর পাদমূলে গঙ্গার উৎপত্তি, মহাদেবের জটার মধ্যে দিয়ে গঙ্গার ধারা বয়ে গেছে, কিন্তু তবু গঙ্গাকে প্রাচীন নদী বলা চলে না। পুরাণের সীমানা পেরিয়ে যায় ভূতত্ত্বের দৃষ্টি, এই ভূতত্ত্ব জানে এমন একদিন ছিল যখন হিমালয় পাহাড় বা হিমালয় থেকে যে সব নদ-নদীর জন্ম তাদের চিহ্নও ছিল না, তখন হিন্দুস্থানের তীর্থস্থানগুলি ছিল সমুদ্রের অতল গর্ভে। ক্রমে জলরাশি ভেদ ক'রে উঠল পাহাড়, পাথরের টুকরোয় সমুদ্র হোলো ভরাট, এই সব পাহাড়ের উপর স্বর্গের দেবতারা আসীন হয়ে করলেন গঙ্গার সৃষ্টি—এমনি ক'রে হোলো এই অনাদি দেশ ভারতবর্ষের উদ্ভব। কিন্তু সত্যি বলতে ভারতবর্ষ আরো ঢের বেশি প্রাচীন। ইতিহাসের পূর্ব্ববতন যুগের সেই সমুদ্রের সমসাময়িক এই মহাদেশের দক্ষিণ অংশ, দ্রাবিড়ের উচ্চ অঞ্চলগুলি পৃথিবীর আদিমতম ভূমি ; তারা সাক্ষ্য দিতে পারে, তাদের একদিকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে যে মহাদেশ করত সেতুবন্ধন তা' গেছে তলিয়ে, আর এদিকে সমুদ্র তোলপাড় ক'রে জেগে উঠেছে হিমালয় পর্ব্বত। পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে প্রাচীন এই স্থান। এখানে কখনো জল ছিল না, গণনাতীত যুগ ধরে এই স্থানটিকে দেখে এসেছে সূর্য্য। যখন পৃথিবী ছিল এই সূর্য্যেরই অংশ, সেই স্মরণাতীত দিনের নিদর্শন আজো এখানে সূর্য্যের দৃষ্টি-গোচর হয়। যদি সূর্য্যের স্পর্শ পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যায় তা এই জায়গায় —এই অসম্ভব প্রাচীন পাহাড়গুলির মধ্যে।

কিন্তু এই পাহাড়গুলিরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। হিমালয় অঞ্চলের উত্থানের সঙ্গে ভারতের এই আদিমতম অঞ্চল গেছে ব'সে, ধীরে ধীরে তা যেন আবার

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পঃ সঃ

পৃথিবীর বুকের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো লক্ষ লক্ষ যুগ পরে একদিন একেবারে সমুদ্রের অতলে এই পাহাড়গুলি অদৃশ্য হবে, সূর্য্যজাত পাহাড়গুলি জলজ উদ্ভিদে পিচ্ছিল হয়ে উঠবে। ইত্যবসরে সমুদ্রের কাজ করছে গঙ্গার উপত্যকা—ক্রমে ক্রমে পাহাড়গুলিকে তা' গ্রাস করছে, নতুন পলিমাটির তলায় সেগুলি পড়ছে চাপা। মধ্যভাগ এখনো মাথা তুলে আছে, কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলের ঘাটিগুলিকে ঘেরাও করেছে বিজয়ী মৃত্তিকাবাহিনী, ছোটখাটো পাহাড়-গুলি কেউ আজানু কেউ আবক্ষ মাটির কবলে লুপ্ত হয়েছে। ভাষা হার মেনে যায় এই পাহাড়গুলির বর্ণনা করতে, পৃথিবীর কোথাও এদের তুলনা নাই, এদের দেখলে পরে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অকস্মাৎ পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে এরা উঠেছে একেবারে উন্মাদের মতন, অন্য যে-কোনো অঞ্চলের সব চাইতে কিম্ভূত কিমাকার পাহাড় যা আছে তাদেরও হার মানিয়েছে এরা, এমনি অদ্ভুত বেঢপ এদের আকৃতি, বাস্তবলোকের বা স্বপ্নলোকের কোনো সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে এদের অণুমাত্র যোগ নাই। যদি বলা যায় এদের দেখলে গা ছম ছম করে, মনে হবে ভূতপ্রেতের কথা, কিন্তু চেতন সত্তার চেয়ে এরা প্রাচীন! দু'চার জায়গায় পাহাড়ের গায়ে আঁচড় কেটে চূণবালির প্রলেপ দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বড় কেউ ওদিকে ঘেঁসে না, কেননা যে-সব তীর্থযাত্রীরা সৃষ্টিছাড়ার অন্বেষণে এদিকে এসেছে তারা একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই সৃষ্টিছাড়ার সন্ধান এখানে পেয়েছে। একটি গুহায় জনকয়েক সন্ন্যাসী একবার আস্তানা গেড়েছিলেন, কিন্তু ধোঁয়ায় অস্থির হয়ে তাঁরা বিদায় হন। স্বয়ং শাক্যসিংহ গয়ার বোধিবৃক্ষ অভিমুখে যাবার পথে নিশ্চয় এই পথ দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন এই সব গুহায় বাস ক'রে তিনি দারুণতর করবার প্রয়াস পাননি, তাই মারাবার অঞ্চলে বুদ্ধদেবের সাধনা ও সিদ্ধির কোনো কাহিনী শোনা যায় না।

গুহাগুলোর বর্ণনা করা অতি সহজ। ছয় হাত লম্বা, চার হাত উঁচু আর দু'হাত চওড়া একটি সুড়ঙ্গ গিয়ে ঠেকেছে বৃত্তাকার একটি প্রকোষ্ঠে, পোনেরো হাত তার ব্যাস। এই হোলো মারাবার গুহা আর এই জাতীয় গুহা একটি নয়—অসংখ্য। ধরা যাক এই রকম গুহা একটি দেখা গেল, কিম্বা দুটি, বা তিনটি, না হয় আরো বেশি, চোদ্দটি বা চব্বিশটি—তারপর চন্দ্রপুরে ফিরে দর্শকের পক্ষে বুঝে উঠা ভার, কি দেখলাম, সত্যি একটা দেখার মতন জিনিষ না বিশেষ কিছুই

না, কিম্বা একেবারে কিছুই দেখিনি। এই গুহাগুলির কথা অন্যকে বলা বা আলাদা আলাদা ক'রে সেগুলিকে মনে রাখা সত্যি শক্ত ব্যাপার, কেননা প্রত্যেকটি এক ছাঁচে ঢালা, কোথাও এতটুকু কাজ এমনকি বাদুড়ের বাসা বা মৌচাক পর্য্যন্ত নাই, যাতে কোনো একটি গুহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ছাপ মনের উপর পড়ে। এমনি জায়গা—কিছু সেখানে থাকে না, থাকতে পারে না; যে-কিম্বদন্তী তাদের সম্বন্ধে রটেছে, মানুষের মুখের কথা তার জন্যে দায়ী নয়। যেন চারপাশের মাটি কিম্বা যে পাখীরা এখান দিয়ে উড়ে যায় তারা ভার নিয়েছে এই গুহাগুলি যে কি রকম সৃষ্টিছাড়া উচ্চৈঃস্বরে তা ঘোষণা করবার, তাদের কথা বাতাসে বাসা বেঁধেছে আর মানুষ তা উপলব্ধি করেছে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।

অন্ধকার এই গুহাগুলি। যেগুলির মুখ সূর্য্যের দিকে, সেগুলিরও ঢোকবার সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে ভিতরের বৃত্তাকার প্রকোষ্ঠে সামান্য আলো পৌঁছয়। দেখবার জিনিষও কিছু নাই, উপায়ও নাই, এক যদি পাঁচ মিনিটের জন্যে এসে দেশলাই জ্বেলে দেখা যায়, তাহলে একেবারে গুহার অন্তস্তলে যেন আর এক আগুন জ্বলে উঠে' কারারুদ্ধ প্রেতের মতন চারদিকের দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ে— এমনি অদ্ভুত পালিশ-করা এই গোলাকার ঘরের দেওয়ালগুলি। মনে হয় দুটি অগ্নিশিখা কাছাকাছি এগিয়ে এসে মিলবার চেষ্টা করে। কিন্তু মিলন হয় না। কি করেই বা হবে? কেননা, একটির জন্ম বায়ুতে, আর একটির পাথরে। প্রেমিক যুগলের মাঝখানে ব্যবধান রচনা করে নানা রঙে মিনা-করা এক আরশি, সাদা কালো গোলাপি রঙের অসংখ্য তারা, অপরূপ সব নীহারিকাপুঞ্জ, ধূমকেতুর পুচ্ছ বা মধ্যাহ্নের চন্দ্র অপেক্ষাও লঘু তাদের জ্যোতি, কঠিন পাথরের বিচিত্র চঞ্চল লীলা—একমাত্র এইখানে যা চোখে দেখা যায়। অগ্রচারী মৃত্তিকারাশি ভেদ ক'রে উঠেছে যে-সব বদ্ধমুষ্টি আর অঙ্গুলি—এই হোলো তাদের উপরকার ত্বক্, জীবদেহের আবরণ কখনো এত সূক্ষ্ম হয় না, নিবাত নিষ্কম্প জলরাশি এত মসৃণ হয় না, প্রেম কখনো এত রমণীয় হয় না। ক্রমশ উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি হয়, দুটি অগ্নিশিখা পরস্পরকে স্পর্শ করে, চুম্বন করে, লয় পায়। আবার অন্যান্য গুহার মতন গুহাটি অন্ধকারে মগ্ন হয়।

এমনি পালিশ-করা দেওয়াল শুধু গোল ঘরটির। সুড়ঙ্গের দেওয়ালগুলি এবড়োখেবড়ো, যেন গোল ঘরটির নিখুঁৎ কাজের উপর বিশ্রী একটা তালি।

নিতান্ত ঢুকবার পথ একটা না হ'লে নয়, তাই যেমন তেমন ক'রে মানুষ একটা তৈরি ক'রে দিয়েছে। কিন্তু, অন্যত্র পাহাড়ের গভীর অভ্যন্তরে এমন সব প্রকোষ্ঠ আছে কি যার প্রবেশদ্বার নাই? দেবতাদের আগমন যখন থেকে তখন থেকে যাদের দ্বার রুদ্ধ? লোকে বলে যেগুলি দেখা যায় তার চাইতে এই রকম গুপ্ত গুহার সংখ্যা অনেক বেশি—মৃতের সংখ্যা যেমন জীবিতের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি—হয়তো চার শ' এরকম গুহা আছে, চার হাজার, এক লক্ষ। একেবারে তারা শূন্য, ধনরত্ন বা মারীর সৃষ্টির আগে থেকে তারা রুদ্ধ অবস্থায় আছে; যদি কৌতূহলী মানুষ খুঁড়ে এই সব গুহা আবিষ্কার করে, পাপপুণ্যের ভাণ্ডারের এতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি তাতে হবে না। সব চাইতে উঁচু পাহাড়টির শিখরে রয়েছে যে বিপুল দোদুল্যমান প্রস্তরখণ্ড, তারি অভ্যন্তরে নাকি আছে এই রকম একটি গুহা, বুদ্বুদের মতন তার আকার, না আছে ছাদ, না মেজে, তার ভিতরকার পুঞ্জীভূত অসীম অন্ধকার আপন অগণিত ছায়া দিয়ে দিকে দিকে আপনাকে ঘিরে রেখেছে। যদি এই বিপুল প্রস্তরখণ্ড পড়ে ভেঙে যায় তাহলে এই গুহাটিও ফাঁপা ডিমের খোলার মতন চুরমার হ'য়ে ভেঙে যাবে। একেবারে শূন্যগর্ভ ব'লে হাওয়ায় এই পাথরটি দোলে, এমন কি একটি কাক এসে বসলেও কেঁপে ওঠে, তাই এই পাথরটি আর যে-বিপুল ভিত্তির উপর এর নির্ভর, 'কাউয়া-দোল' নামে তা' পরিচিত।

(১৩)

ঠিক জায়গা বেছে দূর থেকে দেখলে আর সুবিধামত আলো পড়লে মারাবার পাহাড়কে মনে হয় অপরূপ। ক্লাবের উপর বারান্দা থেকে বিকাল বেলায় একদিন সেটা দেখে মিস কেষ্টেড না বলে পারলেন না যে ওখানে যেতে পারলে কি খুসিটাই তিনি হ'তেন, ফিলডিং সাহেবের বাড়ি ডাক্তার আজিজ নাকি বলেছিলেন যে সব ব্যবস্থা তিনি করবেন, আর এদেশের লোকেদের কি রকম যেন ভুলো মন। যে-চাকরটি তাঁদের পানীয় যোগাচ্ছিল কথাগুলি তার কানে গেল। লোকটি ইংরেজি বুঝত। অবশ্য তাকে ঠিক গোয়েন্দা বলা চলে না, কিন্তু কান খাড়া করে চলাফেরা করা ছিল লোকটির অভ্যাস, আর মহম্মদ আলি তাকে যে ঘুষ দিতেন তা নয়, তবে কথা হচ্ছে কি তাঁর বাড়ির চাকর বাকরের সঙ্গে এসে সে দুটো খোসগল্প করুক এটা তিনি চাইতেন, আর বাড়িতে থাকলে হয়তো বেড়াতে

বেড়াতে একবার ওদিকে গিয়ে তিনি হাজির হতেন। মিস কেষ্টেডের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল, রঙচঙ সমেত। বেচারি আজিজ! ত্রস্ত হয়ে সে শুনল যে মহিলাদ্বয় তার নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় দিনের পর দিন ব'সে থেকে থেকে নাকি বেজায় চটে গেছেন। কথার কথা একটা ব'লে ফেলেছিল, কে আর তা মনে রেখেছে, এই ছিল ওর ধারণা। ওর নিজের মন ছিল দুটি, একটিতে কোনো কিছুরই ছাপ থাকত না, আর একটিতে থাকত। মারাবার গুহার কথা স্থান পেয়েছিল প্রথম পর্য্যায়ে। অবিলম্বে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তার হোলো পদোন্নতি, ব্যাপারটি চুকিয়ে ফেলার জন্যে ও কোমর বেঁধে লেগে গেল। ঠিক হোলো ঐ চা-পার্টির মতন এক পার্টির ব্যবস্থা—বিরাট আকারে। প্রথমত ও করল ফিলডিং সাহেব ও অধ্যাপক গডবোলকে যোগাড়, তারপর ফিলডিং সাহেবের উপর ভার দেওয়া হোলো মিসেস মুর ও মিস কেষ্টেডের কাছে কথাটা উত্থাপন করতে, যখন তাঁরা একলা থাকেন, যাতে তাঁদের সরকারি অভিভাবক রণি সাহেবের খর্পরে না পড়তে হয়। ফিলডিং যে কাজটি খুব পছন্দ করলেন তা নয়। ব্যস্ত লোক, গুহাটুহা তাঁর ভালো লাগত না, তার উপর ব্যয়সাধ্য ব্যাপার আর তাতে মন কষাকষির সম্ভাবনা। কিন্তু বন্ধুর এই প্রথম অনুরোধ উপেক্ষা করতে তিনি চাইলেন না, তার কথামত কাজ তিনি করলেন। মহিলাদ্বয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। অসুবিধা যে ছিল না তা নয়, যথেষ্ট কাজ তাঁদের ছিল, যাহোক্ হিসলপ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁরা ঠিক করলেন ওরই মধ্যে সময় ক'রে নেবেন। রণি বললেন, ফিলডিং যদি পুরোপুরি ভার নেন যাতে তাঁদের আরামের ত্রুটি না হয়, তাঁর কোনো আপত্তি নাই। খুব যে তাঁর এতে উৎসাহ ছিল তা নয়, মহিলাদ্বয়েরও বিশেষ ছিল না—আর কারই বা ছিল? তবু কিন্তু কিছু আটকাল না।

আজিজ তো ভেবে অস্থির। এমন কিছু বেশি দূর যেতে হবে না, ভোরে চন্দ্রপুর থেকে একটা ট্রেণ যায়, আবার টিফিনের আগেই ফেরৎ ট্রেণ আসে, কিন্তু আজিজ সামান্য একজন কর্ম্মচারী, পাছে কিছু ত্রুটি ঘটে এই তার ভয়ের কারণ। মেজর ক্যালেণ্ডারের কাছে এক বেলার জন্যে সে ছুটি চাইল, তিনি রাজী হলেন না, কেননা সম্প্রতি সে একটু ঢিলে দিচ্ছিল। এখন উপায় কি? আর একবার ফিলডিংকে দিয়ে ক্যালেণ্ডারকে ধরানো হোলো। দাঁতমুখ খিচিয়ে তিনি নিতান্ত

অবজ্ঞার সঙ্গে মত দিলেন। মহম্মদ আলির কাছ থেকে ছুরি কাঁটা চামচ সব ধার করতে হোলো, অথচ তাকে নিমন্ত্রণ করা হোলো না। তারপর পানীয়ের ব্যবস্থা। মিষ্টার ফিলডিং আর ঐ মহিলারা বোধ হয় পানে অভ্যস্ত, সুতরাং হুইসকি সোডা পোর্ট প্রভৃতির আয়োজন করা উচিত না কি? মারাবার ষ্টেশন থেকে পাহাড় পর্য্যন্ত যানবাহনের ব্যবস্থাও তো করা চাই। আর এক সমস্যা অধ্যাপক গডবোলে—তাঁর নিজের আহার্য্য ও তাঁর আশেপাশে যাঁরা থাকবেন তাঁদের আহার্য্য—অর্থাৎ একটি নয়, দুটি সমস্যা। অধ্যাপক মশায় যে খুব গোঁড়া হিন্দু তা নয়; চা, ফল, সোডা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কারো হাতে খেতেই তাঁর আপত্তি নাই। ব্রাহ্মণের রাঁধা হ'লে ভাত তরকারি সবই চলতে পারে। কিন্তু মাংস চলবে না, আর কেক, কেননা তাতে ডিম আছে, আর চলবে না তাঁর ত্রিসীমানায় গোমাংস ভক্ষণ, সাত হাত দূরে কারো পাতে এক টুকরো গোরুর মাংস দেখলে ভদ্রলোকের মনে আর সোয়াস্তি থাকবে না। আর যা ইচ্ছে খাওয়া হোক, আপত্তি নাই, ছাগল ভেড়া, এমনকি শূয়োরের মাংস। কিন্তু শূয়োরের মাংস আবার আজিজের ধর্ম্মে অচল, অন্যের শূয়োর খাওয়াও সে দেখতে পারত না। আপদের পর আপদ ওকে ছেঁকে ধরেছিল, কেননা এ হোলো ভারতবর্ষের মাটি, মানুষকে আলাদা আলাদা ভাগ ক'রে রাখাই এখানকার রেওয়াজ, আজিজ যে এই মাটির বুকে এক সৃষ্টিছাড়া পর্ব্বের উদ্যোগ ক'রে বসেছিল।

অবশেষে শুভদিন উপস্থিত হোলো।

বন্ধুবর্গের মতে মেম সাহেবদের সঙ্গে এ রকম জড়িয়ে পড়াটা মোটেই বুদ্ধির কাজ হয় নাই, আর তাঁরা সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যেন সময় মত কাজের কিছুমাত্র ত্রুটি না ঘটে। তাই ও আগের রাতটা ষ্টেশনেই কাটাল। চাকরবাকর সব প্ল্যাটফর্ম্-এ দল বেঁধে হাজির ছিল, কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন এদিক ওদিক না যায়। আজিজ সময় কাটাল পায়চারি করে, সঙ্গে ওর ডানহাত, মহম্মদ লতিফ। কি রকম যেন ওর ভয় ভয় করছিল আর অদ্ভুত লাগছিল। একটা মোটর গাড়ি এসে থামল, আজিজের আশা হোলো, বুঝি বা ফিলডিং আসছেন, এলে ও একটু বল পাবে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামলেন মিসেস্ মূর, মিস্ কেষ্টেড, আর তাঁদের গোয়ানি চাকর। স্ফূর্ত্তির চোটে ও একেবারে দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "তা'হ'লে শেষ পর্য্যন্ত এসেছেন

দেখছি। আপনারা সত্যি ভারি ভালো। এত আনন্দ আমার কখনো হয়নি।"

মহিলা দুটি বেশ ভদ্রতা ক'রে কথাবার্ত্তা বল্‌লেন। তাঁদের জীবনে এত আনন্দ যে আগে কখনো হয়নি তা অবশ্য নয়, কিন্তু ট্রেণ ধরার হাঙ্গামটা চুকলে তাঁদেরও আশা হচ্ছিল খুব ভালোই লাগবে। যাবার ব্যবস্থা ঠিক হবার পর আজিজের সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়নি, তাই দেখা হতে ওঁরাও আজিজকে যথাবিহিত ধন্যবাদ জানালেন।

"টিকিটের দরকার নাই, চাকরকে বারণ ক'রে দিন। মারাবার ব্র্যাঞ্চ লাইনে টিকিট লাগে না—এই হোলো লাইনটার মজা। ফিলডিং যতক্ষণ না আসেন গাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন। আপনাদের কিন্তু মেয়েদের গাড়িতে যেতে হবে, জানেন? ভালো লাগবে তো?"

ওঁরা জবাব দিলেন, হ্যাঁ তা ভালোই লাগবে। ইতিমধ্যে ট্রেণ এসে লেগেছিল। চাকরবাকর সব ঠিক এক পাল বানরের মতন গাড়িটা চড়াও ক'রেছিল। এদের মধ্যে আজিজের নিজের তিনটি, বাদবাকি বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা। কার কি রকম কদর তাই নিয়ে গিয়েছিল ঝগড়া বেধে। মহিলা দুটির সঙ্গের চাকরটি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসছিল। এই লোকটিকে তাঁরা সংগ্রহ ক'রেছিলেন বম্বেতে, যখন তাঁদের ভবঘুরে অবস্থা ঘোচেনি। হোটেল-ফোটেলে আর ছিমছাম লোকেদের জায়গায় চাকরটি একেবারে খাসা কাজ করত। কিন্তু যেই তাঁরা এমন কোনো লোকের সঙ্গে মিশতেন যাকে সে একটু খেলো দরের মনে করত অমনি তার হাল যেত বদলে, সেরেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখত তাঁদের কি রকম নাজেহাল অবস্থা হয়।

তখনও রাতের অন্ধকার ঘোচেনি, কিন্তু আকাশের চেহারা এমন হয়েছিল যাতে বোঝা যায় ভোর হতে আর দেরি নাই। একটা চালার উপর শুয়ে শুয়ে ষ্টেশন মাষ্টারের মুরগিগুলো পেঁচার বদলে চিলের স্বপ্ন দেখা সুরু করেছিল। পরে আবার কে নেবায়, তাই ইতিমধ্যেই সব আলোগুলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্ধকার আনাচে-কানাচে থার্ডক্লাশের যাত্রীরা বিড়ি খাচ্ছিল, তারই গন্ধ নাকে এসে লাগছিল আর থুতু ফেলার থুক থুক শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

খোলা মাথায় লোকগুলি সবাই দাঁতন ঘষতে ব্যস্ত। ষ্টেশনের এক ছোটখাটো কর্ম্মচারীর মনে হোলো নিশ্চয় আবার সুর্য্য উঠবে, উৎসাহে প্রচণ্ড জোরে তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

চাকরবাকর অমনি ত্রস্ত হ'য়ে উঠে' এখুনি ট্রেণ ছাড়বে ব'লে চীৎকার ক'রে আর একটু থামিয়ে রাখবার জন্যে দুদিকে দৌড়ে গেল। মেয়েদের গাড়িতে তখনো অনেক জিনিষ উঠতে বাকি—ফেজ-মাথায় একটা তরমুজ, পিতল-বাঁধানো একটা বাক্স, পেয়ারা-বাঁধা একটা তোয়ালে, একটা মই, একটা বন্দুক। অতিথিদের ব্যবহারে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। সাদা কালোর ভাব তাঁদের মনে একেবারে ছিল না, কেননা, মিসেস মূর হয়েছিলেন যথেষ্ট বৃদ্ধ, আর মিস কেষ্টেড একেবারে আনকোরা নতুন লোক। তাই যে-কোনো যুবক ভালো ব্যবহার করলে তার সঙ্গে যে রকম ভাবে কথাবার্ত্তা বলতেন, আজিজের বেলাতেও তাই করলেন। আজিজ তো একেবারে মুগ্ধ! ও ভেবেছিল ওঁরা বুঝি ফিলডিং সাহেবের সঙ্গে আসবেন, কিন্তু ওঁরা আগে এসে একলা একলা ওর কাছে বিশ্বাস ক'রে খানিকটা তো রইলেন।

আজিজ বলল, "আপনাদের চাকরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিন। তাহলে বেশ হবে—এখানে থাকব শুধু একদল মুসলমান।"

"আর ওর মতন ভীষণ চাকর! এ্যান্টনি, তুমি যেতে পারো, তোমাকে দরকার নাই"—অধৈর্য্য হয়ে তরুণীটি ব'লে উঠলেন।

"কর্ত্তার হুকুম তাই এসেছি।"

"কর্ত্রীর হুকুম, ফিরে যাও।"

"কর্ত্তা বলে দিয়েছেন সারা সকাল আপনাদের কাছে কাছে থাকতে।"

"কিন্তু আমাদের দরকার নাই।" এই ব'লে আজিজের দিক ফিরে মিস কেষ্টেড বল্‌লেন, "ডাক্তার আজিজ, ওকে বিদায় করুন।"

আজিজ 'মহম্মদ লতিফ' বলে হাঁক দিল। গাড়ির ভিতরে বেজায় গণ্ডগোল হচ্ছিল আর এই গণ্ডগোলের তদারক করছিল মহম্মদ লতিফ—আজিজের দরিদ্র আত্মীয়। হাঁক শুনে তরমুজের উপরকার 'ফেজ'টা নিজের মাথায় প'রে, আর নিজের মাথার 'ফেজ'টা তরমুজের উপর রেখে, জানলা দিয়ে গলা বের ক'রে সে তাকাল।

"এই আমার ভাই মহম্মদ লতিফ। না, না, ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবেন না, ও হোলো একেবারে সেকেলে লোক, সেলামটাই পছন্দ, ঐ দেখুন। মহম্মদ লতিফ বেশ চমৎকার ক'রে সেলাম করো তুমি—দেখুন, ইংরেজিতে বল্‌লাম, কিছু বুঝল না। একেবারে ইংরেজি জানে না।"

বৃদ্ধ ভাঙা ইংরেজিতে বেশ ঠাণ্ডা গলায় বল্‌ল, "মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কথা! চমৎকার! বুড়ো ভারি মজার লোক, না? ওকে নিয়ে পরে খুব রগড় করা যাবে। ও টুকটাক কত কাজ যে করে। ভাববেন না একটু ও বোকা, কিন্তু ভারি গরীব। ভাগ্যি ভালো আমাদের বড় পরিবার"—বলে মহম্মদ লতিফের নোংরা গলা জড়িয়ে ধরল। "কিন্তু আপনারা এবার ভিতরে ঢুকে আরাম করুন—একেবারে শুয়েই পড়ুন না কেন।" ততক্ষণে হৈ-চৈ একটু শান্ত হয়েছিল। "একটু মাপ করুন, আমার অন্য দুই অতিথির একটু খোঁজ নিই।"

মাত্র দশ মিনিট ট্রেণ ছাড়তে বাকি, তাই বেচারি একটু অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। সময় যখন হয়ে আসছে, তখন এই কথা ভেবে আজিজ সান্ত্বনা পেল যে ফিলডিং হলেন সাহেব মানুষ, ওঁরা কখনো ট্রেন ফেল করেন না। আর গডবোলে হিন্দু, সুতরাং না এলে বিশেষ ক্ষতি নাই। মহম্মদ লতিফ এ্যান্টনিকে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করেছিল। প্ল্যাটফরম্‌-এ বেড়িয়ে বেড়িয়ে ওদের দুজনে কাজের কথা হচ্ছিল। চাকর বড় বেশি হ'য়ে গেছে, দুই জনকে মারাবার ষ্টেশনে রেখে যাওয়াই ভালো। আজিজ ওকে বুঝিয়ে বল্‌ল যে গুহার মধ্যে গিয়ে ওকে নিয়ে অতিথিদের আমোদের জন্যে একটু আধটু মজা করবে, ও যেন কিছু মনে না করে। বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসায় ওর কিছু মাত্র অরুচি ছিল না। আজিজকে তাই বল্‌ল, "যা ইচ্ছে কোরো, কুছ পরোয়া নাই।" এমন কি ফুর্ত্তির চোটে ও একটা অশ্লীল গল্প ফেঁদে বসল।

"এখন থাক ভাই, আর কোনো সময়ে হবে, যখন তারা থাকবে না। আপাতত এই সব বে-জাতের লোকেদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে তো। মনে রেখো তিনজন ইংরেজ, আর হিন্দু একটি, তাঁকে ভালো করে দেখতে শুনতে হবে, যাতে না ভাবেন যে অন্যদের চাইতে তাঁর কদর কিছু কম।"

"তাঁর সঙ্গে দর্শন আলোচনা করব।"

"উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু তার চাইতে চাকরদের দেখাটা বেশি দরকার। বেবন্দোবস্ত হয়েছে এরকম মনে করার কারণ যেন না ঘটে। আর ঘটবেই বা কেন? আমি চাই তুমি এর ভার নেবে..."

মেয়েদের গাড়ির থেকে হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল। গাড়ি দিয়েছিল ছেড়ে।

মহম্মদ লতিফ 'আল্লার মোহরবানি' বলে এক লাফে একটা গাড়ির ফুটবোর্ডে গিয়ে উঠল। পিছন পিছন উঠল আজিজ। বিশেষ কসরৎ ওদের করতে হয়নি, কেন না, ব্র্যাঞ্চ লাইনের গাড়ি, চট ক'রে তার চাল বদলায় না। গাড়ির হাতল ধ'রে হাসতে হাসতে মেম-সাহেবদের ডেকে আজিজ বলল, "ভয় নাই, আমরা বাঁদর।" তারপর, 'ফিলডিং ফিলডিং' ব'লে ও প্রচণ্ড এক হাঁক দিল।

দারুণ সর্ব্বনাশ! ফিলডিং আর বৃদ্ধ গডবোলে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আটক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

একটু আগে ভাগেই গেট বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, তাই ওঁদের এই দুর্দ্দশা। টঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁরা খুব হাত মুখ নাড়লেন। বৃথা চেষ্টা! এত কাছে, তবু এত দূরে। পয়েন্টের উপর দিয়ে গাড়ি যাবার সময়ে ওরই মধ্যে মর্ম্মভেদী কথাবার্ত্তা দুচারটে হয়ে গেল।

"বেশ যাহোক, আমার দফা একেবারে সেরেছেন।"

সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, "দোষ আমার না, এরকম ঘটল গডবোলের পূজোর জন্যে।"

জপতপের কথা ভেবে ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোদৃষ্টি হলেন। হবারই কথা, একটা স্তোত্রের সময় উনি ঠিক আন্দাজ ক'রে উঠতে পারেন নি।

আজিজ প্রায় পাগলের মতন হ'য়ে বলল, "লাফ দিয়ে উঠুন না, আপনাকে নইলে চলবে না।"

"আচ্ছা, হাত বাড়িয়ে দিন।"

মিসেস মুর আপত্তি ক'রে বললেন, "না, মারা পড়বেন যে।"

সাহেব তবু লাফ দিতে ছাড়লেন না কিন্তু আজিজের হাতের লাগাল না পেয়ে লাইনের উপর গেলেন প'ড়ে। গম্‌গম্ ক'রে ট্রেণ চলে গেল। গা ঝাড়া

দিয়ে উঠে তিনি চেঁচাতে লাগলেন, "কিছু হয় নাই, আপনারাও বেশ আছেন, ভয় নাই।" বলতে বলতে ট্রেণ উধাও হোলো, তাঁর গলা আর শোনা গেল না।

আজিজের এদিকে প্রায় অশ্রুপাতের উপক্রম। ফুটবোর্ডের উপর টলতে টলতে গিয়ে ও বলল, "মিসেস মুর, মিস কেষ্টেড সব মাটি হোলো।"

"শিগ্‌গির গাড়িতে ঢুকুন—তা না হ'লে মিষ্টার ফিলডিং-এর দশা হবে। মাটি হবার লক্ষণ তো কিছু দেখছি না।"

বেচারি একেবারে একটি ছোট ছেলের মত কাঁদ-কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি বলছেন? কেন, বলুন না।"

"আপনি তো এই চেয়েছিলেন—এখন শুধু থাকব আমরা ক'জন মুসলমান।"

সত্যি, মিসেস মুর আজিজের প্রাণের বন্ধু, মিসেস্ মুর—তাঁর আর তুলনা নাই, সব সময়েই তিনি সমান। সেই যে মসজিদে ওঁর প্রতি প্রীতিতে ওর মন গদগদ হ'য়ে উঠেছিল, আবার সেই প্রীতি, এতদিন চাপা থাকার পর যেন নতুন আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। ওঁর জন্যে আজিজ কি না করতে পারে? ওঁর সুখের জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় তাতেও ও রাজি।

মিস কেষ্টেড বললেন, "ঢুকে পড়ুন না, ডাক্তার আজিজ, আমাদের যে মাথা ঘুরছে। ওঁরা ট্রেণ ধরতে পারেন নি নিজেদের বোকামিতে, আমাদের তাতে কি ক্ষতি?"

"আমি যখন নিমন্ত্রণ করেছি, তখন আমারই কসুর।"

"কি যে বলেন! শিগ্‌গির গাড়িতে ঢুকুন। ওঁরা না এলেন তো বয়ে গেল, আমাদের মজা কিছু কম হবে না।"

আজিজের মনে হোলো, না, মিসেস মুরের মতন একেবারে নিখুঁৎ নয়, তবু সহৃদয় খাঁটি লোক বটে। পরম মূল্যবান এই সকাল, এহেন দুটি আশ্চর্য্য নারীরত্ন এই একটি বেলার জন্যে ওর অতিথি হয়েছেন তো! নিজেকে একটা কেউকেটা কাজের লোক ব'লে ওর মনে হোলো। ফিলডিং হ'লেন ওর বন্ধু, দিনে দিনে ওদের সৌহার্দ্দ্য বাড়ছে, উনি না আসাতে ওর খালি খালি লাগবে, কিন্তু তবু, ফিলডিং এলে পরে উনিই হতেন সর্ব্বেসর্ব্বা, ও শুধু ঘুরত ওর ছায়ায় ছায়ায়। "এদেশের লোকের কোনো দায়িত্বজ্ঞান নাই" বড় কর্ত্তাদের এই মত; হামিদুল্লাও প্রায়ই এই কথা বলে। ওদের সব দেখিয়ে দিতে হবে যে তা নয়।

স্মিতমুখে গর্ব্বভরে ও একবার বাইরে তাকিয়ে দেখল। অবিশ্যি দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু মনে হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট স্রোতের ধারা। তারপর মাথা তুলে ও দেখল আকাশে বৃশ্চিক রাশির বিসর্পিত তারার দল পাণ্ডুর হয়ে আসছে। দরজা খুলে একটি সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ির মধ্যে ও ঢুকে পড়ল।

"আচ্ছা, ভাই, মহম্মদ লতিফ, এই গুহাগুলোর মধ্যে সত্যি কি আছে বলতো? আমরা সবাই যে সেখানে চলেছি, কেন?" এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া মহম্মদ লতিফের সাধ্যাতীত। ও জবাব দিল, কি যে ওখানে আছে তা জানেন খোদা আর কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা, আর তারা খুব খুসি হ'য়ে ওদের সব দেখিয়ে দেবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

পুস্তক-পরিচয়

A Vision—by W. B. Yeats, (Macmillan) 15/-

ইয়েট্‌স বইয়ের নাম দিয়েছেন Vision ; বাংলা অনুবাদে বলতে হলে তাকে বলতে হবে 'দর্শন'। কারণ Vision ইউরোপীয় philosophy নয়, বরং ভারতীয় দর্শনের সমপর্য্যায়ভুক্ত। যুক্তি তর্ক দিয়ে কোন সত্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা তাতে নেই, অলৌকিক উপায়ে যে সব রহস্য তাঁর নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে সেই সব রহস্য সুসংবদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার সাহায্যে অনেক প্রাচীন দার্শনিক তত্ত্বের অর্থ-উদ্ধার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ইয়েটস্ যে mystic সে কথা পূর্ব্বেই জানা ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনে যে সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল পূর্ব্বে তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। সে পরিচয় এ বইয়ের ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। ইয়েটসের বিবাহের চার দিন পরেই তাঁর স্ত্রীর মধ্য দিয়ে এ সব ঘটনা ঘটতে সুরু করে। অজ্ঞাত পণ্ডিতদের অশরীরী আত্মা তাঁর মধ্য দিয়ে ইয়েট্‌সের নিকট অনেক দার্শনিক রহস্য উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন। এর প্রথম উপায় ছিল automatic writing অর্থাৎ আবিষ্ট অবস্থায় যথেচ্ছ লেখা। পরে ইয়েট্‌সের পরামর্শে যখন তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ ভাবে এই সব আত্মার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে লাগলেন, তখন তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ইয়েট্‌সের সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। এই সময়ে তাঁর স্ত্রী জাগ্রত ও ঘুমন্ত উভয় অবস্থাতেই আবিষ্ট হতেন। এই আত্মারা কখনো অসময়ে এসে medium-এর অসুবিধা ঘটাতেন না, কোনদিন যদি ভুল করে আসতেন পরদিন সেটা শুধরে নিতেন। আত্মাদের সঙ্গে যে সব আলাপ আলোচনা হত তার মধ্যে যদি কোন দার্শনিক তত্ত্ব না থাকৃত তাহলে সেগুলি ভুতুড়ে গল্পের মত শোনাত। সৌভাগ্যক্রমে সে আলোচনা ছিল তত্ত্বপূর্ণ, আর সেই সব তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা হত যা ইয়েট্‌স পূর্ব্বেই আবছায়ার মত পেয়েছিলেন এবং তাঁর অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে তার ইঙ্গিত করেছিলেন। সুতরাং এসব আধিভৌতিক আলোচনা তাঁর স্বকীয় চিন্তার ধারার সঙ্গে অসংলগ্ন নয়।

ইয়েট্‌সের এ গ্রন্থের প্রধান দার্শনিক তত্ত্বকে চন্দ্র-তত্ত্ব বলা যেতে পারে। ইয়েটস একে বলেছেন—"The phases of the moon", চন্দ্রের গতি অনুসারে তিনি মানুষের চিন্তার ধারা, ব্যক্তিগত জীবন, জাতীয় জীবন, প্রভৃতিতে উত্থান পতনের কারণ নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজেই স্পষ্ট করে বলেছেন যে this wheel is every completed movement of thought or life, twenty-eight incarnations, a single incarnation, a single judgment or act of thought.

সুতরাং ইয়েটসের এই চন্দ্রতত্ত্ব কি তা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিজেই সংক্ষেপে তার যে পরিচয় দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করা যাক্—

Twenty and eight the phases of the moon,
The full and the moon's dark and all the crescents,
Twenty and eight and yet but six and twenty
The cradlles that a man must needs be rocked in
For there's no human life at the full or the dark.

ইয়েট্‌সের মতে চন্দ্রের ২৮টী অবস্থা আছে। অমাবস্যার চন্দ্র হচ্ছে প্রথম অবস্থা এবং পূর্ণিমার চন্দ্র পঞ্চদশ অবস্থা। অমাবস্যা হতে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী পর্য্যন্ত প্রথমপাদ বলা যেতে পারে। কৃষ্ণাষ্টমী হতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দ্বিতীয়পাদ, পূর্ণিমা হতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত তৃতীয় এবং শুক্লাষ্টমী হতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চতুর্থপাদ। যে কোন মানুষের জীবন এই চারিপাদে বিভক্ত। ইয়েট্‌সের মতে প্রথমপাদ হচ্ছে—

.... the dream
But summons to adventure, and the man
Is always happy like a bird or a beast.

দ্বিতীয় পাদে—

He follows whatever whim's most difficult
Among whims not impossible, and though scarred
His body moulded from within his body
Grows comelier,......
......The hero's crescent is the twelfth,

And yet, twice born, twice buried, grow he must,
Before the full moon, helpless as a worm.
The thirteenth moon but sets the soul at war
In its own being and when that war's begun
There is no muscle in the arm ; and after
Under the frenzy of the fourteenth moon,
The soul begins to tremble into stillness,
To die into the Labyrinth of itself!

তৃতীয় পাদে—

And after that the crumbling of the moon :
The soul remembering its loneliness
Shudders in many cradles, all is changed
... it takes
Upon the body and upon the soul
The coarseness of the drudge.

এই তৃতীয়পাদের ক্রমপরিণতিতেই চতুর্থ পাদের আরম্ভ। তখন

—you are forgotten, half out of life,
And never wrote a book, your thought is clear.
Reformer, merchant, statesman, learned man,
Dutiful husband, honest wife by turn,
Cradle upon cradle, and all in flight and all
Deformed....
Deformed beyond deformity, unformed,
Insipid as the dough before it is baked.

অমাবস্যায় চন্দ্রের যে অবস্থা তাকে বলা হয়েছে—Complete objectivity (সম্পূর্ণ বহির্মুখী ভাব), কৃষ্ণাষ্টমী—Discovery of strength, পূর্ণিমা—Complete subjectivity (সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী ভাব), এবং শুক্লাষ্টমীতে Breaking of strength, মানুষ কখনই সম্পূর্ণ বহির্মুখী কিম্বা অন্তর্মুখী ভাব লাভ করতে পারে না। সুতরাং বাকি ২৬টী অবস্থাতেই তাকে পরিভ্রমণ করতে হয়। কৃষ্ণাষ্টমীতে মানুষের ব্যক্তিত্ব লাভের চেষ্টা পরিস্ফুট হয়, পূর্ণিমাতে সে শক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশ ও শুক্লাষ্টমীতে সে শক্তির হ্রাস। শুক্লাষ্টমী হতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত

ইয়েট্‌সের মতে মানুষের জীবনের primary অবস্থা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে অবস্থা তা হচ্ছে antithetical। দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে জীবন তা হচ্ছে আপ্রাকৃত এবং প্রথমার্দ্ধের জীবন প্রকৃতির বশবর্ত্তী বা সহজাবস্থা। অমাবস্যায় এই সহজাবস্থার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। চন্দ্রের এই ২৮টী অবস্থানুযায়ী মানুষের ইচ্ছা-শক্তির যে বিকাশ হয় তা হচ্ছে—1... 2. Beginning of energy; 3. Beginning of ambition; 4. Desire for primary objects; 5. Separation from innocence; 6. Artificial individuality; 7. Assertion of individuality; 8. War between individuality and race; 9. Belief takes place of individuality; 10. The image-breaker; 11. The consumer, the pyre-builder; 12. The fore-runner; 13...14. The obsessed man; 15.—; 16. The positive man; 17. The Daimonic man; 18. The emotional man; 19. The assertive man; 20. The concrete man; 21. The acquisitive man; 22. Balance between ambition and contemplation; 23. The receptive man; 24. The end of ambition; 25. The conditional man; 26. The multiple man, also called the Hunch-back; 27. The Saint; 28. The fool.

ইয়েট্‌সের এই নূতন দার্শনিক তত্ত্ব অবধানযোগ্য। হয় ত আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ তত্ত্বের খোঁজ পাওয়া যাবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র প্রণীত, (৫৩ নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত নন—এ গ্রন্থই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা—কিন্তু সাময়িক পত্রে যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন অথবা আমার মত যাঁহাদের তাঁহার সহিত কতকটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারাই

জানেন তিনি বেশ চিন্তাশীল ব্যক্তি—দেশের ও দশের হিতকামী এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায় তৎপর। ১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত ৩৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বৃহৎ গ্রন্থে এবং তাহার উপক্রম ও তিনটি পরিশিষ্টে পাঠক ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়—সমাজে নারীর স্থান, সত্ত্ব, অধিকার ও স্বধর্ম। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার নানা সম্পর্কিত বিষয়ের অবতারণ করিয়াছেন, যথা বিবাহের বয়স ও কর্ত্তব্য, বাল্য বিবাহ, যৌবন বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, তথাকথিত 'নারী-নির্য্যতন', Socialism, Communism, Bolshevism, হিন্দু সমাজগঠনতত্ত্ব, Labour Guilds, Trade Unions ইত্যাদি। এই সকল গুরুতর প্রশ্নের—ভাসা ভাসা পল্লবগ্রাহী ভাবে নয়—বেশ নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রগতির দিনে তাঁহার সিদ্ধান্ত-সকল অনেক স্থলে 'conservative' মনে হইতে পারে—কিন্তু একেবারেই 'hasty' নয়। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, গ্রন্থকার আদৌ গতানুগতিক নহেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে ভ্রম থাকিতে পারে—এবং মতভেদেরও যথেষ্ট অবসর থাকিতে পারে—কিন্তু তিনি যে গভীর ভাবে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবিষয়ে আমার সংশয় নাই।

'পুরুষ বড় কি নারী বড়'—এ প্রশ্ন নিরর্থক—'বর বড় না কনে বড়'—এ প্রশ্নের মতই নিরর্থক। পুরুষে এমন গুণ আছে, যাহা নারীতে নাই—আবার নারীতে এমন গুণ আছে, যাহা পুরুষে নাই। দার্শনিক Newman বলিয়াছেন—যদি ভগবানকে প্রেমভাবে পাইতে চাও তবে তোমাকে নারী হইতে হইবে—তুমি যতই পৌরুষ-বিশিষ্ট হওনা কেন—

You must be a woman, however manly you may be among men.

অন্য পক্ষে Frederick Harrison লিখিয়াছেন—

—The fact remains that no woman has ever approached Aristotle, Archemedes, Shakespeare, Descartes, Raphael or Mozart or has ever shown a kindred mass of powers. * * The world has never seen a female Alexander, Caesar, Charlemagne or Cromwell.

কিন্তু কথা এই—নর ও নারী কি সম না বি-যম। গ্রন্থকার ঠিক বলিয়াছেন যে বৃত্তিতে ব্যাপারে শরীরে অধিকারে নর ও নারী সমান নয় এবং প্রমাণ স্থলে 'Realities and Ideals' গ্রন্থ হইতে এই সুচিন্তিত বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

In mind, body and feeling, in character—women are by nature designed to play a different part from men. These differences show that that part is personal and not general, domestic, not public.

'সাম্য' রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রও প্রবীণ বয়সে লিখিয়াছিলেন—"পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র। সাম্য কি সম্ভবে?" অতএব উভয়ের পক্ষে তুল্যরূপ শিক্ষা, সাধন, জীবনযাপন অবিহিত।

গ্রন্থকার বলেন—নারীর প্রধান সত্ব ও অধিকার মাতৃত্ব। যে সামাজিক ব্যবস্থা নারীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে কিম্বা নারীর এই সত্ব সঙ্কুচিত করে, সে ব্যবস্থা জঘন্য ও বর্জ্জনীয়। গীতার কথা এই—সধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। পাশ্চাত্যে নারী স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়ায় পশ্চিম দেশে কি গুরুতর সামাজিক অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত প্রাচ্যেরা এদেশে তাহার অনুকরণ করিলে কি সাংঘাতিক অবস্থা ঘটিবে গ্রন্থকার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহার বিবৃতি করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ statistics এবং নানা প্রামাণিক পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে অভিমত সংগ্রহ করিয়া নিজমতের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহাকে 'well documented' বলে এই গ্রন্থ সেইরূপ বহু প্রামাণ্য-সম্বলিত এবং যাঁহারা পাশ্চাত্যভাবে প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করিতে চান তাঁহাদিগের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

গ্রন্থকার গ-চিহ্নিত পরিশিষ্টে আমাদের সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যবস্থার সবিশেষ আলোচনা এ ক্ষুদ্র সমালোচনায় সম্ভব নয়, তবে গ্রন্থপাঠে দেখা যায় গ্রন্থকারের যৌথ পরিবার-প্রথার প্রতি এবং জাতিভেদের উপর বিশেষ পক্ষপাত। যৌথ পরিবার সম্বন্ধে তিনি Sir James Stephenএর মত সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

I think it will be impossible for any candid person to deny that Hindu institutions favoured the growth of many virtues, have practically solved many problems,—the problem for instance of pauperism,—which we English are far enough from solving.

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যে মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া যৌথপরিবার-প্রথা এদেশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল এবং নানাভাবে বিবিধ কল্যাণ সাধিত করিয়াছিল বাংলাদেশ হইতে সে মনোভাব অনেকদিন তিরোহিত হইয়াছে। সে ভাবের অভাব আমরা কিরূপে পূর্ণ করিব? কিরূপে কলিকাতা-তল-বাহিনী ভাগীরথীকে গঙ্গোত্রীতে ফিরাইয়া লইব? যে প্রথা প্রাণহীন—তাহা পরিহার করাই সঙ্গত নহে কি? কিন্তু স্মরণে রাখিতে হইবে যে প্রাণবন্ত অজর অক্ষর—তাহার বিনাশ হয় না। যৌথপরিবার-প্রথার প্রাণ কি?

To everyone according to his needs and from everyone according to his capacity.

যার যত উচ্চ শক্তি, কার্য্য উচ্চতর
পক্ষে তার—দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর

—নবীনচন্দ্র

অতএব আমার বিশ্বাস যৌথপরিবার-প্রথার ঐ প্রাণ ভবিষ্যতে নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং 'the whole world will become a gigantic joint family। বর্ণাশ্রম ধর্ম—যাহা জাতিভেদ প্রথার মূল ভিত্তি—আমিও তাহার পক্ষপাতী। কিন্তু ভাগবতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমি বলি—বর্ণাশ্রম যুতং ধর্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ। এই 'পূর্ব্ববৎ' শব্দের প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম এদেশে সজীব ছিল, তখন সূতপুত্র কর্ণ রথাতম হইতে পারিয়াছিলেন। তাহারও অধিক—ধীবরী-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস' হইয়া ব্রহ্মণ্যের সর্ব্বোচ্চ অধিকার পরিচালন করিয়াছিলেন।

এ সকল গুরুতর কথা দু' এক ছত্রে সিদ্ধান্ত করা যায় না। আমার ইচ্ছা আছে যদি সুযোগ পাই তবে চারু বাবুর আলোচ্য সমস্যা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য একদিন সবিস্তারে আলোচনা করিব। গ্রন্থের অনেক গুণ আছে এবং প্রধান গুণ

এই যে, গ্রন্থকার সামাজিক নানা সমস্যায় পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের গুরুতর একটি দোষ আছে। আলোচ্য বিষয় ক্রমানুযায়ী সজ্জিত করিবার যে সুকৌশল—গ্রন্থে তাহার অভাব দেখিলাম। অর্থাৎ, গ্রন্থের বিষয়-সংস্থান সুবিন্যস্ত নয়। সেইজন্য একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

Blasting & Bombardiering—By Wyndham Lewis
(Eyre & Spottiswoode)

কোন একটি দুর্জ্ঞেয় কারণে জীবনচরিত সাহিত্যের কদর অত্যধিক ভাবে বেড়ে গেছে আজকাল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন আমাদের এই যুগটি বিরাট পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ এবং সেকালের 'রোমাণ্টিক' ধারা পরিত্যক্ত হয়ে নূতন প্রকাশভঙ্গী প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে আত্মদর্শনের তাগিদ এসেছে, তাই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এই সহানুভূতির বাহুল্য।

আবার অনেক সমালোচক ভাবেন বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্পসৃষ্টি যত অনায়াস-সাধ্য সমষ্টিবদ্ধ ও যন্ত্রচালিত হতে চলেছে, ব্যক্তি বিশেষের আন্তরিক প্রতিবাদ ততই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে আত্মনিবেদনের আকার গ্রহণ করে। অর্থাৎ, শিল্পীর পূর্ব্বতন উপকরণের ভিতর নাকি স্বাচ্ছন্দ্য প্রবেশ করে প্রাণ হরণ করে নিয়েছে, তাই শিল্পী আজ সে সমস্ত পরিহার করে আপন কোটরে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়ে নূতন করে সৃষ্টি-প্রণালী আবিষ্কার করতে চায়।

প্রকৃত কারণ যাই হোক, সাহিত্যরসিক পাঠক সম্প্রদায় আজ উপন্যাস উপভোগে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই।

সুচতুর প্রকাশক-সঙ্ঘের অর্থনৈতিক অণুবীক্ষণের মধ্যে এই 'স্বাদ পরিবর্ত্তন' ধরা পড়েছে, তাই আজ পুরাতন দিনপঞ্জিকা, উচ্ছিষ্ট প্রেম-পত্র, এমনকি পাঠ্য পুস্তকের উপর খামখেয়ালী মার্জ্জিন-মন্তব্য পর্য্যন্ত চাকচক্যমান পোষাকে আবৃত হয়ে উচ্চমূল্যে বিকিয়ে যাচ্ছে।

অধুনা প্রকাশিত আত্মকাহিনীর মধ্যে বেশীর ভাগ গ্রন্থ অর্থের প্রলোভনে, সামাজিক অপবাদ ক্ষালনের চেষ্টায় অথবা যশোলিপ্সার মোহে রচিত। ছোট বড় যত শিল্পী, নট, নটী, সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ আত্মকথা ব্যক্ত করে গেছেন তার মধ্যে কদাচিৎ এমন রচনা মিলবে নিছক বলার আনন্দ যেখানে বড়। রসপ্রতিপত্তির এই প্রাথমিক উপাদানের অভাব সত্ত্বেও রচনা চিত্তাকর্ষক হয়।

দেখছি, মানব-হৃদয় যতই পঙ্কিল আবর্জ্জনাপূর্ণ বা নিষ্ঠাশূন্য হোক না কেন দ্বার উদ্ঘাটিত হলেই মনের অবচেতন স্তরের ভিতর আলোক প্রবেশ করে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম অন্তর্বেদনার রেখা উদ্ভাসিত করে দেয় যার উপস্থিতি সম্বন্ধে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই অচেতন থাকলেও পরিচয়ের পুলক লাগে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান গ্রন্থকার অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড চিত্র দ্বারা একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন প্রতিফলিত করবার প্রয়াসী হয়েছেন বলে এই গ্রন্থে সর্ব্বপ্রকার সুকুমার মনোবৃত্তি শাসিত হয়েছে কঠোর ভাবে। ফলে ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনাই উপেক্ষিত হয়েছে। এমন কি আদ্যন্ত রচনাটি প্রণিধানের পরও অনুমান করবার উপায় থাকে না তিনি বিবাহিত ছিলেন কিম্বা কখনও কোন রমণীর সাহচর্য্য পেয়েছেন কি না। প্রিয়-জনের বিচ্ছেদে কোথাও কাতরোক্তি নেই। সাফল্যের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সংযত। সমরাঙ্গণের দীর্ঘায়িত বিভীষিকা-চিত্র পর্য্যন্ত আবেগশূন্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আত্মনিবেদনের এই বৈশিষ্ট্যে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জক হবার কথা নয়। উপরন্তু অনেক স্থানে বর্ণনভঙ্গী আপাত-বিস্তারিত না হয়ে এমন একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ তির্য্যক্ গতি ধারণ করেছে যে পাঠককে তার সমস্ত বিদ্যাবত্তা একত্রিত করে রেল-পথ-যাত্রীর সৌন্দর্য্য আহরণের মত ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে প্রাণান্ত হতে হয়। তথাপি গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল।

প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় গ্রন্থকার তাঁর এই স্মৃতি-চয়নিকাটির মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেইজন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকেন্দ্রতা বাহ্যিক অলঙ্কার স্বরূপ ঝরে যায়।

মাত্র দশ বছরের আয়তনের মধ্যে মহাযুদ্ধ ও উত্তর-সামরিক এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণ গ্রথিত—এই দাবী করা হয়েছে। ইতিবৃত্তিটি সংস্কৃতির বিবর্ত্তনের,

ঘটনার নয়—সুতরাং একটি অতিভাষণের দৃষ্টান্ত ত' গোড়াতেই বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত তখনকার দিনের ঘটনাপুঞ্জ সুদীর্ঘ সময়ের অতিক্রমে যে কতখানি রূপ পরিবর্তন করে এতখানি চিত্রকল্প হয়েছে তা অনুমানসাপেক্ষ। গ্রন্থকার হয়ত' দিনপঞ্জিকা হ'তে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু যৌবনের উদ্যান হতে প্রৌঢ় হস্তে পুষ্প চয়িত হলে বর্ণ-সামঞ্জস্য নির্ভুল হয় না। কোন কোন স্থানে ঘটনার পারম্পর্য্যে বৈষম্য অনুভব করেছি। সত্যের অপলাপ হওয়াও অসম্ভব নয়, বিশেষ করে যখন পরবর্তী কালের আহৃত রাজনৈতিক গোঁড়ামির প্রলেপ পড়েছে তাতে।

কিন্তু এতে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক সম্পদ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি না। প্রথমতঃ আত্মনিবেদন-সাহিত্যে সত্য মিথ্যার বিচার খাটে না। একাগ্রচিত্ত সৌন্দর্য্য-উপাসকের দিনপঞ্জিকা ঘেঁটে দেখেছি, খেয়াল ও অনুভূতির মনোরম কারুকার্য্যের সৃজন-উৎস হচ্ছে শারীরিক গ্লানি। সত্যভাষণের সঙ্কল্প সত্যকে অনুধাবন করে শেষ পর্য্যন্ত বিতাড়িত করে বেড়ায়—এ দৃষ্টান্ত যে কোন নিষ্ঠাপ্রবণ মহাত্মার আত্মজীবনী প্রণিধান করলে বোধগম্য হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যৌবন-মাদকতায় অস্থির স্বৈরাচারীর অকপট স্বীকারোক্তি প্রগাঢ় ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত বৃদ্ধ দেহের অবদমিত কোলাহলের চেয়ে শ্রুতিযোগ্য হয়েছে।

গ্রন্থখানির মধ্যে সমরাঙ্গণের বর্ণনাতে একটি স্বতন্ত্র আভিজাত্য আছে। এই পরিচ্ছেদগুলিকে পৃথক ভাবে প্রকাশ করলে শ্রেষ্ঠ সমর সাহিত্যের অন্যতম বলে আদৃত হতো। এতখানি নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার অথচ নিবিড় বিবৃতি কোথাও পড়েছি বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার নিঃকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করেছেন যে তাঁর গোলন্দাজ-বাহিনীকে পদাতিকদের কৃচ্ছ্র-সাধনা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু ক্লেশ ও মৃত্যুর রুদ্র মূর্ত্তি উজ্জীবিত করা তাঁর অভিপ্রায় নয়। যুদ্ধ-উন্মাদনার একটি ভয়াল আনন্দের দিক আছে; আর আছে অচেনা মানবের সহিত আকস্মিক সৌহার্দ্দ্য; অভাবিত কৌতুকের আচম্বিত আবিষ্কার; মৃত্যুর সমীপ স্পর্শে দেহের হাস্যকর বিকার; ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আমোদপ্রদ ভাব-স্বাতন্ত্র্য; প্রকৃতির রূপ পরিগ্রহণ; অসীম কর্দ্দম-সমুদ্রের বিরাট স্তব্ধতা।

এই সকলের স্থান সঙ্কুলান করতে হলে দৃষ্টিকে এমন একটি উর্দ্ধতন

লোক হতে নিক্ষেপ করতে হয়, যেখান থেকে বক্তাকেও একটি ক্রীড়নক মাত্র রূপে দেখা যায় এবং তাঁর ব্যক্তিগত সাময়িক রুচি অরুচি উজ্জ্বলতর বর্ণ-বিক্ষেপের মধ্যে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

দু একস্থানে ভাষা তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে যখন গ্রন্থকার সেই যজ্ঞানলের আহুতি ইংরাজ সৈনিকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন—"বেচারারা মর্য্যাদার অহঙ্কারে অন্ধ, গরু বাছুরের মত অসহায়, মায়া হয়। তারপর সে-মায়া অস্বস্তিতে পরিণত হয় যখন তারা লয়েড জর্জ্জ-এর ভরসা বাণীর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে প্রিয়জনদের ধৈর্য্য সংগ্রহ করতে উপদেশ দেয়—পুনরাবৃত্তি করে 'এ যুদ্ধ সভ্যতার দ্বার উদ্‌ঘাটনের যুদ্ধ, চির শান্তি আনয়নের যুদ্ধ'—ম্যাগনা কার্টা-র উত্তরাধিকারী এরা, মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিচ্ছে দলে দলে, কাতারে কাতারে—"

কথাগুলির মধ্যে যে জ্বালা বিকীর্ণ হয় সে হচ্ছে নিষ্ফলতার জ্বালা। গ্রন্থকার স্বয়ং যুদ্ধ-বিরতির উপায় উদ্ভাবন করতে কৃতকার্য্য হন নি, এ হচ্ছে তারই আক্ষেপোক্তি। লয়েড জর্জ্জ-এর সহিত তাঁর কোন কলহ নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ', লিটন ষ্ট্রেচী, বেনেট প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীগণ গ্রন্থকারের কাছে অবজ্ঞাত হয়েছেন আর এক কারণে। গ্রন্থকার নিজেকে যে যুগের প্রতীক বলে মনে করেন সেখানে তাঁদের স্থান নাই, তাই উপেক্ষা করতে বাধেনি।

বিস্ময় লাগে, বাইশ বছর পরে সে প্রাক্-যুদ্ধ-কালের উপর গ্রন্থকার কেমন করে এমন হাল্কা ভাবে অবতীর্ণ হলেন।

'ব্লাষ্ট'-এর উৎকট মুদ্রালিপি পুরাতন ফাইল-এ মজুত ছিল। কতকগুলি নমুনা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে দৃষ্টিকটু দীর্ঘাকৃতি অক্ষরবিন্যাস সমেৎ। কিন্তু তখনকার দিনের গরম গরম তর্ক বিতর্ক, মুষ্টিযুদ্ধ, অভিজাত শ্রেণীর বৈঠক সভা, প্রধান মন্ত্রী এ্যাস্‌কুইথ-এর নাসিকা কণ্ডুয়ন ইত্যাদি বহু বিচিত্র ব্যাপার এমন শ্রুতিমধুর ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে পড়ার সময় ভুলে যেতে হয় যে সে সকল একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকার অলঙ্কার মাত্র।

রণডঙ্কার চাঞ্চল্য দিনপঞ্জিকা হতে উদ্ধৃত হয়েছে গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন।

যুদ্ধের শেষ ভাগে কৃতান্তের শত চেষ্টা নিষ্ফল করে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত

নিরাপদ প্রান্তে প্রেরিত হয়েছেন, সঙ্গে ছিলেন অগাষ্টাস্ জন। সামরিক কর্ত্তাদের স্থূল বুদ্ধিতে শিল্পীকুলের ধ্বংস নিবারণের প্রয়োজনীয়তা প্রবেশ করাতে বিলম্ব হয়েছিল—আলোচ্য গ্রন্থখানির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মনে হয় ভালই হয়েছিল—কেননা, পিছনে সে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব-লীলা অবারিত না থাকলে ক্যানেডিয়ান বাহিনীর রসদখানা হতে হুইস্কী চুরির তদন্ত আর শ্মশ্রুধারী সঙ্গীটিকে সম্রাট ভ্রমে বিভ্রাট এতখানি আমোদ-প্রদ হত না।

শান্তির প্রহসন সমাপন হবার পর বিধ্বস্ত সমাজে আসন গ্রহণ করা সম্ভব হল না গ্রন্থকারের। ঐশ্বর্য্যশালী বন্ধুর অভাব ছিল না তাঁর এবং পূর্ব্বতন রীতি অনুযায়ী নৈশভোজন-সভায় আমন্ত্রিত হতে থাকলেন। কিন্তু তখন প্রখরতর হয়েছে দৃষ্টি। অচিরে উপলব্ধি হল উপচীয়মান স্বাচ্ছন্দ্য শিল্প-সাধনার অনুকূল ক্ষেত্র নয়; নিজের যশোরাশির অন্তঃসারশূন্যতাও সেই সঙ্গে প্রতিভাত হতে গ্রন্থকার কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন।

ইংরাজ জাতির শিল্পজ্ঞানে বীতস্পৃহাজনিত গুরু গম্ভীর আক্ষেপোক্তি ব্যতীত উত্তর-সামরিক জীবনটি কৌতুকপ্রদ মানুষ ও ঘটনায় সমাচ্ছন্ন।

টি, ই, হিউমের সহিত গ্রন্থকারের তর্ক বিতর্ক এক সময় মল্লযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল এবং তিনি সোহো উদ্যানের লৌহ প্রাকারে মর্দ্দিত হয়ে নক্ষত্র দেখে-ছিলেন। তারপর পুনর্মিলনের পূর্ব্বেই হিউম রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই হিউমের শিল্পদৃষ্টির বিস্তারিত নিন্দাবাদ আছে। এ নিন্দা যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষজাত নয় হয়ত' অনেকের বোধগম্য হবে,—কিন্তু এর পিছনে যে সাহস প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা ক'জন উপলব্ধি করবে?

সেই সাহসের পরিচয় পাই আর একভাবে গ্রন্থাকার যখন তাঁর প্রিয় বন্ধু টি, ই, লরেন্স-এর খ্যাতিগাথা হতে একে একে সকল আভরণ খুলে নিয়েছেন।

এর পর তিনি যখন অকস্মাৎ ভেল্কিবাজি-প্রদর্শকের মত তুড়ি মেরে বিশ্ব-বিজয়ী রথী-চতুষ্টয়কে প্রকাশ করলেন তখন আশ্চর্য্য হবার কিছু রইল না।

এজরা পাউণ্ড, টি, এস, ইলিয়ট, জেম্‌স্ জয়েস এবং স্বয়ং গ্রন্থকার সে রথে সমাসীন রয়েছেন দেখা গেল।

গ্রন্থকার হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—"এক শত বছর পর আমাদের এই বাণী যখন প্রাক্‌ডাইনাষ্টিক্ মৈশরী শিলাখণ্ড অপেক্ষা সুদূরে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন

উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে বিমর্দ্দিত কোটি কোটি 'প্রলিটেরিয়েট্' তাদের পদযুগলের মধ্যে লাঙ্গুল চালনা করে দেখবে আর ভাববে,—কি দুর্দ্দান্ত উদ্যম, কি অসীম সাহস ছিল এদের"—তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে নিয়ে নেপথ্যে বলেছেন—"আর কিছু হোক বা না হোক আমার এই বক্তব্য ভবিষ্যতের দু চারটি লুড্‌ভিগ্, লিটন ষ্ট্রেচীকে ডিগবাজি খাইয়ে দিলেই আমি খুশী।

গ্রন্থকার নিজের অহঙ্কার নিজেই ছেদন করেছেন প্রতি পদে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়নি কখনও। স্পষ্ট হয়নি শুধু, অন্ততঃ আমার কাছে, কোন সূত্রে তাঁদের চারজনকে একত্রে বেঁধেছিল।

গ্রন্থকার দাবী করেছেন বাণীর ঐক্য। আমি কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে এমন কোন আত্মীয়তা দেখি না যা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন নয়। আলোচ্য রচনাটির আয়তনের মধ্যে গ্রন্থকারের শিল্পসাধনা নিবদ্ধ ছিল চিত্র-অঙ্কনে। সেই সকল হতে চয়ন করে যে ক'খানি গ্রথিত করে দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম যুগের দুর্ব্বোধ্য 'কিউবিজম্' বাদ দিলে বহু পুরাতন 'বোট্টেচেলীর' সম্বন্ধ নিবিড়তর বলে মনে হয়।

বর্ত্তমান গ্রন্থ হতে মানবীয় দুর্ব্বলতা যে-রূপ রূঢ় ভাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে হয়ত' কোন কোন স্থানে 'হলো ম্যানে'র বিরাট শূন্যগর্ভতা স্মরণ করিয়ে দেয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় কয়েকটি ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে, তার মধ্যে মৃত্যুকালীন বেকার-এর বিকার-উক্তি ও নবীন গঞ্জিকাসক্ত কবির দু চারটি মামুলী কথা অন্যতম। গ্রন্থকার মৃত্যুর শোকোচ্ছ্বাস দমন করেও মুমূর্ষুর মুখে বাণী দিয়ে প্রগাঢ়তর অন্তর্বেদনা প্রকাশ করেছেন।

দৃষ্টান্ত দিয়ে লাভ নেই। হয়ত সকলের সকল রচনার সহিত পরিচিত হলে চোখের সামনে চার চারটি অখণ্ড, বিরাট ও অনুরূপ 'মনোলিথ্' ভেসে উঠবে। আপাততঃ দেখছি পরস্পরের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সৌহার্দ্দ্য গড়ে উঠেছে গভীর ভাবে এবং এই হৃদয়-ঘটিত কারণে পরস্পর পরস্পরের প্রশস্তি প্রচার করেন।

গ্রন্থকার তাঁদের বন্ধুত্ব গঠনের বিবরণ দিয়েছেন মাধুর্য্য-মণ্ডিত করে। পাউণ্ড ছিলেন দলের পাণ্ডা, তাঁরই উদ্যোগে 'একজোড়া পুরাতন জুতা' উপলক্ষ করে এলিয়াট্ ও জয়েসের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

নিজেদের এই গোষ্ঠীর কোন উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাননি গ্রন্থকার। বর্ত্তমান যুগের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিত্রকলার দুর্দ্দশায় সন্তাপ প্রকাশ করবার সময় অনুমান করেছেন কাব্য-লোকের নবীন অভিযান নূতনতর প্রাণ-শক্তিকে উজ্জীবিত করবে। ভেবেছিলাম সম্ভবতঃ অডেনের কথা স্মরণ করে এই আশা পোষণ করেছিলেন কিন্তু সেদিন দেখলাম অভিজাত মণ্ডলীর এক সাম্প্রদায়িক পত্রে এই কবিটির সাম্য-প্রীতির প্রতি তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে মন্তব্য জ্ঞাপন করেছেন।

গ্রন্থকারকে আমন্ত্রণ করি আর একখণ্ড আত্মজীবনী রচনা করে তাঁর অভিমতকে আরও প্রাঞ্জল করে ব্যক্ত করুন।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Pepita—by V. Sackville-West, (The Hogarth Press).

আমাদের মধ্যে অধিকাংশের জীবনই বড় একঘেয়ে, জীবনের ইতিহাসে উল্লেখ করবার মত ঘটনা থাকে না বল্‌লেই চলে। আমাদের নিজেদের জীবনে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব ব'লেই, বোধ হয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কাহিনী পড়্‌তে আমাদের ভাল লাগে ও ইচ্ছা করে।

পেপিটার জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নিশ্চয়ই ছিল না। সে ছিল স্পেনদেশের একটী অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকা। তার মায়ের আমরা পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তার পিতা কে ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিধিমত তার বিবাহ হয়, কিন্তু তার মায়ের দোষেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, স্বামীর সঙ্গে সে বেশী দিন বসবাস কর্‌তে পারেনি। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদও কোনদিন ঘটেনি। নৃত্যবিদ্যায় তার কিছু পারদর্শিতা ছিল। রূপও ছিল তার অসামান্য। স্বামী-পরিত্যক্তা হবার পর, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সে ঘুরে বেড়ায় ও একজন সুন্দরী নর্ত্তকী বলে খ্যাতি লাভ করে। শুধু খ্যাতিই যে লাভ করে তা নয়। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সে বহু গণ্যমান্য ও ধনী লোকের হৃদয়ও জয় ক'রে বসে। এই সব লোকেদের মধ্যে

একজন ছিলেন লাইওনেল স্যাক্‌ভিল ওয়েষ্ট, যিনি পরে লর্ড স্যাক্‌ভিল হন। যুবা বয়সেই তিনি পেপিটার রূপে আকৃষ্ট হন। তাঁরই উপপত্নীরূপে পেপিটা বহুকাল কাটান। লর্ড স্যাক্‌ভিল অবশ্য চিরকালই অবিবাহিত থাকেন। পেপিটার ছেলেমেয়ে ছিল সংখ্যায় সাতটি। তার মধ্যে সবকটিই লর্ড স্যাক্‌ভিলের ঔরস-জাত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা বোধ হয় খুব বেশী অন্যায় নয়। কেননা, পেপিটার প্রেম যে খুব একনিষ্ঠ ছিল না, তার অনেক প্রমাণ আমরা পাই।

পেপিটা বইখানিতে গ্রন্থকর্ত্রী এই পেপিটা ও তার বড় মেয়ে (যিনি পরে লেডী স্যাক্‌ভিল বলে খ্যাত হন)—এই দু'জনের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থকর্ত্রী হচ্ছেন পেপিটার দৌহিত্রী, লেডী স্যাক্‌ভিলের মেয়ে। পেপিটার সঙ্গে লাইওনেল স্যাক্‌ভিল ওয়েষ্টের বিধিমত বিবাহ হয়েছিল কি না, তা নিয়ে এক মামলা হয়। এই মামলার জন্য যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা থেকেই গ্রন্থকর্ত্রী পেপিটার জীবন-কাহিনীর মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। পেপিটার জীবনের যে চিত্র তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তাতে কিন্তু আমরা প্রধানত তার জীবনের বাহ্য-ঘটনাবলীর ইতিহাসই পাই, তার অন্তরের ভিতর আমরা প্রবেশ করতে পারি না। বিখ্যাত নর্ত্তকী ইসাডোরা ডানকান তাঁর নিজের যে জীবন-কাহিনী লিখেছেন তা খুব বেশী আদরণীয় হয়েছে তার এক কারণ, বোধ হয়, তিনি তাঁর জীবনের শুধু বাহ্য ঘটনাবলীর ইতিহাস লেখেন নি, তিনি তাঁর অন্তর্জীবনেরও একটি পরিষ্কার ছবি পাঠকের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন। এই অন্তর্জীবনের চিত্র থাক্‌লে পেপিটার জীবন-কাহিনী নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু এর জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। কেননা পেপিটার অন্তর্জীবনের ছবি আঁক্‌তে হ'লে যে মালমশলা দরকার তার কিছুই, বোধ হয়, তাঁর হস্তগত হয়নি আর তিনি মাতামহীর জীবন-কাহিনী লিখতে গিয়ে, ইচ্ছে করেই, কল্পনার আশ্রয় মোটেই গ্রহণ করেন নি।

পেপিটার জীবন বৈচিত্র্যময় ছিল, কিন্তু তার কন্যা লেডী স্যাকভিলের জীবনে যে বৈচিত্র্যের খুব বেশী স্থান আছে তা নয়। কিন্তু লেডী স্যাকভিল্ ছিলেন গ্রন্থকর্ত্রীর মা। তাঁকে দেখবার এবং গূঢ়ভাবে জানবার অনেক সুযোগই

গ্রন্থকর্ত্রী পেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর মায়ের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, সে চিত্রে গ্রন্থকর্ত্রীর চরিত্র অঙ্কনে নিপুণতা অনেক বেশী প্রকাশ পেয়েছে। লেডী স্যাকভিলের সঙ্গে পেপিটার যতটা সাদৃশ্য থাকুক না থাকুক, পেপিটার মা কাটালিনার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল অনেক বেশী। মা ব'লে গ্রন্থকর্ত্রী লেডী স্যাকভিলের চরিত্র অঙ্কনে কোন পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন ব'লে মনে হয় না। গ্রন্থকর্ত্রীর মাতৃভক্তির পরিচয় আমরা অনেক স্থলেই পাই। কিন্তু এই মাতৃভক্তি তাঁকে একেবারে অন্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারেনি। কাজেই লেডী স্যাকভিল্‌কে একেবারে দেবীর পর্য্যায়ে উন্নীত করেন নি। তাঁর দোষগুণ, মনের সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা সমস্তই তিনি আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন।

এই সত্যনিষ্ঠার ছাপ শুধু লেডী স্যাকভিলের চরিত্র অঙ্কনে নয়, বইখানির প্রায় সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। যেসব জায়গায় তিনি অনায়াসে সত্য গোপন করতে পারতেন, সেখানেও তিনি তা করেন নি। আর কিছুর জন্য না হ'লেও, এই সত্যনিষ্ঠার জন্যও বইখানি বিশেষ আদরের যোগ্য।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

কল্লান্তিকা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

কল্লান্তিকার প্রচ্ছদপটের অপর পৃষ্ঠায় পুস্তকখানির পরিচয় দেওয়া হয়েছে "অভিনব কাব্য প্রচেষ্টা" বলে। বিষয়, ভাষা আর ছন্দের দিক থেকে এ কাব্যের অভিনবত্ব কোন পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াবে না। এ অভিনবত্বের স্বরূপ ধূর্জ্জটিবাবুর ভূমিকায় অল্প কথায় ধরে' দেওয়াও আছে। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে অসিতবাবু এ কাব্যে অবচেতনার শক্তির সাহায্যে চিত্রের সঙ্গে কবিতার সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, এবং সেটা করতে তিনি অবচেতনায় উদ্ভূত কতকগুলি প্রতীককে চেতনরাজ্যে রূপ দিয়েছেন কাব্যের বিষয়বস্তুতে কয়েকটি দ্বিত্ব-বোধের অবতারণা করে' আর কিছু দুরূহ শব্দকে তাদের আদি অর্থে ব্যবহার করে'।

কল্লান্তিকায় চিত্রের সঙ্গে কবিতার সম্বন্ধ স্থাপনে একটু বিশেষত্ব আছে। সে সম্বন্ধ চিত্রকলার সাধারণ ভঙ্গীগুলিকে আশ্রয় করেই শেষ হয়নি। অর্থাৎ কবি যে প্রতীকগুলি সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি ছবি হিসাবে স্পষ্ট বলেই যে এ কাব্য চিত্রধর্ম্মী তা নয়। কিম্বা বিষয় বা প্রতীকের বর্ণনায় রঙরেখা-রাজ্যের বিরোধাভাস আনা হয়েছে বলেই যে এ কাব্যের ছবিলতা সম্পূর্ণ হয়েছে তাও নয়। কল্লান্তিকার কবিতারাজির চিত্র-সম্বন্ধ আর এক ভাবে বিশেষ, আর সেই বিশেষত্বের ভিত্তির উপর এর অভিনবত্বের দাবী আরো দৃঢ় হয় বলে' মনে করি।

এই প্রসঙ্গের বিচার করতে হ'লে আরো দুটি বিভিন্ন ধরণের দ্বিত্ব লক্ষ্য করতে হবে ; প্রথম ভাষার মধ্যে, দ্বিতীয় ছন্দে। এদের প্রভাব ক্রমশঃ বর্ণনীয়। কল্লান্তিকার বিষয়বিন্যাসে আর খণ্ড ছবিগুলির ব্যঞ্জনায় যে সম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণ, স্পষ্ট আর অস্পষ্ট প্রভৃতি দ্বিত্বের সমাবেশ আছে, (বিষয়ে যেমন পুরুষ আর প্রকৃতি, আলো আর ছায়া ; ছবিতে যেমন শ্যেন-দৃষ্টি দুই চোখের একটিতে অন্ধকার, অন্যটিতে আলোক), সেগুলি ভাষার দিক থেকেও শক্তি সঞ্চয় করে শব্দরাজির খরস্পর্শতা আর ধ্বনি-স্পষ্টতা থেকে। খরস্পর্শতা আভাস দেয় গঠন বা অঙ্কনের দিক থেকে অসম্পূর্ণতার, ধ্বনির স্পষ্টতা নির্দ্দেশ করে সম্পূর্ণ রচনার রূপরেখা। বিষয় আর ছবির দ্বিত্ব এইভাবে ভাষার দ্বিত্বের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করে এককালীন একটা সমাপ্তি আর অসমাপ্তির পরিমণ্ডল। অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতার আভাসগুলির মধ্যে ধরা থাকে রচনার গোড়ার দিককার সীমানা আর সম্পূর্ণতা বা স্পষ্টতার নির্দ্দেশগুলির মধ্যে ফোটে রচনাশেষের আলেখ্য। রচনার আরম্ভে শিল্পীর সকল রসোপকরণ কিভাবে স্তূপীকৃত ছিল আর শেষে কোন আকৃতিতে পরিণতি লাভ করবে, দুই রসিকের রস-দৃষ্টিতে জাগে। এইখানে এসে যুক্ত হয় ছন্দের দ্বিত্ব ; একদিকে তার অবাধ আর স্থানে স্থানে রীতিমত দ্রুত গতি আর অন্যদিকে সেই গতির মধ্যে মাঝে মাঝে রূঢ় নির্ম্মম যতি। নীচে একটা উদাহরণ দিলুম :—

দুর্ভর দুর্যোগে ভরে গেল দশ-দিশ
দুর্দ্দিনের কুহেলিকা মাঝে,...

ভবিতব্যতায় পূর্ণ হ'ল।
মঙ্গল কলসখানি
প্রত্যাসন্ন প্রনষ্টের পরে
ক্ষণতরে ভেসে এসে
স্তিমিত প্রদীপ হেন সন্দর্ভ তাহার
গেল শেষ করি।
অমঙ্গল বিষ-কুম্ভ উঠিল ভাসিয়া
নিষ্প্রভ অতল হ'তে ;
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল সব
তন্দ্রীভূত তমসায় ভরি।

ছন্দের গতির ফলে অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণের দিকে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ধারাটিও অনুভব করা যায়। গোড়ার অবস্থা থেকে অর্দ্ধস্ফুট মধ্য অবস্থায়, আর তার থেকে সম্পূর্ণ আকৃতিতে পরিণতির একটা গতিরেখা যেন দৃষ্টিপটে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই প্রগতিবোধকে বাধা দেয় ছন্দের যতিগুলি। তখন যেন রচনার বিকাশের ধারা উজান পথে চলে। অর্থাৎ উপলব্ধি এক সম্পূর্ণ রসরূপের আশ্রয়ে বিরাম লাভ না করে' শেষ পর্য্যন্ত চঞ্চলই থাকে। তার বিবরণ হয়ে পড়ে অস্পষ্ট আর স্পষ্ট, অসমাপ্ত আর সমাপ্ত, অরূপ আর রূপ, এই দুই রাজ্যের সীমানার মধ্যে একটা অন্তহীন স্পন্দন।

কল্পান্তিকায় এই কাল আর গতির বোধই তার চিত্রধর্ম্মকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আমরা শুধু চিত্র দেখি না, চিত্রণও দেখি। দেখি যে শিল্পীর রেখার আঁচড় এখনও কাটা হচ্ছে, রঙ ফলানো এখনও চলেছে, অথচ সেই সঙ্গে সে দিয়ে চলেছে সমাপ্ত রচনার রসসংবাদ আর রূপ-পূর্ব্ব অবস্থার রূপে আত্মপ্রকাশ করবার যন্ত্রণাটুকুর আভাসও, পূর্ণের স্বপ্ন আর অসম্পূর্ণের স্মৃতি দুয়েরই রেশ বাজে তার প্রয়াসের ছন্দে ; ভূত আর ভবিষ্যৎ দুই জড়িয়ে আসে বর্ত্তমানে। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই গতিচঞ্চল চিত্রব্যঞ্জনা কল্পান্তিকার অভিনবত্ব। এর কবিতার পর কবিতায় যেমন রূপের মধ্যে থেকে অরূপের নির্দ্দেশ বা অরূপ থেকে রূপের জীবনলাভের কথা আছে, এর রচনাপদ্ধতিতেও তারই চলমান

প্রতিরূপ লক্ষ্য করি। এই কাব্যের ভাষাতেই বলতে গেলে যে শক্তি "রূপ-কল্প কল্পনার খেলা খেলে অবহেলে" সে আমাদেরও সে খেলার সাথী করে :—

কুজ্ঝটিকা পারে নিয়ে যায়
প্রদীপ্ত সে লোকে।
প্রজ্ঞাচক্ষু দেখিবারে পায়...
প্রচেতা প্রবুদ্ধ তারি বিস্ময়ের ছায়া
সাগরে গগনে ভরি কভু তারি মায়া
বিতত বিশাল রূপ-প্রতিবিম্ব আনে।

শ্রীনবেন্দু বসু

Letters from Iceland—by W. H. Auden and Louis Macneice (Faber)

সম্প্রতি অডেন্ ম্যাক্‌নীস্ স্পেণ্ডর প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের বিরুদ্ধে টম হ্যারিসন প্রমুখ কৃতবিদ্য সংখ্যানবিশ সমাজতাত্ত্বিকরা এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। সে আপত্তি সংক্ষেপে হচ্ছে এই : ঐ নবীন কবিরা নাকি জনসমুদ্রে হাবুডুবু খান না অর্থাৎ সমাজসত্তার চৈতন্য তাঁদের অস্থিমজ্জায় নেই। এবং যেহেতু ঐ চৈতন্য না থাকলে ঐতিহাসিক দৃষ্টি হয় না আর যখন উক্ত দৃষ্টি না থাকলে একদিকে মার্কস্-কথিত সমাচার প্রচার সম্ভব নয় এবং অন্যপক্ষে প্রগতিবিরোধী ট্রাজেডি উপলব্ধি করা যায় না, সেই কারণে এই নালিশে আমার মতো কবি-ভক্তদের মুস্কিল। এর আসান্ অবশ্য প্লেটোতে ; কিন্তু এই বুর্জোয়া কলহে সেই সম্ভ্রান্ত প্রাজ্ঞকে টান্‌তে সঙ্কোচ লাগে।

সম্পাদক মশায় এখানে গুঞ্জন করতে পারেন যে আলোচ্য পুস্তকে এসব কথা ওঠে কোথায়। কথাটা ঠিক। এ বই প্রধানত ভ্রমণ-কাহিণী, এতে মানচিত্র আছে, পথঘাটের বিবরণ আছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়েও প্রচুর খবর আছে। বারকয়েক ডার্বির টাকা জিতলে আমি যদি আইস্‌ল্যাণ্ড যাই, তাহলে বইটি আবার দেখব সন্দেহ নেই। আর আছে এতে মজার চিঠি, গদ্যে পদ্যে, মেয়েপুরুষকে, জীবিত মৃতকে। তাতে অন্তত অডেন সম্বন্ধে এত খবর পাই, যে ষ্ট্রেচি—লিটন অবশ্য, জন নয়—হলে আমি একটা জীবনী লিখতে

পারতুম। আমার কবিভক্তি অত্যন্ত হাস্যকর তুচ্ছতাচ্ছিল্যে তৃপ্তি পায়, তাই অডেনের বয়স, দৈর্ঘ্য, নখ-খাওয়ার অভ্যাস, রুচি, মতামত ইত্যাদি জেনে খুব খুসি হয়েছি। দেশকালপাত্রভেদ সত্ত্বেও একটা পরিচয় হল মনে হচ্ছে। আমার কাছে সে পরিচয় মূল্যবান ও মুখরোচক হলেও গভীর ব্যক্তিদের কাছে তা না হতে পারে। তাই এসব অংশের সারমর্ম দেবার লোভ সম্বরণ করছি।

আর আছে নাম করে' এবং নৈর্ব্যক্তিক ঠাট্টাতামাসা বা ব্যঙ্গ। কিন্তু তাতে এত বেশি ভালো মানুষী আর খামখেয়ালী মজা মেশানো যে আমাদের পরিচয়ের মতো গুরুগম্ভীর উচ্চকপালে কাগজে তার থেকে উদ্ধৃতি বা সারানুবাদ শোভন হবে কিনা বিবেচ্য। কলকাতায় স্কচ্ বণিকরাই তো দণ্ডধর আর কার্লাইল ইংরেজী ছেলেমানুষীতে ওস্তাদ ল্যাম্-কে না বলেছিলেন, তোৎলা পাঁঠা কোথাকার। তাছাড়া, বোধ হয় অডেনের ব্যঙ্গরস উইণ্ডহ্যাম লুইস্মার্গের স্যাটায়ার্ নয়, নৈর্ব্যক্তিক সুইফট্ জাতীয়ই—যদিও মৈত্রীর আভাসে এ ব্যঙ্গ আর মুখে তেতো স্বাদ রেখে যায় না, স্বাদ যদি রাখেই তো হয়তো চোকোলেটের স্বাদই রাখে, কোএকার-কীর্তি ক্রীম-চোকোলেটের বুঝি বা।

সে যাই হোক মুস্কিলে পড়েছি। মৃত্যুর মুখোমুখি হলেই নাকি সমাজ-চৈতন্য ঘুলিয়ে ওঠে, ফ্যাশিষ্টরা মাথা কামায়, সাম্যবাদের সঙ্কটে বাদীরা মাথা ঘামায়, এক শুধু লিবরাল্-রাই মর্ষণকাম ষ্টোইকধর্মে ভর দিয়ে বসে' থাকে। এবং মৃত্যুর সুর এই জীবনধর্মী কবিদের কাব্যেও প্রায়ই পাওয়া যায়। এমন কি এই বইতেও সোফোক্লিসমুগ্ধ ইয়েটস্-পন্থায় অডেনের ষ্ট্যান্জা চারেকের একটি কবিতা আছে, যার বিষয়ে হ্যারিসন তাঁর আপত্তি জানিয়েছেন। তার সংক্ষিপ্ততর শ্লোকটি পড়লেই পাঠক নিজে বিচার করতে পারবেন:

'O who can ever gaze his fill'
Farmer and fisherman say,
'On native shore and local hill,
Grudge aching limb or callous on the hand ?
Fathers, grandfathers stood upon this land,
And here the pilgrims from our loins shall stand.'
So farmer and fisherman say
In their fortunate heyday :
But Death's soft answer drifts across
Empty catch or harvest loss
Or an unlucky May.
The earth is an oyster with nothing inside it
Not to be born is the best for man
The end of toil is a bailiff's order
Throw down the mattock and dance while you can

বিশেষ করে' ঐ ধুয়াটি : Not to be born is the best for man যে মৃত্যুগামীর লক্ষণ, তা মানতেই হবে এবং মৃত্যু সমাজোত্তর, নিদেন সমাজেতর। স্পেণ্ডর্ এ বিষয়ে হ্যারিসনকে জবাব দিয়েছেন, স্পেনে মৃত্যুর সামনে মৃত্যুর সত্যতা নাকি স্বতঃসিদ্ধ। অডেনের একটি কবিতা স্পেনে যাওয়ার ফলে লেখা আর একটি গদ্য রচনাও এবং দুটিই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ জবাবেও মুখ বন্ধ নয়, এরা রিয়ালিটি-পিলাতক নিঃসন্দেহ। এ বইয়ে ম্যাক্নীসের একটি আলাপবাচক কবিতার ক লাইনে এ পলায়ন সপ্রমাণ। দুই কবির আলাপ হচ্ছে:

R. I come from an island, Ireland, a nation
Built upon violence and morose vendettas.
My diehard countrymen, like drayhorses,
Drag their ruin behind them.
Shooting straight in the cause of crooked thinking
Their greed is sugared with pretence of public spirit.
From all which I am an exile.
C. Yes, we are exiles,
Gad the world for comfort.
This Easter I was in Spain, before the Civil war ইত্যাদি
R. And so we came to Iceland,
C. Our latest joyride.

কিম্বা শেষের কবিতা, ম্যাক্নীসের Epilogue-এ দরজায় করাঘাতের দীর্ঘ প্রতীক্ষা এলিয়ট্কে মানালেও ম্যাক্নীস্কে মানায় কি?

বিষ্ণু দে

■

ডাকের চিঠি—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)।

আলোচ্য পুস্তকটি পশুপতিবাবুর কোনো বন্ধুকে লেখা কয়েকটি চিঠির সমষ্টি। বন্ধুর নাম বা পরিচয় বইটির মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। চিঠিগুলি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহের পত্রাবলী" বা "ছিন্নপত্র" ধরণের লেখা। নাগরিক সমাজের বহুদূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় লেখা এই চিঠিগুলির

মধ্যে লেখকের মানস-জীবন গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। কোনো না কোনো পল্লীগ্রাম থেকে এই চিঠিগুলি লেখা। সেইজন্য বোধ হয় লেখকের মানসিক পরিমণ্ডলে নৈসর্গিক বস্তু বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে কোথাও আড়ষ্ট ভাব দেখা যায় না। অতি সহজ ভাষায় পল্লীশ্রী ও গ্রাম্যজীবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে যে কোনো পাঠকই খুসী হবেন। চিঠিগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন লেখকের গায়ে নগরের আবহাওয়া কখনও লাগেনি। যে দৃঢ়তা থাকলে নাগরিক মনও তরল হয়ে গ্রাম্যজীবনে মেশে, সে দৃঢ়তা পশুপতিবাবুর আছে, এবং সেইজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কয়েকটি চিঠির মধ্যে গ্রাম্যজীবনের সাময়িক দু'একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে; সেগুলি পড়ে পাঠকেরা গল্পের স্বাদ পাবেন। লেখকের মতামত সম্বন্ধে সকলে হয়ত একমত নাও হতে পারেন, এমনকি কোনো কোনো স্থানে ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসের জন্য হয়ত অনেকেই খুসী হবেন না; কিন্তু এমন সরল আত্মবিশ্বাসের জোরে এই চিঠিগুলি লেখা যে, পাঠকের মন শেষ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। বলাই বাহুল্য যে, চিঠি বা ডায়েরীর মধ্যে সাহিত্যিক গুণ ছাড়াও লেখকের ব্যক্তিত্বের ওপর নজর পাঠকেরা কিছুমাত্র কম দেন না। এমনও দেখা গিয়েছে যে, আপাত দৃষ্টিতে ভাব বা ভাষার গড়ন এলোমেলো দেখা গেলেও নিছক ব্যক্তিত্বের দ্বারা কোনো কোনো ডায়েরী বা পত্রাবলী সাহিত্যপদবাচ্য হয়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে অসংলগ্ন ভাব যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি লেখকের ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে ওঠে না। পশুপতিবাবুর এই বিশেষত্বটুকু সব পাঠকেরই নজরে পড়বে।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তপ ও তাপ—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, নিউ বুক ষ্টল, মূল্য ১॥০
আলো আর আগুন—প্রবোধকুমার সান্যাল, ডি, এম্‌, লাইব্রেরী, মূল্য ১॥০
হংসবলাকা—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌, মূল্য ১॥০

কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে এক ভদ্রলোক, তাঁর শ্রীপুত্রকন্যা ও এক বিধবা শ্যালিকা নিয়া বাস করেন। শ্যালিকা বিভা বালবিধবা, সংসারের

কাজে ও সেবায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া যৌবন ও প্রণয়ের আবেগ কোনোমতে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময়ে গ্রামসম্পর্কীয় সমবয়স্ক ফার্ষ্ট-ইয়ারের ছাত্র একটি প্রিয়দর্শন তরুণের আবির্ভাব। তাহারই ফলে বিধবার নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি নিরাসক্তি, ভগিনীপতির ঈর্ষ্যা, ভগিনীকন্যার কৈশোরস্বপ্ন, তরুণের প্রথম যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অতি-আবশ্যিক ঘটনা-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। আত্মনিগ্রহ ও ভোগস্পৃহা, এ দুই প্রবৃত্তির ঘোরতর দ্বন্দ্বের ফলে রক্তধারায় প্রবাহিত জননীর সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠার আকস্মিক জয়, 'তপ ও তাপ' উপন্যাসের এই নাটকীয় পরিণতি। রাধাচরণবাবু এই নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারটিকে নিরুদ্ধ যৌনবোধ (যথা, বালবিধবার আঁচলে তরুণের দাড়ী-কামানোর রক্তস্পর্শ ও নিরালায় তাহারি আঘ্রাণ) ও মনস্তত্ত্বের প্যাঁচে ফেলিয়া বেশ খানিকটা ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন। গল্পের দিক্‌ হইতে বলিতে পারি, উপন্যাসখানিতে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিবোধ নাই। তপ ও তাপের মধ্যে, বিধবাটির তপের পরিচয় কিছুই পাইলাম না, তবে তাপ ফুটিয়াছে প্রচুর। ভাষার দিক্‌ হইতে খানিকটা আতিশয্য ও ভাবপ্রবণতা, খানিকটা ফেনায়িত বর্ণনার ভারে তাহার শ্রী ও সহজ, সরল গতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বইখানিতে খাপ্‌ছাড়া আড়ষ্ট ভাব, পুনরাবৃত্তি, ও প্রাদেশিক কথ্য ভাষার সঙ্গে অর্থহীন, কষ্ট-কল্পিত বিদগ্ধ বুলির অসুন্দর সংমিশ্রণ।

'তপ ও তাপের' সহিত প্রবোধকুমারের 'আলো আর আগুনের' নামগত সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহার বই আরো উচ্চাঙ্গের মেলোড্রামা। পাঠশেষে মনে হয়, এ আলোও নয়, আগুনও নয়, একেবারে বিশুদ্ধ দাবানল। জগতের কৃত্রিমতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ ও কশাঘাতের অধিকার অবশ্য সকল লেখকেরই আছে। কিন্তু অসংযত প্রলাপ পড়িবার ধৈর্য্য পাঠকের না থাকিতে পারে। এ বইতে মেলোড্রামার যাবতীয় উপাদান পাওয়া যাইবে। ইহাতে আছে অসামান্যা সুন্দরী, ধনিকন্যা, প্রেমবিদ্ধা নায়িকা, আর তাহার অপরূপ, উদ্ভ্রান্ত, শাপভ্রষ্ট দেবতার মত সরল সুন্দর প্রেমিক যাঁহার কার্য্যকলাপ সম্ভাব্যতার বাহিরে, আর আছেন নীরব, আত্মত্যাগিনী মহীয়সী জননী, আর লালসা, চটুলতা, কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের দলপতিগণ। আর আছে দুর্নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নায়কের অসংবদ্ধ প্রলাপ। এই সমাজ সম্বন্ধে লেখকের

যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সত্যও থাকে, তাহা হইলেও এতগুলি অসঙ্গত চিত্রের অরুচির সমাবেশ ঘটাইবার পূর্ব্বে লেখকের একবার ভাবা উচিত ছিল, পাঠকের স্কন্ধে তাঁহার সামাস্যসেবী রচনার এ নিদারুণ নিদর্শন সহিবে কি না।

পরিশেষে বক্তব্য—বইয়ের শেষ দৃশ্যটি একেবারে খাঁটি য়্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স্। মদমত্ত অধিকারে ডিনার-টেবিলে বাসন-ভাঙ্গাস্বরূপ গুণ্ডামি, গুপ্ত জন্মরহস্যের উন্মোচন, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণের অভাবনীয় সাক্ষ্য, আর আকস্মিক যুগল-মিলনে বইখানিকে সস্তা চিত্রনাট্যের সংস্করণ বলিয়া ভ্রম করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। তবে প্রবোধকুমার যে উত্তেজনারসের পরিবেশন করিয়াছেন, সেই অনুপাতে প্রবেশমূল্য আরো অনেক কম হওয়া উচিত ছিল।

তাপ আর আগুনের জ্বালা হইতে হংসবলাকার স্নিগ্ধ পরিবেশের সংস্পর্শে আসিয়া মন খুসী হইয়া ওঠে। এই বইখানির বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এইটুকু মাত্র বলিলেই চলে, যে ইহাতে সামঞ্জস্য-বোধ, শোভনতা ও সংযম আছে। গল্পে, চরিত্র-চিত্রণে, কথাবার্ত্তায় বেশ সহজ ও সংযত ভাব। স্কুলের আর সংবাদ পত্র অফিসের আবহাওয়া অতি পরিষ্কার ফুটিয়াছে আর প্রথম জীবনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সুরটুকুও স্বাভাবিক হইয়াছে। বিষয়-বস্তুর দিক্ দিয়া বইখানি বিভূতিভূষণের উপন্যাসে আদর্শবাদের সমধর্ম্মী, কিন্তু ভাষায় ও আখ্যানে সরোজকুমারের স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পিজনোচিত বাহুল্যবর্জ্জন চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৪৫

পরিচয়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

(বিবৃতি ও সংপূর্তি)

[১]

উপক্রম

১২৭৯ বঙ্গাব্দের শুভ ১লা বৈশাখ (ইং ১৪ই এপ্রেল, ১৮৭২) বাংলার সাহিত্য-পঞ্জীতে একটি সু-পুণ্য তিথি। ঐ দিন যুগ-প্রবর্তক 'বঙ্গদর্শনে'র জন্ম-দিন। চার বৎসর মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—তথাপি ঐ বর্ষ-চতুষ্টয় বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ।

'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বেও কয়েকখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রবর্তিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ঐ পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ছয় বৎসর ধরিয়া বেশ দক্ষতার সহিত ঐ পত্রিকা পরিচালন করিয়া ১৮৬০ সালে উহার সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ১৮৫৫ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা ও ১৮৫৬ সালে 'সর্বতত্ত্ববিকাশিকা' পত্রিকা প্রচার করিয়া বাংলা মাসিক সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রস্তুতই ছিলেন এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সংস্রব ত্যাগ করিলে কালীপ্রসন্ন সিংহ উহার

পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া* আট মাস ধরিয়া ঐ পত্রিকা প্রকাশ করেন। † তখনও 'বঙ্গদর্শন' ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে কোনও বাংলা মাসিকপত্র শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করিতে পারে নাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব। ইহার অন্যতম—হয়ত' মুখ্যতম কারণ এই ছিল যে, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ হইতে থাকে।

'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করিতেন—তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই :—

'যেমন কুলি-মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।' ‡

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র ক্ষেত্রে নানা খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। দর্শনধারা—যাহা সংপ্রতি আমার আলোচ্য—ঐ বিচিত্র ধারা-সমূহের অন্যতম ছিল।

'অনুশীলন'-গ্রন্থের এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আপন দার্শনিক প্রচেষ্টার কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য

* তদুপলক্ষে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন—'যিনি (ডাঃ রাজেন্দ্রলাল) বাঙ্গালি ভাষারে বিবিধ তত্ত্বালংকারে অলংকৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।' অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বঙ্গজননীর এই সুসন্তান (কালীপ্রসন্ন সিংহের) জীবনদীপ মাত্র ৩০ বৎসরে ১৮৭০ সালে নির্বাপিত হইয়াছিল।

† উল্লিখিত বিবরণ ১৩৪৪ সালের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

‡ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন।

পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।' ইত্যাদি

এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন-চিন্তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।*

ধর্ম দর্শনের অন্তরঙ্গ—অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই মনে করিতেন। তাঁহার প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ—'ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন'। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন—আদর্শ ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাঁহার নিজের কথায় বলি—'আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তার পর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়।' সেই জন্য 'ধর্মতত্ত্বে'র পর 'কৃষ্ণ চরিত্র'। 'ধর্মতত্ত্বে' যাহা তত্ত্বমাত্র, 'কৃষ্ণ চরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব এবং সম্পূর্ণ ধর্ম তাঁহাতেই আকারপ্রাপ্ত।

'ধর্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্মাধর্ম-জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না।' †

সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' ও পরে 'প্রচারে' নানা সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ অনেক পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ‡

* এই দার্শনিক চিন্তার কয়েকটি প্রাথমিক সুফল বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' 'জ্ঞান' 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র' 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাঁচ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ সাংখ্য দর্শন বিষয়ক নিবন্ধ। আমার বিশ্বাস সে যুগে উহাই বাংলায় প্রথম সাংখ্য মতের বিবৃতি। পরে ঐ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বিবৃতি জরতী (out of date) হইয়া যায় নাই।

† ধর্মতত্ত্ব—এয়োবিংশ অধ্যায়।

‡ ১২৭৯ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চার বৎসর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার পর এক বৎসর বঙ্গদর্শন বন্ধ থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শন' পাঁচ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। ঐ কয় বৎসরের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ প্রবন্ধ ও কয়েকখানি বিখ্যাত উপন্যাস (যথা,—চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীর কিয়দংশ) প্রকাশিত হয়। ১২৯১ শ্রাবণ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'প্রচার' ১২৯৫ চৈত্র পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ঐ 'প্রচারে' তাঁহার কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ এবং 'সীতারাম' উপন্যাস ও তৎকৃত 'গীতাভাষ্য' প্রকাশিত হয়। 'প্রচারের' সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'নবজীবন' নাম দিয়া এক মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ঐ 'নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'অনুশীলন তত্ত্বের' অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অতএব 'দার্শনিক' বঙ্কিমচন্দ্রকে জানিতে হইলে এবং তাঁহার ধার্মিক ও দার্শনিক মত বুঝিতে হইলে ঐ 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে'র নিবিষ্ট ও নিবিড় ভাবে আলোচনা করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য ঐরূপ আলোচনা করিয়া তবে 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রে'র বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধাবলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের বিবৃতি করিব এবং যে স্থলে তাঁহার মত অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ মনে হইবে, সেখানে তাহার সংপূর্তি করিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য সংস্তুতি (appreciation) মাত্র নয়—সমালোচনাও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিমাপ করিতে হইলে, তিনি যে বেষ্টনীর মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। পলাশির যুদ্ধের পর ৮১ বৎসর অতীত হইলে ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন, ১৮৩৮) এক পুণ্যতিথিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। ইতিমধ্যে বঙ্গ বিহার আসাম উড়িষ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে—অনেক বাদ-বিবাদ আপত্তি-বিপত্তির পর বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার ভূয়ঃ প্রচার হইয়াছে। রামমোহন-যুগে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ ও গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—তার পর এখন প্রায় প্রত্যেক জিলায় জেলা-স্কুল ও কোথাও কোথাও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (বঙ্কিমচন্দ্রের যখন বয়স ৬ বৎসর —তখন তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের ছাত্র হইয়াছিলেন—তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্)। সিপাহি মিউটিনির পর বর্ষে (বঙ্কিমচন্দ্রের তখন বয়ঃক্রম ২০ বৎসর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ঐ ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বদ্ধমূল হইল। ফলে ? পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিলোড়িত ও বিকৃত করিল। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত হইল—সে ভুলিয়া গেল সে ঋষি-সন্তান —প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী। 'দেশশুদ্ধ জোন্‌স্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইতে চলিল।'* অনেক বি এ, এম্ এ উৎপন্ন হইল বটে (বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি এ-গ্রাজুয়েট্), কিন্তু তাহারা Bachelors of Arts ও Masters of Arts না হইয়া

* বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধ।

(থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অল্‌কট সাহেবের ভাষায়) 'Bad Aryans' ও 'Mad Aryans'-এ পরিণত হইল। সে কালের মনোভাব বর্ণন করিয়া আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি :—

With the English-educated classes—with whom as the result of their contact with the West, materialism and atheism were the order of the day, who were profoundly ignorant of the majesty and grandeur of their own religion and who 'in their hourly increasing selfishness never seemed to remember that they had a mother, degraded, fallen down and trampled under the feet of all—but *still mother*'—to them Hinduism at that time appeared little better than a mass of superstitious practices and time-grown corruptions. Then again, not being the religion of the dominant race in India, it was the constant and convenient target for missionary ridicule.

এ সম্পর্কে বঙ্গিমচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন—'আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টামব্লারে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না।' স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহাকে আমরা 'Hindu Revival' বলি, তখনও সে প্রতিক্রিয়া সুরু হয় নাই। সেই জন্যই স্বদেশ-বৎসল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এই বলিয়া তীব্র পরিবাদ করিতে হইয়াছিল—

কতরূপ স্নেহ করি' দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

পাশ্চাত্য প্রভাবের আর একটি ফল দেখা দিয়াছিল ইংরেজি-শিক্ষিতদিগের দৈনন্দিন জীবনের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতায়। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' পুস্তিকায় এবং মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনে উহার নিখুঁত ফটো তুলিয়াছেন। মধুসূদনের নিজের জীবনই ঐ অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার জাজ্বল্য নিদর্শন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—'উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা (রিরংসা বলিলেই ভাল হয়) এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রন। * * সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।'

প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রও পাশ্চাত্য মোহমুক্ত ছিলেন না—কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ঐ মোহ অল্পদিনেই কাটিয়া গিয়াছিল। ১২৮৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহাকে লিখিতে দেখি :—

'দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজীতে শিক্ষিত, স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।'

সে যুগে মদ্যপান সভ্যতার পরিচায়ক ছিল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' (অষ্টম অধ্যায়) লিখিয়াছেন—'মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল—তাহারই বিঘ্নকর,—এ কথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।' এমনকি সেই হাক্‌স্লি-টিন্‌ডেল-এর জড়বাদ প্রভাবিত যুগে—যখন শিক্ষিত বাঙ্গালি শিখিতেছিল—There is a Here but no Hereafter * * In Matter is the only promise and potency of Life—সেই যুগে তিনি বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দীকে 'পোড়ার মুখী' বলিতে দ্বিধা করেন নাই।

'এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংসপূতিগন্ধশালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্ লোডার-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তৎসমুদায় ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না।' (ধর্মতত্ত্ব—সপ্তম অধ্যায়)

এই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঐ 'ধর্মতত্ত্বে' অন্যত্র লিখিতেছেন—

'মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তারপর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল * * জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা। অ-পরিণত বয়সে শিক্ষিতের প্রতি প্রযুক্ত কষাঘাত আরও তীব্রতর। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বৎসরে প্রকাশিত 'অনুকরণ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন :—

জগদীশ্বর-কৃপায় উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু জগতে দেখা দিয়াছে * * কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব 'নব্য বাঙ্গালী'-চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, গর্দ্দভ হইতে গর্জন—এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল উজ্জলকারী ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমুলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। * * গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালীও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্ররূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ-পূর্ব্বক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজসংস্কারের গাড়ীতে বিলাতী মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

এই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চাবুকের মত আমাদের মর্মে বাজে—কিন্তু অত্যুক্তি হইলেও উক্তিটি এ কালেও আমাদের প্রণিধান-যোগ্য নয় কি?

সে যুগে ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্যদিগের (যাঁহাদের Orientalists বলে) একাধিপত্য ছিল। তাঁহাদের কথায় ইহারা উঠিতেন বসিতেন। অবশ্য Orientalist-দিগের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা খুবই প্রশংসনীয়। Facts-এর সন্নিবেশে ও সমীকরণে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত —কিন্তু যখনই Theory-র ভূমিতে আরোহণ করেন, তখনই সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতে হয়—'সাধু! সাবধান'! এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের যেরূপ সতর্ক করিয়াছেন—তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহার 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য

বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন,—তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

উপক্রমে যাহা বলিবার আছে, সকল কথা বলা হইল না। অথচ ইতিমধ্যেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল। অতএব এখানেই উপসংহার করি। অন্যান্য কথা আগামী বারে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সোমলতা

(১৩)

সকালে সমবেত বৈষ্ণব-সজ্জনদের সামনে ছোট বাবাজি গৌরহরি ও তমাললতার মালা-বদলের কথা ঘোষণা করলেন। গৌরহরি নম্রভাবে সকলকে নমস্কার জানালে এবং ছোট বাবাজির পায়ের ধুলা নিলে। বৈষ্ণবেরা এই শুভ সংবাদে আনন্দে হরিধ্বনি ক'রে উঠল। তাদের কলরবে আখড়া মুখর হয়ে উঠল।

কিন্তু কলরবের মাত্রাটা বৈষ্ণবী মহলেই যেন বেশী। ঘরের মধ্যে নীরবে তমাললতা ছিল ব'সে। তারা সেইখানে গিয়ে তাকে আক্রমণ করলে। কেউ তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, কেউ তার ব্রীড়াবনত মুখখানি তুলে দেখে। বেচারা স্বল্পভাষিণী তমাললতা বিব্রত হয়ে উঠল।

এমনি ভাবে সকালের পালা শেষ হ'ল। জনে জনে ছোট বাবাজি ও গৌরহরির কাছে বিদায় নিয়ে গেল। পুরুষবর্গ গৌরহরিকে এবং স্ত্রীবর্গ তমাললতাকে জানিয়ে গেল, ভয় নেই আবার তারা আসছে,—তাদের মালা-বদলের সময়। সেদিন তারা এর চেয়েও বেশী বিরক্ত ক'রে যাবে। তারও আর দেরী নেই। বৈশাখের আর ক'টা দিনই বা আছে?

এমনি ক'রে তারা হাসতে হাসতে বিদায় নিয়ে গেল। একটি দিনের মহোৎসব সুখস্বপ্নের মতো ফুরিয়ে গেল। গৌরহরি কারো ঝুলি, কারো লাঠি হাতে নিয়ে খানিক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। তমালতাকেও বৈষ্ণবীদের বিদায় দেবার জন্যে হাসি মুখে বাইরে এসে দাঁড়াতে হ'ল।

কেবল ললিতা এক পাশে কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে নিঃঝুম ব'সে রইল। আসন্ন বিবাহের গৌরবে উজ্জ্বল গৌরহরি ও তমাললতার পাশে তার নিষ্প্রভ মূর্ত্তি বড় একটা কারো চোখেই পড়ল না।

যার পড়ল সে একবার এসে জিজ্ঞাসা করলে, অমন ক'রে ব'সে যে ভাই?

—শরীরটা ভালো লাগছে না।

—শরীরের আর দোষ কি? যে খাটুনিটা ক'দিন ধ'রে খাটলে।

ললিতা বিনয় প্রকাশের জন্যেও তার প্রতিবাদ জানালে না। নিঃশব্দে চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে রইল।

—আজ আসি ভাই। আবার আসা তোমার দাদার বিয়ের দিনে। সেদিন মনের খেদ মিটিয়ে তোমাদের জ্বালাতন ক'রে যাব।

ললিতা ম্লান হাস্যে তাতে সম্মতি জানালে।

একটি দিনের গান-বাজনা-কোলাহলে মুখর আখড়া অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন ক্লান্ত হয়ে প্রভাত-রৌদ্রে ঝিমুচ্ছে। এখন যেন জোরে কথা বলতে ভয় হয়।

তমাললতা ছোট বাবাজিকে এসে জানালে, আহ্নিকের জায়গা হয়েছে।

তিনি আহ্নিক করতে গেলেন।

তমাললতা আদেশের অপেক্ষায় নিঃশব্দে এসে ললিতার কাছে দাঁড়াল। ললিতা কিন্তু চোখ মেলেও চাইলে না।

মৃদুকণ্ঠে তমাললতা জিজ্ঞাসা করলে, শরীরটা কি খুব খারাপ করছে?

ললিতা ক্লান্তভাবে চোখ মেলে চাইলে। দেখলে, তমাললতা এরই মধ্যে কখন স্নান সেরে এসেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর গেরো দিয়ে বাঁধা। তারই এক পাশ দিয়ে মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়েছে। সদ্যস্নাত মসৃণ দেহ যেন সূর্য্যের আলোয় চিকমিক করছে। গত দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি যেন আর একটা নতুনতর সুষমা এনেছে। ললিতা মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখলে, হ্যাঁ, মেয়েটি সুন্দরী বটে!

বললে, কেমন যেন ভালো লাগছে না।

তমাললতা বললে, স্নান ক'রে এসে একটু সরবৎ খাও। শরীরটা সুস্থ হবে।

ললিতা বললে, তাই যাই।

—কি রান্না হবে?

—যা হয় কিছু কর।

তমাললতা ভাঁড়ারে তরকারী কি আছে দেখতে গেল।

পাকা কথার আকস্মিকতার আঘাতে ললিতা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সে এমন ভাবেনি! গৌরহরি এবং বিনোদিনীর তাসের ঘর যে একদিন ভাঙবে

তা সে জানত। কিন্তু জানত বিনোদিনীর দিক দিয়ে ভাঙবে। সে ঘরণী-গৃহিণী, ছেলের মা। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, স্বামীর ঘরে ফিরতে তাকে একদিন হবেই। দু'দিনের খেলার অবসান হবে তখন। এ কথা জানত না,—কোনোদিন ভাবতেও পারেনি,—যে, গৌরহরিই খেলা ভেঙে দেবে। কেন এমন হ'ল? কেন এমন হয়? যে গৌরহরি বিনোদিনীর একটুখানি সস্নেহ দৃষ্টির বিনিময়ে না করতে পারত এমন কাজ নেই (ললিতা তো সবই জানে), সেই গৌরহরি কি ক'রে এমন নিষ্ঠুর হতে পারল?

এই রকম একটা সম্ভাবনার আভাস রসময় দিয়েছিল বটে। ব'লেছিল, গৌরহরি শিকল কেটে পালাবার তালে আছে। কিন্তু ললিতা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। ব'লেছিল, পালালেই হ'ল! দাদার বড় সাধ্যি! তবে আমি আছি কি করতে?

সে তো আজও আছে! তারই সুমুখেই তো পাকা কথা হয়ে গেল! কী করতে পারলে সে!

ললিতা আর ভাবতে পারে না। আস্তে আস্তে উঠে গামছা কাঁধে নিয়ে স্নান করতে গেল।

ছোট বাবাজির আহ্নিক শেষ হ'লে তমাললতা এসে তাঁর জলখাবারের জায়গা ক'রে দিলে। একখানা শালপাতায় কিছু ফল আর একটা পাথর বাটিতে মিছরীর সরবৎ নিয়ে এল। এবং অদূরে বসল।

ছোট বাবাজি বুঝলেন, ওর কিছু বলবার আছে।

সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর তমালমণি?

তমাললতা মুখ নীচু ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কবে যাব?

কোথায়? আখড়ায়? কি ক'রে যাই? গৌরহরি কিছুতে ছাড়ে না যে!

তমাললতা ঝঙ্কার দিয়ে বললে, ছাড়ে না বললেই থাকতে হবে? সে হবে না।

—তা তো বুঝি। কিন্তু এই একবার যাব, আবার ক'দিন পরে আসব। এত হাঁটা হাঁটি কি এই বুড়ো হাড়ে সয় দিদি?

তমাললতা বললে, খুব সইবে। আমার কিন্তু অত দিন থাকতে লজ্জা করবে।

ছোট বাবাজি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, তা তো করবে। কিন্তু বিয়ের পরে যে আরও অনেক বেশী দিন থাকতে হবে, তখন লজ্জা করবে না?

ভ্রূকুটি হেনে তমাললতা বললে, যান।

এমন সময় ললিতা স্নান ক'রে এসে ভিজে কাপড়েই ঘরের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে দেখলে, কে কথা কইছে। তারপর ও ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে।

তমাললতাও তাড়াতাড়ি উঠল। ললিতার জন্যে সরবৎ ভিজতে দিয়েছে। সেটুকু ছেঁকে ও ঘরে নিয়ে গেল।

ললিতার মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ আছে। তমাললতার ইচ্ছা করে তার কাছে ঘুরতে, তার সঙ্গে দুটো কথা কইতে। কিন্তু পারে না। প্রথমত সে নিজেই লাজুক এবং স্বল্পভাষিণী। দ্বিতীয়ত ললিতা সর্ব্বত্র হেসে খেলে বেড়ালেও তাকে যেন কেমন আমল দিতে চায় না। সেজন্যে তার ভারি দুঃখ হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

তমাললতাকে দেখে ললিতা বললে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওইখানে নামিয়ে রেখে দিয়ে যাও। আহ্নিক ক'রে খাব।

তমাললতা এক কোণে সরবতের বাটিটা নামিয়ে রেখে তবু দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে বললে, তোমার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দোব?

—দাও। এই ঘরে।

তমাললতা এই ঘরে তার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।

আহ্নিক শেষ ক'রে সরবৎটুকু খেয়ে ললিতা সেইখানেই নির্জ্জীবের মতো ব'সে রইল। তমাললতা তাকে সেই অবস্থায় দেখে ফিরে যাচ্ছিল।

ললিতা ওকে জিজ্ঞাসা করলে, কি?

—রান্নার কি হবে?

—বললাম তো, ভাঁড়ারে যা আছে তাই দিয়ে যা হোক কিছু কর।

ওর কণ্ঠস্বরের বিরক্তি লক্ষ্য ক'রে তমাললতা আর কিছু বললে না, চ'লে গেল। আসল কথা মহোৎসবের পরে ঝুড়িতে তরকারী যা প'ড়ে আছে সে

কিছুই নয়। তা দিয়ে এই ক'জন লোকেরও চলবে না। সেই কথাটাই সে বারে বারে বলতে আসছিল। কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারল না।

এমন সময় বীরদর্পে গৌরহরি এল। তার আঁচলে কতকগুলো ঝিঙে, বেগুন, আরও যেন কি। আর ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড বড় কুমড়ো।

বললে, কিছুতেই নোব না, শিবদাসও ছাড়বে না। শেষ পর্য্যন্ত দিলে এই কুমড়োটা গছিয়ে। আর তার মা জোর ক'রে আঁচলে এইগুলো সব বেঁধে দিলে। আচ্ছা যা হোক!

রান্নাঘরে নিরিবিলি তমাললতাকে দেখে উৎসাহের আধিক্যে কি একটা রসিকতাও করতে যাচ্ছিল। এমন সময় দৃষ্টি পড়ল দ্বারপ্রান্তে ললিতার উপর। সে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

ললিতা তাকে ইসারায় ডাকলে।

গৌরহরি কাছে এসে বললে, কি?

—আস্তে কথা বল। এ সব কি কথা?

—কোন সব? গৌরহরি সভয়ে চারি দিকে চেয়ে বললে, আমি জানি না তো।

—তুমি জান না? তোমাকে না জানিয়েই বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গৌরহরি শুধু বললে, ও।

—কেন এমন করলে?

গৌরহরি যেন একটু একটু তৈরি হচ্ছিল। বললে, তা একটা ঘর-সংসার পাততে হবে তো। তোরাই তো তখন কত বলতিস্!

—যখন বলতাম তখন তো পাতনি। এখন কেন?

গৌরহরি হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, তখনও যা এখনও তাই। এক সময় হ'লেই হ'ল!

রাগে ললিতার আপাদ মস্তক জ্বালা ক'রে উঠল। অন্য জায়গা হ'লে সে কেঁদে-কেটে, চেঁচিয়ে অনর্থ করত। কিন্তু পাশের ঘরে ছোট বাবাজি রয়েছেন, রান্নাঘরে তমাললতা।

উদ্যত রোষ যথাসাধ্য সংযত ক'রে ললিতা বললে, তা'হলে আর তোমাকে বলবার কিছু নেই। তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব ব'লে কিছুই নেই।

গৌরহরি এ তিরস্কার গায়ে না মেখে বললে, আচ্ছা, তা নেই তো নেই। রসময় কোথায়?

—চলে গেছে।

—সে কি! আমাকে একবার ব'লে গেল না? কোথায় গেল?

—জানি না।

—বেশ কাণ্ড! তোকেও তাহ'লে ব'লে যায়নি!

ললিতা সে কথার জবাব দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, এঁরা কতদিন এখানে অধিষ্ঠান করবেন? বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত?

এবার যেন গৌরহরি বিরক্ত হ'ল। বললে, কেন? থাকলেই বা ক্ষতি কি?

—আর বিয়ের পরে তো ওদেরই ঘর-সংসার, তখন তো থাকবেই।

ললিতা ঈর্ষার সঙ্গে হাসলে।

বিরক্ত এবং বিব্রত ভাবে গৌরহরি বললে, আস্তে।

—আস্তেই তো বলছি। ভয় নেই, আমি কাউকে তাড়াচ্ছি না। তাড়াবই বা কিসের জোরে? আজ যদি মা থাকতো।

ললিতা আঁচলে চোখ মুছলে।

গৌরহরি দেখলে বেগতিক। এখানে আর বেশী ক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা, আচ্ছা। কাঁদিস না। আমি অন্য সময় সব কথা বুঝিয়ে বলব, তখন বুঝতে পারবি।

ব'লেই আর সে তিলার্দ্ধও দাঁড়াল না।

ললিতাকে নিয়ে গৌরহরির উৎকণ্ঠার আর সীমা রইল না। যা খাম-খেয়ালী মেয়ে, অতিথিদের অপমান ক'রে বসাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এখন অবশ্য নিঃশব্দে দম ধ'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কখন যে কি করে ঠিক কি। ভরসার মধ্যে এইটুকু যে, ছোট বাবাজি রয়েছেন। ললিতা যেমনই মেয়ে হোক, তাঁর সামনে অশোভন কিছু করতে বোধ হয় সাহস করবে না।

ললিতার চেয়েও তার বেশী ভয় বিনোদিনীকে। গত রাত্রে তার যে দুঃসাহসী রূপ দেখেছে তাতে ভয় আরও বেড়েছে। লোকলজ্জা, ভয়-ভাবনা ব'লে কিছুই

যেন তার নেই। ওর জন্যে গৌরহরির দুঃখ হয়, রাগও হয়। ভুল-ত্রুটি মানুষের হয়। গৌরহরিও অনেক ভুলই করেছে। কিন্তু বিনোদিনীকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যে ভুল ক'রেছে তার সীমা নেই।

নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে গৌরহরি অবাক হয়ে যায়। এই বিনোদিনীর জন্যে সে ঘর ছেড়েছে, সংসার ছেড়েছে, দেশে দেশে বিরাগী হয়ে বেড়িয়েছে। সত্য। কিন্তু এমনি বিধাতার বিড়ম্বনা, তখন তাকে শত সাধ্য-সাধনাতেও পেলে না। পেলে তখন, যখন বিনোদিনীর সম্বন্ধে তার আকর্ষণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। অথচ এর জন্যে দায়ী তো সে নিজেই!

ললিতার ভয়ে গৌরহরি ঘরে চোরের মত ঘোরে। কে জানে এ সংবাদ বিনোদিনীর কানেও পৌঁছেছে কি না। সে রাস্তায় বেরুতেও সাহস পায় না; পাছে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তার মন দূরে বাইরে পালাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারও উপায় নেই। ঘরে অতিথি।

এমনি তার মনের অবস্থা। ঘরে ললিতা, বাইরে বিনোদিনী। এমন হয়েছে যে, তমাললতার চোখে চোখ পড়লেও সে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তাকেও সে এড়িয়ে চলে।

সেদিন সকাল থেকেই গৌরহরির শরীরটা খারাপ করছিল। বোধ হয় গত কয়েক দিনের পরিশ্রমের ফলেই। কিন্তু ততখানি গ্রাহ্য করল না। সকালে আর ভিক্ষায় বার হ'ল না বটে, কিন্তু স্নানও ক'রে এল, দুটি ভাতও খেলে। ভাত খাবার তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রান্না ক'রেছে ললিতা। শরীর অসুখের কথা জানতে পারলে সে একটা অযথা হট্টগোল বাধাবে। বিশেষ ক'রে তার ভয়েই সে স্নানাহার করলে।

ফলে, দুপুর বেলায় মাথাটা ভার বোধ হল। গায়ে ব্যথাও করতে লাগল। গৌরহরি ও পাড়ার দাবার আড্ডায় না গিয়ে নিজের ঘরে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

শেষ ফাল্গুনের মধ্যাহ্ন মনকে কেমন যেন উদাস ক'রে দেয়। দিবানিদ্রা গৌরহরির অভ্যাস নেই। স্বল্লান্ধকার স্নিগ্ধ ঘরে শুয়ে শুয়ে পৃথিবীর এই ঔদাস্য সে উপভোগ করছিল। মন তার ঘুরে বেড়াচ্ছিল কোন অনির্দ্দেশ্য লোকে।

অকস্মাৎ ঘরে যেন একটু আলো এল। কে যেন অত্যন্ত-সন্তর্পণে দরজা

একটু ফাঁক করলে। গৌরহরি চেয়ে দেখলে, তমাললতা। দেখেই আবার চোখ বন্ধ করলে।

ও জেগে আছে দেখে তমাললতা ঘরের মধ্যে ঢুকল। দরজার পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখলে গৌরহরি চোখ মেললে না, তখন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি শরীর খারাপ করছে ?

ভয়ে ভয়ে গৌরহরি বললে, না।

তমাললতা হেসে বললে, মিথ্যে কথা ? খেতে ব'সে যখন তুমি খেতে পারলে না, তখন তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, শরীর ভালো নয়। তারপর যখন দেখলাম, দাবা খেলতে গেলে না তখন বুঝলাম, ঠিকই।

গৌরহরি এই প্রথম ওকে এমন সুন্দর হাসতে দেখলে। বললে, না, ঠিক খারাপ নয়। কেবল মাথাটা ধ'রেছে, গায়েও কেমন বেদনা হচ্ছে।

—জ্বর হয়নি তো ?

—না বোধ হয়।

তমাললতা দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, ললিতা কোথায় ?

—বেড়াতে গেছে।

—ছোট বাবাজি ?

—ঘুমুচ্ছেন।

গৌরহরি আর কিছু বললে না। ক্লান্তি ভরে চোখ বন্ধ করলে।

তমাললতা একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, মাথাটা একটু টিপে দোব ?

—থাক।

তমাললতা ছেলেমানুষ হলেও 'থাক'-এর অর্থ বুঝতে ভুল করলে না। ওর শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বললে, না, জ্বর নয়। একটু ঘুমোও, তাহ'লেই মাথা ছেড়ে যাবে।

—কে বললে ?

—আমি জানি। মাঝে মাঝে আমারও মাথা ধরে কি না। ঘুমুলেই ছেড়ে যায়।

গৌরহরি মনে মনে হাসছিল। বললে, তোমার নরম মাথা, সহজেই ছেড়ে যায়।

তমাললতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, হ্যাঁ, খুব নরম। একেবারে তুল তুল করছে !

ওর স্বচ্ছন্দ হাস্যে এবং সস্নেহ স্পর্শে গৌরহরির মন অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলেও এই স্বল্পবাক্ মেয়েটির স্নেহ সম্বন্ধে কোনোদিন সে সুনিশ্চিত ছিল না। ছোট বাবাজির আখড়ায় অথবা এখানে এত দেখাশোনা এত কথাবার্তার মধ্যেও কোনো দিন তার কাছে সে প্রশ্রয় পায়নি। সমস্ত সময় যেন কেমন একটা দূরত্ব রেখে চলত। ওর মনটিকে এই স্বল্পান্ধকারে যেমন পরিষ্কার দেখতে পেলে এমন দেখা ইতিপূর্ব্বে কখনও তার ভাগ্যে ঘটেনি। সুখ-সৌভাগ্যের আঢ্যতায় সে বিহ্বল হ'য়ে উঠল।

ওর একখানি হাত গৌরহরি নিজের চোখের উপর রাখলে।

তমাললতা চমকে বললে, তোমার চোখ গরম কত !

—হুঁ। এইবারে ঠাণ্ডা হ'ল।

তমাললতা লজ্জিতভাবে চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ গৌরহরি মাথা তুলে বললে, কেউ যদি এই সময় আমাদের দেখে ফেলে তমাললতা ?

তমাললতা লজ্জিত হাস্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, তোমার লজ্জা করবে না ?

—তা তো করবেই।

—তবে এলে যে ! কোনো দিন তো আসনি ?

—তোমার যে শরীর খারাপ। না এসে করি কি ?

ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে গৌরহরি মিটি মিটি হাসতে লাগল।

তাতে তমাললতা বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, অমন ক'রে হাসছ কেন ? তাহ'লে কিন্তু আমি চ'লে যাব।

—আচ্ছা, আর হাসব না। চুপ করলাম।

তমাললতা ধমক দিয়ে বললে, চুপ করলে শুধু হবে না। তোমার মাথা ধ'রেছে ঘুমোও।

—ঘুম আসছে না যে।

—মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি তাতেও ঘুম আসছে না ?

গম্ভীরভাবে গৌরহরি বললে, বোধ হয় তাতেই ঘুম আসছে না।

—তাহ'লে আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে যাই। কি বল ?

—তাহ'লে তো আরোই ঘুম আসবে না।

চিন্তিতভাবে তমাললতা বললে, তাহ'লে কি ক'রলে ঘুম আসবে ?

—মনে হচ্ছে কিছুতেই না। তার চেয়ে বরং তুমি ব'সে থাক, দুজনে গল্প করি।

এত ক্ষণে তমাললতা ওর চালাকি বুঝতে পেরে হেসে ফেললে। বললে, উঃ। কি চালাক।

গৌরহরি ওর কোলে মাথা রাখলে। তমাললতা বাধা দিলে না। শুধু একবার বললে, যদি কেউ এসে পড়ে ?

গৌরহরি নির্ব্বিকার চিত্তে বললে, এলেই বা।

তমাললতা আর কিছু বললে না। বোধ হয় মনে-মনে তাতে সায়ই দিলে।

(১৪)

ললিতা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দুপুর বেলায় বিনোদিনীর কাছে এল। তাকে তার মুখ দেখাতেই লজ্জা করছিল। কিন্তু বিনোদিনীকে দেখে অনেকখানি আশ্বস্ত হ'ল। বুঝলে, এখনও কথাটা বিনোদিনীর কানে এসে পৌছয়নি।

বিনোদিনী ঘরের মেঝেয় আঁচল পেতে আলস্যভরে শুয়েছিল। ললিতা বাড়ীতে আর জনমানবের সাড়া পেলে না। বোধ হয় বেড়াতে গেছে। কেবল আতাগাছের ছায়ায় খেলাপাতির ভাত রেঁধে মেনী পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের খাওয়াচ্ছিল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোর মা কোথায় রে মেনী ?

মেনীর তখন সাড়া দেবার ফুরসুৎ ছিল না। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের ভিতর থেকে ডাকলে, এই যে, এই ঘরে আয়।

বিনোদিনী বললে, এই যে, ললিতা ঠাকরুণ। দুপুর বেলায় কি মনে ক'রে ? রসময়কে কোথায় রেখে এলি ?

—কেন ? তাকে কি আমি দিনরাত আঁচলে বেঁধে বেড়াই না কি ?

—তাই তো বেড়াস।

—মরণ আর কি।

বিনোদিনী আবার জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় সে ?

—চ'লে গেছে।

—আর তুই রইলি যে ?

ললিতা এবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল :

—ওরে বাবা। মোটে তো ক'দিন এসেছি, এরই মধ্যে আমাকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিস ?

বিনোদিনী হেসে বললে, হয়েছিই তো। তোকে আমার একটুও ভালো লাগে না। তুই গেলে যেন বাঁচি।

অন্য সময় হ'লে ললিতা ছেড়ে কথা কইত না। হয়তো 'দারুণ ননদিনী' গানটা অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাইত। কিন্তু এখন আর সে রসিকতা করতে পারলে না।

শুধু বললে, যাব দেখ্ তো।

—দেখব তো নিশ্চয়ই। বুঝেছি, দাদার বিয়ে না দেখে আর যাচ্ছিস না।

ললিতার মুখ অকস্মাৎ শুকিয়ে গেল। বললে, তুইও শুনেছিস ?

বিনোদিনী জোরে জোরে হেসে উঠল। বললে, এইখান থেকে এইটুকু, তা আর শুনব না ? আমি কি কানে তুলো দিয়ে থাকি না কি ?

ললিতা কিছু বললে না। শুধু বিস্মিতভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে এসেছিল, বিনোদিনীকে সান্ত্বনা দিতে, গৌরহরির সঙ্গে তার যে কলহ হয়েছে তা বিবৃত করতে এবং সম্ভব হ'লে কি ভাবে এই বিয়ে ভাঙা যায় তার যুক্তি করতে। কিন্তু এই তো বিনোদিনী। তার সঙ্গে কি যুক্তি করবে ?

শুষ্ককণ্ঠে ললিতা বললে, দাদার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—কেন ? অসুবিধাটা কি হচ্ছে ?

ললিতা চুপ ক'রে রইল। সে কিছুতে বুঝতে পারছে না, বিনোদিনীর চোখের সামনে কি ক'রে গৌরহরি আর একজনকে বিবাহ করতে পারছে। হৃদয়ের কথা ছেড়ে দিলেও একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে।

কিন্তু কথাটা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে। বললে, তোর কি দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?

বিনোদিনী বুঝতে পারলে কেন এ প্রশ্ন সে করছে। হেসে বললে, ঝগড়া হবে কেন ?

—তবে ?

—কি তবে ? কেন বিয়ে করছে ? তাও বুঝতে পারছিস না ?

—না।

পরম গম্ভীর ভাবে বিনোদিনী বললে, ওরে বোকা, তমাললতার মতো সুন্দরী যুবতী মেয়েকে তোর দাদা তো দাদা, সাবধানে থাকিস, রসময়ই না বিয়ে ক'রে পালায়।

ললিতা হেসে ফেললে। বললে, যা ব'লেছিস। বিশ্বাস নেই কাউকেই।

ললিতা ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। কঠিন মুখভাব। স্বামীগৃহ থেকে পালিয়ে আসার পরে যে বিনোদিনীকে দেখেছিল, এ সেই বিনোদিনী। এই সত্যিকারের বিনোদিনী। কঠিন অথচ সহজ এবং স্বাভাবিক।

জিজ্ঞাসা করলে, তুই কি করবি ভেবেছিস ?

—আমি ? কি আর করব ? বোষ্টমের বিয়ে, গিয়ে যে পাতা পেড়ে দু'খানা লুচি খেয়ে আসব তারও উপায় নেই। তুই সেই গানটা গা তো ললিতা,—'আন সখি, ভখিমু গরল।'

ললিতা শিউরে উঠল। তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। ধমক দিয়ে বললে, ও সব আবার কি কথা।

—তবে কোন গান গাইবি,—'আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া' ?

ললিতা ও কথা কানেই তুলল না। বললে, বিনোদিনী, তোর হাবল-মেনীর কথা ভাবছিস না ?

ক্লান্তস্বরে বিনোদিনী বললে, ওদের কথাই তো ভাবছি সারাদিন।

—তুই স্বামীর ঘরেই ফিরে যা বিনোদিনী।

বিনোদিনী স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। সে এক আশ্চর্য্য দৃষ্টি। তার মধ্যে আছে ক্রোধ, আছে হতাশা,—এক সঙ্গে আছে বিদ্রোহ এবং আত্মসমর্পণ। ললিতা ভয়ে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলে।

বিনোদিনী বললে, স্বামীর ঘরে, না সতীনের ঘরে ?

—এখনও তো বিয়ে হয়নি।

—হয়নি, হবে।

—না হ'তেও পারে, ভেঙে যেতেও পারে।

বিনোদিনী ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল। বললে, সে কথাও ভেবেছি, হাবল-মেনীর মুখ চেয়ে। কিন্তু কি হবে গিয়ে ? আর কি সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধতে পারব ?

—কেন পারবি না ? তোর ঘর, তোর বাড়ী,

বিনোদিনী অত্যন্ত ম্লানভাবে হাসলে। বললে, তোরা ঘর বাঁধিস না, কি আনন্দে যে ঘর বাঁধে তাও জানিস না। আমার কথা তুই বুঝতে পারবি না।

কিন্তু ললিতা বুঝতে পারলে। বুঝলে হারাণের উপর ওর আর মন নেই। বললে, কিন্তু এত দিন তো বেঁধেছিলি ?

—হুঁ। কি ক'রে বেঁধেছিলাম, তাই ভেবে অবাক হই।

ললিতা চুপ ক'রে রইল। প্রশ্নটা একটু কঠিন। জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারলে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকতেও পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, হারাণকে কি কোনো দিনই তুই ভালোবাসিস নি ?

উদাসভাবে বিনোদিনী বললে, কি জানি ! ঠিক বুঝতে পারি না।

একটু পরে বললে, একদণ্ড আমাদের বনত না। রোজ ঝগড়া হ'ত। কেন হ'ত তাও জানি না। আমাদের ঝগড়ার চোটে পাড়ার লোকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কথায় কথায় ঝগড়া। কিন্তু ভালোবাসতাম কি না কিছুতেই বুঝতে পারি না। আগে অনেক দিন এ সব ভাবতাম, এখন আর ভাবি না। কি হবে ভেবে ?

বেলা প'ড়ে আসছিল।

হাবল গরু নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে এসে হৈ চৈ আরম্ভ ক'রে দিলে। যাবার সময় চোঙায় ক'রে তেল সে নিয়ে গিয়েছিল। মাঠ থেকে স্নান সেরেই ফিরেছে। বিনোদিনী তাকে ভাত দিতে গেল। ললিতাও উঠল।

ফেরবার পথে ললিতাও ওই একটা কথাই ভাবতে ভাবতে এল। 'ঠিক বুঝতে পারি না'। ঠিক বোঝা যায়ও না। ললিতার নিজেরই এমনি হয়। তারাপদ এল, চলে গেল। তার সতৃষ্ণ নয়নে অনেক কথা জমে ছিল। অথচ একটা কথাও কইবার সময় পেলে না। ললিতা বুঝলে। বুঝে দুঃখও পেলে। কিন্তু যখনই ভাবে তারাপদকে সে সত্য সত্যই ভালোবেসেছে কি না, তখনই কেমন সব গুলিয়ে যায়। কিছুতে ঠিক বুঝতে পারে না।

তারাপদ এলে সে খুশী হয়। তার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে। ওর চোখে যেন যাদু আছে। ওকে তার অদেয় কিছুই নেই। তারাপদ চ'লে গেলে মনে হয় ললিতার জীবনযাত্রায় কোথায় যেন ফাঁক পড়ল। সবই হয়। তবু ভালোবাসে কি না ঠিক বুঝতে পারে না।

অথচ রসময়ের বেলা তো এমন হয় না? রসময় কাছে থাকলেও সে অনেক সময় জানতে পারে না, দূরে গেলেও বিরহবেদনায় কাতর হয় না। তার সঙ্গে কথা বলাও একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। থেকে এবং না থেকে তার সমস্ত সত্তাকে সে যেন ঘিরে রেখেছে। যেমন ক'রে এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে আকাশ। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে মেঘমায়া অনির্ব্বচনীয়তার রঙীন আনন্দ নিয়ে। কিন্তু নিস্তরঙ্গ আকাশ আছেই। তাকে বাদ দিয়ে সে নিজেকে কল্পনা করতে পারে না।

এমন ক'রে ভাববার ক্ষমতা ললিতার অবশ্য নেই। কিন্তু অস্পষ্টভাবে এমনি একটা কিছু সে মনে মনে উপলব্ধি করতে গিয়ে অবশেষে হতাশ হয়ে ভাবছিল, ঠিক বোঝা যায় না।

ঠিক বোঝা যায় না,—কিছুতেই ঠিক বোঝা যায় না। বুঝতে গিয়ে কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। মানুষের কাছে তার নিজের মনের চেয়ে অপরিচিত আর কিছুই নেই। তার শেষ পর্য্যন্ত নজর চলে না। কেবল অস্পষ্ট অনুভব করা যায়। কেবল কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না,—এবং কিছুই ঠিক বোঝা যায় না।

ললিতা বুঝে দেখলে, এমনিই হয়। বিনোদিনীর এমনি হয়েছে, তার নিজের এমনি হয়েছে,—এবং কে জানে, হয়তো গৌরহরিরও এমনি হয়েছে।

গৌরহরির কথা মনে হতেই সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কিছুমাত্র অসম্ভব

নয়। হয় সে বিনোদিনীকে ভালোবাসত না, কিন্তু সে কথা জানতে পারেনি। নয় সে কি করতে যাচ্ছে জানে না। এমন হয়। হওয়া খুবই সম্ভব। গৌরহরির পক্ষেও। এ দোষ তার নিজেরও নয়। আসল কথা, ঠিক কিছুই বোঝা যায় না।

এই কথাটা ভাবতে গিয়েই ললিতার মন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। বুঝলে গৌরহরির দোষ নেই। তার উপর রাগ করা মিথ্যা। তমাললতার উপর তো নয়ই। সে ছেলেমানুষ, সে কি করবে? ছোট বাবাজি যা করবেন তার উপর তার বলবার কিছু নেই। ছোট বাবাজিই বা কি করবেন? তমাললতা পিতৃমাতৃহীন বিধবা। তাঁরও বয়স হয়ে আসছে। কখন আছেন, কখন নেই। তার আগে তমাললতার একটা ব্যবস্থাও তো ক'রে যেতে হবে।

ললিতা তৎক্ষণাৎ ওদের ক্ষমা ক'রে ফেললে। ওদের উপর রাগ করার জন্যে মনে মনে লজ্জিতও হ'ল। না, না, ওদের কোনো দোষ নেই। কারও কোনো দোষ নেই! এমনিই হয়,—হয় ঝোঁকের উপর, না ভেবে-চিন্তেই। বেচারা বিনোদিনী! এ তার ভাগ্যলিপি।

ললিতার মনে পড়ল রসময়কে। সে যে কি করছে, কবে ফিরবে কে জানে! সে থাকলে ভালো হ'ত। মানুষকে তার মতো এমন সহজে বুঝতে আর কেউ পারে না। কোনো কথা শুনলেই তার অর্দ্ধেকটা সে উচ্ছ্বসিত হাস্যেই দেয় উড়িয়ে, আর বাকি অর্দ্ধেকটা প্রফুল্লচিত্তে স্বচ্ছন্দভাবেই নেয় মেনে।

রসময় থাকলে ভালো হত। কবে যে সে ফিরবে কে জানে।

ললিতা রসময়ের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ী পৌঁছুল। গিয়ে দেখে বাড়ীতে জনমনুষ্য নেই। ও ঘরে ছোট বাবাজি নিদ্রা যাচ্ছেন, এ ঘরে বোধ হয় দাদা। কিন্তু তমাললতা গেল কোথায়? বোধ হয় ঘাটে, কিম্বা পাশের বাড়ীতে।

ললিতা দাওয়ায় ব'সে সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ ক'রে গাইতে লাগল। একটু পরে দরজায় খুট ক'রে শব্দ হতেই পিছন ফিরে দেখে তমাললতা।

দরজা আধ-খোলাই ছিল। তমাললতা বেরিয়ে আসতে গিয়ে ললিতাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গৌরহরি ঘুমিয়ে প'ড়েছে। তার মাথায় হাত

বুলিয়ে দিতে দিতে তমাললতাও কখন দেওয়ালে ঠেস দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। গৌরহরির মাথা তার কোলের উপর। কে জানে ললিতা দেখেছে কি না।

ওকে দেখে ললিতা খুশীর সঙ্গে বললে, তুই ঘরে ঘুমুচ্ছিলি নাকি? আমি এসে দেখি, জনমনিষ্যির সাড়া নেই। ভাবছিলাম, আর একটা চক্কর দিয়ে আসব নাকি? আয়, আয়, এদিকে আয়।

লজ্জাজড়িত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই ললিতা হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিয়ে নিজের পাশে বসালে।

বললে, দাদা কি তাহ'লে পাশা খেলতে গেছে? তার শরীরটা খারাপ মনে হ'ল যেন।

তমাললতা মুখ নামিয়ে বললে, হুঁ।

—তবে আবার পাশা খেলতে যাওয়ার দরকারটা কি ছিল?

অনেক ইতস্ততঃ ক'রে তমাললতা অস্ফুটস্বরে বললে, পাশা খেলতে যায়নি।

—যায়নি? তবে?

—মাথায় খুব যন্ত্রনা হচ্ছিল। ঘরে ঘুমুচ্ছে।

—ঘরে? এই ঘরে?—ললিতার চোখ কৌতুকে নেচে উঠল।

তমাললতা উত্তর দিতে পারলে না। তার মাথা লজ্জায় কোলের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

ললিতা ওর লজ্জানত মুখের দিকে চেয়ে খুব কৌতুক বোধ করলে। বললে, আর তুই কি করছিলি? মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলি? বল্ না।

ললিতা ওর মুখখানা জোর ক'রে তুলে ধরলে। বাধ্য হয়ে তমাললতাকে ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হ'ল।

অসহ্য আনন্দে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ললিতা বলতে লাগল, কিন্তু অমনি ক'রে দরজা খুলে রাখে? যদি কেউ হঠাৎ এসে পড়ত।

ললিতার কাছ থেকে এমন আদর তমাললতা এই প্রথম পেলে। আবেশে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। সে নিঃশব্দে তার বুকে মাথা রেখে পড়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বাংলা ও ইংরাজী*

আমরা আজকাল বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী আরম্ভ করিয়া, এবং গণিত ইতিহাস প্রভৃতিও আজন্ম পরিচিত মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে দুর্গম ইংরাজীর সাহায্যে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া যে অনর্থক সময় ও শক্তি নষ্ট করি একথা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। রাজভাষা হিসাবে ইংরাজীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। কিন্তু দুই শ্রেণীর লোকেরই তাহা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন; সাধারণের, এমনকি পাণ্ডিত্যাভিমানীরও পক্ষে, সে প্রয়োজনের অস্তিত্বাভাব। ঐ দুই শ্রেণীর লোক রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক নেতা। ইহাদিগকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আসিতে হয়। উকিল ও রাজন্যসভার সদস্য,—এই দুই দলও ঐরূপ সম্পর্কে আসেন, কিন্তু রাজা সেখানে দেশী ভাষায় কথা বলিবার অধিকার দিয়াছেন। আমরা যদি জানিয়া শুনিয়াও পিঠের বোঝা ভারীই করিতে চাই তাহা হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? ফলে নেতা ও রাজপুরুষেরই বিশেষ ভাবে ইংরাজী জানা প্রয়োজন। ইংরাজী জানা দেশী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিবার জন্যই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন,—নতুবা নিরস্ত্র পরাধীন জাতির সম্মুখে ইউরোপীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিত্র হাজির করিয়া দিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আজকাল সরকারের আর সেরূপ কর্ম্মচারীর অভাব নাই; বরং ইংরাজী শিখিয়া ফেলার পুরস্কার স্বরূপ লোকে সরকারী চাকরীর দাবী করিতেছে বলিয়া সরকার এই শিক্ষার অতিবিস্তৃতিকে কিছু সঙ্কুচিত করিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। নেতৃদলে সরকারের প্রয়োজন না থাকিলেও স্বাধীনতা-শিক্ষাপূর্ণ বিদ্যালাভ করিয়া দেশের লোক কিছু চঞ্চল হইয়া উঠায় তাহাদের এই নেতৃদলে প্রয়োজন হইয়াছে, এবং ভাল মন্দ যেমন ভাবেই হউক তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, এবং যতই সময় যাইবে সম্ভবতঃ ততই অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিয়া তাঁহারা জাতীয় প্রতিনিধির ও

* এ প্রবন্ধ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইহার বিষয়বস্তু আজও পুরাতন হয় নাই, বরং বাংলা ভাষা প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীর শিক্ষার বাহনরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় প্রসঙ্গটির আবেদন সম্প্রতি আরো বাড়িয়াছে—পঃ সঃ।

অন্বর্থনামা জাতীয় অধিনায়কের আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইংরাজীতে কথা বলা, চোটপাট করিয়া জবাব দেওয়া বা ক্ষিপ্রতার সহিত হুকুম তামিল ও অভাবে বিনীত উত্তর প্রদান করার প্রয়োজন ঐ দুই দলেরই। তাঁহারাও অধিক বয়সে ইংরাজী আরম্ভ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজীতে অশিক্ষিতপ্রায় ব্যক্তিও বুড়া বয়সে বিলাত গিয়া অনর্গল ইংরাজী বলিতে শিখিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং সেটি বড় অধিক ব্যাপার নহে। আর ইংরাজ জাতটিও ঠিক্ বক্তৃতায় ভুলিবার জাতি নহে; তাহারা ব্যবসাদারের জাত, কাজ বুঝে; ভিতরকার রহস্যোদ্ভেদ করিয়া যদি দুইটা কথা বলিতে পার তাহাও ঐরূপ জাতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে, কিন্তু দীর্ঘচ্ছন্দ সহস্র বক্তৃতা দ্বারাও কিছু হইবে না। ইংরাজ জাতি এত সংযমী ও কার্য্যাভিজ্ঞ না হইলে শতাব্দী পূর্ব্বে French Revolution-এর সময়, ও আজ Bolshevism-এর দিনে কোন মতেই constitution বজায় রাখিতে পারিত না,—এবং অবস্থাভিজ্ঞ বলিয়াই মুসলমান ও আইরিশের শত আবদার ও সহস্র উৎপাত উপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ধীরতাই জাতটির প্রধান গুণ; বক্তৃতায় তাহাদিগকে বা তাহাদের প্রতিনিধি-গণকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা দুরাশা। যে সমস্ত উকিল সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য তাঁহারাও শ্রেষ্ঠ বক্তা নহেন, সূক্ষ্ম তার্কিক মাত্র; তবে পণ্ডিত লোক বলিয়া বক্তৃতা কার্য্যেও তাঁহারা অনভিজ্ঞ নহেন। সুরেন্দ্রবাবু বা বিপিন পালের মত বক্তা দুর্লভ, কিন্তু আদালতে কি তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেন? আজকাল জিতেনবাবু খুব বক্তা, কিন্তু তিনি কি উকীল হিসাবে খুব বড়? আর বক্তৃতা যদি প্রয়োজনই হয় তাহা যে ইংরাজীতেই অভ্যাস করিতে হইবে তাহা কে বলিল? সুরেন্দ্রবাবু কোন দিন বাংলায় বলেন নাই,—স্বদেশীর যুগে এক দিনেই তিনি বাংলায় বাগ্মী হইয়া উঠিলেন। ইহার উল্টা দৃশ্যও অসম্ভব নহে বরং অধিক সম্ভব। যাঁহারা আজীবন বাংলায় বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের যদি ইংরাজীতে দখল ও শব্দসম্পদ থাকে তাহা হইলে তাঁহারাও অনায়াসে বা অল্পায়াসে ইংরাজী বক্তা হইতে পারেন। সেজন্য শৈশব হইতে হাতে খড়ির প্রয়োজন নাই। তবে বাঙ্গালীর ছেলেকে Athenian-এর মত বাগ্মী করিয়া তোলাই যদি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় তবে অবশ্য art হিসাবে তাহাকে উপযুক্ত বয়সে বক্তৃতা কার্য্যে শিক্ষিত করা যাইতে পারে, অবশ্য বাংলায়। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য হিসাবে

ইংরাজী পড়াশুনা খুবই থাকিবে, তাহা হইলেই প্রয়োজনমত যথাসময়ে তাহারা ইংরাজী বাগ্মিতায় কৃতিত্ব লাভ করিবে। রাজপুরুষ, রাজার যাঁহারা বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র,—রাজা যতদিন ইংরাজীতে হিসাবপত্র রাখা, report করা ও minute লেখার প্রথা বাহাল রাখিবেন (স্বায়ত্তশাসনে এই period কমান যাইতেও পারে) ততদিন তাঁহাদিগকে সেই হুকুম তামিল করিতেই হইবে। তাঁহারা ইংরাজী শিখুন, আমরা আপত্তি করিব না, আর তাঁহাদের কাছে দেশের প্রত্যাশাও কম; বিদেশীর অধীন হইলেও পরায়ত্ত শাসন-প্রণালীর মধ্যে থাকিলে দেশের স্বার্থ ও রাজার স্বার্থ নানা কারণে এক থাকিতে পায় না। সুতরাং দেখা গেল দেশসেবার অজুহাতে যে ইংরাজী শিক্ষার উপরে অত্যধিক জোর দেওয়া হয় তাহা অনেকটা ভিত্তিহীন। আর যদি বাগ্মিতা হিসাবে আশৈশব ইংরাজী চেষ্টার প্রয়োজনও স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ভাব ও চিন্তার গভীরতার দিক হইতে বক্তার যে ক্ষতি হয় বাগ্মিতা দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবার কোন উপায়ই থাকে না। ইংরাজের মত জাতির নিকট ত তাহা ব্যর্থ হইবারই কথা, বাঙ্গালীর মত ভাবপ্রবণ জাতির নিকটও তাহা ব্যর্থ হয়—সঙ্গে সঙ্গে না হউক দুই পাঁচ দিন পরে হয়। জাতীয় জাগরণের বিগত বন্যার সময় জাতির কর্ণধার বাগ্মিদল না হইয়া কাজের লোক হইলে ভাল হইত,—তাঁহারা যদি দেশকে ডাক মাত্র দিয়া কাজের লোকদের হাতে চালন-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক অবসর গ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও ক্ষতি হইত না; গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের চমক দেখিয়া যদি প্রদীপ ও দেশলাইটা হাত করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই নির্ব্বিঘ্ন যাত্রার সম্বল আহরণ করা হয়, নতুবা বিদ্যুৎ চমক দিয়াই পলায়ন করে, সহজ চক্ষুকেও কিছু পীড়িত করিয়া যায়। ফলও তাহাই হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ নির্ভরযোগ্য common sense ও experience-এর অভাব। গড়নের কাঠ বা মাটি ভাল হওয়া চাই, তারপর তাহাকে দেশী বা বিলাতী যেমন ইচ্ছা ও পছন্দ সেইরূপ আকার প্রদান করিতে কষ্ট হইবে না, কিন্তু আসলে গলদ থাকিলে চলিবে না। আমাদের এই ইংরাজী ভাষাশ্রিত শিক্ষার প্রধান দোষই এই গোড়ায় গলদ, আমরা তোতা পাখীর মত অনেক বুলি শিখি, ভাব শিখি না—কথা শিখি, কাজ শিখি না। আমাদের মধ্যে R. N. Mukerji প্রভৃতি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহাদের কেহই আগে কথা

শিখিয়া কাজ শিখেন নাই,—কাজ করিতে গিয়া কথা শিখিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমরা এতই তারতম্য-জ্ঞানশূন্য যে বস্তুর দিকে লক্ষ্য নাই—লক্ষ্য খালি তাহার পরিচয়ের দিকে। হইবারই কথা—বস্তু যাহার নাই সে পরিচয় ছাড়া আর কি দিবে? রূপ যাহার নাই অলঙ্কারই তাহার ভরসা। আমরাও সেইরূপ অবাস্তবের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছি; খুব বক্তৃতা দিয়া ভাবিলাম কেল্লা ফতে হইল,—কিন্তু ফতে হয় কেবল নিজের বাড়ীর জলখাবার।

এই অবাস্তবের দায় হইতে নিষ্কৃতির এক প্রধান উপায় মাতৃভাষার কারবার। বাঙ্গালী খুব শৈশবেই পড়ে—The horse is a noble animal। কিন্তু ইহার যে ঠিক অর্থবোধ তাহার শৈশবে হইবার উপায় নাই তাহা রবিবাবু দেখাইয়াছেন, অথচ ছেলেরা ঐরূপ sentence খুব ব্যবহার করিতে শিখে। এইরূপ ভাবশূন্য ভাষায় তাহারা শৈশবেই অভ্যস্ত হয়। এই জন্য ভূদেববাবু যতক্ষণ না কোন বিজাতীয় বাক্যকে বাংলায় তর্জ্জমা করিতে পারিতেন (অন্ততঃ মনে মনে) ততক্ষণ তিনি ঐ বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি অবশ্য শৈশবেই ইংরাজী বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন, তবে সুখের বিষয় ছিল তিনি জাতীয় ভাবের ভাবুক এক মহা পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন; এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ তর্জ্জমার রোগ ছাড়িতে পারেন নাই,—কাজেই তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধাদি গ্রন্থ অমর হইয়া আছে। ত্রিবেদী মহাশয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াও বাংলায় বক্তৃতা দিতেন, এজন্যই তাঁহার অধ্যাপনা এত হৃদয়গ্রাহী হইত। বঙ্কিমবাবু কি করিতেন ঠিক জানি না, তবে অতি বাল্যকাল হইতেই যে মানসী ও ললিতায় হাত পাকাইতেছিলেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। কে বলিবে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির ও সাহিত্য চক্রবর্ত্তিত্বের সহিত এই বাল্য অভ্যাসের সম্বন্ধ নাই? জাতীয় ভাষায় ভাব প্রকাশের চেষ্টা যে ভাবটিকে ভালরূপে আয়ত্ত করিবার উপায় তাহা অন্য প্রকারেও বুঝা যায়। যত বড় বড় বিজাতীয় কথাই বলা যাক্ না কেন সেই সব কথার উপযোগী বা অনুরূপ জাতীয় শব্দ যদি না থাকে তাহা হইলে ভাববোধের অসুবিধা, চাই কি তাহা অসম্ভবই হইয়া পড়ে। বিজাতীয় একটি কথায় হয়ত এমন ভাব নিহিত থাকিতে পারে যাহা জাতীয় অনেকগুলি ভাবের সমবায়ে উৎপন্ন; এই সমস্ত complex idea অন্য-দেশী শিশুর পক্ষে দুরূহ বা অসম্ভব ত বটেই, বয়োবৃদ্ধের পক্ষেও ঠিক সহজ নহে।

নিজ ভাষায় প্রথমে অনুরূপ ভাবের সহিত পরিচয় ও বিজাতীয় ভাষায় complex ভাবটির সহিত অত্যন্ত পরিচয়ে অবশেষে একটি ঠিক ধারণা জন্মিয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে কথাটি ধ্বনি মাত্র থাকে। এইরূপ বহু ধ্বনির সংযোগে একটা কিছু বাস্তব ভাব গড়িয়া তোলা আর অনেকগুলি শূন্যের সাহায্যে একটি রাশি লিখিবার চেষ্টা করা দুইই সমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিকে বিজাতীয় ভাবকে আত্মস্থ করিয়া তাহা নিজ ভাষায় প্রকাশ করা যেমন দুরূহ, নিজের ভাবও বিজাতীয় ভাষায় প্রকাশ করা সেইরূপই দুরূহ। মাইকেলের ইংরাজী কবিতা ও Milton-এর গ্রীক রচনা জীবিত আছে কি? অথচ তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ ভাষায় অমর কবি। এ সমস্ত ঘটনা কি নিতান্তই আকস্মিক,—ইহার মূলে কি কোন নিগূঢ় সত্য নিহিত নাই? মাইকেল ও Milton নিজ নিজ ভাষায় কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের সময়ে তাঁহাদের ভাষায় সাহিত্যসম্পদই বা কত ছিল? হয়ত সেই সম্পদের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা বহুসম্পদশালী বিদেশী ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন। বাস্তবিক Milton-এর মত Classical Scholar ইংলণ্ডে বিরল,—মাইকেলের মতও ইংরাজী Scholar ভারতবর্ষে বিরল। কিন্তু কই বিদেশী ভাষায় ত তাঁহাদের প্রতিভাস্ফুর্ত্তি হইল না? সেই হীনসম্পদ অবজ্ঞাত মাতৃভাষাই ত শেষে তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিল! আসল কথা এই যে প্রাণের কথা প্রাণদাত্রী জননীর ভাষাতেই ব্যক্ত হয়, অন্যত্র তাহার প্রকাশ নাই। প্রতিভা একটা সত্য অবলম্বনের অপেক্ষা করে, বিদেশী ভাষার মধ্যে সে অবলম্বন নাই; এইজন্যই রসানুবাদ এত দুরূহ। ভাষার অধীনতাও কম অধীনতা নহে। তাহাতে ক্ষতিও কম হয় না। জর্ম্মন জাতি য়েনা যুদ্ধের পূর্ব্বেও যাহা ছিল পরেও তাহাই ছিল; কিন্তু উভয় যুগের জর্ম্মনের মধ্যে কত তফাৎ! সমসাময়িক সাহিত্যে মাত্র এই পরিবর্ত্তনের মূল নিরূপণ করা যায়। রাজনৈতিক কারণে জর্ম্মন রাষ্ট্রগুলির একীকরণ ও এক প্রচণ্ড কেন্দ্রীয় শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু জর্ম্মনীর আত্মিক মুক্তি, দীর্ঘসুপ্ত শক্তিগুলির উন্মেষ, সাহিত্যিক কারণেই হইয়াছিল। এই কারণ রাজনৈতিক হইলে জাগরণ যুগে ইতালির আত্মিক উন্মেষ হইতে পারিত না; Dante, Boccaccio, Petrarch, Michael Angelo, Raphael, Machiavelli, Lorenzo de Medici, Galileo এই যুগের সৃষ্টি; তখন কিন্তু

ইতালীর রাজনৈতিক অবস্থা মোটেই উন্নত ছিল না। এইরূপ প্রতিভাবিকাশ যদি দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে দুই বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে, এবং যদি দেখা যায় যে উভয়ত্রই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি আছে,—কিন্তু রাজনৈতিক উন্নতি উভয়ত্র নাই, তাহা হইলে প্রতিভাবিকাশের সহিত জাতীয় সাহিত্যেরই সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এবং যেটি পূর্ব্বগামী তাহাকেই কারণ ও যেটি পরগামী সেইটিকেই কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত হয়। এই হিসাবে জাতীয় সাহিত্যকে প্রতিভা বিকাশের কারণ বলা চলে, বিশেষতঃ যদি দেখা যায় সেই সাহিত্য পূর্ব্বে ছিল না। ঘটনাও তাই ;—অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্ম্মনীর জাতীয় সাহিত্য ছিল না, মাতৃভাষাকে জর্ম্মনগণ বর্ব্বরোচিত বোধ করিয়া ফরাসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করিতেন, Frederick the Great এই কারণেই Voltaire-কে আশ্রয় দিতে গিয়াছিলেন এবং নিজেও ফরাসী কবিতায় হাতেখড়ি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে জর্ম্মনীর প্রতিভাবিকাশ হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে জর্ম্মন পণ্ডিতগণ জাতীয় দুর্গতির অবসান কামনায় জাতীয় সাহিত্যের উপাসনা আরম্ভ করিলেন। গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, কবিতা সকলই মাতৃভাষায় আলোচিত হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক সুবিপুল জর্ম্মন সাহিত্যের সৃষ্টি করিল, এবং সমস্ত জর্ম্মনীকে প্রতিভায় ও পরাক্রমে অপরাজেয় করিয়া তুলিল।

জাতীয় জীবনে ইহাই যদি জাতীয় সাহিত্যের কীর্ত্তি হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত জীবনে সে সাহিত্যের কি কোন প্রভাবই নাই? বিদেশীর নিকট ভাষা ধার করিয়া, সুতরাং বিদেশীরই পক্ষে যাহা স্বাভাবিক এইরূপ ভাব ধার করিয়া যে নির্জীব সাহিত্য চলিতেছিল, মাতৃভাষার অমৃতস্পর্শে যদি তাহা মুঞ্জরিত হইয়া এক বিরাট অপূর্ব্ব মহীরুহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যক্তিগত শিক্ষার কাজ ও নিষ্ফলতা দূর করিতে হইলে মাতৃভাষাদত্ত শিক্ষার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বিজাতীয় সাহিত্য জাতীয় ও ব্যক্তিগত উভয়বিধ জীবনেই তুল্যরূপে অনিষ্টকারী। বাংলাদেশে ইংরাজী সম্বন্ধে এরূপ বিরুদ্ধ ধারণা হয়ত কেহই পোষণ করিতে রাজী হইবেন না, কিন্তু তথাপি তাহা সত্য কথা, ইংরাজীও আমাদিগকে খর্ব্ব করিয়াছে। বৈষ্ণবযুগের গৌড়ীয় জাগরণ ও তুকারাম যুগের মহারাষ্ট্রীয় জাগরণ এখানে স্মরণীয়। সকলে

বলিবেন বৈষ্ণবের রাসলীলা ও তুকারামের অভঙ্গ লইয়া আমরা ত বেশ ঘুমাইয়াই ছিলাম,—তাঁহাদের জাগরণ ত আমাদের চিরনিদ্রারই কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় যে ইংরাজী শিক্ষা আসিয়া আমাদের কাল নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিল, বিজিত হইলেও আমাদিগকে দৃপ্তচক্ষে বিজেতার দিকে তাকাইতে শিক্ষা দিল, সেই ইংরাজীর নিন্দা? কথাটা একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যুগ-ভেদে প্রতিভার বিকাশভেদ হয়, ধর্ম্মের যুগে যে প্রতিভা কেবল জাতির অভাবের কথা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল যুদ্ধের সময় হয়ত সেই লেখনী হইতেই অনলবর্ষণ হইত। খঞ্জ টার্শিয়াম এইরূপেই পিলোপনেশ্যান সৈনিকগণকে রণজয়ী করিয়াছিলেন। আরও এক কথা, প্রতিভা ও প্রতিভার বিকাশক্ষেত্র এক নহে। আজকালকার যুদ্ধ-জাহাজের তুলনায় হয়ত ড্রেকের জাহাজ পানসী; নেলসনের জাহাজ গাধাবোট মাত্র; তাহা বলিয়া জর্ম্মন-বিজয়ী জেলিকো সাহেবকে ড্রেক-নেলসনের পুজনীয় বলিতে পারিব না। হ্যানিবল বিনা কামানে যুদ্ধ করিলেও তাঁহাকেই স্থলযোদ্ধৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রতিভার বিচারে ক্ষেত্র ও উপাদান যেমন গণনীয় নহে, জাগরণের প্রকৃতি বিচারেও সেইরূপ গর্জ্জনের অংশটুকু সযত্নে বাদ দিতে হইবে। তাহা বাদ দিলে, বিদ্যাপতির বংশীর সহিত হেমচন্দ্রের শিঙ্গার তফাৎ অল্পই থাকে, যাহা থাকে তাহা বংশীর দিকেই পড়ে। অবশ্য ইংরাজী ভাষার নিকট বঙ্গীয় প্রতিভা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কতটুকু? নেপোলিয়ানের নিকট জর্ম্মন প্রতিভা যতটুকু, উদীয়মান হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় মিশনরির নিকট যতটুকু,—রোগী বিষৌষধের নিকট যতটুকু। জগন্নাথের মত নৈয়ায়িক, রামমোহনের মত কর্ম্মী, গঙ্গাধরের মত কবিরাজের জননী হইলেও বঙ্গমাতা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাস্তবিকই মুমূর্ষু-দশাপন্ন হইয়াছিলেন। এমন সময় ইংরাজী ভাষা রামমোহনের মত ছাত্রের নিকট আসিয়া রাজনৈতিক মুক্তির সমাচার ও ইঙ্গিত দিয়া গেল। নেপোলিয়ান জর্ম্মনীর পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ ধ্বংসলীলার অভিনয় করিয়া জর্ম্মনীকে বুঝাইয়া দিল তাহার দুর্ব্বলতা কতদূর। মিশনরী আসিয়া হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মকে নাড়া দিয়া তাহাকে প্রবল আঘাতে বুঝাইয়া দিল তাহার দুর্ব্বলতা কোথায়। এইখানেই সংবাদদাতৃগণের সহিত সংবাদগ্রহীতার সম্বন্ধ শেষ। জর্ম্মনী নেপোলিয়ানকে বক্ষের হাড় করিয়া রাখে নাই; হিন্দুধর্ম্মও মিশনরীর পদে ধূল্যবলুণ্ঠিত

হইতেছে না ; ইংরাজী ভাষার সহিত ও বঙ্গীয় মুমূর্ষু প্রতিভার সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার তীব্র বিষে সেই মুমূর্ষু দেহে তাপ-সঞ্চার ও অবশেষে স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছে ; এখন আর বিষকে পথ্যবোধে সেবনীয় ভাবিলে চলিবে না ; যিনি ভাবিবেন তিনি মরিবেন, যাঁহারা ভাবিতেছেন তাঁহারা মরিতেছেন, মুখে তাঁহারা যতই ইংরাজী বুকনী দিয়া আপনাদের উন্নতিশীলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করুন না ; যাঁহারা সুস্থ অতন্দ্রিত তাঁহারা ঐ সমস্ত বিলাতী বুলিকে বিকারগ্রস্তের প্রলাপ বলিয়া মনে করিতেছেন, রোগ সারিলেই সহজ বুলি ও সহজ ভাব ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। ফল কথা ইংরাজী ভাষার নিকট আমাদের প্রভূত ঋণ এই যে ঐ ভাষা আমাদিগকে রাজনৈতিক জীবন বলিয়া নূতন জীবনের সন্ধান দিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে এক সমাজজীবন ছাড়া আর কিছুর ধার ধারতাম না ; রাজনৈতিক আবিষ্কারের উন্মাদনা আমাদিগের অনভ্যস্ত মণ্ডলীমধ্যে তীব্র মদিরার ন্যায় কাজ করিতেছে, অনেককে মাতাইতেছে, বহু লোককে কুপথেও লইয়া গিয়াছে। এই উগ্র চেতনাকে অবলম্বন করিয়া নানাদিকে আমাদের কর্ম্মশীলতার চর্চ্চা হইতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে উক্ত রাজনৈতিক মূল হইতে আমরা রাজনৈতিক প্রেরণা ছাড়া আর নূতন বড় কিছু পাই নাই। ওকালতী, স্থাপত্য-কার্য্য, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা সকলই বাংলায় ছিল। আজকাল কেবল এগুলির পাশ্চাত্য ভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আকারে নূতন হইলেও আসলে ইহারা নূতন নহে। রাজনীতির নূতন ক্ষেত্রেই আমরা আপনাদের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া সচেতন ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছি ; দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ জর্ম্মনীর মত (জর্ম্মনীর অনুকরণে কিনা জানি না) জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই ক্ষুদ্রতার অপনোদনে যত্নবান হইয়াছেন, সেই সাহিত্যেই আমাদের সচেতন দেহে অমৃত পথ্য, এখন আর মুমূর্ষু দেহোচিত বিষচর্য্যায় প্রয়োজনাভাব।

এই যে নূতন চেতনা আমরা লাভ করিয়াছি তাহারও প্রকৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাহা অভাবমূলক (negative) নহে ভাবমূলক (positive), দৈন্যময় নহে, শক্তিময়। এ চেতনায় কেবল আমরা বলিতেছিনা যে আমরা অতি দীন, আমাদিগকে কিছু দাও। যাঁহারা সেরূপ ভাবিতেছেন তাঁহারা

বাস্তবিকই দীন, এবং দীনোচিত ভিক্ষালাভেও তাঁহারা বঞ্চিত না হইতে পারেন। কিন্তু এই নবযুগের যাঁহারা তাপস, তাঁহারা ইংরাজীর কষ্টিপাথরেই আপন ঘরের তৈজস পত্র কষিয়া লইয়া দেখিয়াছেন যে সে তৈজস খাঁটি সোনা, আমরা দীন নহি ধনবান, আমরা ভিক্ষুক নহি দাতা। আমাদের ন্যায় সভ্যতা কাহার ? আমাদের ন্যায় দর্শন ও ভাষাবিজ্ঞান কাহার ? জ্ঞান কোথায় এরূপ অখণ্ডতা-প্রয়াসী ? আমাদের ন্যায় উদার ধর্ম্ম কোথায় ? স্বদেশী বিদেশী সকলকে সমভাবে দেখিতে পারে কাহারা ? অতিথি কোথায় সর্ব্বদেবময় ? যুদ্ধও কাহার নিকট ধর্ম্ম ? পলায়িত শত্রু কোন্ দেশে বিজেতার অবধ্য ? স্বাধীনতা কোথায় ভোগাধিকারনিষ্ঠ না হইয়া আত্মনিষ্ঠ ? যদি আমরা কখনও বাঁচি আমাদের এই সমস্ত নিজস্ব সম্পত্তিকে লইয়াই বাঁচিব ; যাহা আমাদের ছিল না, যাহার প্রতি আকর্ষণ আমাদের মৌলিক নহে, সে বস্তুর উন্মাদনা ইউরোপে যতই হউক না কেন, এবং বর্ত্তমান যুগে ভারতেও যতই হউক না কেন, ভারতের তাহা চিরন্তন সাধন-বস্তু কখনই হইতে পারিবে না। এই পুরাতন সুসভ্য জাতি, যাহারা ধর্ম্ম ও বিশ্বকল্যাণের উচ্চতম স্তরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তাহারা আর পারিবে না জাপানের মত বলিতে India for the Indians।

"বিশ্বজগৎ আমারে ডাকিলে কে মোর আত্ম পর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।"

এই অমৃত বাণী ভারতীয় ঋষিরই দৃষ্টমন্ত্রের প্রতিধ্বনি ; আমরা যতই দীন হীন হইয়া থাকি না কেন, এ বাণী ভুলিব না। আদর্শ ত উচ্চই হওয়া চাই, বিশেষ যে আদর্শ আমাদের নিজের ও যাহা প্রতিবিম্ব মাত্র নহে। যাহা উপলব্ধ সত্য (তা সে সত্যের দর্শক যত অল্পই হউক না) তাহা আমাদের অপরিত্যজ্য। এই দুর্দ্দিনে আমরা পুনরায় সেই মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে চাই। তাহার সাধনও আরম্ভ হইয়াছে, রামকৃষ্ণ সেদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জীবনালোকে এখনও এই অন্ধ জাতি পথের পরিচয় লাভ করিবে। মনে কর আমরা ইংরাজী যুগের ঠিক পূর্ব্ব কালটিতে মরিয়া ছিলাম। এখনই বাঁচিয়াছি, পুনরায় নিজের দেখা পাইতে হইবে। সেই নিজস্ব প্রতিষ্ঠাই আমাদের কার্য্য, ফুটিয়া উঠাই যেমন ফুলের কার্য্য। ইহা প্রাণন ব্যাপার, জগতের সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের ন্যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় গর্জ্জন ও সমারোহশূন্য। কেহ যেন

এই নীরব যাত্রার অমর্য্যাদা না করেন। রাজনীতির নূতন ক্ষেত্রে তাঁহারা কাজ করিতে হয় করুন, কিন্তু ভারতের প্রাণ আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে, সেখানে যেন আমরা না ঠকি। জানি না ময়ূরের পালকে দাঁড়কাক ময়ূর হইবে কিনা, কিন্তু কাকত্বেই বা সে লজ্জিত হইবে কেন? বরং যাহাতে সেই কাকত্ব-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মাইবে তাহাই কাকের বর্জ্জনীয়। আশৈশব ইংরাজীর চর্চ্চা যদি বাঙ্গালীর আত্মোন্মেষের ক্ষতিকর হয় বাঙ্গালীকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার মনে হয় ইংরাজীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে, ইংরাজীর আঘাতে আমরা নিজেকে হারাইয়াই আবার নিজের দেখা পাইয়াছি। এখানে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর কোন অস্পষ্টতা নাই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এখন জাতীয় সাহিত্যের জয়-পতাকা হস্তে লইয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, শত্রুর নিকট কিছু কাড়িয়া লইতে পারি সামরিক নিয়মে তাহা লওয়া যাইবে,—কিন্তু সে শত্রুর মাহাত্ম্য যতই গগনস্পর্শী হউক না কেন, তাহারা যে শত্রু, তাহারা যে স্বতন্ত্র, একথা আমরা ভুলিব না, আমরা তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাইব না। তবে অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্। ইংরাজী হইতে যদি আমাদের গ্রহণীয় এমন কিছু থাকে যাহাতে আমাদের ক্ষতি না করিয়া উপকারই করিবে, তাহা হইলে ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি। এখানে আমি অজ্ঞাত-কুলশীল সম্বন্ধে নীতিজ্ঞের বচন অনুসরণ করিতে চাই। হয়ত বালির মধ্যেও পুষ্টিকর বস্তু আছে, কিন্তু মৎস্য বা উদ্ভিদ গোড়ায় তাহা আত্মস্থ করিয়া মানবীয় পাকস্থলীর উপযোগী করিয়া না নিলে, সোজাসুজি বালুকা ভক্ষণ মৃত্যুর কারণই হইয়া থাকে। শুনিতে পাই জগজ্জয়ী সিকন্দরের অধোগতি ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যাসিডনের ক্ষয়ের প্রধান কারণ পারস্য জয় ও পারসীক বিলাসিতার অনুকরণ। বাহিরে যাহা পাওয়া যায় তাহার মোহন দৃশ্যে ভুলিলে চলিবে না, চক্ষুষ্মাণের দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া লইতে লইবে। আমরাও ইংরাজীর যাহা লইব তাহা যেন ভাল লোকের হাত দিয়াই লই। আর সকলের উপর বড় কথা, পরের লইতে গিয়া যেন ঘরকে না ভুলিয়া যাই,—আগে আত্মপ্রতিষ্ঠা পরে বাহিরের বরণ।

৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ

মা

অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, সাহেবদের তাড়িয়ে কি রাজত্ব করবে তোমরা? ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি করা তোমাদের জাতের স্বভাব।

অতঃপর তিনি যাহা বলিলেন সেটুকু চর্ব্বিত-চর্ব্বণের সামিল; বহুবার তিনি এ কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তরুণের দল মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিল। কার্ত্তিক বাবু এটুকু লক্ষ্য করিলেন, তিনি তীক্ষ্ণ ঘৃণার সহিত বলিলেন—হেসো না, হাসির কথা নয়! ইংরেজরা আমাদের ভাই, এক বংশ। ওরাও আর্য্য আমরাও আর্য্য। আমরা বাবাকে প্রাচীন ভাষায় বলি, পিতা-পিতর, ওরা বলে ফাদার, মাতর—মাদার, বাবা পাপা, মা মাম্মা, ভ্রাতা ব্রাদার! তফাৎ কোনখানে? আমরা ভয় লাগলে বলি, হরিবোল হরিবোল, ওরা বলে, 'হরিব্‌ল্ হরিব্‌ল্'। চামড়ার তফাৎ—সে তোমার দেশের জল-বাতাসের গুণে। আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মে বলেছে, তৃণাদপি সুনীচেন—তৃণের চেয়ে নত হবে। তা না ধ্বজা পতাকা উঁচু করে বন্দেমাতরম আর ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা!

ছেলেরা কি একটা ডে উপলক্ষে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল, তাহারা আর তর্ক না করিয়া পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। কার্ত্তিক বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ যাও, বাড়ী যাও সব। পড়াশুনো কর মন দিয়ে, চাকরী বাকরী কর।

কিন্তু ছেলেরা গান ধরিল—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—কার্ত্তিক বাবু তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—An idle brain is the devil's work-shop! বেকার—যত সব অপগণ্ডের দল!

সত্যকার গোপন কথাটি হইতেছে পেন্সন। কার্ত্তিক বাবু বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন, এখনও মোটা পেন্সন পাইয়া থাকেন। সংসারের কয়েকজন এখনও সরকারী কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে।

প্রাচীন জমিদার বংশের ভূতপূর্ব্ব নায়েব প্রৌঢ় রামসুন্দর বলিল, সর্ব্বদেবময়ো রাজা! এখনও আপনার এক দুই তিন বল্‌লেই লাট নিলেম হয়, কিন্তু দরখাস্ত কর, নীলেম করাবে না। ব্যবস্থা কি! বন্দোবস্ত কি!

কার্ত্তিক বলিলেন, তোমার বাবুর ছোট ছেলেটি আবার এককাঠি সরেশ। সে আবার কি বলে কংগ্রেসের leader, একবারে extremist। উগ্রপন্থী। বাপরে!

রামসুন্দর আক্ষেপ করিয়া বলিল, আর বলেন কেন মশাই, সে আবার বলে ঈশ্বর মানি না!

—তোমার বাবুকে ছেলের বিয়ে দিতে বল, ছেলের বিয়ে দিন।

—বিয়ে করে খাওয়াবে কি বলুন, ছেলেপুলে হবে তাদের ভরণ পোষণ করবে কি দিয়ে। সেই জন্যেই তো আপনাকে বারবার বিরক্ত করছি!

জমিদার বাবু রামসুন্দর মারফত ছেলের চাকরীর জন্য কার্ত্তিক বাবুকে ধরিয়াছেন।

কার্ত্তিক বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বড় দুঃখ হয়, বুঝলে রামসুন্দর, এতবড় বংশের এই রকম পরিণাম দেখলে বড় দুঃখ হয়। বিশেষ ক'রে আমাদের দুঃখ হয় বেশী।

রামসুন্দরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, তা তো হবারই কথা; আপনারা হলেন আত্মীয়—আপনার জন—দশজন পরেরই হয়, তো আপনাদের কথা তো স্বতন্ত্র।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, যা হয়েছিল তা হয়েছিল, দৈবের ওপর হাত ছিল না, কিন্তু কর্ত্তার মাথাটা যদি খারাপ না হ'ত তা হলে বাড়ীটা বজায় থাকত। ধীরেনের কাণ্ডটি থেকেই ওঁকে সেরে দিয়ে গেল।

রামসুন্দর এ তথ্যটা অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মশাই, মাথার ওঁর অনেক দিন থেকেই গোলমাল হয়েছে। বুঝলেন, বহুদিন পূর্ব্বে প্রথম সংসার শেষ হবার পরই এর সূত্রপাত। তখন মধ্যে মধ্যে কবরেজ ডাকিয়ে ফিস্‌ফাস ক'রে পরামর্শ করতেন। একদিন কবরেজ আমাকে বলেছিলেন, বড়লোকের কেমন অদ্ভুত ভয় দেখ দেখি। বলেন কি—দেখ আমার হাতে কুষ্ঠ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেন? না—হাত কি রকম লাল হয়েছে দেখ!

কার্ত্তিক বাবু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি? কুষ্ঠ?

—আরে মশাই কুষ্ঠ কোথা পাবেন, মনের ভয়। আমার মনে হয় ঐটাই মাথাখারাপের সূত্রপাত। হাতের তালু অল্প অল্প লাল সকলেরই হয়—আবার

ওঁদের বংশের কথা আলাদা—ওঁদের হাতই যেন লাল রঙ মাখানো। এখন আর তাও নাই—রক্তহীন সাদা ফ্যাকাসে চেহারা হয়ে গেছে বাবুর।

কার্ত্তিক বাবুর কিন্তু কথাটায় বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে মনেই কথাটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। রামসুন্দর কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, এখনও তো আপনার সেই একই বাতিক। ধীরেন বাবুর দ্বীপান্তর হবার পর থেকে বাতিক—বাঁ হাতে আমার কুষ্ঠ হচ্ছে। তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না—আমি বেশ বুঝতে পারি। আগে চুপচাপ থাকতেন, যা বলা কওয়া কবিরাজের সঙ্গেই হ'ত। এখন সেটা প্রকাশ্যে—আর ওই একটা মনগড়া লজ্জায় ঘর থেকে বেরুবেনও না; কিছু করবেন না হাত দিয়ে, চুপচাপ ঘরে বসে আছেন।

ধীরেন জমিদার মহাবিষ্ণু সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছয় বৎসর পূর্ব্বে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, দেখ রামসুন্দর, বলতেও আমার বাধে—লজ্জা কষ্ট দুইই হয়। ওঁরা হয়তো মনে করবেন কার্ত্তিক কাজ ক'রে দিলে না। কিন্তু যার বাপ পাগল, ভাই খুন ক'রে দ্বীপান্তর-বাসী, নিজে যে সরকারের বিরোধী, তার চাকরী কি হয়! অন্ততঃ সরকারী চাকরী।

রামসুন্দর সরকারবাড়ীর পুরাতন নায়েব; বর্ত্তমানে সরকার বংশের সম্পত্তিও নাই, রামসুন্দর আর নায়েবও নয়, তবুও মমতার একটা নিবিড় বন্ধনে পুরাতন প্রভুবংশের সহিত তাহার জীবন জড়াইয়া গিয়াছে। সে এখনও তাঁহাদের জন্য এই সংসার-সমুদ্রে ভারবহনক্ষম একখানি তরণীর সন্ধানে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তরণীতে তাহার মন উঠে না, মনের গোপন ইচ্ছা—একখানি ধ্বজশোভিত অর্ণবপোত। এই চাকরীর জন্য কার্ত্তিক বাবুকে অনুরোধ সে মিথ্যা মহাবিষ্ণু বাবু ও তাঁহার পত্নীর নাম দিয়া, নিজেই করিতে আসিয়াছে। তাঁহারা কেহ বিন্দু-বিসর্গ পর্য্যন্ত জানেন না। দয়াময়ী, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রতিমার মত ছোট মায়ের ম্লান মুখ মনে হইলে তাহার চোখে জল আসে!

* * *

পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে রচিত সরকারদের দালান বাড়ীখানা এখন ইটকাঠের একটা স্তূপ; একদিকে একটা বটগাছ প্রবল বিক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই নাগ-পাশের মত মূলবেষ্টনীর পেষণে একে একে বক্ষপঞ্জরগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়া

চলিয়াছে। সে দিকটা এখন অব্যবহার্য্য, বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া নিশীথরাত্রে বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে, মধ্যে মধ্যে ধুপ্ ধাপ্ করিয়া পলেস্তারা বা ইটের চাঙড় খসিয়া পড়ে, দুই মাস তিন মাস অন্তর এক একখানা কড়ি অথবা বরগা। একটা অংশ জরাজীর্ণ হইলেও এখনও ব্যবহার করা চলে, সেই অংশে মহাবিষ্ণু বাবু তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্র নীরেনকে লইয়া বাস করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। প্রথমা পত্নীর সন্তান সন্ততি ছিল না, কনিষ্ঠা পত্নী করুণাময়ীর দুই পুত্র ধীরেন ও নীরেন। আশ্চর্য্য দুই জনে প্রকৃতিতে—দিন ও রাত্রির রূপের মত বিরোধী এবং বিপরীত। ধীরেন এই জমিদার বংশের বংশানুক্রমিক ধারায় দুর্দ্দান্ত, দাম্ভিক, উগ্র, বিলাসী—জীবনে সে চলিতে চাহিত ঝড়ের মত, তাহার সম্মুখে নত না হইলে সে তাহাকে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিত। লেখাপড়াও বিশেষ করে নাই—স্কুল হইতেই বিদায় লইয়া সে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছিল। প্রয়োজনও ছিল। তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই মহাবিষ্ণু বাবু ঘরে ঢুকিয়া বসিয়াছিলেন—মধ্যে মধ্যে কবিরাজ আসা যাওয়া করিত অপর কাহারও সহিত দেখাও তিনি করিতেন না—বাহিরেও বড় আসিতেন না। ধীরেনের মাও বিশেষ আপত্তি করিলেন না—এত বড় বাড়ীর পৈত্রিক মর্য্যাদা-সম্পদ উদ্ধার করিতে যদি ধীরেন পারে—তবে উর্দ্ধতন সাতপুরুষ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সেই ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল। তরুণ ধীরেন্দ্র মহলে গিয়াছিল—সেখানে প্রজাদের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া বসিল। একদিন প্রজাদের কয়জন মাতব্বর আসিয়া তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলিল, আপনি এমন ক'রে চাপরাশী লগদী পাঠাবেন না বাবু, আমরা আর খাতির রাখব না।

ধীরেনের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ অজগরের মত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, হুঁ। তারপর ?

—আমরা খাজনাও দেব না। বৃদ্ধি সুদ, এ তো দেবই না।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? বেশী যদি করেন—আমরা মেজেষ্টারের কাছে দরখাস্ত করব—দরবার করব।

—আর ?

আর কিছু প্রজারা খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের ছেলের এই আকাশস্পর্শী আভিজাত্যের নিকট অত্যন্ত খাটো হইয়া গিয়া তাহাদের অন্তর ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। সেই ক্ষোভের আক্রোশেই একজন বলিয়া উঠিল, মাশায়, এত ভালো নয়, বুঝলেন। এই পাপেই আপনার বাবার কুঠ হয়েছে।

অকস্মাৎ যেন একটা বজ্রপাতে আগ্নেয়গিরির উৎসমুখ খুলিয়া গিয়া অগ্ন্যুদগার হইয়া গেল। হাতের কাছেই ছিল বন্দুক—একটা বিপুল শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল; লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রোতে মাটি ভাসিয়া গেল। ধীরেন্দ্র বন্দুকটা খুলিয়া ফুঁ দিয়া নলের ধোঁয়া বাহির করিয়া দিয়া বন্দুকটা হাতেই থানায় গিয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। কোন কথা সে গোপন করিল না—অনুগ্রহ করিয়া বিচারক চরম শাস্তির পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন। সে আজ ছয় বৎসর পার হইয়া গেল।

এখন এ সংসারের ভরসাস্থল নীরেন। ভরসা করিবার মত সন্তান সে। ধীরেন্দ্রের মামলায় ও ঋণের দায়ে বিষয় সম্পত্তি সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল, নীরেনের স্কুলের বেতন যোগানো দায় হইয়া উঠিল। কিন্তু স্কুলের হেডমাষ্টার তাহার বেতন কোনদিন চাহিলেন না। ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, তবুও তাহার বেতন মাসে মাসে জমা হইয়া যাইত। নীরেনকে ডাকিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিয়া দিলেন, দেখ, যখন তোর হবে মাইনে দিস; আমরা বাকীই রেখে যাচ্ছি। বেতন লাগিবে না কথাটাও তিনি বলেন নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় রামসুন্দর একেবারে হিসাব করিয়া টাকা আনিয়া দিল। বিনা প্রশ্নে মাষ্টার মহাশয় সে টাকা গ্রহণ করিলেন। নীরেন বৃত্তি পাইল পনের টাকা। মাষ্টার মহাশয় রাশিকৃত নূতন ঝকঝকে বই নীরেনকে পাঠাইয়া দিলেন—To the best boy of my school—with my best wishes।

তারপর নীরেন আই-এ বি-এও সম্মানের সহিত পাশ করিল। কিন্তু এম-এ পরীক্ষা দিবার সময় জাতীয় আন্দোলনে মাতিয়া পড়া ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

তাহার মা বলিলেন, নীরেন, বাবা, আমার মাথা আর খাসনে বাবা। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরেন বলিল—তোমার মাথা কি আমি খেতে পারি মা?

মা ভুলিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন, মায়ের চোখের জল ফেলে কি আনন্দ হয় নীরু?

—আনন্দ? জান মা, আলেকজেণ্ডার বলেছিলেন—আমার মায়ের এক বিন্দু চোখের জল—

—মিথ্যে আমায় ভোলাচ্ছিস নীরু; তুই আমায় পরিষ্কার কথা বল। যা বুঝতে পারি এমন কথা বল।

—তোমাকে দুঃখ আমি দিতে পারি না মা। আমায় কি করতে হবে বল?

—উপায়ের একটা পথ কর; এম-এ টা পাশ কর—আইন পড়। বাবুর বড় সাধ ছিল ধীরেনকে উকীল করবেন—আর—

ঝর ঝর করিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নীরেন সেই বৎসরই এম-এ পরীক্ষা দিয়া বসিল। পড়াশুনা তাহার শেষ হইয়াই ছিল, পরীক্ষায় পাশও সে করিল। কিন্তু ফল আশানুরূপ হইল না।

রামসুন্দর আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল—এইবার ভাই আইনটা পাশ করে ফেল। আমি তোমার কেস এনে দেব। একবার ওই কার্ত্তিক বাবুকে আমি দেখিয়ে দিই তা' হ'লে।

* * * *

অন্ধকার রাত্রি। বাড়ীর সেই ফাটলে ভরা জরাজীর্ণ অংশটার ছাদের উপর নীরেন বসিয়াছিল। মৃদু বাতাসের বেগে বটগাছটার পত্রান্দোলনে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছিল—যেন কাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, কানাকানি করিয়া হাসিতেছে। নীরেন সেই দিকে চাহিয়া কিছু বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল। মা তাহার সন্ধান পাইলেন, তিনি ডাকিলেন—নীরেন উঠে আয়।

নীরেন হাসিয়া বলিল—তুমি বুঝি আমার গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াও? সন্ধানও তো ঠিক পাও।

—উঠে আয় আগে।

নীরেন অবহেলা করিল না, উঠিয়া সন্তর্পণে ভাঙা ছাদ পার হইয়া নিকটে

আসিতেই মা বলিলেন—তুই কি আমার সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বিনে? ওই ভাঙা ছাদ—চারিদিকে ফাটল গর্ত্ত—ওই বটগাছ—ওখানে তোর কি কাজ শুনি?

হাসিয়া নীরেন বলিল—বেশ লাগে মা আমার!

—তুই আর হাসিসনে নীরেন, তোর হাসি দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কখনও কি তোর মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তা হয় না, দুঃখ হয় না! এই এত বড় বংশ, এত বড় বাড়ী—কি ছিল মনে কর দেখি, আর ভাব তো কি হয়েছে!

সেই হাসি হাসিয়াই নীরেন বলিল—সেই তো ভাবি মা। ভাবি কেন, চোখে যেন দেখি—'মা কি হইয়াছেন!' আনন্দ মঠ মনে আছে মা? মা কি ছিলেন—আর মা কি হইয়াছেন! অন্ধকার কালো রাত্রির মধ্যে—আমাদের এই ভাঙা বাড়ীর মধ্যে—সমস্ত দেশের—

মা বলিয়া উঠিলেন—তোর পায়ে পড়ি নীরেন—চুপ কর। তোর দেশকে ছাড়। মাটীকে ভক্তি না ক'রে মাকে ভক্তি কর একটু!

মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া নীরেন বলিল—তুমি বড্ড সেন্টিমেণ্টাল। আর রাগ করবে না তো? বড্ড হিংসুটে তুমি।

মা দৃঢ়স্বরে এবার বলিলেন—দাঁড়া এইবার তোর বিয়ে দেব আমি। তোর এই সব পাকামী আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

নীরেন হা-হা করিয়া হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল। হাসি দেখিয়া মায়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—হাসছিস কেন?

—বিয়ের কথা শুনে আনন্দ হচ্ছে মা।

মা আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি সেখান হইতে একেবারে আসিয়া সন্তর্পণে স্বামীর কক্ষের দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিলসুজের উপর প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। ঘরখানি আয়তনে বৃহৎ, ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের মৃদু আলোকের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে পারে নাই, আলোকিত পরিধিটুকুর চারিপাশে অন্ধকার নিথর হইয়া যেন দীপ-নির্ব্বাণের প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর ঘরখানা অস্বাভাবিক রূপে নিস্তব্ধ। আলো-আঁধারিতে ও নিস্তব্ধতায় ঘরখানি যেন রহস্যের মোহে আচ্ছন্ন। মহাবিষ্ণু বাবু বিছানার উপর নিস্তব্ধ ছায়ামূর্ত্তির মত বসিয়া আপনার বাঁ-হাতখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিলেন।

নীরেনের মা ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি নীরবেই তাঁহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ওই দৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার ভাষা প্রকাশ পায়। নীরেনের মা তাঁহার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, খিদে পেয়েছে ?

আপনার চিবুকে অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে একবার হাত বুলাইয়া তিনি মৃদুস্বরেই উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

—আচ্ছা আনছি খাবার। কিন্তু—আমি একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। আর না বললে নয়।

—বল।

—তুমি একবার নীরেনকে ডেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল।

—বলব।

—হ্যাঁ। ডেকে বল, বাবা তোর মুখ চেয়ে আমরা বসে রয়েছি। আইন পাশ ক'রে তুই ওকালতি কর—অভাবের কষ্ট আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। পৈত্রিক মর্য্যাদা তুই আবার বজায় কর।

—নীরেন এবার তো এম-এ পাশ করলে, না ?

—হ্যাঁ। ও যদি মনে করে তবে না পারে এমন কাজই নেই। কিন্তু দেশেই ওকে খেলে। কি যে দেশ দেশ বাতিক হয়েছে।

—দেশ ?

—হ্যাঁ দেশ—জন্মভূমি—বন্দেমাতরম।

—হুঁ। তারপর গভীর চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—আচ্ছা, সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে মশায় এখন কি করছেন ?···ও—না, এখন তো লীডার হলেন গান্ধী। বলিয়া তিনি ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিলেন—যেন ব্যাপারটা সব তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে—সকল কথাই তাঁহার মনে পড়িয়াছে।

—আমি ডেকে দিচ্ছি নীরেনকে। বলিয়া নীরেনের মা বাহির হইবার জন্য দরজার মুখে ফিরিলেন। মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন—শোন।

—কি ?

—অভাব কি আজকাল খুব বেশী হয়েছে ?

—না না। কিন্তু নীরেন ওকালতি করলে যে আবার সেই সব হবে। চণ্ডীমণ্ডপ, পূজো, বাড়ী, জমিদারী এ সব ফিরে আসবে।

গাঢ়স্বরে মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন—দেখ, কি করব আমি। লজ্জায় আমি বেরুতে পারি না। কুষ্ঠরোগ নিয়ে কি দশের সামনে বের হওয়া যায় ?

—কোথায় তোমার কুষ্ঠরোগ ? ওই তোমার এক বাতিক। ডাক্তার কবরেজরা কি বলেছে ? দুবার রক্ত পরীক্ষা করান হ'ল, বলেছে কেউ যে ওই ব্যাধি হয়েছে !

—এই হাতটায়। এটাতে আর নেই কিছু। এইটায়—দেখ না, এই রকম লাল হয় কারও হাত ? এত টাটিয়ে থাকে। তিনি শীর্ণ জীর্ণ হাতখানি সেই অস্পষ্ট আলোকের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

নীরেনের মা একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আর এখন নীরেনকে পাঠাইয়া কোন লাভ নাই—এখন ওই রোগের কথা ছাড়া আর কোন কথাই মহাবিষ্ণুবাবু বলিবেন না।

নীরেন ঘরের মধ্যে পড়িতে বসিয়াছিল, মাকে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল—বাবার খাওয়া হয়ে গেল মা ?

মা বলিলেন—না। তুই কাল সকালে একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করবি। আমায় বলছিলেন।

—আচ্ছা।

তারপর আবার সে বলিল—কাল কলকাতায় যাব মা। আইনটা পড়ে ফেলাই ভাল। একটা চাকরী-বাকরী দেখে খরচ চালিয়ে নেব কোন রকম করে।

মা খুসী হইয়া উঠিলেন।

নীরেন বলিল, রামসুন্দর দাদার কাছে গিয়েছিলাম আমি। তিনি বললেন, কোন মোড়লের কাছে প্রায় ষাট টাকা আমাদের পাওনা রয়েছে, কালই তিনি টাকাটা আদায় ক'রে আনবেন। না-হ'লে উনিই এখন দেবেন তারপর পরে আদায় করে নিজে নেবেন।

মা সজল নেত্রে বলিলেন, দেখ বাবা, ঐ রামসুন্দরের অনুগ্রহও আমাদের নিতে হচ্ছে। এ লজ্জার হাত থেকে তুই আমাদের বাঁচা। তোদের পৈত্রিক মর্য্যাদা তুই আবার উদ্ধার কর বাবা।

পরদিনই নীরেন কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

* * *

মাস ছয়েক পর।

গভীর রাত্রে নীরেনের ডাক শুনিয়া মা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। নীরেন? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, না তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

—মা।

ওই তো। নীরেনই তো। তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

—এমন হঠাৎ যে তুই নীরেন? এখন ট্রেনই বা কোথায়?

হাসিয়া নীরেন বলিল, হরিপুরের একটি ছেলে সঙ্গে ছিল মা। সে একা বাড়ী যেতে পারলে না, তাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী আসছি। নেমেছি রাত্রি আটটায়।

—কিন্তু কই বাড়ী আসবার কথা তো লিখিস নি?

—তোমার জন্যে মন কেমন ক'রে উঠল মা। চলে এলাম।

—মুখ হাত ধুয়ে ফেল, ব'স, আমি দুটো গরম ভাত চড়িয়ে দিই।

—ভাত? একটুখানি চিন্তা করিয়া নীরেন বলিল—আচ্ছা, দাও, অনেক দিন তোমার হাতের রান্না খাইনি। আবার চলে গিয়ে কবে আসব। কালই চলে যাব।

মা তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দিলেন।

—হ্যাঁরে, দুটো ভাজাভুজি ক'রে দিই কেবল—না, তরকারীও একটা করে দেব? নীরেন।

নীরেন তখন দাওয়ার উপর পড়িয়াই অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মা একটু স্নেহের হাসি হাসিলেন, এখনও সেই বালকের মত স্বভাবই রহিয়া গেল, মাটী বিছানা বিচার নাই, মায়ের উচ্ছিষ্ট এখনও কাড়িয়া খায়। ও যে কেমন করিয়া বিদেশে থাকে।

—দরজা খোল, কে আছে?

কে? কাহার কণ্ঠস্বর? দরজায় এমন ক্রুদ্ধ আস্ফালন ও প্রভুত্বের ভঙ্গিতে কে আঘাত করিতেছে!

—দরজা খোল।

নীরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি চল্লাম মা।

—সে কি? তোর হাতে ও কি?

—পিস্তল।

পিস্তল! নীরেনের মা ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াই যেন পিস্তলটা চাপিয়া ধরিলেন। ছাড়্—ছাড়্।

নীরেন পিস্তলটা ছাড়িয়া দিল। সেটা তৎক্ষণাৎ তিনি উঠানের কূয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, নীরেন।

নীরেন বলিল—আমি একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি ক'রে মেরেছি মা।

মা এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নীরেন বলিল, থাকতে পারলাম না মা। অন্য বন্ধুরা আমাকে ভার দিতে চায় নি। আমি নিজে নিয়েছি আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য্য তোমার মুখও তখন মনে পড়ল না। ওদিকে দরজার খিলটা প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙিয়া খুলিয়া গেল। পুলিশ কর্ম্মচারী ও কনেষ্টবলে বাড়ীর ওপাশটা গিস্ গিস্ করিতেছিল।

মায়ের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া নীরেন অগ্রসর হইয়া বলিল, আমি ধরা দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ রাত্রির মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তস্বর জ্যা-বিমুক্ত শরের মতই ঊর্দ্ধলোকের দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আর্ত্তনাদ করিয়া নীরেনের মা সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

* * *

রামসুন্দর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নীরেনের মামলার তদ্বির তদারকের জন্য কলিকাতা ছুটা-ছুটি আরম্ভ করিল।

মহাবিষ্ণু বাবুও ব্যাপারটা শুনিয়াছেন। সেই দিনেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। খানাতল্লাসী করিতে পুলিশ তাঁহার ঘরেও প্রবেশ করিয়াছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন—খুন করেছে নীরেন? অ! তা আমাকে সুদ্ধ ফাঁসী দেবে না কি?

সেদিন রামসুন্দর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, আপনাকে একবার যেতে হবে। কোর্টে আপনাকে একবার দাঁড়াতে হবে।

—আমাকে? কেন, আমারও বিচার হ'বে না কি?

—না। সরকারী উকীল আমাদের থানার দারোগার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, আসামীর দাদাও খুন করেছে। আমাদের ব্যারিষ্টার সেই সুযোগে জেরা করেছেন

—আসামীর বাপ পাগল কি না? দারোগা স্বীকার করেছে। কিন্তু নীরেনের জন্মের পূর্ব্বে থেকে পাগল এইটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে। আপনাকে দেখাতে পারলে অনেক ফল হবে।

মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন, কিন্তু কুষ্ঠ রোগ—তা অনেকটা এখন ভাল বটে, কিন্তু তবু তো কুষ্ঠ রোগ।......

নীরেনের মা বলিলেন, না বাবা রামসুন্দর, ওঁকে আর টানাটানি কর না। হয়তো হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারাই যাবেন। বরং গ্রামের কাউকে......।

রামসুন্দর বলিল, কার্ত্তিক বাবু যদি সাক্ষী দেন তা হ'লে কিন্তু অনেক কাজ হয়।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরেনের মা বলিলেন, আমাদের কবরেজ মশায়কে দিয়ে হবে না? উনি তো সকলের চেয়ে ভাল জানেন।

—দেখি তাই না হয়, মন্দের ভালোও তো হবে। ক্ষুণ্নমনেই রামসুন্দর ফিরিল। মহাবিষ্ণু বাবু কি যেন ভাবিতেছিলেন, অকস্মাৎ বলিলেন, আচ্ছা রামসুন্দর।

রামসুন্দর দাঁড়াইল, বলিল, আজ্ঞে!

—আচ্ছা ওরা আমাকে কেন ফাঁসী দিক না! আমারই তো ছেলে। দোষ তো আমারই।

নীরবে মাথা নত করিয়া রামসুন্দর চলিয়া গেল। চোখে জল, মুখে হাসি লইয়া নীরেনের মা বলিলেন, ভেবো না তুমি, রামসুন্দর বলেছে আমাকে—নীরেন খালাস হয়ে যাবে। কবরেজকে দিয়ে এইটে প্রমাণ করতে পারলেই পাগল বলে খালাস দেবে।

—খালাস দেবে?

—হ্যাঁ দেবে।

—কবরেজকে একবার ডাকাও দেখি।

—ডাকতে হবে না, রামসুন্দর নিজে গেল তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

—না, সে জন্যে নয়, ব্যারামটা আমার বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে—মানে এই হাতটা কেবল একবার ভাল করে দেখুন। তুমিই দেখ না, গাঁঠে ঘা হয়েছে না? এইবার বোধ হয় গলবে।

নীরেনের মা দেখিলেন—আঙুলের গিঁঠে গিঁঠে কয়টি ক্ষত চিহ্ন। নখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া গিঁঠগুলি ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এমন ক'রে নখ দিয়ে ছিঁড়ো না। এ যে সব নখের আঁচড়ের ঘা। বস তোমার নখগুলো কেটে দিই আমি।

ছোট একখানি কাঁচি লইয়া তিনি স্বামীর নখ কাটিতে বসিলেন। তাঁহার মরিবার উপায় নাই, তাঁহার কাঁদিবার উপায় নাই, মহাবিষ্ণু বাবু যেন অহরহ তাঁহাকে ডাকেন—দেখ। আমার আঙুলগুলো দেখ তো ভাল ক'রে। না-না এই হাতে কি খাওয়া যায়! তুমি বরং খাইয়ে দাও।

* * *

কয়েক মাস পর।

আগামী প্রত্যূষে নীরেনের ফাঁসী হইবে। নীরেনের মা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃদুগুঞ্জনে কাঁদিতেছিলেন। মহাবিষ্ণু বাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, তেমনি দৃষ্টি তেমনি ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে তেমনি স্বল্প আলোক—আলোক-পরিধির চারিপাশে তেমনি নিথর অন্ধকার।

সহসা মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন, রামসুন্দর গেছে কলকাতায়?

—হ্যাঁ কাল সন্ধ্যে নাগাদ নীরেনকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। বহু কষ্টেই নীরেনের মা উত্তর দিলেন। সংবাদটা মহাবিষ্ণু বাবুর নিকট গোপন রাখা হইয়াছে।

মহাবিষ্ণু বাবু অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তার ফাঁসী হবে আজ; আমি জানি, শুনেছি আমি। তোমরা কথা কইছিলে—

এতক্ষণে নীরেনের মা হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহাবিষ্ণু বাবু কিন্তু তেমনি ভঙ্গিতেই বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ কাঁদিয়া নীরেনের মা বলিলেন, আমার ভাগ্যের দোষ, আমার গর্ভের দোষ, আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট।

পূর্ব্বের মতই ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন—না!

তারপর বহুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, জান না তুমি—কেউ জানে না, শুধু ভগবান জানেন, আমার দোষ, আমার রক্তের দোষ! ছায়ামূর্ত্তির মত মৃদু সঞ্চালনে হাত তুলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে তোমার দিদিকে আমি

এই দুই হাতে গলা টিপে মেরেছিলাম। নীরেনের মা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—আমার নিজের চরিত্র খারাপ ছিল; তাকেও আমার সন্দেহ হ'ত। খুব সুন্দরী ছিল কি না! আর খুব হাসতো।

নীরেনের মা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না-না। বলতে হবে না! বলো না!

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার অকস্মাৎ মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন, যখন তার বুকে চেপে ব'সলাম সে শাপ দিলে, ওই দুই হাতে তোমার কুষ্ঠ হবে। কিন্তু এ হাতটা বাঁচিয়ে দিলে ধীরেন আর ঐটা দিলে নীরেন। তোমার দোষ নাই, খুনের রক্ত তো।

বাহিরে পাখীর কলরবে প্রত্যুষ ঘোষণা করিয়া উঠিল। নীরেনের মা বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, নীরেন নীরেন রে!

চকিত হইয়া মহাবিষ্ণু বাবু বলিলেন, এঁ্যা!

তারপর বলিলেন, ভোর হয়ে গেল?

জানালাটা খুলিয়া দিয়া ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া উদয়াচল হইতে ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সহসা আপনার হাত দুইটি সেই আলোকের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন, সাদা হয়ে গেছে।

অস্থিচর্ম্মসার রক্তহীন বিবর্ণ হাত!

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশে বৈদিক সভ্যতা

(১)

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি যে বৈদিক সভ্যতার বহির্ভূত সে সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করেন না। এ সন্দেহ পোষণ করবার প্রধান কারণ হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে পতিত মনে করেন। উপরন্তু বৈদিক সাহিত্যে বাংলাদেশ বা বাঙ্গালী জাতির কোন উল্লেখ নাই। ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যে উল্লেখ আছে তা'তেও বাংলাদেশের আচারকে ভ্রষ্টাচার মনে করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণগুলিকে অকাট্য বলে মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

বৈদিক পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতা পূর্ব্বগামী হলেও তা মিথিলা অতিক্রম করে নি। বৈদিক সভ্যতার প্রথম লীলাভূমি হচ্ছে পাঞ্জাব প্রদেশ। সে প্রদেশে পশ্চিম প্রান্ত হতে পূর্ব্ব প্রান্ত সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত তা প্রসার লাভ করে। শাস্ত্রকারদের মতে এই সরস্বতী নদী ও তার নিকটবর্ত্তী দেশ হচ্ছে বৈদিক সভ্যতার প্রকৃত কেন্দ্র।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেব নদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।।

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অন্তর্বর্ত্তী দেশই হচ্ছে দেবতাদের নির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। আর এই ব্রহ্মাবর্ত্তের আচারই ছিল একমাত্র সদাচার। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের চারিদিকে যে সব দেশ, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন বা মথুরা তার প্রাচীন নাম ছিল ব্রহ্মর্ষি দেশ। এই ব্রহ্মর্ষিদেশের আচার উত্তম আচার হলেও তা ব্রহ্মাবর্ত্তের আচার হতে ছিল হীন।

এই প্রদেশ হতে বৈদিক সভ্যতা কালক্রমে পূর্ব্বদিকে প্রসার লাভ করে। ঋগ্বেদে গঙ্গা এবং যমুনা নদীর উল্লেখ একবার কি দু'বার মাত্র করা হয়েছে। আর সে দুই নদীর যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে মনে হয় যে সে দুই নদী যে প্রয়াগে মিলিত হয়েছে তা ঋগ্বেদের ঋষিরা জান্‌তেন না। পরবর্ত্তীকালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিদেহ-দেশে বৈদিক সভ্যতার প্রচারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ প্রচারের অগ্রদূত ছিলেন বিদেঘ মাঠব নামক একজন ঋষি। তিনি প্রথম সদানীরা নদী অতিক্রম করেন ও উপনিবেশ বিস্তার করেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই বিদেঘ নাম হতেই বিদেহ নামের উৎপত্তি। এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে কীকট বা মগধের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে দেশ ছিল সম্পূর্ণ অনার্য্য ও বৈদিক সভ্যতার বহির্ভূত। আরণ্যকগ্রন্থে অঙ্গ ও বঙ্গের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

এই সব কারণেই অনুমান করা হয়েছে যে বৈদিক সদাচার পূর্ব্বদিকে বিদেহ পর্য্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছিল; আর তার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ প্রদেশে বৈদিক সভ্যতা কোন দিনই প্রসার লাভ করে নি, বৈদিক সদাচারও প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই সূত্রকারেরা যে সমস্ত উক্তি করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে।

বৌধায়ন তাঁর ধর্ম্মসূত্রে বলেছেন—

অবন্তোঽঙ্গমগধাঃ সুরাষ্ট্রাঃ দক্ষিণাপথাঃ।
উপাবৃৎ সিন্ধুসৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ॥

অর্থাৎ অঙ্গ মগধ সুরাষ্ট্র দক্ষিণাপথ উপাবৃৎ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের লোকেরা সঙ্কীর্ণযোনি বা মিশ্রজাতি।

সেই সব দেশে গেলে ব্রাহ্মণের যে পাতক হয় আর সে পাতক হতে মুক্তি লাভ করবার যে উপায় তা বৌধায়ন তাঁর ধর্ম্মসূত্রে নির্দ্দেশ করেছেন—

আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্।
প্রনূনাং ইতি চ গত্বা যজেত সর্বপৃষ্ঠয়া বা॥

অর্থাৎ আরট্ট, কারস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রনূন প্রভৃতি দেশে যাবার জন্য যে পাতক হয় তা পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টির দ্বারা দূরীভূত হয়।

বৌধায়ন এবং হিরণ্যকেশী তাঁদের শ্রৌতসূত্রে ঐ কথারই পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এ সম্বন্ধে অন্যরূপ কথা বলেছেন। দেবল তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে বলেছেন যে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র ও মগধ প্রভৃতি দেশে তীর্থযাত্রার জন্য যাওয়া চলে, প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রায়শ্চিত্ত করলেই দোষ কেটে যায়।

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

বসিষ্ঠ তাঁর ধর্ম্মসূত্রে এ কথা আরও স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীরাই হচ্ছে শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং সেই দেশের ধর্ম্মই সর্বত্র অনুসরণ-যোগ্য। এই আর্য্যাবর্ত্ত কোন দেশ ?

বসিষ্ঠের মতে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা হচ্ছে পশ্চিমে অদর্শন অর্থাৎ সরস্বতী নদী যেখানে মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, পূর্ব্বে কালকবন, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য। বসিষ্ঠ আরও বলেছেন যে অনেকের মতে গঙ্গা যমুনার অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশই হচ্ছে আর্য্যাবর্ত্ত। কিন্তু ভাল্লবিরা বলেন—

পশ্চাৎ সিন্ধু বিধারণী সূর্য্যস্যোদয়নং পুরঃ।
যাবৎ কৃষ্ণোভিধাবতি তাবদ্বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসম্॥

অর্থাৎ পশ্চিমে সিন্ধু নদী হতে পূর্ব্বে যেখানে সূর্য্যোদয় হয় সে দেশে যতদূর কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে সেই দেশই বেদালোচনার দেশ।

মনুসংহিতায়ও এ কথার স্পষ্ট উল্লখ আছে—

আ সমুদ্রা বৈ পূর্ব্বাদাত্তু সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বত। এই সীমানার মধ্যবর্ত্তী দেশকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। এই দেশের মধ্যে যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে তাকে যজ্ঞিয় দেশ বলে, তার বাইরে সমস্ত ম্লেচ্ছ দেশ। এই সমস্ত পবিত্র দেশকে সযত্নে আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণসার মৃগ পাঞ্জাব হতে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই পাওয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রকরদের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে বলতে হবে যে এই সমগ্র দেশেই এক সময়ে বেদমার্গ প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, উত্তর ভারতের কোন একটি বিশিষ্ট প্রদেশে তা নিবদ্ধ ছিল না।

(২)

খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত গৌড় ও কামরূপ প্রদেশে যে বেদালোচনা ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেই সময়ের তাম্রপট্ট ও শিলালিপি হতেই পাওয়া যায়। পাল বংশের রাজা দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি হতে আমরা "বেদার্থবিদ্ যাজ্ঞিক" ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র আশ্বলায়ন শাখার ব্রহ্মচারী বীহেকরাত মিশ্রের পরিচয় পাই। দেবপালদেব বৌদ্ধ হলেও এই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে গ্রামদান করেছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় নামক স্থানে প্রাপ্ত মহীপালদেবের তাম্রশাসনে যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখার অধ্যয়নে নিযুক্ত মীমাংসা ব্যাকরণ তর্ক বিশারদ ব্রাহ্মণদের উল্লেখ আছে। নয়পালদেবের রাজ্যকালীন একখানি তাম্রশাসনে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক ক্রিয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা প্রণিধান-যোগ্য—

বেদাভ্যাস-পরায়ণঃ দ্বিজগণোদ্গীর্ণোগ্র-পাঠক্রমা-
দুচ্চৈ রুচ্চরিত ধ্বনিব্যতিকরৈ-র্যত্রাব্যথার্থা গিরঃ।
কিকাব্যপ্রিতহোমধূমপটলধ্বান্তাবৃতো সাম্প্রতং।
ধর্ম্মো যত্র মহাভয়াদিব কলেঃ কালস্ত সংতিষ্ঠতে॥

"তথায় বেদাভ্যাস-পরায়ণ দ্বিজগণের কণ্ঠনিঃসৃত (শিক্ষাবর যথাক্রুষ্ট) পাঠপদ্ধতিক্রমে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত পাঠধ্বনির সংমিশ্রণে (অস্ত) বাক্যালাপ সম্বন্ধে বোধগম্য হইয়া থাকে। সেখানে নিরন্তর যে হোমধূমরাশি উদ্গত হইতেছে তাহার তিমিরাবরণের মধ্যই ধর্ম্ম কলিকালের মহাভয়ে সম্প্রতি (আত্মগোপন করিয়া) অবস্থিতি করিতেছেন।"

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানে প্রাপ্ত গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে এক ব্রাহ্মণবংশের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। সেই বংশের কেদারমিশ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

আসন্নাজিহ্বরাজবহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্‌চক্রবালো
দুর্ব্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতাশেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।

"তাঁহার (হোমোকুণ্ডোত্থিত) অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল।"

কামরূপের প্রাচীন রাজাদের শিলালিপি যে সব স্থানে পাওয়া গিয়েছে

তা বেশীর ভাগই বাংলা দেশের অন্তর্গত। ভাস্করবর্ম্মা ছিলেন কামরূপের রাজা, হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগের লোক। শ্রীহট্ট জেলায় নিধনপুর নামক স্থানে তাঁর এক তাম্রপট্ট পাওয়া যায়। এই নিধনপুর লিপিতে ২০৫ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এদের প্রত্যেককেই ভূমিদান করা হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণেরা বেদের যে যে শাখার প্রতিনিধি ছিলেন সে সব শাখার নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

১। যজুর্বেদ—বাজসনেয়ী, চারক্য, তৈত্তিরীয়, ১০১
২। সামবেদ বা ছান্দোগ, ১৪
৩। ঋগ্বেদ বা বাহ্ব্‌চ্য, ৬০

সুতরাং এ অঞ্চলে যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদেরই বেশী প্রতিপত্তি ছিল, এবং সে বেদের বাজসনেয়ী শাখার উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়, তৈত্তিরীয় ও চারক্য শাখার উল্লেখ খুব কম। চরক বা চারক্য যজুর্বেদের শাখা বলেই অনেকেই অনুমান করেছেন, কিন্তু সে শাখা ছিল অপ্রচলিত।

এ ছাড়া, বনমাল, বলবর্ম্মা, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতি রাজাদের তাম্রশাসনে বেদাধ্যায়ন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং সে বিষয়ে পারদর্শী ব্রাহ্মণের বহু উল্লেখ রয়েছে।

বৈদিক যাগ যজ্ঞ ও বিভিন্ন বৈদিক শাখার প্রচলন যে সেনরাজাদের সময়েও ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ ঐ যুগের তাম্রশাসন হতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকে চন্দ্ররাজবংশ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেছিলেন। এ চন্দ্রদ্বীপ ঠিক কোথায় তা নির্দ্ধারিত হয় নি, তবে সে প্রদেশ দক্ষিণ বঙ্গের কোথাও অবস্থিত ছিল বলেই অনুমান হয়। এই চন্দ্র রাজাদের এক তাম্রশাসনে 'কোটিহোম' করবার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে বিক্রমপুরের রাজা ভোজবর্ম্মার এক শাসনে উত্তররাঢ় প্রদেশে যজুর্বেদের কাণ্বশাখার অধ্যায়ন নিরত এক ব্রাহ্মণবংশকে ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই তাম্রশাসনেই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋগ্ যজুস্ সাম এই তিন বেদের প্রচলনের উল্লেখ রয়েছে—'পুংসামাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি' অর্থাৎ পুরুষের আবরণই হচ্ছে ত্রয়ী, আর আমাদের সে আবরণের অভাব নেই। উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভট্টভবদেবের এক শিলালিপি ভুবনেশ্বরে পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালিপি একাদশ শতকের। সেই যুগে বাঙালী

ব্রাহ্মণেরা কি কি শাস্ত্র অধ্যায়ন করতেন তার প্রমাণ এই শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ রয়েছে—"সাবর্ণস্য মুনের্ম্মহীয়সি কুলে যে যজ্ঞিরে শোত্রিয়া স্তেষাং শাসনভূময়োজনি গৃহং গ্রামাঃ শতং সন্ততে"—অর্থাৎ সেই উত্তর রাঢ়ে অন্ততঃ একশত গ্রাম ছিল যেখানে শোত্রিয় বেদাধ্যয়ন নিরত সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের শাসন-ভূমি ছিল।

সেন রাজাদের প্রথম রাজা বিজয়সেন খুব সম্ভব একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যে শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করতেন তার উল্লেখ তাঁর নিজের তাম্রশাসনেই আছে। গঙ্গাতীরের সেই আশ্রম ছিল "উদ্‌গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগ-শিশুরসিতা খিন্ন বৈখানসস্ত্রী-স্তন্যক্ষীরানি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপরায়ণানি"—অর্থাৎ সে স্থান ছিল হোমধূমে সুগন্ধী, সেখানে মৃগশিশু সহৃদয় বৈখানসস্ত্রীদের স্তন্যক্ষীর পান করত এবং শুক পাখীদের সমস্ত বেদ ছিল কণ্ঠস্থ। অন্যান্য সেন রাজাদের তাম্রশাসনে যে সব বেদ ও বৈদিক শাখার উল্লেখ আছে সেগুলির নাম করলেই বোঝা যাবে যে বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণদের সে সময়ে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সে নামগুলি হচ্ছে এই—সামবেদ—কৌথুমী শাখা, ঋগ্বেদ—আশ্বলায়ন শাখা, অথর্ব্ববেদ—পৈপ্পলাদ শাখা, যজুর্ব্বেদ—কাণ্ব শাখা। ত্রয়োদশ শতক হতে সেন রাজাদের যে সব তাম্রশাসন পাওয়া যায় তাতে আর আমরা বেদ অথবা বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতির বিশেষ উল্লেখ পাই না।

সুতরাং খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে বৈদিক সভ্যতার প্রচলন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত এ প্রচলন হয়েছিল মধ্যদেশ হতে আগত ব্রাহ্মণদের হাতে। মধ্যদেশ হতে যে ব্রাহ্মণেরা বাংলা দেশে এসেছিলেন তার প্রমাণ আদিশূরের গল্প ছেড়ে দিলে এই যুগের শিলালিপি বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। ভোজবর্ম্মা এবং বিজয়সেনের তাম্রশাসনে "মধ্যদেশবিনির্গত" ব্রাহ্মণদের উত্তর রাঢ় এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূমিদানের কথা স্পষ্ট করেই উল্লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গে শ্রাবস্তী কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সব জনপদ যে মধ্যদেশ হতে আগত ব্রাহ্মণেরা স্থাপিত করেছিলেন সে অনুমান করা হয় ত অসঙ্গত নয়।

(৩)

এখন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে বাংলাদেশ হতে বেদানুশীলন এবং বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড লোপ পেল কি করে। আমার মনে হয় যে তা কোনদিনই লোপ পায় নি, রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও বেদানুশীলনের লোপ এক সময়ে ঘটে এবং এই দুই ঘটনার মধ্যে যে যোগ রয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। বেদানুশীলন শুধু তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বেদ ও তন্ত্র উভয়েই হচ্ছে আগম অর্থাৎ অপৌরুষেয়। তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন হলেও প্রাচ্যভারতে তার বহুল প্রচার হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে এবং বাংলাদেশে সেই সময় হতেই বা তার কিছু পূর্ব্বে থেকেই সে শাস্ত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশের হিন্দু সভ্যতা যে বর্ত্তমানে বহুপরিমাণে তান্ত্রিক তা তার দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার অনুশীলন করলে সহজেই বোঝা যায়।

তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি কি পরিমাণে বেদের মধ্যে আছে তা এখনো নির্দ্ধারিত হয় নি। তার কারণ বৈদিক মন্ত্রের অর্থ এখনো সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় বৈদিক মন্ত্রের বহু পরিমাণে শব্দগত অর্থ নির্দ্ধারিত হয়েছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ যে এখনো ধরা যায় নি তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। শব্দগত অর্থ নির্দ্ধারণ করবার জন্য যথেষ্ট বৈদিক উপাদান ছিল, কিন্তু মর্ম্মার্থ উদ্ধার করবার উপাদানের অভাববশতই তা সম্ভব হয় নি। সায়ন-ভাষ্যের মধ্যে মর্ম্মার্থ গ্রহণের উপাদান কিছু যে নাই তা বলা যায় না, তবে তা এত অসংলগ্ন ভাবে রয়েছে যে তার প্রামাণ্য স্বীকার করা অসম্ভব।

বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে যোগসূত্রের অভাব নেই। উভয়েই 'মন্ত্র' এবং সে মন্ত্রশক্তিতে আমাদের বহুদিন ধরেই অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। তা ছাড়া বৈদিক মন্ত্রের মর্ম্মার্থ যে তন্ত্র শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে তাহা প্রমাণ করাও অসম্ভব নয়। ঋক্ মন্ত্রে ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ বৃক্ষের উল্লেখ আছে। এ বৃক্ষকে বর্ত্তমান-যুগের অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিত অশ্বত্থ গাছ মনে করেছেন। বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরা বলেছেন যে সে মন্ত্রে সত্যকার কোন গাছের উল্লেখ নাই এবং সে মন্ত্রের অর্থও স্পষ্ট উপলব্ধি করা অসম্ভব। অথচ এই গাছের উল্লেখ উপনিষদেও নানাস্থানে পাওয়া যায়। যথা মুণ্ডকে—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।'

অর্থাৎ সহবর্ত্তী ও সমান-স্বভাব দুটী সুপর্ণ একই বৃক্ষে সংসক্ত রয়েছে।

সুপর্ণ দুটী যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বৃক্ষটি কি ? শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—অয়ং হি বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিফলাশ্রয়ঃ—অর্থাৎ ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির মূল ঊর্দ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধোদিকে, অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ মূল হ'তে এর উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফলের এ বৃক্ষ হচ্ছে আশ্রয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে এ বৃক্ষের বহু উল্লেখ আছে। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

ওঁকার পূজনা বাক্যং একবৃক্ষাদিরগ্রতঃ।
কোষাভ্যন্তরতঃ স্থানে অন্তবৃক্ষে বিবর্জ্জিতঃ॥
একবৃক্ষেতি সর্ব্বেষাং কথ্যতে ন চ জ্ঞায়তে।
শরীরং বৃক্ষমিত্যুক্তং করশাখাদিযোজিতং॥
বেদান্তেষু চ পঠ্যন্তে তন্ত্র-তন্ত্রান্তরেষু চ।
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ঃ॥
ফলপুষ্পসমন্বিত-বৃক্ষনামেন চোচ্যতে।
গুপ্তবৃক্ষমজানীয়াদ্দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্॥

সুতরাং তন্ত্রমতে বেদ-উপনিষদে উল্লিখিত সে ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষ হচ্ছে দেহমধ্যস্থ গুপ্তবৃক্ষ। এবং সে গুপ্তবৃক্ষ যে কি তা যাঁরা তন্ত্রালোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন।

তন্ত্রে বেদের এই যে মর্ম্মার্থের খোঁজ পাওয়া যায় তা কতটা যথার্থ তা বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু তার ভিতর যে এ মর্ম্মার্থ নির্দ্ধারণের ধারাবাহিক চেষ্টা আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারতপথে *

(১৪)

জীবনের বেশির ভাগ সম্বন্ধেই বলার কিছু নাই, এম্‌নি তা নীরস, তবু অবিশ্যি লোকে বলতে ছাড়ে না, কি মুখের কথায়, কি বইএর পাতায়, ফলে হয় অত্যুক্তি। কাজ কর্ম্ম সামাজিক আদান প্রদান যেন মানুষের তৈরি গুটিপোকার জাল, তারই আড়ালে মানুষের মন থাকে সুপ্ত, শুধু ভালো লাগা মন্দ লাগার পার্থক্য সে করতে পারে কিন্তু যতটা সচেতন ব'লে আমরা ভান করি ততটা সচেতন সে মোটেই নয়। খুব রোমাঞ্চকর দিনেও অনেকখানি সময় এমনি কাটে যখন ঘটবার মতন কিছুই ঘটে না ; মুখে যদিও আমরা বলি, 'কি মজাই না করছি' বা 'বাপরে, কি ভীষণ!' আসলে কিন্তু কিছুই আমাদের মনে হয় না। সত্যি কথা বললে বলতে হয়—'যতটা বুঝি বেশ লাগছে', কিম্বা 'ভয়ানক ব্যাপার' —বাস। আর যার মন স্থির সুস্থ সে এস্থলে একেবারেই নীরব থাকবে।

মিসেস মূর ও মিস কেষ্টেড-এর মনকে নাড়া দেয় এমন কিছু প্রায় একপক্ষ কাল ঘটেনি। অধ্যাপক গডবোলের সেই অদ্ভুত গানের পর তাঁদের দুজনের জীবন কেটেছিল গুটিপোকার জালের অভ্যন্তরে ; এইটুকু শুধু তফাৎ যে বৃদ্ধা নিজের মনের এই উদাসীন অবস্থা বেশ সহজ ভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু তরুণীটির তা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বেচারি এডেলা, তার ছিল এই বিশ্বাস যে এই বিপুল বিশ্বের যা কিছু ঘটে সবই অত্যন্ত সরস, অত্যন্ত মূল্যবান, তাই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলেও সে ভাবত এ তার নিজেরই দারুণ ত্রুটি, আর জোর করে মুখে তাই সে বলত বড় বড় কথা। তার সরল মনে এটুকু ছাড়া আর কোনো অসরলতা ছিল না—বাস্তবিক এ হোলো নিয়তির বিরুদ্ধে তার যৌবনের সজাগ

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আজও নবীন উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

বুদ্ধির প্রতিবাদ। সে একে রয়েছে ভারতবর্ষে, তার উপর বাগ্‌দত্ত অবস্থায়, এই দ্বৈতপ্রভাবে তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত মহীয়ান হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তা না হওয়াতে সে যেন কি রকম দিশাহারা হয়ে পড়েছিল।

বিশেষ করে আজকের সকাল বেলায় ভারতবর্ষকে যেন বিশেষ নিষ্প্রভ বলে দেখাচ্ছিল, যদিও এই দেখার পর্ব্বের উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতবর্ষেরই লোক। এডেলার ইচ্ছাপূরণ হোলো বটে কিন্তু যে সময়ে হওয়া উচিত ছিল তার অনেক পরে। আজিজ বা তার ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে ওর কিছুমাত্র উৎসাহ হচ্ছিল না। অবশ্য ওর বিন্দুমাত্র মন খারাপ হয়নি। বরঞ্চ ওর চার পাশের নানা অদ্ভুত ব্যাপার—মেয়েদের আলাদা গাড়ি, গাদা করা কম্বল আর তাকিয়া, বড় বড় সব তরমুজ, ট্রের ওপর চা ও ডিম পোচ সাজিয়ে মহম্মদ আলির খানসামার গাড়ির গোসলখানার মধ্য থেকে অকস্মাৎ নিষ্ক্রমণ—এই সবই ওর চোখে ঠেকছিল নতুন আর খুব মজার, আর যোগ্য মন্তব্য করতেও ও ছাড়ছিল না, কিন্তু তবু কিছু যেন মনে বসছিল না। এই ভেবে ও সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করল যে অতঃপর ওর জীবনের প্রধান ব্যাপার হবে রণি।

"কি চমৎকার চাকর! কেমন স্ফূর্ত্তি ক'রে সব কাজ করে। আর আমাদের এ্যাণ্টনি, বাপরে!

মিসেস মূরের আশা ছিল একটু ঘুমিয়ে নেবেন, তিনি বললেন, "কিন্তু কি রকম চমকে দিয়েছে, আর চা করারই বা কি অদ্ভুত জায়গা!"

"এ্যাণ্টনিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। প্ল্যাটফরম্-এ কি কাণ্ডটাই করল—এর পর আর ওকে রাখা চলে না।"

মিসেস মূরের মনে হোলো সিমলায় গেলে এ্যাণ্টনি আবার ঠিক ভালো হয়ে যাবে। ঠিক হয়েছিল রণি আর মিস কেষ্টেডের বিয়ে সিমলাতে হবে। ওঁর খুড়তুতো না কি রকম ভাই বোনরা ওখানে ছিল, তাদের বাড়ি থেকে নাকি তিব্বত দেখা যায়, তারা ওঁকে ডেকেছিল।

"যাই হোক, আর একটি চাকর রাখতেই হবে; কেন না, সিমলাতে আপনি তো হোটেলে থাকবেন, আর আমার মনে হয় না রণির বল্‌দেও"…এই রকম জল্পনা কল্পনা মিস কেষ্টেডের বিশেষ ভালো লাগত।

"বেশ, তবে তুমি আর একটি চাকর রেখো, আমি এ্যাণ্টনিকে রাখব। ওর ধরণধারণে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গরম কালটা ওকে নিয়েই আমার চলে যাবে।"

"গরম কাল টাল আমি মানি না। ওসব মেজর ক্যালেণ্ডারদের একটা ফিকির, ওঁরা খালি এই সব বলেন আর ভাবেন যে শুনলে আমাদের ধারণা হবে কি রকম আমরা অসহায় অনভিজ্ঞ—ঠিক যেমন কথায় কথায় ওঁরা বলেন, 'বিশ বছর এই দেশে আছি'।"

"আমি অবিশ্যি গরম খুব মানি, আমাকে যে একেবারে বন্দী হতে হবে, আগে কিন্তু আদৌ তা বুঝতে পারিনি।" মিসেস মূরের আশা ছিল ওদের বিয়ের পরই দেশে ফিরবেন, কিন্তু তার আর উপায় ছিল না, কেন না রণি আর এডেলা পরম জ্ঞানীর মতন ঠিক করেছিল ধীরে সুস্থে কাজ করাই ভালো—অতএব মে মাসের আগে বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু মে মাস পড়তে না পড়তে সারা ভারতবর্ষ আর চার পাশের সাগর একেবারে আগুনের বেড়াজালে ঘিরে ধরবে, সুতরাং যতদিন পৃথিবী আবার ঠাণ্ডা না হয়, হিমালয়ে পালিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এডেলা বল্‌ল, "আমি বন্দী হতে পারব না। এখানে স্বামীরা সব গরমে ঝল্‌সে মরে আর স্ত্রীরা আরামে পাহাড়ে যান—মোটে আমার তা সহ্য হয় না। এই দেখুন না, মিসেস ম্যাকব্রাইড, বিয়ের পর গরমে একটিবারও থাকেননি, বছরের অর্দ্ধেক স্বামীকে ছেড়ে তিনি থাকেন, আর অমন বুদ্ধিমান স্বামী। তারপর কি না স্বামীর সঙ্গে যোগ নাই ব'লে ন্যাকামি করেন।"

"ওঁর যে ছেলেপিলে আছে।"

একটু দমে গিয়ে এডেলা জবাব দিল, "হ্যাঁ, তা বটে।"

"যতদিন না ওরা বড় হয় আর ওদের বিয়ে হয় ততদিন সব প্রথম ভাবতে হবে ছেলেপিলের কথা। তারপরে যেমন খুসি থাকো না কেন—আর যেখানে খুসি, পাহাড় বা সমতল জায়গা।"

"হ্যাঁ, তা' ঠিক, আমি অতটা ভেবে দেখিনি।"

"যদি না একবারে কেউ অথর্ব্ব হয়ে পড়ে আর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।"

চাকরের হাতে তিনি চায়ের খালি কাপটা দিলেন।

"আমার ইচ্ছা এই যে সিমলায় ওরা আমার জন্যে একজন চাকর ঠিক ক'রে দেবে। অন্তত এই বিয়ের টাল সামলানোর জন্যে, তার পর রণি চাকরবাকর সব ব্যবস্থা একেবারে নতুন ক'রে করবে। একা মানুষের পক্ষে ভালোই ও চালায়, তবু বিয়ের পর অদল বদল করতেই হবে—ওর সব পুরানো চাকররা চাইবে না আমার হুকুম মত চলতে, আর আমিও তাদের দোষ দিই না।"

গাড়ির জানালা তুলে মিসেস মূর বাইরে তাকিয়ে দেখলেন। রণি ও এডেলার ইচ্ছামত উনি ওদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর বাড়া পরামর্শ দেওয়া ছিল ওঁর সাধ্যের বাইরে। ধ্যান-দৃষ্টি বা দুঃস্বপ্ন যাই হোক, ওঁর এই কথা ক্রমশ যেন বেশি বেশি ক'রে মনে হোতো যে মানুষের মূল্য আছে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মূল্য তেমন কিছু নাই—আর বিশেষ ক'রে মনে হোতো এই যে বিয়ে ব্যাপারটা বৃথাই এত বাড়ানো হয়েছে, দেহের মিলন ঘটেছে যুগ যুগ ধ'রে, কিন্তু মানুষ তার ফলে কি পরস্পরকে এতটুকু বেশি বুঝতে শিখেছে? আজ এই উপলব্ধি তাঁর মনে এত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল যেন এও একরকম ব্যক্তিগত সম্বন্ধ—যেন একটি মানুষ তাঁর হাত ধরবার চেষ্টা করছে।

"পাহাড়টা কিছু দেখা যাচ্ছে কি?"

"শুধু একটা অস্পষ্ট কালো ব্যাপার আর কিছু না।"

"এইখানেই কোথাও সেই হায়নাটা ছিল।" সেই ধূসর অস্পষ্টতার দিকে ও তাকিয়ে দেখল। ট্রেন একটা নালা পার হচ্ছিল। নিতান্ত আস্তে সাঁকোর উপর দিয়ে এন্‌জিন্ চলার একঘেয়ে শব্দ কানে আসছিল। একশ' গজ পরে আবার একটা নালা, তার পর আবার একটা, বোঝা গেল কাছেই উঁচু ডাঙা আছে।

"বোধ হয় এই জায়গাটা হবে, যাই হোক, রাস্তাটা রেলের পাশাপাশি যাচ্ছে।" সেদিনকার দুর্ঘটনা আজ ওর কাছে একটা সুন্দর স্মৃতিমাত্র, এরই ফলে ওর মনটা বেশ জোর নাড়া খেয়ে বুঝতে পেরেছিল রণির প্রকৃত মূল্য—ওর সরল মনের চিন্তায় আজ শুধু ও এই কথাই অনুভব করছিল। আবার সুরু হোলো জল্পনা-কল্পনা, আবাল্য জল্পনা-কল্পনা ওকে একেবারে পেয়ে

বসন্ত। মাঝে মাঝে বর্ত্তমানের তারিফ যে ও করছিল না তা নয়, যথা, আজিজের বন্ধুপ্রীতির ও বুদ্ধির সুখ্যাতি, পেয়ারা ভক্ষণ, ভর্জিত মিষ্টান্নে অরুচিজ্ঞাপন কিম্বা ভৃত্যদের ওপর নবার্জ্জিত উর্দ্দুর প্রয়োগ ইত্যাদি। কিন্তু ওর চিন্তার ধারা বার বার ঘুরে ফিরে যাচ্ছিল ভবিষ্যতের দিকে—যে ভবিষ্যৎ ওর করায়ত্ত, আর যে ইঙ্গ-ভারতীয় জীবন ও বহন করবে ব'লে বদ্ধপরিকর হয়েছিল তার দিকে। টার্টন বার্টন প্রভৃতি উপচার সমেত এই জীবনকে ও বোঝার চেষ্টা করছিল। ওর চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে ঢিকোতে ঢিকোতে ঝিমোতে ঝিমোতে ট্রেন চলছিল। ব্রাঞ্চ লাইনের এই ট্রেন—কোনো যেন বিশেষ গন্তব্য স্থান তার নাই, আর নাই তার একটি কামরাতে বড়দরের একজনও যাত্রী। দুদিকে একঘেয়ে ক্ষেত, তারই মাঝে উঁচু জমীর উপর লাইন পাতা, তার উপর চলেছে এই ট্রেন—যেন তার অস্তিত্ব আছে কিনা বোঝা দায়। মানে এর একটা অবশ্য ছিল, কিন্তু এডেলা তা ধরতে পারেনি। পশ্চাতে বহুদূরে সশব্দে মেল ছুটছিল—শুনলেই মালুম হয় যে হ্যাঁ একটা কিছু হচ্ছে বটে—কলকাতা লাহোর বড় বড় সহরে সহরে হচ্ছে যোগস্থাপন, সেখানে বড় বড় সব ঘটনা ঘটে আর মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এডেলা একথা বুঝল।

দুঃখের বিষয় বড় সহর ভারতবর্ষে খুব কম। এ হোল শুধু মাঠ আর মাঠ, তারপর পাহাড়, জঙ্গল, পাহাড়, আবার মাঠ, শুধু মাঠ। ব্রাঞ্চ লাইন শেষ হ'লে, তারপর বড় রাস্তা, কিছুদূর পর্য্যন্ত তাতে মোটর গাড়ি চলে, তারপর কাঁচা রাস্তায় গোরুর গাড়ির কঁ্যাচর কঁ্যাচর, মাঝে মাঝে মেঠো পথ ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেছে। হঠাৎ এক ঝলকা লাল রঙের তলায় এই পথের শেষ। এই রকম দৃশ্য কি কখনো মনে ধরে? বিজেতার দল বংশানুক্রমে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যে-বিদেশী সে বিদেশীই তারা থেকে গেছে। বড় বড় সহর তারা বানায়, সেগুলি শুধু তাদের আশ্রয়স্থল মাত্র, তাদের দ্বন্দ্ব কলহ শুধু ঘরছাড়াদের মনের বিকার। ভারতবর্ষ জানে তাদের দুর্দ্দশার কথা, সমস্ত পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা—একেবারে হাড়ে হাড়ে জানে। তাই শতমুখে, তুচ্ছ মহৎ সহস্র বস্তুর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সবাইকে 'এস, এস' বলে আহ্বান করছে। কিন্তু আসবে কোথায়? তার উত্তর পাওয়া যায় নাই। শুধু আছে আহ্বান, প্রতিশ্রুতি নাই।

নির্ভরযোগ্য মেয়ে এডেলা। সে ব'লে চল্‌ল, "ঠাণ্ডা পড়লে আমি সিমলা

থেকে আপনাকে নিয়ে আসব, দেখবেন আপনাকে কয়েদ থেকে সত্যি মুক্তি দেব। তারপর মোগলদের কীর্ত্তিকলাপ কিছু দেখা যাবে—আপনি তাজমহল দেখবেন না এ হতেই পারে না—তারপর বম্বে গিয়ে আপনাকে জাহাজে তুলে দেব। এ দেশকে একেবারে শেষ দেখাটা দেখবেন কি রকম চমৎকার লাগে।”

মিসেস মূরের ততক্ষণে ঘুম এসেছে। অত সকাল সকাল বেরিয়ে তিনি বেজায় ক্লান্ত হয়েছিলেন, শরীরটাও তাঁর ইদানীং ভালো ছিল না, এ রকম হৈ হৈ না করাই ছিল তাঁর পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এসেছিলেন, পাছে তাঁর অভাবে ওদের আমোদ মাটি হয়। যেমন চিন্তা, তেমনি তাঁর স্বপ্ন, শুধু ছেলেদের কথা, কিন্তু অন্য দুটির, র‍্যালফ্ আর ষ্টেলা, কি যেন তারা চায়, আর তিনি বুঝিয়ে বলছিলেন, একসঙ্গে দুই বাড়িতে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁর ঘুম যখন ভাঙল ততক্ষণে এডেলার জল্পনা কল্পনা শেষ হয়েছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বলছিল, “সত্যি, আশ্চর্য্য বটে।”

মারাবার পাহাড় প্রকৃতই অপরূপ, সিভিল ষ্টেশনের উঁচু ডাঙার থেকে দেখলেও, কিন্তু এখানে মনে হয় মারাবার গিরিশ্রেণী যেন দেবসভা আর পৃথিবী একটা প্রেত। সব চাইতে কাছে দেখা যাচ্ছিল কাউয়া দোল—সটান একটা পাথরের চাঙাড় উঠে গেছে একেবারে আকাশে, মাথার উপর একটি শুধু পাথর, যদি অমন প্রকাণ্ড একটি ব্যাপারকে একটি পাথর বলা যায়। এর পিছনে হেলে রয়েছে একটার পর একটা আরো সব পাহাড় যাদের ভিতরে ভিতরে রয়েছে অন্য গুহাগুলি। প্রত্যেক দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সমতলভূমির প্রশস্ত ব্যবধান, তাই পাহাড়গুলি সব বিচ্ছিন্ন। সব শুদ্ধ দশটি এই রকম পাহাড়। পাশ দিয়ে ট্রেন যাবার সময় একটু এরা স'রে গেল, যেন ট্রেনের আগমন লক্ষ্য ক'রে।

উৎসাহের আবেগে এডেলা অত্যুক্তি ক'রে বল্‌ল, “এরকম দৃশ্য না দেখলে জীবন বৃথা হোতো। ঐ দেখুন, সূর্য্য উঠছে, একেবারে তুলনাহীন এ দৃশ্য—শিগ্‌গির দেখুন—এ না দেখলে জীবন সত্যি বৃথা। টার্টনরা আর তাঁদের সেই সনাতন হাতীর অপেক্ষায় থাকলে কি আর এ ব্যাপার দেখতাম।”

এডেলার কথা শেষ হতে না হতে বাঁ দিকের আকাশ ডগ্‌ডগে কমলালেবুর

রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল। গাছের বিচিত্র নক্‌সা, তারই পিছনে হচ্ছিল রঙের স্পন্দন, ক্রমে তার গাঢ়তা বাড়ল, আরো তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একেবারে অসম্ভব উজ্জ্বল, যেন আকাশের গা বেয়ে বাইরে থেকে রঙ চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। এখনই ঘটবে এক অলৌকিক ব্যাপার, স্তম্ভিত হ'য়ে সবাই তার প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু যে পরম মুহূর্ত্তে রাত্রির মরণ ও দিনের জন্মলাভের কথা, কিছু তখন ঘটল না। পূর্ব্বকাশে রঙের খেলা ম্লান হ'য়ে এল, মনে হোলো যেন পাহাড়ের সার আরো অস্পষ্ট, যদিও অনেক বেশি আলো তাদের উপর পড়ছিল। ভোরের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিরাশায় সবাই হোলো অভিভূত। দেবলোকের উৎসে পুণ্যের স্রোত যেন হঠাৎ শুকিয়ে গিয়েছিল। বাসরঘর প্রস্তুত, পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ পথ চেয়ে আছে, কিন্তু কই, শঙ্খধ্বনি হুলুরব সহকারে বরের আগমন সূচিত হোলো না। সূর্য্য উঠল, কিন্তু এতটুকু আড়ম্বর তার নাই—খানিকটা পরে তা' দৃষ্টিগোচর হোলো, হলদে রঙ, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে গাছের পিছনে, কিম্বা জোলো আকাশের গায়ে, মাঠে মাঠে যারা কাজ করছে তাদের লেগেছে তার ছোঁওয়া।

“এ নিশ্চয় আসল সূর্য্যোদয় নয়—রাত্রে আকাশে যে-সব ধুলো জ'মে থাকে তারই জন্যে তো এরকম হয়—না? মিষ্টার ম্যাকব্রাইড বোধ হয় তাই বলে-ছিলেন। যাই হোক, ইংল্যাণ্ডের মতন সূর্য্যোদয় এখানে হয় না স্বীকার করতেই হবে। গ্রাস্‌মিয়ার্-এর কথা মনে আছে?”

“গ্রাস্‌মিয়ার্—মনে করতেও আনন্দ!” সেখানকার ছোট ছোট হ্রদ আর পাহাড় এঁরা কি ভালোই না বাসেন। জায়গাটি অপরূপ কিন্তু আয়ত্তের মধ্যে, আর যে গ্রহে তার উৎপত্তি এদেশের মতন নিষ্করুণ তা নয়। আর এখানে শুধু এলোমেলো খোলা মাঠ, একেবারে গিয়ে ঠেকেছে মারাবারের সানুদেশে।

আজিজ ট্রেনের পিছন থেকে হঠাৎ “গুড্ মর্নিং” বলে চেঁচিয়ে উঠে বল্‌ল, “শিগ্‌গির মাথায় টুপি পরুন, এই সকাল বেলার সূর্য্য মাথার পক্ষে ভারি খারাপ, ডাক্তার হিসেবে আমি বলছি।”

“গুড্ মর্নিং, গুড্ মর্নিং, ম'শায় নিজে টুপি পরুন তো।”

“আমার এ মোটা মাথার কিছু হবে না” ব'লে আজিজ মাথায় এক চাপড় মেরে মুঠো ক'রে চুল উঁচু ক'রে ধরল।

এডেলা বলল, “সুন্দর লোক, না?”

“ঐ শুনুন মহম্মদ লতিফ ‘গুড্ মর্নিং’ বলছে।” তারপর খানিকক্ষণ অর্থহীন তামাসা চল্‌ল।

“আচ্ছা, ডাক্তার আজিজ, আপনার পাহাড়ের কি হোলো? ট্রেন দেখছি থামবার কথা ভুলে গেছে।”

“বোধ হয় এই ট্রেন আর থামে না, চক্কর খেয়ে ঘুরে আবার চন্দ্রপুরেই যায়, কে জানে।”

প্রায় মাইল খানেক সমতল ভূমিতে চ’লে ট্রেন গিয়ে থামল একটা হাতীর কাছে। প্লাটফরম্ একটা ছিল বটে, কিন্তু নিতান্তই সেটা নগণ্য মনে হোলো। কপালে রঙ-মাখা এক হাতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছিল। মহিলাদ্বয় ভদ্রতা ক’রে বললেন, “কি মজা—সত্যি, ভাবিনি!” আজিজ মুখে কিছু বলল না কিন্তু তার আনন্দ আর আশ্বস্তি আর ধরছিল না। এই অভিযানের সব চাইতে জমকালো অঙ্গ হোলো এই হাতী। ভগবান জানেন এর জন্যে আজিজকে কি না করতে হয়েছে। নবাব বাহাদুরের কৃপায় এই হাতীর শুভাগমন হয়েছিল। নবাব বাহাদুরকে ধরতে হয়েছিল আবার নুরুদ্দিনকে দিয়ে। কিন্তু নুরুদ্দিন চিঠিপত্রের জবাব কখনো দেয় না, তবে কিনা ওর মা’র কথা খুব শোনে। ওর মা আবার হামিদুল্লা বেগমের বন্ধু। হামিদুল্লা বেগমের অনুগ্রহের শেষ নাই, নুরুদ্দিনের মার কাছে নিজে তিনি যাবেন ব’লে কথা দিয়েছিলেন, অবশ্য যদি কলকাতা থেকে ওঁর বন্ধ গাড়ির ভাঙা খড়খড়ি ঠিক সময়ে এসে পৌছয় তাহলে। এই রকম লম্বা আর এই রকম সরু সুতোয় যে একটা হাতী বাঁধা পড়বে ভেবে আজিজের মন ভারি প্রসন্ন হোলো, আর তার মনে হোলা মজার দেশ বটে, বন্ধুর বন্ধুরাও এ দেশে কাজে লাগে, আর যা কিছু ব্যবস্থা বলো কোন না কোনদিন তা হবেই, আর যে কেউ লোক হোক না কেন—তার সুখের ভাগ সে পাবেই। মহম্মদ লতিফও বেশ খুসি ছিল, কেন না দুজন অতিথি ট্রেন ধরতে পারেননি, ফলে গোরুর গাড়িতে পিছন পিছন না গিয়ে হাতীর পিঠে হাওদাতেই তার জায়গা হবে। হাতী আসাতে তাদের কদর বেড়ে গিয়েছিল, তাই চাকররাও খুসি ছিল, ফুর্ত্তির চোটে হুড়মুড় ক’রে তারা মালপত্র মাটিতে নামাতে আর প্রাণপণ চীৎকার ক’রে এ ওকে হুকুম করতে সুরু ক’রে দিয়েছিল।

মিষ্টি হেসে আজিজ বল্‌ল, “যেতে এক ঘণ্টা, ফিরতে এক ঘণ্টা, আর গুহাগুলো দেখতে দু’ঘণ্টা অর্থাৎ কিনা তিন।” আজিজের চালচলন মনে হচ্ছিল একেবারে রাজারাজড়ার মতন। “ফেরার ট্রেন ছাড়ে এগারোটায়। আপনারা ফিরে ঠিক রোজকার মতন সোয়া একটায় হিস্‌লপ সাহেবের সঙ্গে গিয়ে টিফিন খাবেন। আপনাদের সব খবর আমি জানি। মাত্র চার ঘণ্টা—এমন কিছু প্রকাণ্ড ব্যাপার নয়—আর এক ঘণ্টা হাতে রাখা হয়েছে অঘটনের জন্যে—আমাদের যা প্রায়ই ঘটে। আমি চাই আপনাদের জিজ্ঞাসা না ক’রে সব কিছু ঠিক করা, তবে, মিসেস মূর বা মিস কেষ্টেড্, আপনারা এই ব্যবস্থার অদল বদল যা চান তাই হবে—গুহা দেখা যদি নাও হয়, কুছ পরোয়া নাই। বুঝেছেন তো? তাহলে এবার এই বন্য পশুটির উপর আরোহণ করুন।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কাব্যের মহত্ত্ব

লংগিন (Longinus)* প্রাচীনকালের রোমসম্রাটদের যুগে বিখ্যাত একজন আলঙ্কারিক। তিনি বলছেন লেখার মহত্ত্ব হল অন্তরাত্মার প্রতিধ্বনি। কবির কবিত্ব তত উঁচু দরের কবির অন্তরাত্মা যত উঁচু দরের। ছোট অন্তরাত্মা দিয়ে বড় কবিত্ব হয় না।

আধুনিক একজন ইংরাজ সমালোচক† এই কথাটি ধরে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে আধুনিক শিল্পসৃষ্টি এবং সমালোচনাসৃষ্টিও বেশির ভাগ অকিঞ্চিৎকর ও ব্যর্থ, কারণ আধুনিক জগতে ঠিক অভাব বড় অন্তরাত্মা।

বাস্তবিক বড় অন্তরাত্মা দূরে থাক, অন্তরাত্মা দিয়ে সৃষ্টি যে কি জিনিষ আজকালকার যুগে আমরা তা একেবারেই প্রায় ভুলে গিয়েছি। আজকালকার সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা প্রধানতঃ হল মস্তিষ্ক, আর না হয় স্নায়ু, অথবা দুইএরই বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ। মস্তিষ্কের কৌতূহল জিজ্ঞাসা আর স্নায়বিক উত্তেজনা ও বুভুক্ষা এই দুইটিতেই সত্তার, চেতনার ও জীবনের সবখানি স্থান অধিকার করেছে, এদের ছাড়া গাঢ়তর গভীরতর যা তা অতলে ডুবে তলিয়ে গিয়েছে। সৃষ্টির দিক দিয়ে, শাস্ত্রের দিক দিয়েও আজকাল নীতি ও তত্ত্ব হল এককথায় art for art's sake—আর্টের জন্যই আর্ট। শিল্পী কোন আদর্শের লক্ষ্যের উদ্দেশ্যের তাঁবেদার নয়, সে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্য আদর্শ—স্বয়ম্ভু, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ, স্বয়ংসিদ্ধ। আদর্শ ত নয়ই, সৌন্দর্য্যও আজকাল শিল্পের বস্তু বা লক্ষ্য নয়। শিল্প কি? শিল্পী যা সৃষ্টি করে! শিল্পী কে? যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন। ভাল কথা। কিন্তু নিজে অর্থ কি? এইখানেই যত গোল—সব নির্ভর করে ঐটুকুর উপর। প্রাচীন যুগে নিজে অর্থ ছিল অন্তরাত্মা, আত্মা—আত্মানং জানথ, know thyself। আজকালকার নিজে অর্থ—নিজের একটা বাহ্য অঙ্গ, মস্তিষ্কগত স্নায়বিক চৈতন্য।

* Longinusএর "us" বিভক্তিটি লাতিন ভাষার বিসর্গ বা "অস্"-এর প্রতিরূপ মাত্র—নরস্ অর্থাৎ নরঃ, যেমন।

† The Decline and Fall of the Romantic Ideal—by F. L. Lucas.

আধুনিকেরা বলেন শিল্প ও শিল্পসৃষ্টির একমাত্র রহস্য হল প্রকাশ, সম্যক-প্রকাশ, সম্যক আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ঔপনিষদ বিরোচনের মত "আত্ম" অর্থে তাঁরা ধরেছেন যদিদং উপাসতে অর্থাৎ "স্নায়ুময় পুরুষ"। তবে স্বীকার্য্য বিরোচনের চেয়ে তাঁরা এক ধাপ এগিয়ে—উপরে বা ভিতরের দিকে—এসেছেন; তাঁরা আবিষ্কার করেছেন অন্নের ও প্রাণের মধ্যবর্ত্তী বা সংযোজক একটা অন্তরীক্ষলোক। প্রাচীন যুগে "আত্ম" অর্থ নিজে বা আপনি নয়—"আত্ম" অর্থ আত্মা অন্তঃপুরুষ।

আধুনিকেরা প্রশ্ন করতে পারেন কবি হতে গেলে সত্যই কি মহান আত্মা বা মহাপুরুষ না হলে চলে না? অতি প্রাচীন কালে কথাটি কিছু হয়ত সত্য ছিল—ব্যাস বাল্মীকি, হোমর পর্য্যন্তও বলা হয়ত চলে। কিন্তু প্রাচীন কালের লাতিন কবি কাতুল্ল,* মধ্যবর্ত্তী যুগের ফরাসী কবি ভিলন, রোমান্টিক যুগের "শয়তানী" কবিদের বেশির ভাগ, ইদানীন্তন যুগের অস্কার ওয়াইল্ড, ভেরলেন, র‍্যামবো কেউই স্বভাবে চরিত্রে মহাপুরুষ কিছুই নন—কিন্তু তাঁদের কবি-প্রতিভা তাই বলে অস্বীকার করতে বা কম বলতে হবে? বরঞ্চ এই কথাই সত্য নয় কি যে ethics আর aesthetics—সদাচরণ আর রসজ্ঞতা দুটি পৃথক জিনিষ—দুটি কখন কখন এক হয়ত হতে পারে—রসানুভবতা মহানুভবতাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠতে পারে—কিন্তু উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ কিছু নাই।

আর্টে যাঁরা মাহাত্ম্য চান আর যাঁরা তা চান না, চান শুধু রসবত্তা—দুটি দলেরই এইখানে একটি বিপুল প্রমাদ এসে দাঁড়ায়। মাহাত্ম্য—মহান আত্মার ধর্ম্ম—অর্থে উভয়েই গ্রহণ করেন সাধারণ নৈতিকতা, আদর্শপরায়ণতা বা বাহ্যজীবনে একটা সুষ্ঠু আচারানুসরণ। আত্মার ধর্ম্ম, অন্তরাত্মার গুণ কিন্তু আমরা সে ভাবে গ্রহণ করি না—এ জিনিষ আচারের, নৈতিকতার অপেক্ষা গভীরতর বৃহত্তর বস্তু। আচার, নৈতিকতা না থাকলেও অন্তরাত্মার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। অন্তঃপুরুষের মহত্ত্ব চরিত্রের সৎগুণাবলীর উপর নির্ভর করে না—ও জিনিষ সত্তার নিভৃত চেতনার স্বরূপ। বাহ্যজীবনে তার প্রকাশ আচারের, অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে নাও হতে পারে—কিন্তু তা ধরা যায় স্বভাবের একটা গতিভঙ্গিতে, জীবন-ধারায় একটা নিভৃত ছন্দে, রঙেরেশে। বায়রণের বাহ্যজীবন কত ক্লেদ কত

* Catullus, এখানেও অন্ত্যের us হল অস্ অর্থাৎ বিসর্গ।

ক্রূরতা কত নীচাশয়তায় পরিপূর্ণ কিন্তু সেই বায়রণই ছুটে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল নিপীড়িতের মুক্তির জন্য। বায়রণ অর্থ এই উদাত্ত মুক্ত প্রাণ—এখানেই তাঁর অন্তরাত্মা—এই অন্তঃপুরুষেরই প্রবেশ স্ফুরিত হয়েছে তাঁর এই কবি-বাণীর মধ্যে—

Jehova's vessels hold
The godless heathen's wine !

কবির কাব্যে তাঁর এই অন্তরাত্মার গৌরবই সবখানি ধরা দেয়—তাই ত বলা হয় রচনারীতি, রচনার চাল কি, না, মানুষের মানুষটি। এ জিনিষের প্রকাশ বিবিধ বহুরূপ। শেক্সপীয়রের অন্তরাত্মা অর্থ বিশালতা উদারতা সাবলীলতা—তাতে যেন জলের গুণ, যে পাত্রে ঢালা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, আধারের যে রঙ সেই রঙেই সে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। মিলটনের অন্তঃপুরুষ সমুচ্চতা, গাঢ়তা গুরুত্ব গাম্ভীর্য্য। দান্তের হল তীব্রতা তীক্ষ্ণতা অপস্যার তেজোময় তপিমা। কালিদাসের সুষমাময়—ঔপনিষদ অন্তরাত্মা জ্যোতির্ম্ময়।

অন্তরাত্মার সত্য সচ্চরিত্র বা নৈতিকতার মধ্যে ধরা দেয় না, বরং তা ধরা দেয় একটা শালীনতার (manners) মধ্যে।* এই শালীনতাই অন্তরাত্মার নিজস্ব ধর্ম্ম। শালীনতার অভাব যা—অর্থাৎ অন্তরাত্মার অভাব যা তাকেই বলা যায় গ্রাম্যতা (vulgarity)। মানুষের অনেক দোষ থাকতে পারে, সে সবই ক্ষমা করা যায়, ভুলে যাওয়া যায় কিন্তু ব্যবহারে গ্রাম্যতা মানুষকে মানুষ পদবীর বাহিরে নিয়ে ফেলে। সেই রকম শিল্পসৃষ্টিতে যদি থাকে শালীনতা—অন্তরাত্মার প্রভাব—তবে অনেক খুঁৎ থাকলেও সে শিল্প হবে সুন্দর মহৎ মূল্যবান। কিন্তু শিল্পে গ্রামত্য গুণরাশীনাশী, তার অর্থ শিল্পের অভাব।

সত্যকার যে কোন শিল্পসৃষ্টির নাম করুন, দেখবেন তার মধ্যে গ্রাম্যতা (vulgarity) কোথাও নাই। বোদেলের, ভেরলেন, অস্কার ওয়াইল্ড—এই সব যাঁরা প্রাকৃত অভিজ্ঞতার অতলে নেমে গিয়েছেন, তবু অন্তরাত্মার শালীনতা তাঁরা কখনো হারান নাই। তাঁদের ভাষা তাঁদের রীতি তাঁদের চলনবলন কোথাও গ্রাম্যতাদুষ্ট নয়। বোদলের ত পুরাপুরি অভিজাত—ক্লাসিকাল—"আরিষ্টো"।

* আমাদের শরৎচন্দ্রকে মনে রাখলে এই পার্থক্যটি বুঝতে কষ্ট হয় না।

পক্ষান্তরে নীতিবাদী ধর্ম্মধ্বজী হয়েও এমন অনেককে দেখা যায় যাঁরা শালীনতা—অন্তরাত্মার সৌরভ—অর্জ্জন করতে পারেন নাই, তাঁদের ধরণধারণে রয়ে গেছে অসংস্কৃতি, গ্রাম্যতা। কারণ এ বস্তুটি বস্তুতঃ শিক্ষা করা, অর্জ্জন করা যায় না—মানুষ তার জন্মের সাথে একে নিয়ে আসে আর এক জগৎ থেকে—cometh from afar—বাহিরে এর প্রকাশ রুচির মধ্যে। গ্রাম্যতার অর্থ রুচির অভাব—মোটা জিহ্বা, যাতে ধান্তের রসের কাছে আঙ্গুরের রস বেশী মূল্য পায় না।

কাব্যে গ্রাম্যতার দুই একটি উদাহরণ দিব কি? লুকাস্ অতিআধুনিক কবি এজরা পাউণ্ডের নাম উল্লেখ করেছেন। ইংরাজীর সাথে গ্রীক লাতিন (তাও আবার ভুল) মিশিয়ে পাণ্ডিত্য বা চাতুরী দেখান, সস্তা অনুপ্রাসের চটক ফলান এসব অতি হীন গ্রাম্যতা ছাড়া আর কি? আমি আমাদের আধুনিকদের কারো নাম করতে চাই না—তবে প্রাচীনতর পূর্ব্বতরদের সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস করতে পারি। মনে করুন লড়ায়ে কবিদের কথা। তাঁদের বেশির ভাগেরই মধ্যে কি ভাষায় কি ভাবে শালীনতার প্রাচুর্য্য কিছু পাই না। অবশ্য বলা যেতে পারে এরকম পুরাপুরি লোকসাহিত্য বা ছড়ার ভিতরে উচ্চাঙ্গ রুচি আশা করা অন্যায়। আমি তাই বলছি—শালীনতার অভাব কি তার উদাহরণ স্বরূপ আমি এদের উল্লেখ করেছি মাত্র। তবুও কৃত্তিবাসও যে এ পর্য্যায়ে নেমে পড়েন নাই মাঝে মাঝে তা বলা চলে না—ধরুন তাঁর অঙ্গদরায়বার, ওতে গ্রাম্য কোন্দলেরই সুর পাই না শুধু? অবশ্য বলা বাহুল্য আদিরস হলেই তা অশালীন বা গ্রাম্য হবে তা মোটেও নয়। কালিদাসের কথা ছেড়েই দিলাম—মহাকবি যাতেই হাত দিয়েছেন তাই সোনা হয়ে গিয়েছে। ভারতচন্দ্র বা বৈষ্ণব কবিরা অনেক অশ্লীল লিখেছেন কিন্তু আমার মনে হয় তা অশালীন খুব কমই হয়েছে বিদ্যাপতির বিখ্যাত

পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব

এ সব কথায় বলার ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে নৈপুণ্য, একটা শালীনতা (urbanity); তাই কথাগুলি কাব্য হয়ে সকল দোষের পারে চলে গিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে গ্রাম্যতা ও শালীনতার সীমানা অনেক সময়ে বড় সূক্ষ্ম—এতটুক্ এদিক ওদিক হলেই এনে দেয় দারুণ পার্থক্য, বৈপরীত্য।

কিন্তু গ্রাম্যতার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ উদাহরণ আমি দিতে পারি। গ্রাম্যতার আদর্শ যিনি, রাজা যিনি—দুর্ভাগ্য তিনি আমাদেরই, ভারতের একজন। তাঁর নাম করা দরকার—কারণ তিনি অনেকখানি কুরুচি সৃষ্টি করে, বিষাক্ত হাওয়ার মত তাকে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখনও যে তাঁর ভক্ত ও পূজারী নাই তা নয়। তিনি হলেন রাজা রবিবর্ম্মা। রবিবর্ম্মার বিষয়গুলি কিন্তু প্রধানত পৌরাণিক অর্থাৎ দেবদেবী, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি জিনিষ নিয়ে। কিন্তু হলে কি হবে? মহৎ জিনিষ তিনি দেখেছেন একান্ত প্রাকৃতজনের চোখে দিয়ে। গঙ্গাবতরণ চিত্রটি স্মরণ করুন। মহাদেব কি রকম? একজন পালোয়ান—গামা কি কিঙ্কর সিং—মাথায় পড়ে-পাওয়া জটা বেঁধে, বাঘছাল পরে, পা ফাঁক করে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আর গঙ্গা—এলায়িত কুন্তলা এক "সিনেমা-ষ্টার" এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে কি glido করে নামছেন বুঝি! আর রঙ্—তাকে শুধু বলা চলে রঙ-চঙ। গ্রাম্যতার চরম আর কোথাও যে এমন মূর্ত্ত হয়েছে তা জানি না। লোকসাহিত্য, লোকশিল্প আছে--সে সব সোজাসুজি গ্রাম্য অর্থাৎ কাঁচা হাতের কাঁচা গড়ন, তাদের কোন উচ্চ দাবি বা দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, অভিনয় করবার মত কিছু নাই। তারা যা, তারা তাই। কিন্তু এখানে যা আছে, তার অনেক বেশী দেবার বা দেখাবার দুশ্চেষ্টা। তাই গ্রাম্যতা দারুণ কটু হয়ে দেখা দিয়েছে।

কবির মহত্ত্ব তাঁর ভিতরের চৈতন্যের মহত্ত্ব। এই ভিতরের চৈতন্যেরই প্রকাশ তাঁর কবিত্ব। এই অন্তশ্চৈতন্য যতক্ষণ তাঁর মধ্যে জাগ্রত সক্রিয় ততক্ষণ তাঁর চলনে বলনে তাঁর শালীনতাকে তিনি হারান না, তাঁর সৃষ্টিতে স্থূল হস্তের অবলেপ পড়ে না। মহাকবি তাদেরই বলি যাদের মধ্যে এ রকম আবরণের সম্পাত প্রায় হয়ই না (যদিও কথায় বলে Homer even nods)—ছোট কবি তাদের বলি যারা এই আবরণকে সরিয়ে ধরতে পারে কেবল কখন কখন। অকবির মধ্যে এ আবরণ এঁটে বসে আছে—একেবারে দৃঢ় অনপনেয় হয়ে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বিভীষণের গান

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাব না কেউ প্রাকারছায়া বা গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে আমরা দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে আজ সন্দিহান।

কবে কোন্‌কালে শ্যামাঙ্গীমাতা স্বর্গগত!
আত্মহনের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, মোরা ধূম্রলকায়।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য! করো খড়্গাহত।

জানি জানি তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, হে জলধরশ্যাম! প্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে গাই,
নয়নাভিরাম! প্রবলমরণে এ রোগ হানো।

বাহুবল তব বিঘটনে জানি প্রাণ বিথারে,
উদ্বায়ু জানি অবনত তব নির্গমে।
ক্ষাত্র দয়ায়, বীরোচিত দানে ধীর দমে
ছত্রপতিরা জলসত্রই মোচন করে
বৈশাখী ঝড়ে, বিদ্যুৎ-কাঁপা নীল ঈথারে।

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যতো।
বক্ষে আঁকড়ি' ধরেছি স্বর্ণসীতারেই,
তেত্রিশকোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি' দেখি
উষারআকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াসাহত।

বিষ্ণু দে

পূর্ণিমা

আকাশে গোটা চাঁদ দেখলেই
তোমার কথা ভাবি, আর
রক্তে আমার বান ডাকে আলাময় প্রবাহের।
ভেবেছি আগে, মূঢ় পৃথিবীর মতো,
তোমার কালাবৈচিত্র্যের সবই আমার জানা।
শুক্লাপ্রতিপদের ক্ষীণারম্ভ থেকে পূর্ণিমার পরিণতিতে সুধু নয়,
কৃষ্ণপক্ষের ক্রমিক ক্ষয়ে
অমাবস্যার অদর্শনেও টান লেগেছে
আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তোমার সান্নিধ্যের।
হঠাৎ কি ঘটে গেলো;
তুমি কি করলে আপন অক্ষদণ্ডে দ্রুত আবর্ত্তন ?
না, আমায় ছিনিয়ে নিয়ে এই ছন্দে-বাঁধা পৃথিবীর
নূপুর-বাজা কক্ষ থেকে,
টেনে নিলে উল্কাগতি জ্যোতিষ্কের বাঁধন দিয়ে ?
নর-লোকের দৃষ্টি-অতীত কি সে দৃশ্য
যেথায় তোমার গোপন সত্তা,
তোমার কামনা-বাসনার অপ্রকাশ উৎস,
হিমগোলকের পূর্ণত্বের রহস্যময় অপরার্দ্ধ।

সৃষ্টি-আদিম অন্ধকারে পেলুম তোমার উলঙ্গ পরিচয়
স্তম্ভিত শিহরিত।
সইবে কেন এ সৌভাগ্য নরলোকের ভাগ্য-অতীত ?
আবার কেন ফিরিয়ে দিলে
পুরাতন পৃথিবীর শৃঙ্খলিত গতিপথে
যার রাত্রি-বেলায় নিত্য চলে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চক্রদোল ?
বিষাদ, সব বিস্বাদ ; আজ যে জানি
তোমার অমাবস্যা ত প্রবঞ্চনা,
কোথায় সেথা আঁধার-ভরা আত্মদান ;
তোমার পূর্ণিমাও যে মেকি,
আধখানা দিয়ে সবখানা বলে' ভোলানো।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

জাতিস্মর

অনেক স্থবির রাত্রি, ক্লান্ত সন্ধ্যা, তিক্ত দীর্ঘ দিন
আর বহু উষাকাল, মধ্যাহ্নের বন্ধ্য দাবদাহ
স্পন্দিত জীবনে এসে স্নায়ু সবি ক'রে গেছে ক্ষীণ,
হৃদয়ে এনেছে যতো জরা আর মৃত্যুর আগ্রহ।

আকাশের অন্ধকারে অগণিত নক্ষত্রের ভিড়
সমগ্র রজনী ভোর জলে'-জলে' স্তিমিত মন্থর,
ছন্নছাড়া জীবনের ছন্দ-সুখ সেও তো স্থবির,
যাতনায় ঝিঁ-ঝিঁ করে স্নায়ুগুলি দেহের ভিতর।

দিন আর রাত্রি ভরে' ছায়াময় কালো ভয়গুলি
শিহরায় আশে-পাশে যেন তারা লুব্ধ অজগর,—
মৃত চাঁদ ভয়ে কাঁপে—তারাগুলি নতশির তুলি'
তাকায় পৃথিবী-পানে, পিপাসায় ম্লান কলেবর।

প্রেম আজ পলাতক। পৃথিবীর ঘৃতাচীর গান
অতীত জোয়ার আর জাগায় না মোর মরলোকে,—
সমুদ্র শুকায়ে গেছে, শুধু তার অন্তিম আহ্বান
বিক্ষোভের বহ্নি-জ্বালা জ্বালে আজো রক্তবর্ণ চোখে।

কবে সে ঘুচিয়া গেছে ঘুমে-ঢালা স্বপ্ন-সয়ম্বর,
আত্মা কাঁপে স্তব্ধ ত্রাসে আকাঙ্ক্ষার স্থূল আমন্ত্রণে,—
হোক সে বিদ্যুৎ-লতা, সম্ভোগের পূর্ণ সরোবর
এড়ায়ে তবুও চলে জলাতঙ্কে তারে সযতনে।

মরুভূর শূন্যপ্রান্তে শব হ'য়ে পাণ্ডু মৃতচোখে
জীবাত্মা খুঁজিয়া ফিরে ক্রোধভরে কার পদধ্বনি,—
হয়-তো বা অজগর নহে সেই অপ্সর-রমণী,
তবু সে বিষাক্ত ফণী মণিহারা অতীতের শোকে॥

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

"মুহূর্ত্তের রিক্ত হাহাকার"

মুহূর্ত্তের রিক্ত হাহাকার
বর্ষ-শেষ পত্র-সম পিঙ্গল পাণ্ডুর।
বন্ধ্যা স্বপ্ন, চির অনুর্ব্বর :

অন্তরের অন্তিম রেখায়,
যেন দূর দিগন্তের ক্ষীণাভ স্বপ্নের
ছায়া ফেলে চন্দ্র শীর্ণকায়।
কত যুদ্ধ, কত হোলি পার হ'ল তবু
শেষ নাহি তা'র,
বর্ষ-শেষ পত্র-সম পিঙ্গল পাণ্ডুর
মুহূর্ত্তের রিক্ত হাহাকার।

মৃত জন্তু চক্ষুসম সব দিন রাত ;
সুপক্ক শস্যের ঘ্রাণ আজি বহুদূরে,
মর্ম্মর মুহূর্ত্তগুলি স্তব্ধ অকস্মাৎ।

মেঘমুক্ত, নীলাভ আকাশ,
দক্ষিণের নব নিমন্ত্রণ,
নির্জ্জন সমুদ্র চুম্বি' নির্জ্জন বাতাস
বসন্তেরে করে আমন্ত্রণ।
তবু হায় সিসা-সম ভারী হ'ল মন,
ব্যর্থ হ'ল দক্ষিণের নবীন মঞ্জরী,
ব্যর্থ হ'ল বনানীর কুসুম কম্পন।

মৃত জন্তু চক্ষুসম সব দিন রাত
চাহে বার বার :
বর্ষ-শেষ পত্র-সম পিঙ্গল পাণ্ডুর
মুহূর্ত্তের রিক্ত হাহাকার।

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

Heredity and Politics—J. B. S. Haldane (Allen and Unwin).

রাষ্ট্রনীতির উপর প্রাণিতত্ত্বের প্রভাব কিছু নূতন নয়। প্লেটোর যুগ থেকেই তা চলে আসছে। মধ্যযুগেও তার প্রভাব দেখা যায়। উনবিংশ শতকে প্রয়োগশীল বিজ্ঞানের ফলবন্ত যুগে হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তায় জীবতত্ত্বের প্রভাব অপ্রমেয়। Darwinism এবং Liberalism সমযুগবর্ত্তী। সক্ষমের উদ্বর্ত্তন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সেই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের কাছে জীবতত্ত্ব-রাষ্ট্রনীতি সমস্যার আবেদন আরও সাম্প্রতিক। অক্ষম এবং দোষদুষ্টকে প্রজননশক্তি রহিত করার আন্দোলন সর্ব্বত্রই চলছে। এর সঙ্গে যে-সব গূঢ় প্রশ্ন এবং সমস্যা বিজড়িত আছে তাদের সমাধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। গত অর্দ্ধশতাব্দীতে—বিশেষ করে গত দুই দশকে—জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যুগপ্রবর্ত্তনকারী উন্নতি হয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে বিশেষ করে উত্তরাধিকার-তত্ত্ব অভূতপূর্ব্ব পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এই নবলব্ধ জ্ঞান একধারে যেমন রাষ্ট্রনীতি ও উত্তরাধিকারতত্ত্বের আলোচনা প্রগাঢ়তর করেছে, তেমনি এই সমস্যার নিরাসক্ত বিজ্ঞানসম্মত বিচারও সম্ভব করেছে। জার্ম্মানির নাৎসী কর্ত্তৃপক্ষরা বলে থাকেন যে তাঁদের ইহুদি-বিতাড়ন-নীতি এবং বন্ধ্যাত্বকরণ জীবতত্ত্ব-ঘটিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা Nordic জাতির সহজাত শ্রেষ্ঠতার কথা ঘোষণা করে থাকেন। তারই জোরে বসুন্ধরা যে তাঁদেরই ভোগ্য তাই প্রমাণ করতে চান। নাৎসীরা যে-নীতিকে কার্য্যে রূপান্তরিত করছেন অন্য অনেকেও সে নীতিতে বিশ্বাস করেন। তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। এই জাতিগত শ্রেষ্ঠতা এবং অনুপযোগীর বন্ধ্যাত্বকরণতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং আলোচনার যে প্রচুর আবশ্যকতা আছে তা সকলেই স্বীকার করবেন।

Haldane-এর নাম বিজ্ঞান-জগতে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সমধিক সুপরিচিত। তিনি একজন বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক এবং তিনি স্পেনে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যোগ-

দান করে আহত হয়েছিলেন। এর জন্যও তাঁর লেখা বইয়ের একটা মূল্য আছে। তিনি গোড়াতেই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় কি তা বলে দিয়েছেন—"I propose in this book to examine certain suggested applications of biology to political science. In particular I wish to examine certain statements regarding human equality and inequality, some of which have been used to justify not only ordinary policy but even wars and revolutions"। সব মানুষ যে সমান নয় এবং জন্মগত ক্ষমতা এবং অক্ষমতা হিসাবে যে অধিকারভেদ আছে সে কথা প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক এবং ভাবুকরা বলে আসছেন। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টট্‌ল্-পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকান বিপ্লবে সাম্য-নীতির অভিষেক হয় এবং ফরাসী বিপ্লবে তার জয় অভিযান সুরু হয়। এই বিপ্লবীযুগের বিশিষ্ট সাম্যনীতির আজ কোন বলবত্তা নেই। সোশালিষ্টদের অনেকে ভুল করে সাম্যনীতিবাদী বলে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান সুযোগ ও সুবিধার দাবী করা এবং প্রত্যেক মানুষ সমান বলা এক নয়। অথচ সোশালিষ্টরা যে বিশিষ্ট রকমের সাম্য দাবী করেন তা ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সাম্যনীতির চেয়ে আরও দূরপ্রসারী। সোশালিষ্টরা যে অসাম্যে বিশ্বাস করেন তা মূলতঃ অর্থ-নৈতিক। অসাম্য-নীতির উপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করেন এমন রক্ষণশীল এবং প্রগতিপরিপন্থী পলিটিশান এবং জীবতত্ত্ববিৎ অনেক আছেন।

Haldane এই সাম্য-অসাম্যনীতি-ঘটিত কয়েকটি প্রচলিত ধারণা বিচার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে আমাদের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে উত্তরাধিকারঘটিত কয়েকটি মতবাদ পোষণ করার এবং সেগুলিকে সমাজে প্রয়োগ করার কোন সঙ্গতি নেই। তিনি পাঁচটি ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১। সমস্ত মানুষ সমান। ২। অনুপযুক্তদের প্রজননশক্তি রহিত করা উচিত। ৩। কয়েকটি শ্রেণীর সহজাত শ্রেষ্ঠতা আছে এবং তাদের দ্রুত উৎপাদন কাম্য। ৪। কয়েকটি জাতির সহজাত শ্রেষ্ঠতা আছে। ৫। বিভিন্ন জাতির রক্তসংমিশ্রণ কাম্য নয়।

সমস্ত মানুষ যে সমান এ কথা কেবল ব্যক্ত, বিকশিত এবং প্রচারিতই

হয়েছে। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বাস্তব প্রমাণ নেই এবং তার সার্থকতা মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক, কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অসাম্য সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। জীবতত্ত্বের একটি বিশেষ শাখারই মানুষের অসাম্য নিয়ে কারবার। প্রজননবিদ্যা বা genetics যদিও প্রধানতঃ সহজাত অসাম্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তবুও তাকে সর্ব্বপ্রকারেরই অসাম্য নিয়ে বিচার করতে হয়। উত্তরাধিকার-তত্ত্ব এরই অন্তর্গত। গত অর্দ্ধশতাব্দীতে—বিশেষতঃ গত দুই দশকে—প্রাণিতত্ত্ব যুগপ্রবর্ত্তনকারী উন্নতি লাভ করেছে। ১৯০৫ সালে Mendel কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কয়েকটি অনুসন্ধানের ফল হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। তার ফলে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অবদানের মধ্যে Weismann-এর doctrine আধুনিকতম। যে পথ দিয়ে উত্তরাধিকার পুরুষ থেকে পুরুষে সঞ্চারিত হয় তিনি সেই পথ আবিষ্কার করেছেন।

এই সব গবেষণার ফলে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের দুটি কারণ থাকতে পারে—প্রকৃতি এবং পালন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রকৃতি এবং পালনের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব কার। এর কোন সাধারণ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি কারণ কার্য্যকর থাকে। এদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াসমূহকে পৃথক করা অতি দুরূহ। কিন্তু পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক প্রথার দ্বারা এই দুটি কারণকে পৃথক করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় একটা জিনিষ প্রকাশ পায় যে Lamarck-কথিত অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্ত্তায় তা সত্য নয়। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্ত্তায় না, স্বাস্থ্য এবং শরীরগত বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তায়। আরও দেখা যায় যে উত্তরাধিকার যেখানেই বর্ত্তমান সেখানেই তা মেণ্ডেলীয় নীতি অনুসরণ করে। সংক্ষেপে মেণ্ডেলীয় নীতি হ'ল এই: যেখানেই এক প্রকারের জীবের দুইটি দল পরস্পরের থেকে সমভাবে এবং অবধারিত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক, সেখানেই cross-breeding পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দেখান যায় যে তাদের বৈষম্যগুলি কয়েকটি নির্দ্ধারিত সংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্ত্তাতে পারে এবং উপযুক্ত cross-এর দ্বারা তাদের প্রত্যেকটিকে অন্যগুলি থেকে পৃথক করা যায়। সন্তানেরা বাপ মায়ের কাছ থেকে কয়েকটি পীড়া এবং বিকলাঙ্গ পায় বটে, কিন্তু সব সন্তানেরাই পায় না। যে-জড়কণার মধ্য দিয়ে

উত্তরাধিকার সঞ্চারিত হয় তাকে genes বলে। বাপ এবং মায়ের কাছ থেকে যারা সদৃশ genes পেয়ে থাকে তাদের homozygotes বলে এবং যারা অসদৃশ genes পেয়ে থাকে তাদের heterozygotes বলে। Homozygoteরা স্বাভাবিক সন্তান প্রজনন করে কিন্তু heterozygoteদের অর্দ্ধেক সন্তান হয় অস্বাভাবিক। আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথমার্দ্ধে লেখক আলোচনা করে দেখিয়েছেন কতরকম অসুখ উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়। কয়েকটি পীড়া আছে যা দু'এক পুরুষে প্রকাশ নাও পেতে পারে। যথা হেমোফিলিয়া। পাঁচ পুরুষ কেটে গেছে তারপর হেমোফিলিয়া প্রকাশ পেয়েছে। অতএব সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক লোকেরা রোগের বাহক হয়। তাহলে হেমোফিলিকের জন্ম নিবারণ করার জন্য স্বাভাবিক লোকের প্রজনন-শক্তি বিনষ্ট করতে হয় এবং চার পুরুষ স্বাভাবিক লোকেরও জন্ম নিবারণ করতে হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে বন্ধ্যাত্ব-করণের দ্বারা জাতির এবং সমাজের উন্নতি এবং উপকার হবে কি না।

গ্রন্থকার বন্ধ্যাত্বকরণের—বিশেষতঃ বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্বকরণের, সমর্থন করেন না। তিনি চান গর্ভনিরোধ প্রচারের দ্বারা দোষযুক্তদের সংসারবৃদ্ধি নিবারণ। তাঁর মতে বন্ধ্যাত্বকরণের বিরুদ্ধে দুটি প্রবল আপত্তি আছে। প্রথমতঃ যদিও পুরুষের বেলায় এর জন্য অস্ত্রোপচার, সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ না হলেও, তুচ্ছ ব্যাপার, স্ত্রীলোকের বেলায় তা নয়। কয়েকটি মৃত্যু অনিবার্য্য। তাঁর মতে রাষ্ট্রের পক্ষে দোষযুক্তদের সংখ্যা কম হওয়ার থেকে মানব জীবনের পবিত্রতা-নীতি পরিশেষে খুব সম্ভবতঃ অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ, যারা বন্ধ্যাত্বকরণ চায় তাদের মনস্তাত্বিক অবস্থা নির্ভরযোগ্যও নয়, কামনীয়ও নয়। মানসিক দোষযুক্তদের বিরুদ্ধে এদের একটা পক্ষপাত জন্মে যায় যা নিছক আবেগজনিত, এবং সহজাত দোষ সম্বন্ধে এদের একটা অদৃষ্টবাদী ভাব থাকে। দুটির কোনটিই বৈজ্ঞানিক নয়। বন্ধ্যাত্বকরণ ছাড়াও অন্য eugenic প্রথা আছে। যথা বিবাহ-নিষেধ ও গর্ভনিরোধ। অনেক ক্ষেত্রে এর থেকেও কমে হয়। এক রকমের উত্তরাধিকারগত বধিরতা আছে যা ৩০।৪০ পুরুষের আগে দেখা দেয় না, যদি না interbreeding হয়। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়-বিবাহ নিষেধ করাই যথেষ্ট হবে। মানসিক বিকারগ্রস্তদের বিষয় জানা যায় যে তাদের অধিকাংশ সন্তান বিকারগ্রস্ত হয় না। অতএব বাপ বা মাকে প্রজননশক্তি হীন করায় একধারে যেমন

কয়েকটি বিকারগ্রস্ত সন্তানের জন্ম রোধ করা সম্ভব হবে অন্যধারে তেমনি তার থেকেও অনেক বেশি সংখ্যার স্বাভাবিক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। হিটলারী জার্ম্মানীর লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্য বন্ধ্যাত্বকরণ-নীতির মূল্য অত্যন্ত সন্দেহ-জনক। উপরন্তু "It is never possible from a knowledge of a person's parents to predict with certainty that he or she will be either a more adequate or a less adequate member of society than the majority।" অতএব এই রকম অনিশ্চিত এবং গণ্ডিবদ্ধ জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে পূর্ব্বপুরুষপারম্পর্য্যের উপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তিকে তার স্বত্ব থেকে নিরর্থক বঞ্চিত করা এবং তার স্বাধীনতা খর্ব্ব করা অর্থহীন এবং অন্যায্য—বিশেষতঃ যখন মৃদুতর ব্যবস্থার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়।

অনুপযুক্তদের বন্ধ্যাত্বকরণের নীতি এমন অনেক প্রশ্নের উত্থাপন করে যার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক জীবনের আদর্শের সমস্ত সমস্যাটাই নিবিড়ভাবে বিজড়িত আছে। কি না করতে পারার অক্ষমতার জন্য "অনুপযুক্তরা" অকিঞ্চিৎকর? বন্ধ্যাত্বকরণ যারা চায় তাদের দাবী কতকটা সমর্থন পায় শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ থেকে। তারা বিশ্বাস করে যে অবস্থাপন্নদের সন্তানদের একটা সহজাত প্রাধান্য আছে। গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করেছেন যে এই ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং এটা কেবল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্ট ধারণাবিশেষ। অবস্থাপন্নদের ভিতর মানসিক বিকারযুক্তরা সমাজের এলাকার মধ্যে আসে না কারণ ধনী-ঘরে তাদের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যেহেতু তা সম্ভবপর হয় না, তাই তারা সমাজের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এটা অল্পমাত্রার বিকার-গ্রস্তদের সম্বন্ধে যতটা খাটে অধিকমাত্রার বিকারগ্রস্তদের বেলায় ততটা খাটে না (যথা বাতুলতা বা সম্পূর্ণ মানসিক জড়তা)। অতএব আমেরিকার মত দেশে এখন যে বন্ধ্যাত্বকরণ হয় তা নিরপেক্ষ হয় না। তথাকথিত অনুপযুক্তরা—এমন কি অল্পমাত্রার বিকারগ্রস্তরাও সমাজের কাজে লাগতে পারে। তার প্রমাণ আছে। অতএব নিরঙ্কুশ অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে মতসর্ব্বস্ব হওয়া যায় না। শারীরিক এবং মানসিক বিকারগ্রস্তদের বন্ধ্যাত্বকরণই যে সমাজের মঙ্গলের জন্য একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠতম উপায় নয় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং যুক্তি গ্রন্থকার দিয়েছেন। মানসিক বিকারগ্রস্তদের প্রজননশক্তি বিনষ্ট করে তাদের আধুনিক

জীবনের নির্ম্মম এবং ক্ষমাহীন সংগ্রামের মধ্যে নিক্ষেপ করা দুর্নীতিক এবং অন্যায়।

শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার্য্য যে নিম্নতর শ্রেণীর চেয়ে professional শ্রেণীগুলি প্রজ্ঞায় এবং বিত্তায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই প্রজ্ঞাগত পার্থক্য সমাজের দুটি প্রান্তস্থিত শ্রেণীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। Professional শ্রেণীগুলি বাদ অন্যান্য অবস্থাপন্ন শ্রেণী নিম্নতর শ্রেণীগুলি অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ নয়। এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন হল যে এই শ্রেষ্ঠতা সহজাত না পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট। পরিবেষ্টনী অবস্থার বৈষম্য যে প্রজ্ঞাজনিত কৃতিত্বের মধ্যে একটা অবধারণীয় পার্থক্য আনতে পারে তা প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু পরিবেষ্টনীকে সমস্তটা পার্থক্যের জন্য দায়ী করা যায় না। "It may be that the differences which are found are largely due to the fact that on the present moment a certain type of intellectual achievement is fairly well rewarded in this country, and that the people who devise intelligence tests happen to be of this particular type of intellectual eminence"। এই সূত্রে আর একটা সত্য প্রণিধানযোগ্য। দেখা যাচ্ছে যে ঊর্দ্ধতর শ্রেণীগুলির উর্ব্বরতা নিম্নতর শ্রেণীগুলি অপেক্ষা অনেক কম। সামাজিক এবং জীবতাত্ত্বিক সাফল্যের এই পরস্পর-বিরুদ্ধতা কিছু আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য নয়। মধ্যযুগেও এর অস্তিত্ব দেখা যায়। এখানেও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জীবতত্ত্বের সম্পর্ক সহজেই দেখা যায়। "If the rich are infertile because they are rich, they might become less so if they were made less rich.......I am inclined to believe inheritance of wealth eugenically undesirable because it tends to make the well-to-do limit their families".

জাতিগত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও বলা চলে না যে এক জাতি আর এক জাতির থেকে সহজাত গুণের জন্য শ্রেষ্ঠ। এইটুকু বলা যেতে পারে যে একটা বিশেষ কোন কাজে একজন ভারতবাসীর থেকে একজন ইংরাজ হয়ত অল্প-বেশি সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্যটুকুও আবার প্রকৃতিগত না পালনগত তা বলবারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। জার্ম্মানির বিশেষ বিশেষ

অংশের লোকেদের মধ্যে চরিত্রগত সামঞ্জস্য নেই। হিটলার-প্রচারিত জার্ম্মান জাতির বিশুদ্ধতা propaganda হিসাবে ফলপ্রদ হতে পারে কিন্তু তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। জাতিগত সহজাত সামঞ্জস্য বলে বিশেষ কিছু নেই। রক্ত সংমিশ্রণও যে অনিষ্টকর তারও কোন প্রমাণ নেই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান জ্ঞান এত গণ্ডিবদ্ধ যে কিছুই নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নেই। এই সম্বন্ধে নাৎসী বৈজ্ঞানিকদের মত শুধু অবৈজ্ঞানিক নয় অনেক স্থলে হাস্যাস্পদ। From the summit of the original Nordic culture of the Stone Age, we have passed through the deep valley of centuries of decadence, only to rise once more to a new height"। বিশুদ্ধ-জাতিতত্ত্বের মুখপাত্র Der Sturmer শুধু অবৈজ্ঞানিক এবং হাস্যাস্পদ নয়, অত্যন্ত অশ্লীল।

বইখানি পড়ে একটা কথা বোধহয় বলা যায় যে এই সমস্ত জাতিতত্ত্ব এবং স্তরবিভাজ্যতা মানবজাতির ভবিষ্যতের পথে প্রচণ্ড অন্তরায় হতে পারে। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীভৎসতম তাণ্ডব এখনও হয়ত আমাদের দেখতে বাকি আছে। কিন্তু তার ফল সম্বন্ধে প্রমত্ত হিটলার-মতাবলম্বী ছাড়া আর কারও কোন সন্দেহ নেই। যে সব বৈষম্যগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন ক্ষমতার মানুষকে স্বতন্ত্র রাখে সেগুলি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সর্ব্বব্যাপী নয়। সম্পূর্ণরূপে অসমঞ্জস লোকেদের এই বৈপরীত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে কর্ম্মভূমিতে সহযোগিতা করার ক্ষমতা সর্ব্বদাই আছে। ব্যক্তিই যখন আদি এবং মূল এর অর্থ সুদূরপ্রসারী।

Haldane পরিষ্কারভাবে জীবতত্ত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁর লেখাতে তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক মত প্রকাশ পেয়েছে বটে কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে কখন আচ্ছন্ন করেনি বা তাঁর সিদ্ধান্তকে বিকৃত করেনি। তাঁর উপসংহারগুলি যথাসম্ভব সংযত এবং নিরাসক্ত। অবশ্য নিরাসক্তিরও একটা সীমা আছে। তা তিনিও স্বীকার করেছেন। তিনি রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জীবতত্ত্বের গুরুত্বে অধিক আস্থাবান নন। তিনি বিশ্বাস করেন যে অদূর ভবিষ্যতে যে-অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটবে তা জীবতত্ত্বঘটিত যে-কোন যুক্তির থেকে প্রবলতর যুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে।

যদিও লেখককে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সকল প্রতিপাদিত করতে হয়েছে, তাঁর লেখা পারিভাষিক কর্কশতার দ্বারা দুষ্পাঠ্য ত হয়নি বটেই, সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয়েছে এবং সহজবোধ্য হয়েছে।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক

সপ্তপর্ণ—শ্রীরাখালচন্দ্র সেন; (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়) মূল্য—দুইটাকা।

কথাসাহিত্যে ছোট গল্পের উদ্ভব খুব বেশী দিনের কথা নয়, ইহার কৌলিন্য-মর্য্যাদা তবুও আজ সভ্যজগতে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। এমন পাঠক বিরল ছোট গল্পে যার অরুচি। এমন কাহিনী-কারও বিরল ছোট গল্পে কৃতিত্ব-অর্জ্জনে যিনি পরাঙ্মুখ। এই অভূতপূর্ব্ব লোকপ্রিয়তার কারণ বহুবিধ, তার মধ্যে দুইটি প্রধান বলিয়া মনে হয়,—লোকশিক্ষার বহুল প্রচার, ও যান্ত্রিকতার চাপে জীবনছন্দের দ্রুতগতি। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ও কল্যাণে সকল দেশেই পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে যাহারা মুদ্রিত অক্ষরমালায় মনের আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে। ইহাদের দাবীপূরণ সাময়িকপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; আর সাময়িকপত্রের সহায়তা না পাইলে ছোট গল্পের প্রসার এত বাড়িতে পাইত কি না সন্দেহ। লোকরঞ্জনে সাময়িকপত্রের অনন্যগতি উপজীব্য ছোট গল্প। শুধু গল্প হইলেই চলিবে না তাহা ছোট হওয়া চাই; একটি বৃহৎ কাহিনীকে বহুদিন ধরিয়া অনুসরণ করিবার সময় বর্ত্তমানে অতিশয় দুর্লভ। যে-আকারের গল্প কর্ম্মস্থানে যাতায়াতের পথে ট্রামে ট্রেনে টিউবে বাসে অনায়াসে পড়িয়া ফেলা যায় তাহারই চাহিদা বেশী।

প্রশ্ন উঠিবে, যাহার জন্ম এরূপ ক্ষণিক সাময়িকতায় তাহাতে স্থায়ী সাহিত্যের কৌলিন্য কি ভাবে সম্ভব। এ প্রশ্ন যে শূন্য-জাত নয় তাহা সহজ-বোধ্য। লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত ছোট গল্পের অধিকাংশই যে দুইবার, এমন কি একবারও, পড়ার অযোগ্য তাহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। আমরা তাহাদিগকে চলিতে চলিতে পড়ি, ও চলিতে চলিতে ভুলি। কিন্তু আকাশের অসংখ্য তারার মাঝে, বনের অজস্র ফুলের ভীড়ে, এমন তারা, এমন ফুল কি

আমাদের চোখে পড়ে না যাহার দিকে আমরা বিমুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি? ছোট গল্পের ইতিহাস স্বধু প্রাচুর্য্যের নয়, ঐশ্বর্য্যেরও; এবং 'সপ্তপর্ণ'-প্রণেতা পরলোকগত রাখালচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব এই যে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাতটি গল্পের সমষ্টি এই গ্রন্থ; পাঁচটি পূর্ব্বে অপ্রকাশিত, দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল 'পরিচয়ে', মাত্র প্রথমটি লেখকের জীবিতকালে ও সম্পূর্ণ অনুমোদনে। লেখক কোনো পরিষ্কার খসড়া রাখিয়া যান নাই, টুকরা-টাকরা কাগজের বিশৃঙ্খলতা হইতে তাঁহার অপ্রকাশিত গল্পগুলিকে উদ্ধার করিতে হইয়াছে। লেখকের শেষ মার্জ্জন-স্পর্শ পাইলে তাহারা কিরূপ দাঁড়াইত কে জানে।

ভূমিকায় লেখা আছে;—"স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৯৭ সালের চৈত্র মাসে, মৃত্যু ১৯৩৪ সালের পৌষে।...খুলনা জেলার সামান্য একটি গ্রামে অতি সাধারণ গৃহস্থের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বৈচিত্র্যহীন বাল্যকালের পর গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তীক্ষ্ণ মেধাবী বালক অসীম অধ্যবসায়ে সাধারণের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১৯ সালে ইতিহাসে এম্ এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও সেই বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মনোনীত হন। দুই বৎসর অক্‌সফোর্ডে কাটাইয়া ১৯২১ সালে সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। তারপর তের বৎসর নানা জেলায় সসম্মানে বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৪ সালে আলিপুরের এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকার সময় মৃত্যু হয়।"

'সপ্তপর্ণে'র সাতটি গল্পে আপেক্ষিক তারতম্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি গল্পও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। প্রত্যেকটি আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধ। বিষয় নির্ব্বাচনে লেখকের বৈচিত্র্য লক্ষ্য-যোগ্য। বাংলার পল্লীগ্রামে সামান্য গৃহস্থ ঘরের বালিকাবধূ, চঞ্চল কৌতূহলী বৌদি-প্রিয় বালক দেবর, কুলটা নারী, স্বদেশপ্রাণ সন্ত্রাসবাদী কর্ম্মী, আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের নরনারী, মাঝির ঘরের অভীপ্সা-প্রবণ মাতৃভক্ত যুবক, ফরাসী নারী ও তাহার স্প্যানিশ প্রণয়ী, বাঙালী ভ্রমণকারী ও তাহার য়ুরোপীয় সহযাত্রী—একই গ্রন্থে

ইহাদের সমাবেশ নিশ্চয় সাধারণ ঘটনা নয়। অথচ, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, কষ্টকল্পনার আভাস অতিমাত্রায় কম। ইহার কারণ, ছোট গল্প রচনায় রাখালচন্দ্রের হাত ওস্তাদ শিল্পীর মতো পাকা। তিনি ঘটনা গাঁথিতে জানেন, চরিত্র আঁকিতে জানেন, আর জানেন কি ভাবে একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিতে হয় যাহাতে ঘটনা ও চরিত্র আপনা হইতে খাপ খাইয়া যায়। মনে পড়ে, ষ্টীভন্‌সন্ একবার তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—তিনি যতদূর জানেন তাহাতে মাত্র তিনটি প্রকারে গল্প রচনা সম্ভব। আগে ঘটনা গাঁথিয়া তাহাতে চরিত্র যোজনা করা; অথবা, চরিত্র নির্ব্বাচন করিয়া তদনুযায়ী ঘটনা সাজানো; অথবা, একটি ভাবমণ্ডলকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ঘটনা ও চরিত্রের সাহায্যে তাহাকে ফোটাইয়া তোলা। ষ্টীভন্‌সন্-কথিত তিনটি পন্থার অনুকূল নিদর্শন রাখালচন্দ্রের রচনাবলীতে প্রচুর পাওয়া যায়।

'সপ্তপর্ণ' আরো সাক্ষ্য দিবে, রাখালচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের নানামুখ বিকাশ ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও উপভোগ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল কবির মতো; মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিত নাট্যকারের মতো; সামাজিক সমস্যার জটিলতা তাঁহার মস্তিকে স্থান পাইত দার্শনিকের মতো; পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য তাঁহাকে টানিত অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মতো। নরনারীর সম্বন্ধ লইয়া তিনি অনেক মাথা ঘামাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার মাধুর্য্যে কখন তিনি মুগ্ধ, তাহার মিথ্যায় কখন তিনি তীব্র; তাঁহার সজাগ মন প্রেমের কোনো একটি বিশেষ দিককেই অদ্বিতীয় বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে রাখালচন্দ্রের গল্পগুলি গল্পই, নিছক রসোত্তীর্ণ গল্প; মনীষার বিচিত্র ইঙ্গিত সত্ত্বেও তাহারা কখনও আত্মপ্রকাশ হইতে আত্মপ্রচারের নিম্নস্তরে অধঃপতিত হয় নাই তাঁহার অটুট সীমাজ্ঞানের প্রভাবে। রাখালচন্দ্রের অকালমৃত্যু বঙ্গ সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি। সান্ত্বনা এই, 'সপ্তপর্ণ' তাঁহার অকালমৃত্যুকেও জয় করিয়াছে। এখন হইতে বাংলা সাহিত্যে এমন শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন কল্পনা করা অসম্ভব রাখালচন্দ্রের 'সহযাত্রী' যাহাতে আপন গৌরবের আসনটি পাইবে না স্বকীয়তার মহিমায়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

A Philosophy For A Modern Man—by H. Levy (Gollancz)

বিলাতের বৈজ্ঞানিক ও সুধীসমাজে লেভির নাম সুপরিচিত কিন্তু বিলাতের সুধীজনোচিত বাস্তব সংসার সম্পর্কে অনাসক্ত মনোভাব তাঁহার আদপেই নাই। তাঁহার লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'Science In An Irrational Society' নামে পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত হইয়া পড়ে। সংসারের সমস্ত সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া দর্শনের ভাবসৌধ রচনা করাই যেখানে ফ্যাশন্ ছিল, সেখানে দর্শনকে কঠিন মৃত্তিকার উপর নামাইয়া তাহাকে বাস্তব জীবনের অতিশয় বাস্তব সমস্যাগুলিকে সমাধান করিবার উপায় হিসাবে ব্যবহার করাকে ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতসমাজ ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে করিতেন। বিগত শতকে মার্ক্স ফয়ারবাখের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য কয়েকটি লিখিয়া এবং তাঁহার দার্শনিক লেখাগুলির মধ্যে পুরানো দর্শনের স্থানে নূতন দর্শনের ভিত্তিস্থাপনা করিয়া পণ্ডিত সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া গিয়াছিলেন, বিলাতী পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে বিস্মৃতির নরকে নির্ব্বাসন দিয়াছিল এবং আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত কান্টের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছিল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিলাতের পণ্ডিত-মহল কেবলমাত্র চর্ব্বিতচর্ব্বণ ছাড়িয়া দর্শনের আসর গরম করিয়া তুলিয়াছেন। একদিকে দার্শনিক বস্তুতন্ত্রবাদ বা ডায়েলেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিস্‌ম্ এবং অপর-দিকে অজ্ঞেয়বাদ ও যুক্তিবিরোধী বিশ্বাসবাদ, এই দুই দার্শনিক ধারা বিলাতী সমাজের দ্বিধাবিভক্ত স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। লেভি বর্ত্তমান পুস্তকে আধুনিক মানুষের দর্শন কি হইতে পারে, তাহারই দিক্‌নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার রচনা একদেশদর্শী নহে, তিনি বাস্তব জগৎ সম্পর্কে তাঁহার মতটিকে যুক্তি ও তথ্যের উপর দাঁড় করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি অপর পক্ষীয় মতবাদের ব্যাখাও দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভিক্টোরীয় ও জর্জ্জীয় যুগে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন অনাসক্ত মনোভাবেরও চমৎকার ব্যাখা দিয়াছেন। অবশ্য এই ব্যাখ্যা ডায়েলেক্‌টিক্ মেটিরিয়ালিষ্ট্‌দের নিকট নূতন নহে, তথাপি প্রকাশভঙ্গীকে যথেষ্ট সরল করিয়া তিনি এই দার্শনিক মতবাদকে সাধারণের বোধগম্য করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিলাতী পণ্ডিত-সমাজের যে অল্পসংখ্যক কয়েকজন দর্শনকে পণ্ডিতদের ভাববিলাসের ক্ষেত্র হইতে নামাইয়া মানব সমাজের দৈনন্দিন বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে সন্ধানী

আলো হিসাবে ব্যবহার করিবার সাহস রাখেন, লেভি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগামী একজন।

কয়েকটি মোটা তথ্যের উপর দার্শনিক বস্তুতন্ত্রবাদের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে; প্রথম জগতের অস্তিত্ব, দ্বিতীয় ইহার পরিবর্ত্তনশীলতা এবং তৃতীয় জীবন ও চিন্তাশীলতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বস্তুর অস্তিত্ব। বস্তু বা matter সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি আধুনিক জনকয়েক বৈজ্ঞানিকের অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে পদার্থ-বিদ্যা ও আণবিক গঠন সম্পর্কে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বস্তু বা matterকে মোটেই উড়াইয়া দেয় নাই, অপর পক্ষে ঐগুলি বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক বেশী পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

লেভির পুস্তকে একটা নূতন কথা পাওয়া যায় যাহা ডায়েলেক্‌টিক্ মেটিরিয়া-লিস্‌মের আর কোনও লেখক পূর্ব্বে ব্যবহার করেন নাই। Isolate কথাটি ব্যবহার করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মোদ্দা কথাটি বেশ পরিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান-প্রণালী আরম্ভ হয় ব্যষ্টিকে তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় বাস্তব পরিবেশের অন্তর্গত ব্যষ্টির উপর তাহাদের হুবহু আরোপে ভুল হইবেই। বস্তুর qualities বা গুণাবলী যে অপরিবর্ত্তনীয় নহে, তাহারই বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিতে করিতে তিনি subjective ও objective অস্তিত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। Statistical isolate-এর ধারণাটি আনিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে law ও probability দুইটিকেই statistical isolate হিসাবে দেখা যায় এবং উহারা objective অর্থাৎ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। এই দিক দিয়া তিনি আধুনিক Indeterministদের law বা probability সম্পর্কে মতবাদের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। লেনিন তাঁহার Materia-lism and Empiro-Criticism-এ মাখ্, এভেনেরিয়াস ও পিয়ার্সন্ প্রভৃতির যুক্তি যে ভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, লেভি সেই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর positive formulation দিয়াছেন। বর্ত্তমানে যেখানে বহু বৈজ্ঞানিক causa-lity ও law সম্পর্কে নিউটনীয় formulation-এর বাহিরে আসিতে পারেন নাই এবং dynamical ও statistical law লইয়া মাথা ঘামাইয়া হয় Inde-

terminist হইয়া উঠিয়াছেন না হয় জোর করিয়া Mechanist থাকিতেছেন, তাঁহারা causality ও law সম্পর্কে dialectical formulation-এর আলোতে আসিতে পারিলে বাঁচিয়া যাইতেন। অবশ্য তাঁহাদের না আসিতে পারার পশ্চাতে গভীর সমাজতাত্ত্বিক কারণ রহিয়াছে। যাহা হউক লেভি এই ডায়েলেক্‌টিক্যাল formulation-এর মোদ্দা কথা ঠিকই ধরিয়াছেন। তাই পৃথিবী তাঁহার কাছে অবোধ্য গোলোকধাঁধাও নহে এবং মরীচিকাও নহে। দর্শনের সন্ধানী আলোকে তিনি প্রকৃতি ও তাহার অভ্যন্তরস্থ মানবসমাজের জটিলতার গ্রন্থিমোচন করিতে সমর্থ। তাঁহার দর্শন শুধু ব্যাখ্যাই করে না, উহা সমাজকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার সাহস ও প্রেরণা দেয়। সামাজিক জীবনের স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি theory ও practice-এর সম্পর্ক নিরূপণ করিয়াছেন এবং theory ও practice-এর unity প্রমাণ করিয়া আধুনিক মানুষকে আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রসর হইবার পাথেয় দিয়াছেন।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী
ভর্তৃহরি কৃতম্ বৈরাগ্যশতকম্
স্তব-সমুদ্রঃ—প্রথম প্রবাহঃ
উদ্ভট-শ্লোক-মালা

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া জেলায় অনেক খ্যাতনামা কবি ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে 'রস-সাগর' নামে পরিচিত কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী একজন স্বভাব-সিদ্ধ কবি ছিলেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভায় তাঁহার যাতায়াত ছিল, এবং সেখানেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ সমস্যাপূরণ কবিতার রচনা ও প্রকাশ করেন। সাধারণ পাঠকের নিকটে তাঁহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও, তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও সমস্যাপূরণ-শক্তি সত্যই প্রশংসার বিষয়। যাঁহারা প্রাচীন ও উদ্ভট কবিতার অনুরাগী তাঁহাদের কাছে রস-সাগরের স্থানীয়, ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক তথ্য-সম্পৃক্ত কবিতাগুলি সমাদর লাভ করিবে। দ্রুত রচনা হইলেও তাহাদের মধ্যে রস আছে। পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় অনেক কষ্ট করিয়া তাহাদের উদ্ধার ও সঙ্কলন করিয়াছেন, সে জন্য তিনি পুরাতন আখ্যানপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। আর একটি কথা এই যে, কবিতাগুলি ফরমায়েসী সমস্যা-পূরণ হইলেও, তাহাদের সাহায্যে আমরা যে তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের চিত্র পাই, তাহার মূল্য নিতান্ত কম নয়।

ভর্তৃহরি-কৃত বৈরাগ্যশতক একশত শ্লোকের সমষ্টি হইলেও পূর্ণবাবু অতিরিক্ত তেইশটি শ্লোকের সযত্ন পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্ত-লিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদক মহাশয় 'বৈরাগ্যশতক' প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্যক্তিগত কারণে সংসারে বীতস্পৃহ, সুপণ্ডিত, রাজসাধক ভর্তৃহরি পার্থিব নশ্বরত্ব লইয়া এ গ্রন্থ রচনা করেন। মায়াত্যাগ বৈরাগ্য এ কাব্যের মূল সূত্র; সেই কারণে নিত্যানিত্য-বস্তুবিচার, বিষয়-পরিত্যাগ প্রভৃতি দশটি বিষয় লইয়া কবি শ্লোকগুলি রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে সংসারে বিতৃষ্ণা, ও নারী-ব্যবহারে অনাস্থা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণবাবুর সম্পাদনায় কৃতিত্ব আছে। তুলনামূলক বিশুদ্ধ পাঠ ও ভাবরক্ষা, বঙ্গানুবাদ ও রাজকবির অনতিদীর্ঘ জীবনচরিত সন্নিবেশিত করিয়া সম্পাদক আপনার শ্রমসাধ্য সংস্কৃতানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

বিপৎ-কালে আরাধ্য-দেবতার নিকটে খেদ-প্রকাশ ও দুঃখ-লাঘবের প্রার্থনা সহজাত প্রবৃত্তি। পুরাকালে বাল্মীকি, বেদব্যাস ও স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও এইরূপ প্রার্থনা করিয়া স্তব-রচনা করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের নামেও অনেকগুলি অনুরূপ স্তব প্রচলিত আছে। 'স্তব-সমুদ্রে'র প্রথম প্রবাহে এই সমস্ত প্রাচীন স্তব একত্র করা হইয়াছে। শ্লোকগুলি বঙ্গ ও দেবনাগর উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশে এই স্তুতিগুলি অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ছন্দঃ-সাম্য রক্ষা করিয়া পদ্যে অনূদিত হওয়াতে 'স্তব-সমুদ্রঃ' হিন্দু পাঠকের আদরণীয় বস্তু হইবে। উপরি-উক্ত গ্রন্থ তিনখানি সঙ্কলন-বিশেষ হইলেও সম্পাদক মহাশয় যে নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসার বিষয়।

'উদ্ভট শ্লোকমালা' পূর্ণবাবুর স্বাধিকৃত বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থ এবং আরও বিশদ ভাবে প্রকাশিত 'উদ্ভট-সাগর' তাঁহার আজীবন সাধনার ফল, একথা গুণজ্ঞ ও রসবেত্তা সকলেই জানেন। উদ্ভট-কবিতা পূর্ব্বে প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পরম আদরের বস্তু ছিল এবং তাঁহাদেরই অকৃত্রিম অনুরাগফলে সেই সূক্তি বা সুভাষিতাবলী আজিও মুখপরম্পরায় বাঁচিয়া আছে। পূর্ণবাবু বহুকাল ধরিয়া সুবচনরাজি সংগ্রহ করিয়া অসিতেছেন। গ্রন্থাকারে তাহাদিগকে সন্নিবদ্ধ করিয়া তিনি আপনার বিদগ্ধ সাধনারই পরিচয় দিয়াছেন।

উদ্ভট শ্লোকের উৎপত্তি লইয়া নানা জনশ্রুতি আছে। কেহ কেহ বলেন কোন বিশিষ্ট বিষয় লইয়া একাধিক কবি বিভিন্ন সময়ে যে শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ভট কবিতা। কাহারও মতে ইহা মহাত্ম-রচিত কবিতা-বিশেষ। কেহ কেহ বলেন উদ্ভট অর্থে উৎকৃষ্ট কবিতা বুঝায়। আবার মতান্তরে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের রাজসভায় কবি ভট্টোদ্ভট অথবা উদ্ভটাচার্য্য যে সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ভট কবিতা নামে পরবর্ত্তী কালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, উদ্ভট-কবিতা যে সংস্কৃত সাহিত্যরাজ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, সে বিষয়ে সুধিজনের মতদ্বৈত নাই। তবে এই মহাজন-রচিত শ্লোকমালার যথাযথ ভাবগ্রহ বিষয়ে অনুপপত্তি আছে। প্রথম কারণ বিষয়বস্তুগুলি অতিবিস্তৃত। গণিত, প্রহেলিকা, নীতিবাক্য ও সমস্যা-পূরণ লইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর দুরূহ কবিতা আছে। দ্বিতীয় কারণ, শ্লোকগুলি প্রবাদ-বাক্যের মত সংক্ষিপ্ত, গূঢ়ার্থ ও গাঢ়বন্ধ। তাহাতে শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতি নানাজাতীয় অলঙ্কার আছে। তৃতীয় কারণ—বহুদিন ব্যাপী ও বিভিন্ন দেশবিস্তৃত প্রচলনের ফলে শ্লোকগুলির প্রকৃত পাঠোদ্ধার অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভিন্নরুচি পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের পাঠের বহু পার্থক্য ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ণবাবু যতদূর সম্ভব সেগুলির তুলনা করিয়া, বিশুদ্ধ পাঠ ও তাহাদের প্রকৃত ভাব লইয়া সরল পদ্যানুবাদ-সহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বইখানিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পাঁচশত শ্লোক আছে। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত শ্রীচন্দ্রমোহন তর্করত্ন-সঙ্কলিত উদ্ভটচন্দ্রিকা এ-বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তাহাতে অন্বয় ও টীকা থাকিলেও পূর্ণবাবুর সংস্করণে শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য অবগতির পক্ষে অধিকতর সুবিধা প্রদত্ত

হইয়াছে। উপরন্তু, রচয়িতৃগণের নামোল্লেখ, বিষয়ানুসারে সুসজ্জিত শ্লোকগুলির শ্রেণীবিভাগ, পরিশিষ্ট-অংশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতার প্রকাশ, স্থানোপযোগী পাদটীকা, ব্যাখ্যা, ছন্দোবিচার ও সরস ভূমিকা-সংযোগে 'উদ্ভট-শ্লোকমালা' আদ্যন্ত সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত রীতির প্রবর্ত্তনা করিয়াছে। গ্রন্থখানি কোনো পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের অনুকৃতি নয়, সঙ্কলন হইলেও ইহা গ্রন্থকারের মৌলিক পরিশীলনের পরিচায়ক।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Rains Came—by Louis Bromfield (Cassell).

একখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানির নামের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—A novel of modern India—আধুনিক ভারতের উপন্যাস।

উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটেছে রাঁচিপুরে, একটি কল্পিত দেশীয় রাজ্যের ভিতর। পাত্র ও পাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—টম্ র‍্যান্সাম্, রাঁচিপুরের মহারাজা ও মহারাণী, মেজর সাফ্কা, মিস্ ম্যাক্ডেড্, স্মাইলি সাহেব ও তাঁর স্ত্রী, ফার্ন্ সাইমন্, মিসেস্ ফিবি ব্যাস্কোম্ব্, লর্ড হেষ্টন্ ও তাঁর স্ত্রী। ছোটখাট পাত্র পাত্রীদের মধ্যে আছে রসিদ, অবনত সম্প্রদায়ের নেতা জোবনেকর, মিঃ ও মিসেস্ সাইমন্, মিসেস্ হগেট-ক্ল্যাপটন, মিঃ ব্যানার্জী ও তাঁর স্ত্রী, মিস্ ডার্কস ও মিস্ হজ।

উপন্যাসের নায়ক বলতে টম্ র‍্যান্সাম্কে বলতে পারা যায়। তিনি একজন এ্যাংলো-এমেরিকান। যৌবনে যুদ্ধে যোগদান ক'রেছিলেন। বেশ টাকাকড়ি থাকায় জীবিকা অর্জ্জনের ভাবনা বা চেষ্টা নাই। বিবাহও হয়েছিল, কিন্তু মনের মিল না হওয়াতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তেও বেশী দেরি লাগেনি। তারপর নানা জায়গায় বেড়িয়ে শেষে রাঁচিপুরে এসে উপস্থিত হন।

টম্ র‍্যান্সাম্ ছাড়া আর যে সব পাত্রপাত্রী আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয় আমেরিকান নয় ইংরেজ। ভারতীয় পাত্রপাত্রীগণের মধ্যেও প্রায় সবাই বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত, আর বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হ'লেও পুরাদস্তুর বিদেশী ভাবাপন্ন। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁর ধমনীতে বিদেশী রক্ত

প্রবাহিত। পুলিশের বড় কর্ত্তা রসিদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী ছিলেন।

এই সব পাত্রপাত্রীদের নিয়ে গঠিত উপন্যাসকে কতটা আধুনিক ভারতবর্ষের উপন্যাস বলা যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলি যদি ভারতবর্ষে না ঘটে অন্য কোথাও ঘটত এবং উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে যারা ভারতীয় তাদের নাম বদ্‌লে যদি কতকগুলি ইংরাজের নাম বসিয়ে দেওয়া যেত তাহ'লেও, দু'এক ক্ষেত্র ছাড়া, বিশেষ অশোভন বা অস্বাভাবিক মনে হত না। ধরুন, রাঁচিপুরের মহারাণীর কথা। যদিও বিদেশে তিনি শিক্ষালাভ করেন নি, তাহ'লেও বিদেশীভাবে তিনি এত অনুপ্রাণিত যে স্বামীর অগোচরে টম র‍্যান্‌সাম্‌, মেজর সাফ্‌কা প্রভৃতি পরপুরুষের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি ধরে তাস খেলে থাকেন। এ ছবি যেন ইয়োরোপের অভিজাত ঘরের কোন মহিলার ছবি ব'লে মনে হয়।

তা' ছাড়া লেখক হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু সম্প্রদায়কে বোঝবার বিশেষ কোন চেষ্টা ক'রেছেন বলেই মনে হয় না। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ঢুকেছে তার ওপরই তাঁর নজর বেশী, ভাল দিকটার দিকে দৃষ্টিপাত করবার ইচ্ছার অভাবই তাঁর লেখার মধ্যে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহারের কথা তিনি দু'চার সময়ে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তাতেও দেখা যায় যে তিনি যা লিখেছেন তা সব সময়ে সত্য নয়। এমন কোন হিন্দু আছেন কি না আমরা জানি না যিনি প্রত্যহ কালীর নিকট ছাগবলি দেন। যদি এমন কোন হিন্দু থাকেন, তাহ'লেও ছাগের রক্তে কালীমূর্ত্তিকে রঞ্জিত করবার কথা নিতান্ত উদ্ভট বলেই মনে হয়। কিন্তু লেখক মিঃ ব্যানার্জী সম্পর্কে সেই কথাই লিখেছেন (২৪৯ পৃষ্ঠা)। তারপর মিঃ ব্যানার্জীর পিতার সৎকারের পর মিঃ ব্যানার্জীর মাথার চুল ছাই মাখা হবে কেন তাও বোঝা গেল না। সন্দেহ হয়, গ্রন্থকার মিস্ মেয়ো এবং মিস্ মেয়ো জাতীয় লেখক লেখিকাদের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। হিন্দুদের অনেক দোষ থাকতে পারে ও আছে ; হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেও অনেক গলদ্ ঢুকে থাকতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের এবং হিন্দুধর্ম্মের একটা ভাল দিকও আছে। এই ভাল দিক্‌টার দিকে একেবারে না তাকিয়ে যে বই লেখা হয়, সে বইকে আমরা আধুনিক ভারতের প্রকৃত চিত্র ব'লে মেনে নিতে পারি না।

উপন্যাসখানি প'ড়ে, আর একটি প্রশ্নও আমাদের মনে উদয় হয়। লেখকের কি ইচ্ছা যে ভারত ইয়োরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠুক ? মেজর সাফ্‌কা প্রভৃতি যে সব ভারতবাসী যত বেশী এই আদর্শ গ্রহণ করতে এবং এই আদর্শ অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করতে পেরেছে, তারা তত বেশী লেখকের অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করেছে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজ ইয়োরোপের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজের মোটেই অনুরূপ নয়। কাজে কাজেই ইয়োরোপের আদর্শ ভারতবর্ষের পক্ষে কতটা উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ভারতের একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। এই বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে গঠিত হ'তে চেষ্টা করা ভারতের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কি না, তাও তর্কের বিষয়। পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে পাওয়া যায়—যে উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র টম র‍্যান্‌সাম্‌, লেডি হেষ্টন্, মেরিয়া লিসিনস্কায়া প্রভৃতির চরিত্রে লেখক আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন, সেই উচ্ছৃঙ্খলতায় ভারতীয় সামাজিক জীবনও অভিশপ্ত হ'ক এরূপ ইচ্ছা কোন ভারতবাসীই, বোধ হয়, করে না। পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ আধুনিক ভারতের অভিপ্রেত নয়। আধুনিক ভারত চায়—নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না ক'রে পাশ্চাত্যের যতগুলি সদ্‌গুণ গ্রহণ করতে পারা যায়, তাই গ্রহণ করতে।

আধুনিক ভারতের সঙ্গে বইখানির সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে যদি পড়া যায়, তা হ'লে প্রথমে আমাদের নজরে পড়ে লেখকের চরিত্র বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা। বইখানিতে অনেকগুলি চরিত্র আছে, কিন্তু চরিত্রগুলি এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে সবগুলিরই উপর একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। গল্পটি জটিল নয়। রাঁচিপুরে আসেন লর্ড হেষ্টন্ ও তাঁর স্ত্রী। এই সময় হ'ল একটি ভীষণ ভূমিকম্প, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন। অনেক ঘরবাড়ী হ'ল ভূমিসাৎ, হাজার হাজার লোক গেল মারা। যাঁরা রক্ষা পেলেন, তাঁদের চরিত্রেরও হ'ল এক অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় র‍্যান্‌সাম্‌, মিঃ ও মিসেস স্মাইলে, লেডী হেষ্টন্, ফিবি ব্যাসকুম্ব প্রভৃতি উত্তীর্ণ হ'লেন সসম্মানে। তাঁরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে লেগে গেলেন আর্ত্তসেবায়। আর মিসেস সাইমন, মিসেস্ হগেটক্ল্যাপটন, মিঃ ব্যানার্জী প্রভৃতি লোক কত অপদার্থ ও অন্তঃসারশূন্য তাও প্রমাণ হ'য়ে গেল। রাঁচিপুর আবার নূতন ক'রে গড়ে উঠতে লাগল। গল্পটি এমন ভাবে

লেখা যে প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব বেশ ফুটে উঠেছে। শুধু একটি জিনিস আমাদের মনে হয়, সেটি হচ্ছে এই যে গল্পটিকে এত বড় না করলেও বোধ হয় চলত। ফেনিয়ে ফেনিয়ে গল্পটিকে এত বড় করা হয়েছে যে অনেক সময় পাঠকের পক্ষে ধৈর্য্য রাখা কষ্টকর হ'য়ে পড়ে। একটু কম ফেনালেও গল্পটির বিশেষ ক্ষতি হ'ত বলে মনে হয় না।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

অষ্টাদশী—হুমায়ুন কবির। নওরোজ পাবলিশিং হাউস।

এলোমেলো—মুরারি দে, বিজন মিত্র, ভক্তি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ।

হুমায়ুন কবির একজন আধুনিক যশস্বী কবি। তাঁর 'স্বপ্নসাধ' ও 'সাথী' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় পূর্ব্বেই পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করেছে। আলোচ্য পুস্তিকায় আঠারোটি সনেট সংগৃহীত হয়েছে।

বর্ত্তমান কালে সনেট রচনার দিকে বাঙালী কবিদের আগ্রহ কিছু বেড়েছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মোহিতলাল ও অজিত দত্তের কয়েকটি ছাড়া আর কারও সনেট প'ড়ে তেমন আনন্দ পাইনি। কবিরের এই সনেটগুলি কয়েকবার পড়লাম। তাঁর রচনার মধ্যে কোনো প্রকার শৈথিল্য না থাকলেও অসাধারণতা বা বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। সেই জন্যই সম্ভবত তাঁর সনেটগুলি পড়া শেষ হ'লে আবার ভুলে যাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্র দত্ত প্রমুখ রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের কাব্যে স্বকীয়তা নামক যে দুর্লভ গুণের পরিচয় পাই, তা কবিরের কবিতায় থাকলে সুখী হ'তাম। অথচ তাঁর কবিতায় একাধিক অন্যান্য গুণ বর্ত্তমান। শব্দ-নির্ব্বাচন ও ভাবাবেগের সুষ্ঠু প্রকাশে তাঁর কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিচিত্র কবি-কল্পনা ও তীব্র অনুভূতিকে এ-ভাবে রূপায়িত করতে অনেকেই ব্যর্থকাম হন। এই সব দিক দিয়ে কবিরের কৃতিত্ব সামান্য নয়।

দ্বিতীয় পুস্তিকাখানি গদ্য-কবিতার। বইখানির নামকরণে লেখকত্রয়ের বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতে হয়। গদ্য-কবিতা নিয়ে যে কি-রকম অনাচার চলতে পারে, এই বইখানি তার নিদর্শন। নিজের কোনো কথা বলবার নেই, অথচ

কবি হিসাবে গণ্য হওয়ার ইচ্ছা থাকলে যে বিপদ ঘটে—এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাউণ্ড-এর নগর সম্বন্ধীয় সুন্দর কবিতাটির ভাব বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে বিজন মিত্র কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, পাউণ্ড্-এর নামের উল্লেখ পর্য্যন্তও তিনি কোথাও করেননি।

সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে এ-জাতীয় বই পড়া একপ্রকার অসম্ভব।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

The Russian Revolution—by M. N. Roy (D. M. Library, Price One Rupee)

মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বিপ্লবী কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁর অক্লান্ত লেখনীর প্রশংসা সকলেই করতে বাধ্য হবেন। দুঃখের বিষয় শুধু এই যে তিনি মার্কস্‌বাদের যে ভাষ্য দেন তাকে অনেক সময় বিকৃতি বলেই মনে হয়। সরকারী পাহারার ফলে যাঁদের হাতে লেনিন বা ষ্টালিনের লেখা পৌঁছাতে পারে না, তাঁদের কাছে তাই রায় মহাশয়ের "রুষ বিপ্লব" সম্বন্ধে পুস্তিকাটি অতি মূল্যবান্ ও সারগর্ভ মনে হবে। কেবল রুষ বিপ্লব নয়, রাষ্ট্র, বিপ্লব ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে এ পুস্তিকায় বহু "মৌলিক" আলোচনা আছে। নিতান্ত বিনয়ী বলেই বোধ হয় তিনি সোজাসুজি বলেননি যে লেনিনের মতে তিনি আর সায় দিতে পারেন না। স্বাভাবিক ঔদার্য্যবশেই বোধ হয় তিনি ষ্টালিনের কর্ম্মপদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ সাম্যবাদীদের মত মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধে "নির্ব্বিচার আনুগত্য" ("uncritical conformity") তাঁর নেই। তাদের চোখ খুলে দেবার জন্যই এ পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছে। উদ্দেশ্য যে সাধু, সন্দেহ নেই।

রুষ বিপ্লবের ঘটনাবলীর আনুক্রমিক বিবরণ পুস্তিকায় পাওয়া যাবে না। যাঁরা পড়বেন, তাঁদের রায় মহাশয়ের মন্তব্যগুলিকে মোটের উপর আপ্ত-বাক্য বলে মেনে নিতে হবে। ৪৩ পৃষ্ঠায় লেনিনের একটি বক্তৃতার অংশ স্বপক্ষে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে সেটা অবিকল উদ্ধৃতি নয়! ঐতিহাসিকের পক্ষে, বিশেষজ্ঞ মার্কস্‌বাদী বলে পরিচিত লেখকের পক্ষে এ পদ্ধতি একটু আশ্চর্য্য বটে।

প্রথম প্রবন্ধে লেখক বলেছেন যে বিপ্লব সফল হতে হলে অনুকূল অবস্থা প্রয়োজন হলেও রাষ্ট্রের ভাঙ্গনই হচ্ছে সাফল্যের প্রধান কারণ। রুষ সম্রাটের শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়েছিল বলেই সেখানে বিপ্লবের জয় সম্ভব হয়েছিল। একথা অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়ঃ কিন্তু রাষ্ট্র সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, রাষ্ট্রের পতন স্বতশ্চল হয়ে ঘটে না; মাত্র আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির ফলেও রাষ্ট্র বিকল হয়ে পড়ে না—গণ-সাধারণের উদ্যোগ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান সহায়। কেবল রুষ শাসকদের অকর্ম্মণ্যতা ও অসাধুতার ফলেই রুষ রাষ্ট্রের পতন হয়নি; সে দেশের শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বিরোধিতাই রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে ফেলে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে যে বিপ্লবী আন্দোলন রুষদেশে চলেছিল, রায় মহাশয় তার গুরুত্ব সম্বন্ধে যেন মনোযোগ দেননি। রাষ্ট্রের পতন আগে হবে, আর তার পরে বিপ্লব সফল হতে পারবে এরকম কথা শুনলে মনে হয় যে ধনিকতন্ত্র যতদিন না জীর্ণ হয়ে পড়ছে আর আপনা আপনি রাষ্ট্রে ভাঙ্গন ধরছে, ততদিন বিপ্লবীদের কর্ত্তব্য হচ্ছে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা।

মার্ক্‌স্‌ প্রত্যাশা করেছিলেন যে ধনিকতন্ত্র যে দেশে খুব অগ্রসর হয়েছে, সেখানেই বিপ্লব আরম্ভ হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আসলে ধনিকতন্ত্র হিসাবে পশ্চাৎপদ রুষদেশেই বিপ্লব প্রথম এল। এই সমস্যার সহজ সমাধান রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন যে প্রলেটেরিয়ন্‌ বিপ্লব এখনও কোথাও হয়নি, রুষদেশেও নয়। রুষদেশে যা ঘটেছে, তা হচ্ছে বুর্জ্জোয়া বিপ্লবেরই প্রকারান্তর, ফরাসী বিপ্লবের পরিশিষ্ট বিশেষ। লেনিনের মতও যে ঐ ছিল, তা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

লেনিনের মত আসলে কি ছিল, তা জানা খুব শক্ত নয়। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে জেনীভায় তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে ১৯০৫ এর বিপ্লব হয়েছিল বুর্জ্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক উদ্দেশ্য নিয়ে বটে, কিন্তু তখনই লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক ধর্ম্মঘট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, আর তা ছাড়া সোভিয়েটেরও পত্তন তখন হয়েছিল। ১৯১৭ সালের এপ্রেল মাসে তিনি বলেন যে ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে যে বিপ্লব হয়েছিল, তাতে বিজয়ী হল বুর্জোয়াশ্রেণী বটে, কিন্তু তখনই পেট্রোগ্রাডে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েট গঠিত হওয়ায় বোঝা গেল যে শীঘ্রই বিপ্লব আর এক স্তর অগ্রসর হয়ে যাবে, শ্রমিকশ্রেণী ও সব চেয়ে গরীব চাষীরা সমাজের শাসনভার নেবে। ১৯১৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই, "State and Revolution" লিখেছিলেন; তাতে মার্ক্‌স্‌ আর এঙ্গেল্‌স্‌কে অনুসরণ করে প্রলেটেরিয়ন্‌ একাধিপত্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে "ধ্বংস" করে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। ১৯২০ সালে "Leftwing Communism" বইয়ে তিনি বলেন, "১৯১৭ সালের মার্চ্চ আর নভেম্বর মাসের বিপ্লবের ফলে দেশে সর্ব্বত্র সোভিয়েটের শক্তি বৃদ্ধি হল, আর সোভিয়েটের জয়ই হল প্রলেটেরিয়ন্‌, সোশালিষ্ট বিপ্লব"।

লেনিন কখনও মুহূর্ত্তের জন্যও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের কথা ভুলতেন না। সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে রুষ কৃষকদের সংগ্রাম যে বিপ্লবের একটা প্রধান অংশ, তা তিনি সর্ব্বদাই মনে রাখতেন। তিনি আরও জানতেন যে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে কৃষকদের না সরাতে পারলে বিপ্লবের সাফল্য সুদূর-পরাহত হবে। স্বৈরশাসন ও বুর্জোয়া শক্তি এ দুইয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে সমর্থ ছিল শুধু শ্রমিকশ্রেণী। রায় মহাশয় এ সব বিষয়ে কোন আলোচনা করেননি, কোথাও বলেননি যে ১৯১৭ সালের নভেম্বরে বুর্জোয়া শ্রেণীই বিপর্য্যস্ত হয়েছিল।

মার্ক্‌স্‌-বাদীরা কখনও বলে না যে প্রলেটেরিয়ট একলা বিপ্লব ঘটাতে পারে, সফল করাতে পারে। প্রলেটেরিয়টের কাজ হচ্ছে সমস্ত শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবী দাবীকে সমর্থন করে সকলকে সাম্যবাদের পক্ষে টেনে আনা। রুষদেশে ঠিক্‌ তাই-ই হয়েছিল। রায় মহাশয় তাঁর বইয়ে কোথাও বলেননি যে সেখানে বহু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক (অনেকে সাম্যবাদের মুখোস্‌ পরে) বিপ্লবকে মাঝপথে রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন; তিনি কোথাও বলেননি যে প্রলেটেরিয়টের মুখপাত্র বলশেভিক্‌ দলের উদ্যোগেই তাঁদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। "চাষীদের জমি দেওয়া হোক্‌" বলে যে রব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি একটা বুর্জোয়া দাবী বলে তুচ্ছ করেছেন! কিন্তু বুর্জোয়া দাবী বলেই যে তাকে পরিহার করতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। তাছাড়া, বুর্জোয়ারা যে দাবী শুধু তুলতে পারে, পূর্ণ করতে পারে না, তাকে প্রলেটেরিয়ন্‌ দল গ্রহণ করবে না

কেন? বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লবী কৃষকরা যে নতুন করে জমি ভাগ করে নিয়েছিল, তার ফলে রুষদেশের চাষী সাম্যবাদের দিকেই অগ্রসর হতে পেরেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন যে ব্যবস্থা, তাকে সাধারণত বলা হয় সমাজতন্ত্র বা সোশালিজ্‌ম্—আর তা হচ্ছে সাম্যবাদের (বা কম্যুনিজ্‌মের) প্রথম স্তর। কিন্তু রায় মহাশয়ের মতে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের তফাৎ হচ্ছে একেবারে ভুয়ো; ও দুই ব্যাপারই এক জিনিষ। মার্ক্‌সের যে ব্যখ্যা তিনি দিচ্ছেন, তাতে সাম্যবাদ আর সমাজতন্ত্রে কোন স্তরভেদ নেই। তাই কম্যুনিজম্ এখনও রুষদেশে প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে তিনি বল্‌ছেন যে সেখানে সোশালিজম্ নেই, সোশালিজমের উদ্যোগ হচ্ছে মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি মার্ক্‌সের "Critique of the Gotha Programme" বেশ ভাল করেই জানেন (এ বইয়ে তা থেকে উদ্ধৃতি আছে), অথচ তাতে মার্ক্‌স সাম্যবাদের স্তরভেদ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সে কথা কোন বিশেষ কারণে একেবারে গোপন করে যাচ্ছেন। লেনিনের "State Revolution" নিশ্চয়ই রায় মহাশয়ের প্রায় মুখস্থ; কিন্তু ঐ বইয়ে আছে: "The scientific difference between Socialism and Communism is clear. What is generally called "Socialism" was termed by Marx the "first" or lower phase of Communism"। অতি সুকৌশলে সোভিয়েট-শাসনের বিরোধিতা করার জন্যই কি তিনি যারা সাম্যবাদের বিকৃতিকে অপছন্দ করে, তাদের "Neo-Marxist" বলে বিদ্রূপ করেছেন?

আলোচ্য পুস্তিকার শেষভাগে রায় মহাশয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে এখন প্রলেটেরিয়টকে কেবল আত্মরক্ষাই করে যেতে হবে, আগুয়ান্ হয়ে বিপ্লব ঘটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু পৃথিবীর মজদুর একই ভাবের ভাবুক, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের সাহায্য করে নেপোলিয়নের মত নানা দেশে বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারে। "Red Napoleonism" কথাটি তিনি প্রায়ই ব্যবহার করছেন; কিন্তু "Red Napoleonism" কথাটার দাম খুব বেশী নয়। নেপোলিয়নের অভিযানের সঙ্গে সাম্যবাদের অভিযানের কোন তুলনা হতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন সাম্যবাদী আন্দোলনের যে প্রধান সহায়, তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্য দেশে বিপ্লব "রচনা" করতে পারে না, বিপ্লব একটা রপ্তানীর মাল নয়। প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তার উপর বৈদেশিক পরিস্থিতির প্রভাবেই বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

আজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে শক্তিমান করে তোলা হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। রুষবিপ্লবে মজদুর শ্রেণী ও বলশেভিক দলের অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই কাজে লাগার কথা। তাই রুষবিপ্লব সম্বন্ধে সযত্ন আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পুস্তিকাতে বিপ্লবী আড়ম্বরের অভাব নেই, কিন্তু রুষ বিপ্লবের অপব্যাখ্যা আছে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বচন্দ্রিকা—শ্রীমাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব কর্ত্তৃক প্রণীত, ৪৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য—১৲

সাংখ্য অতি প্রাচীন দর্শন, কিন্তু সে দর্শন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বইয়ের অভাব আছে বলেই এখনো নূতন বই প্রকাশ করবার প্রয়োজন আছে। সেই কারণেই গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টা। গ্রন্থকার ভূমিকায় সে কথা বলেছেন—"ঋষিপ্রোক্ত তত্ত্বকথা সমস্তই দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কাজেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য। যাহাতে অল্পবিদ্য লোকেও অনায়াসে অব্যক্তাদি তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আমি তত্ত্বগুলির লক্ষণ সরল সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি।"

এ বইয়ে গ্রন্থকার সাংখ্যের শুধু চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যাই করেছেন, সাংখ্য দর্শনের কোন সুসঙ্গত পরিচয় দেন নি। বইয়ের শেষে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু তা থেকে সাংখ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য সাংখ্য দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ দেবার জন্য যে এ বই লেখা হয় নি, তা বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যাবে।

সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা-কার বলেছেন—"মূল-প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ"। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান হচ্ছে অবিকৃত ; বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র বা রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও স্বাদ এই সাতটি তত্ত্ব হচ্ছে প্রকৃতির বিকৃতি। বাকী ষোলটি তত্ত্ব হচ্ছে বিকার। এই ষোলটি তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই হল সাংখ্যের প্রধান উপাদান আর এই উপাদানের সাহায্যে সাংখ্যকার সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির রহস্য নির্দ্ধারণ করেছেন।

তত্ত্বচন্দ্রিকায় এ তত্ত্বগুলির প্রত্যেকটির অর্থ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোচনার সারমর্ম্ম সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হয়েছে। শ্লোকগুলি অতি সহজ এবং তা সকলেই বুঝতে পারবে। একটি উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হবে—

নিত্যশুদ্ধস্বভাবো যো নিত্যমুক্তঃ সনাতনঃ।
সান্নিধ্যাৎ সৃষ্টিহেতুশ্চ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে।

অর্থাৎ পুরুষ হচ্ছে তাঁরই আখ্যা যিনি শুদ্ধস্বভাব, নিত্যমুক্ত, সনাতন এবং যাঁর সান্নিধ্যই হচ্ছে সৃষ্টির হেতু। মূল প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য লাভ না করলে সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ এ সৃষ্টি-ব্যাপারে পুরুষ নিজে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আলোচ্য বইখানি হতে সাংখ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় না পেলেও তত্ত্বগুলির সহজ ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। আর তত্ত্বগুলির অর্থ না বুঝতে পারলে শুধু সাংখ্য কেন ভারতীয় দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রের যে অনেক কথাই অবোধ্য হয়ে পড়ে তা' বলাই বাহুল্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
11904
LIBRARY

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।